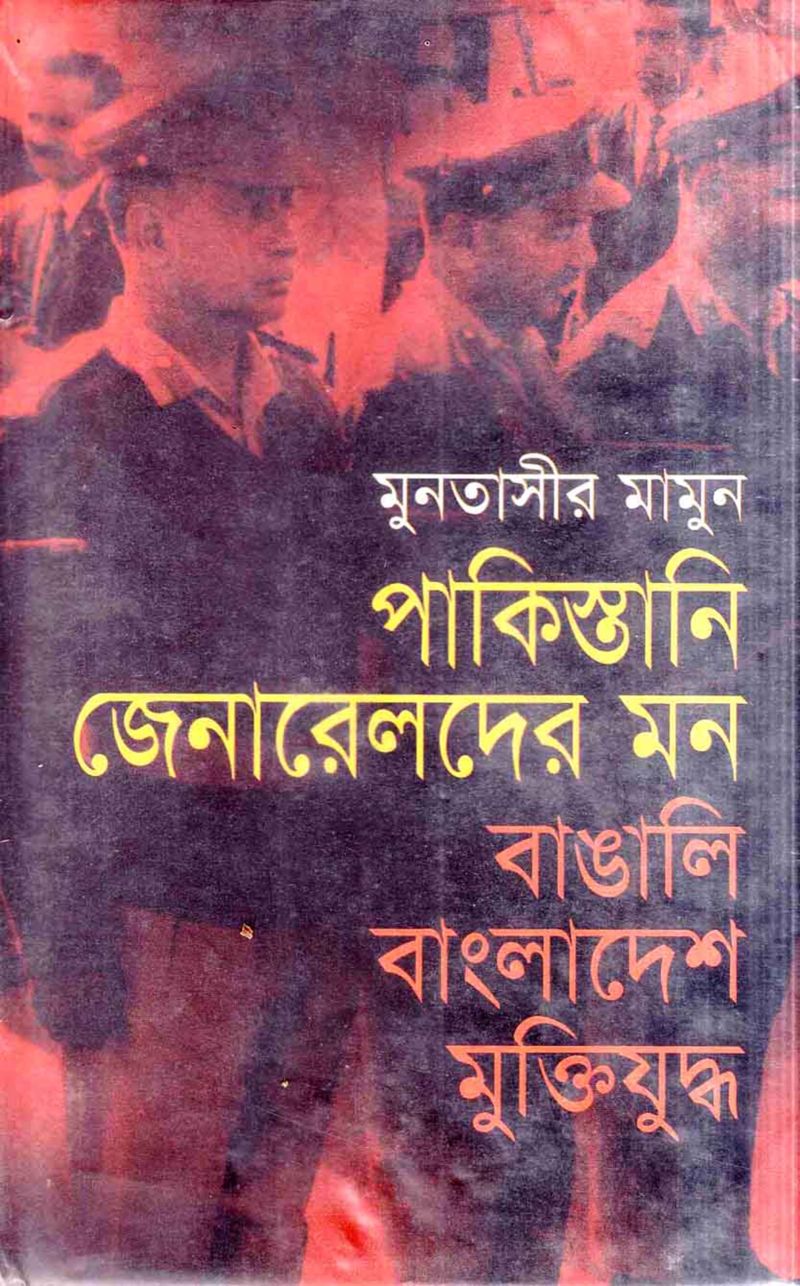


মুনতাসীর মামুন

পাকিস্তানি জেনারেলদের মন
বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

উৎসর্গ

সেইসব পাকিস্তানিদের
১৯৭১ সালে আমাদের দুঃসময়ে
যারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ করার সাহস দেখিয়েছিলেন

সূচিপত্র

বাঙলাদেশ

আমি একটা দেশ নই
যে তুমি আমাকে জ্বালিয়ে তছ্‌নছ করে দেবে
আমি একটা দেওয়াল নই
যে আমাকে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করবে
একটা সীমান্তরেখা,—আমি তা'ও নই
যে তুমি আমাকে মুছে ফেলে দেবে

দুনিয়ার পুরানো একটা নকশা
তুমি টেবিলে পেতে রেখেছ
এর মধ্যে কিছুই নেই
জটপাকানো কয়েকটা আঁকিবুঁকি ছাড়া
বৃথাই তুমি আমাকে সেখানে খুঁজে মরছো।

আমি উদ্বুদ্ধ মানুষের আকাঙ্ক্ষা
নিপীড়িতদের মরণজয়ী স্বপ্ন
মানুষ যখন মানুষকে শুষে রক্তপান শুরু করে
লুটতরাজ যখন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়
দমন-নির্যাতন যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গড়ায়
অদৃশ্য থেকে তখন যেন হঠাৎ আমি বেরিয়ে পড়ি
রক্ত-ঝরা হৃদয়ের ভেতর থেকে আমি জেগে উঠি

এর আগেও হয়তো তুমি আমাকে দেখেছ
কখনো পুবে, কখনো বা পশ্চিমে
শহরের সড়কে অথবা মেঠো-গাঁয়ে
মানুষজনের মধ্যে কখনো, আবার
এমনকি হয়তো বনে জঙ্গলে

আমার রয়েছে একটা ইতিহাস, আর
ইতিহাসই একমাত্র আমার
কিন্তু ভূগোল? না, মোটেই তা নেই
আমার ইতিহাস ঠিক পাখি-পড়া ক'রে
শেখানো যায় না
কিন্তু মানুষ—তবু তারা গোপনেই
এই সব শিখে নেয়

কখনো কখনো আমি প্রবলভাবে জয়ী
কখনো কখনো বা নির্জিত
কখনো আমিই চড়াই কসাইদের শূলে
কখনো বা নিজেই হই ক্রুশবিদ্ধ
ফারাকটা শুধু এই–
আমাকে যারা মারে, নিজেদেরই তাদের মরতে হয়
আমি, না
আমার মৃত্যু নেই

তুমি কী বেয়াকুফ
পিষে ফেলতে চাও আমাকে ট্যাঙ্কের তলায়
ভিক্ষেয় যা জুটিয়েছো
আমার ওপর ফেলতে থাকো নাপাম বোমা, দিনে-রাতে,
এতে একমাত্র নিজেকেই তুমি ফুরিয়ে ফেলবে
আমার কোন্ হাতটা তুমি শেকলে বাঁধতে চাও?
সাত কোটি হাত রয়েছে!
আমার কোন্ মাথাটা ধড় থেকে নামাতে চাও?
রয়েছে সাত কোটি মাথা!

মূল : কাইফি আজমী
তর্জমা : সিদ্ধেশ্বর সেন
[১৯৭১ সালে কাইফি আজমী উর্দুতে কবিতাটি লিখেছিলেন]

ভূমিকা

১৯৯৮ সালে আমি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য পাকিস্তান যাই এবং প্রায় একমাস প্রকাশক জনাব মহিউদ্দিন আহমদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রায় ৩৫ জন নীতি নির্ধারক ও বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এ ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রধান নির্বাহী আমেনা সাঈদের সাহায্য না পেলে প্রায় কিছুই করা সম্ভব হতো না। ফিরে এসে আমি পাকিস্তান সম্পর্কিত দুটি বই প্রকাশ করি— *সেই সব পাকিস্তানি* ও *পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ* [এর ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে]। উল্লেখ্য শেষোক্ত গ্রন্থটির ৭টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

পরাজিত পাকিস্তানি . . . ছিল ৪টি প্রবন্ধের সংকলন। এর মধ্যে দীর্ঘতম প্রবন্ধটি ছিল 'পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ।' পাকিস্তানে বিভিন্ন শহরে ভ্রমণের সময় পাকিস্তানি জেনারেলদের বেশ কিছু আত্মজীবনী চোখে পড়ে। সেগুলো সংগ্রহ করে পড়ে ফেলি এবং মনে হয় ঐসব গ্রন্থে যেসব মিথ্যাচার আছে সেগুলোর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। সে কারণেই প্রবন্ধটি রচনা করি। প্রবন্ধটির ভিত্তি ছিল ৭টি গ্রন্থ।

১৯৯৮ থেকে পরবর্তী দশ বছর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে জেনারেলদের লেখা আরো ১৪টি বই যোগাড় করি। আমার মনে হয়েছে, পাকিস্তানে জেনারেলরা ১৯৭১ সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক কাঠামোর সৃষ্টি করেছেন যার ভিত্তি মিথ্যাচার, তার বিশ্লেষণ করা উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মোট ২১টি বইয়ের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছি। এর মধ্যে তিনটি বই ইতিহাস সংক্রান্ত, একটি কমিশনের রিপোর্ট, বাকীগুলি আত্মজীবনী। এর বাইরেও যে দু-একটি বই নেই, তা নয়। তবে, আমার মনে হয় তাতেও আমরা যে তাত্ত্বিক ফ্রেম তৈরি করেছি ও যে উপসংহারে পৌঁছেছি তার হেরফের হবে না। এ বিষয়ে এটিই প্রথম বই। সুতরাং, ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারে। পাঠকরা পরামর্শ দিলে তা শুধরে নেব।

এ গ্রন্থে সম্পূর্ণতা আনার জন্য আমার ও মহিউদ্দিন আহমদের নেয়া বেশ

কটি সাক্ষাৎকারও সংকলন করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে *পরাজিত পাকিস্তানি . . .* গ্রন্থের ৭টি পরিশিষ্ট। ইতিহাসের কারণে, এসব পরিশিষ্ট [তথ্য] সংযোজন প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছে। পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা ১৯৭১ সাল সম্পর্কে কী ভাবছেন, তাদের নিবন্ধে তা বোঝা যাবে। এখানে উল্লেখ্য, *পরাজিত পাকিস্তানি . . . র* আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।

প্রায় এক দশক আগে কাজটি শুরু করেছিলাম। এখন তা শেষ করতে পেরে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, একটি কর্তব্য কর্ম সমাপন করলাম। পাণ্ডুলিপি রচনার সময় কলকাতার 'মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ' স্বল্প সময়ের জন্য একটি ফেলোশিপ প্রদান করেছিল। ফলে কাজটি দ্রুত এগিয়েছে। এর জন্য ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু আহমেদ মাহফুজুল হক ও আমাদের বিভাগের গবেষণারত ছাত্রী মুর্শিদা বিনতে রহমান-কে যিনি প্রুফ দেখার ও শব্দসূচি তৈরীতে সহায়তা করেছেন এবং ফরিদ আহমেদকে যিনি দ্বিধা না করে আমার যে কোন গ্রন্থ প্রকাশে প্রস্তুত।

১৯৯৯-২০০০ সালে পাকিস্তানিদের সহযোগী রাজাকারদের নিয়ে আমি দু'খণ্ডে একটি বই লিখি, নাম *রাজাকারের মন।* সে বইয়ে একই ভাবে রাজাকারদের লেখা বিশ্লেষণ করে যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম তার সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের জেনারেলদের মনের আশ্চর্য মিল দেখতে পাচ্ছি। একদিক থেকে দেখতে গেলে গ্রন্থ দুটি পরস্পরের পরিপূরক।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। আমরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম তা আমরা জানি। কিন্তু, পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ ও জেনারেলরা কেন আমাদের দমিত করতে চেয়েছিলেন? পশ্চিম পাকিস্তানিরা (তৎকালীন) কেন এ গণহত্যা সমর্থন করেছিলেন। বা পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা কি অনেক দিন ধরেই ভেবেছিলেন যে এরকম একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেবেন? নাকি তাৎক্ষণিক কারণেই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল? এখন প্রায় চারদশক পর তারা কী ভাবছেন? এসব বিষয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। এর একটা কারণ, হতে পারে যে এ বিষয়ে কেউ তেমন ভাবেননি। মুক্তিযুদ্ধে প্রতিপক্ষের অবস্থান গবেষণার দাবি রাখে।

এ বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করতে গিয়ে আমি পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলাম কয়েকবার। প্রথম ১৯৯৮ সালে। প্রকাশনা সংস্থা ইউপিএলের কর্ণধার মহিউদ্দিন আহমদ ও আমি এ বিষয়ে একটি প্রকল্প তৈরি করি। তারপর পাকিস্তান যাই। করাচির খ্যাতনামা প্রকাশনা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রধান আমিনা সাঈদ আমাদের সফরসূচি ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগের সুচারু বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তা না হলে আমাদের পক্ষে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ১৯৭১ সালের নীতিনির্ধারকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। এ সাক্ষাৎকারের সময়ই আমরা বিভিন্ন তথ্য পাই ও পাকিস্তানের নীতিনির্ধারকদের মানস জগত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট।

এ নিয়ে আমি একটি বই লিখি *সেইসব পাকিস্তানি* (১৯৯৯)। মহিউদ্দিন আহমদ ও আমার সম্পাদনায় সেই সব সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়। নাম *পাকিস্তানিদের চোখে মুক্তিযুদ্ধ* (২০০৫)। দুটি গ্রন্থই প্রকাশ করেছিল ঢাকার ইউপিএল।

এ কাজটি করার সময় জানতে পারি পাকিস্তানি জেনারেলরা আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে অনেকের আত্মজীবনী প্রকাশিতও হয়েছে। এসব আত্মজীবনীতে ১৯৭০-৭১ সালের ঘটনাবলি বিধৃত হয়েছে [কখনো কখনো প্রাক পাকিস্তানি বা ১৯৪৭ থেকে]। গত প্রায় দেড় দশকে বিভিন্ন জায়গা

থেকে আমি সেইসব আত্মজীবনী সংগ্রহ করেছি। বর্তমান গ্রন্থের ভিত্তি সেইসব আত্মজীবনী। পাকিস্তানি জেনারেলদের আত্মজীবনী লেখার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ [ব্যক্তিগত আগ্রহ বাদে]।

১. বর্তমানে পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে সৎ ও ত্রাতারূপে তেমনভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত সেনাবাহিনীকে দায়ী করা হচ্ছে। এ নিয়ে খোলাখুলি লেখালেখি হচ্ছে।
২. ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী বা যৌথ কমান্ডের কাছে ঢাকায় আত্মসমর্পণ [অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিম সীমান্তে ব্যর্থতা] এখনো সেখানকার মানুষজন, বিশেষ করে এলিট ও স্টাবলিশমিন্ট মেনে নিতে পারছে না। পাকিস্তান ভাঙার জন্য সে সময়কার কর্তাব্যক্তিদের দায়ী করা হচ্ছে। যারা ১৯৭০-৭১ সালে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের কাছে এটি বিব্রতকর।

আরেকটি বিষয়ও প্রাসঙ্গিক। এখনও গণহত্যার প্রসঙ্গ উঠে আসছে। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে– এ কথা শোনার পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। গণহত্যার প্রসঙ্গ এলে শুধু সেই সময় যারা ছিলেন তারাই নয়, বর্তমানে যারা আছেন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়েছে, হচ্ছে, হবে। কারণ, গণহত্যার দায়দায়িত্ব বর্তাচ্ছে রাষ্ট্রের ওপর।

এসব কারণে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে জেনারেলরা বা সেনা কর্মকর্তারা] বই লিখছেন। উল্লেখ্য, সেই ১৯৭২ থেকেই এ ধরনের বই লেখা হচ্ছে যার খবর আমাদের অনেকের জানা নেই। ১৯৭২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত প্রকাশিত জেনারেলদের ২১টি বই আমি আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। নিচে বছরের ক্রম হিসেবে বইগুলির নাম দিচ্ছি। উল্লেখ্য সবগুলি বই-ই ইংরেজিতে লেখা–

1972	Khan, Fazal Muqeem, Maj. Gen. *Pakistan Crisis in Leadership* Rawalpindi (Ferozsons)
1975	Khan, Saadullah, Brig. Gen. *East Pakistan to Bangladesh* Lahore (Lahore Law Times Pub.)
1977	Salik, Siddiq *Witness to Surrender* Karachi (Oxford University Press)

1983	Khan, Mohammad Ashgar, Air Marshal *Generals in Politics* Pakistan 1958-1982 Dhaka (UPL)
1984	Salik, Siddiq Brig. Gen. *The Wounded Pride* Lahore (Wajidalis)
1984	Musa, Mohammad, General *Jawan to General* Karachi (EWP)
1991	Malik, Tazammal Hussain, Maj. Gen. *The Story of My Struggle* Lahore (Jang Publishers)
1992	Ali, Rao Farman, Maj. Gen. *How Pakistan Got Divided* Lahore
1993	Khan, Gul Hassan, Lt-Gen. *Memoirs* Karachi (OUP)
1994	Matinuddin, Kamal, Lt-Gen. Tragedy of Errors *East Pakistans Crisis (1968-71)* Lahore (Wajidalis)
1996	Siddiqui, A. R. Brig. Gen. *The Military in Pakistan* *Image and Reality* Karachi (Vanguard Books)
1995	Arif, K. M. General *Working With Zia* *Pakistans Power Politics* Karachi (OUP)
1998	Khan, Z.A. Brig. Gen. *The Way it was* Karachi (Dynais)
1998	Niazi, A.A.K., Lt. Gen. *The Betrayal of East Pakistan* Karachi (OUP)
2002	Qureshi, Hakeem Arshad, Maj. Gen. *The 1971 Indo-Pak War* *A Soldiers Narrative*

	Karachi (OUP)
2002	Arif, K. M., General *Khaki Shadows* Pakistan (1947-1997) Karachi (OUP)
2002	Mitha, A.O., Maj. Gen. *Unlikely Beginning* *A Soldiers Life* Karachi (OUP)
2004	Siddiqi, A. R. Brig. Gen. East Pakistan : The Endgame *An Onlookers Journal (1969-1971)* Karachi (OUP)
2005	Khan, M. Ashgar, Air Marshal *We have Learnt Nothing from History* *Pakistan : Politics and Military Power* Karachi (OUP)
2007	Khan, Gohar Ayub, Capt. *Glimpses into the Corridors of Power* Karachi (OUP)
2007	Khan, Mohammad Ayub, Field Mrashal *Diaries of Field Marshal* Mohammad Ayub Khan (1966-1972) Editied and Annotated by Craig Baxter Dhaka (UPL)

এখানে উল্লেখ্য ফজল মুকিম (১৯৭২), মতিনউদ্দিন (১৯৯৪), সিদ্দিকি (১৯৯৬) ও আরিফের (২০০২) বই চারটিতে মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিকাশ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে রচিত হলেও তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বিধৃত হয়েছে। এছাড়া এই বইগুলিতে পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা পরিস্ফুট। বাকিগুলি সম্পূর্ণভাবেই আত্মজীবনী। বাকিদের মধ্যে অধিকাংশ কোনো না কোনো সময় পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কারণে যে তা ১৯৭১ সম্পর্কিত। ইয়াহিয়া খানের রিট আবেদনটিও আলোচিত হয়েছে। ১৯৭১ সাল সংঘটনের দায়-দায়িত্ব ইয়াহিয়া খানের। রিট আবেদনে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে এটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। রিপোর্ট

পাকিস্তানি জেনারেলদের মন : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

সম্পর্কি এ বই হলো : *The Report of the Hamoodur Rahman Commission of Inquiry in to the 1971 War,* Lahore (vanguard)

২

আত্মজীবনীগুলি পড়লে বোঝা যাবে এক ধরনের ইতিহাসতত্ত্বের কাঠামো তারা তৈরি করেছেন এবং সেই কাঠামোর আওতায় বইগুলি (দু-একটি ব্যতিক্রম হতেই পারে) লেখা হয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে পড়লে বিষয়টি ততটা সুষ্ঠু হবে না হয়তো। কিন্তু এ ধরনের বেশ কিছু বই একসঙ্গে পড়লে কাঠামোটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং বোঝা যায় কিছু পূর্ব ধারণা নিয়ে বইগুলি রচিত হয়েছে।

এ ইতিহাসতত্ত্বের ভিত্তি গণতন্ত্র, সমাজ, রাষ্ট্র সম্পর্কে পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত ও নীতিনির্ধারক এলিটদের চিন্তা-ভাবনা। কয়েকবার পাকিস্তান যাওয়ার সুবাদে আমার সুযোগ হয়েছিল সেখানকার বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে কথা বলার। তাদের সঙ্গে আলোচনার পর ধারণা হয়েছে তাদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে জেনারেলদের চিন্তা-ভাবনার বেশ মিল। ফলে, বলা যেতে পারে, এ ইতিহাসতত্ত্ব বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়, পাকিস্তানের মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গিই এ তত্ত্ব নির্মাণে সাহায্য করেছে। তবে, যারা বামপন্থী তারা এর সঙ্গে একমত নন। কিন্তু এ বিষয়ে তারা প্রকাশ্যে বলেন না।

জেনারেলদের মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, কিছু পূর্ব ধারণা তাদের মনের গহীন গভীরে গেঁথে আছে। প্রাক-পাকিস্তান ও পাকিস্তান পর্বের রাজনীতি এ ধারণার সৃষ্টি করেছে। অনেকে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেও দেখা যায় অন্তিমে এ পূর্ব ধারণা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেননি। এ পূর্ব ধারণার সৃষ্টির ভিত্তি, ইতিহাস ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা। সামাজিক সংগঠিত সমাবেশের ক্ষেত্রে ইতিহাস একটি ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্ষমতায় যাওয়ার পটভূমি তৈরি করতে পারে যা পরে দিতে পারে ক্ষমতার বৈধতা।

১৯৪৭ সালের আগে ভারতে মুসলমান নেতৃবৃন্দ সামাজিক সংগঠিত সমাবেশ ঘটানোর জন্য ইতিহাসের সূত্রগুলি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তারা মুসলমান নৃপতিদের কথা তুলে ধরেছেন, যারা শৌর্যে-বীর্যে ছিলেন অতুলনীয় এবং মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন ভারতীয় মুসলমানরা তাদেরই বংশধর। 'ইসলামী শাসনে'র যুগ স্বর্ণ যুগ। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের [কংগ্রেস] চক্রান্তে আজ

তারা হীনাবস্থায়। এই হীনাবস্থা থাকবে না যদি মুসলমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য, অর্থনীতির বঞ্চনাটাই ছিল মূল প্রতিপাদ্য।

এখানে উল্লেখ্য, মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্গের, ভূস্বামী বা ক্ষয়িষ্ণু ভূস্বামী। অন্য অর্থে সামন্তবাদী। ধর্ম ব্যবহার তাদের স্বার্থ রক্ষায় সহায়তা করেছিল। জিয়াউল হক এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সততা থেকে বিচ্ছিন্ন এই ধর্মবোধের উপর বেশি গুরুত্ব নানারকম ভণ্ডামীর জন্ম দেয় এবং শাসক শ্রেণীর হাতকেই আরো শক্তিশালী করে। ধর্মের রাজনীতিকরণ দরিদ্র জনগণের বিভ্রান্তি ও তাদের উপর শোষণকেই আরো বৃদ্ধি করে এবং যে দুর্নীতিকে তারা চারিদিকে দেখে আসছে এবং যে দুর্নীতির ভেতরে তারা সুদীর্ঘকাল ধরে আটকে রয়েছে, সেটাই বৃদ্ধি করে। ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ এক ধরনের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে যা দিয়ে এর প্রবক্তারা নিজেদেরকে সামন্ত তন্ত্র ও পুঁজিবাদ সৃষ্ট দুর্নীতির ক্লেদ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে।"

ইতিহাসের এই ব্যবহার মুসলমান তরুণদের সংগঠনে ভূমিকা রেখেছে এবং পাকিস্তান মানসিকতা তৈরি করেছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, পাকিস্তান = মুসলমান, ভারত = হিন্দু। এই মানসিকতা গঠন এত তীব্র ছিল যে এর রেশ এখনো উপমহাদেশের মুসলমানদের পক্ষে একেবারে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। হিন্দুদের পক্ষেও, হয়তো ১৯৪৬ সালে, এ কারণে শরৎবসু ও সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গুরুত্ব পায়নি, না মুসলিম লীগ না কংগ্রেসের কাছে। মুসলিম লীগ তখন এবং পরবর্তীকালে সফলভাবে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেছে।

পাকিস্তান হওয়ার পরও শাসকরা ইতিহাসের ক্ষেত্রে একই নীতির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। পাকিস্তান আমলে, আমরা যারা পড়াশোনা করেছি তাদের মধ্যে এই বোধই ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই সময় মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম রচিত দশম শ্রেণীর পাঠ্য *পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টিতে* (১৯৬৯) 'খিলাফত আন্দোলন, লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও অসহযোগ আন্দোলন' অধ্যায়ের উপসংহারে দেখান হয়েছে, জিন্নাহ কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন, খিলাফত আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন [অর্থাৎ তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদেই বিশ্বাস করতেন] "কিন্তু এই আন্দোলন চলাকালেই তাঁহার জ্ঞানোন্মোষ হয়েছিল যে, উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান দুইটি সম্প্রদায় দুইটি পৃথক জাতি। এই সময়টিতেই একদিকে গোঁড়া হিন্দু মহাসভীদের আর অন্যদিকে উগ্রপন্থী কংগ্রেসীদের হাতে মুসলমানদের বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই এই

সময়েই কায়েদে আজম মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন। অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, লক্ষ্নৌ চুক্তির ব্যর্থতা এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতাসমূহই পাক-ভারতের কোটি কোটি মুসলমানকে ১৯৪৭ সালে মুক্তি'র পক্ষে নেতৃত্ব দানে জাতির পিতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে প্রয়োজনীয় মনোবল ও প্রেরণা যোগাইছিল।" ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের সময় যা বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছিল, ছাত্রদের দাবির মুখে *দেশ ও কৃষ্টি* পাঠ্য তালিকা থেকে প্রত্যাহার করতে বোর্ড বাধ্য হয়।

অন্যদিকে, ভারতেও এই ধরনের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে ভাবনার জগতে। ভারত ভাগের পর ঐতিহাসিকরা এই তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন বা যে তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তা হলো, ভারত বিভাজনের জন্য মুসলমান বা মুসলিম লীগই দায়ী। এর সমালোচনা যে খানিকটা হয়নি তা নয়। তবে দল হিসেবে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসীরা এই তত্ত্ব বেশি প্রচার করেছেন যাতে ভারত বিভাগের দায় তাদের ওপর না পড়ে। বাংলা বিভাগের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন এর সবটাই সত্য নয়। তিনি লিখেছেন, ১৯৮০ সালে যখন তিনি গবেষণা শুরু করেন, "তখন একটা সাধারণ ও অনুকূল ধারণা প্রচলিত ছিল যে ভারত বাংলার বিভক্তি মুসলমানদের কাজ। হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমির অখণ্ডতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে কোনো কিছুই করেনি। ঐ সময়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণায় প্রকাশ পায় যে, স্বাভাবিক ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল এবং বহুত্ববাদী তাই হিন্দুত্বে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নেই। ... ঐ গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকদের (elites) ক্রম-সহিষ্ণু ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও মর্যাদা হুমকীর সম্মুখীন হওয়ায় তারা সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে কূট-কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা হিসেবে বিভিন্ন ভাবাদর্শকে ব্যবহার করে। সত্যিকার অর্থে ঐ কূট-কৌশলকে একমাত্র সাম্প্রদায়িক হিসেবেই আখ্যায়িত করা যায়।"

গত শতকের শেষ দশক থেকে ভারতে আবার হিন্দুত্ববাদের বা রাজনীতির প্রবল প্রতাপ, তাতে, জয়া জানাচ্ছেন, তাঁর যুক্তিগুলিই "কত বিতর্কিত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।"

গত দু'শ বছরের ইতিহাস চর্চায় এ ধরনের অসঙ্গতি সব সময় ছিল। ভারতে বা বাংলায় কী ধরনের ইতিহাস লেখা হয়েছে তাঁর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার' প্রবন্ধে। যে বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' প্রবন্ধটি নিত্য আমরা উদ্ধৃত করি আমাদের ইতিহাস রচনার স্বল্পতা ও 'ব্যর্থতার' ক্ষেত্রে সেটি সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আসলে বঙ্কিম কাদের বাঙালি মনে করতেন এবং কাদের ইতিহাস তিনি চেয়েছিলেন। বাঙালি তাঁর কাছে ছিল হিন্দু বাঙালি, অন্যরা তো নয়ই এমনকি মুসলমান বাঙালিরাও এই সংজ্ঞার বাইরে ছিল। সেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারা অব্যাহত থেকেছে, জোরদার হয়েছে, মাঝে মাঝে রাজনৈতিকভাবে পরাজয়ের কারণে পিছু হটেছে কিন্তু সব সময়ই ঐ ধারা পুষ্ট ছিল এবং ১৯৯০-এর দিকে তা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সেক্যুলার ইতিহাস চর্চার সংকট এইখানেই আজকের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জাতীয়তার ইতিহাসের সামঞ্জস্য আনা। সংকট এই জন্য যে জাতীয়তার যে ইতিহাস গত শতাব্দী থেকে লেখা হয়ে এসেছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে রয়েছে এমন সব কাহিনী, ধারণা, ব্যাখ্যা যা আজকের উগ্রহিন্দু প্রচারের প্রধান উপাদান। সত্যি বলতে কি বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখলে একটা সাংঘাতিক সত্য বেরিয়ে আসবে। সেটা হলো যে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিচ্ছবি, আয়নায় মুখ দেখার মতো তার রূপ। আকৃতি গড়ন, অবিকল এক।"

স্বল্প মেয়াদী সুবিধার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি মাঝে মাঝে এমন পন্থা গ্রহণ করে যা অন্তিমে শুধু তাদেরই নয় দেশেরও মারাত্মক ক্ষতি করে। এবং এ পন্থা তারা গ্রহণ করে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রে ইতিহাস বিশ্লেষণে বিপরীতমুখি দুটি দল বা ধারার আঁতাত বা সমঝোতা হতে পারে। গত শতকের আশির দশকে ভারতের একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। হিন্দুত্ববাদ বিকাশের সময়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। তাদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যে কংগ্রেস ও হিন্দু মৌলবাদী দলগুলি শংকিত ছিল। তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছিল, ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টি গাদ্দারের ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং ইঙ্গিতটি হচ্ছে স্বাধীন ভারতে তাহলে কমিউনিস্ট পার্টির বৈধতা কী? অন্যদিকে কংগ্রেস স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছে আর হিন্দু মৌলবাদী দেশগুলিতো হিন্দুরই প্রতিনিধি। প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরি [পরে বিজেপির] 'দি গ্রেট বিট্রেয়াল' নামে চার কিস্তিতে এক প্রবন্ধ লিখে আক্রমণ পরিচালনা করেন। কমিউনিস্ট নেতা নাম্বুদ্রিপাদ তখন বলেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর কর্তৃত্বমূলক শাসন ও ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বামপন্থী

কমিউনিস্ট দল লড়াই করছে এবং এখন তাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে অকমিউনিস্ট দলগুলি। এতেই দুপক্ষ আতঙ্কিত হয়েছে। উল্লেখ্য অরুণ শৌরি শতকে বিজেপি সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী হয়েছিলেন।[১]

এই ধরনের আঁতাত বিজেপিকে সহায়তা করেছে। পরবর্তীকালে বাবরি মসজিদ ঘটনায় ইতিহাস ব্যবহার করে তারা জনমত সংগঠন করেছে। তারা কতটা উগ্র জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক ও হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা ব্যক্ত করেছেন কয়েকজন ঐতিহাসিক। "উর্দুকে বিদেশী ভাষা এবং দাসত্বের সূচক বলে নিন্দা করা হয়, যদিও উর্দুর জন্ম ভারতে। একটি প্রবন্ধের জোরালো আওয়াজ : 'উর্দুর নামে আর একটি পাকিস্তান যেন না হয়।' অনুরূপভাবে, ভারতীয় খ্রিস্টানরা সংস্কৃত বা হিন্দির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে বলে তাদের নিন্দা করা হয়। জৈনধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মেরও অবমাননা করা হয়। কারণ, তারা অর্থনীতিক দার্শনিক চিন্তায় সেরকম কিছু প্রভাব রাখেনি।" বিজেপি-ভিএইচপি আরএসএস এর বহুল প্রচার যে তারা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে (সুতরাং, তারাই আসল ধর্ম নিরপেক্ষ); এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে *অর্গানাইজার*-এর এই অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা যায় : হিন্দু শুধু চায় যে তার সংস্কৃতি মহিমা অর্জন করুক। সে হতবাক হয় যখন একজন মুসলমানকে রাষ্ট্রপতি আর একজন মুসলমানকে প্রধান বিচারপতি করার পরে তাকে বলা হয় যে, সে মুসলমানদের চাকরি দিচ্ছে না... মুসলমানদের স্বীকার করতে হবে যে ভারত ঠিক ততটাই হিন্দু রাষ্ট্র যতটা মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তান অথবা ব্রিটেন খ্রিষ্টান রাষ্ট্র।"

৩

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিসরে বলা যায় ইতিহাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় সবাই কারণ ইতিহাস মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় জনমত বা জনসমাবেশ সংগঠনে যা সাহায্য করে ক্ষমতায় যাওয়ায় এবং ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ইতিহাসের যে যুক্তি ব্যবহার করা হয় তা বাস্তবায়নে যে ক্ষমতা পায় তা ব্যবহার করে বৈধতা পাওয়ায়।

এখানে গণতান্ত্রিক কাঠামোর কথা আসতে পারে তার ইঙ্গিত আগে দিয়েছি। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ইতিহাস সরকারিভাবে চাপিয়ে দেয়া সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কারণ, বিকল্প ধারায় তা প্রতিরোধ করা যায় ভায়োলেন্স ছাড়াই। যেমন, ভারতে বিজেপি ক্ষমতায় এসে পাঠ্য বই বদলানোর কর্মসূচি গ্রহণ করে কিন্তু সব রাজ্যে তা করা সম্ভব হয়নি। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টোরিকাল

রিসার্চের তারা খোলনলচে পাল্টে ফেলেছিল কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারেনি। কারণ এর বহুমাত্রিক প্রতিবাদ হতে পারে, হয়েছেও। তবে, চাপিয়ে দেয়া ইতিহাস অন্তিমে গৃহীত হয় না। হিন্দুত্ব ও তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়ে জনসমাবেশ বিজেপি করেছিল, অর্থনৈতিক সুফল তা বয়ে আনতে না পারায় তারা ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। আমাদের মতো দেশে সাধারণ মানুষ ইতিহাসের সত্যাসত্য থেকে অনেক দূরে। দৈনন্দিন অর্থনৈতিক বিষয়টিই অভিঘাত হানে বেশি। এলিট রাজনৈতিক নেতা ইতিহাস ব্যবহার করে জনসমাবেশ সংগঠন করতে পারে কিন্তু অন্তিমে সে আবেগ থাকে না। কংগ্রেস গত নির্বাচনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বেধে ক্ষমতায় গেছে এবং বিজেপি ইতিহাস নিয়ন্ত্রণে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল তা বিলুপ্ত করছে।

পাকিস্তানে শাসকরা ইতিহাসের পথ ধরেই এসেছে এবং বৈধতা অর্জন করতে চেয়েছে। ১৯৪৭-এর পর প্রথম কয়েক বছর সংসদীয় ব্যবস্থা থাকলেও অচিরেই তা হস্তগত করে বেসামরিক আমলারা এবং পরে সামরিক আমলারা। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের আগে যারা শাসন করেছেন তারা মুসলিম লীগের ব্যানারেই করেছেন। শুরু থেকে যে ইতিহাস দিয়ে জনসমাবেশ সংগঠিত করা হয়েছিল সেই ধারাটিই অক্ষুণ্ন ছিল। অর্থাৎ প্যান ইসলামিক মতবাদ, ভারতে মুসলমানদের আগমন ও মুসলমান শাসকদের শাসন-এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং এর ধারক মুসলমানরা। মুসলমানদের আনুগত্য থাকবে পাকিস্তান যিনিই শাসন করুন না কেন তার প্রতি এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি। এই ইতিহাস বোধ তীব্র করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রথম থেকেই পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিমের মুসলমানদের উঁচু স্থান দেয়া হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছে কলোনিতে। বিষয়টি বিদেশীদের চোখেও এড়িয়ে যায়নি। সেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় রিচার্ড পার্ক ও রিচার্ড হুইলার নামে দুজন গবেষক 'ফার ইস্টার্ন সার্ভে'তে লেখেন : "Gradually East Pakistanis have been impressed that their economic and development interests were being subordinated to those of west; that East Bengal was being treated as a 'colony' by the central Government. This feeling has been intensified by the language issue in the longstanding attempt of the Pakistan Government to popularise Urdu as the national language, to the detriment of Bengali. These grievances against the Muslim League Government at the centre compounded by the alleged corruption and inefficiency of the provincial Muslim League Government."

পাকিস্তানের ইসলামী আদর্শের মূল বিষয়টি সরলভাবে বলতে দাঁড়ায় এরকম– পাকিস্তান : মুসলমান যারা শৌর্যে বীর্যে শ্রেষ্ঠ। ভারত : হিন্দু, শৌর্যে বীর্যে যারা অধস্তন। পূর্ববঙ্গ/পাকিস্তান এর যোগ আছে ভারতীয়দের সঙ্গে। মুসলমান হলেও তারা ঠিক ততটা মুসলমান নয় যতটা মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানিরা। সুতরাং হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান থাকবে পূর্ব পাকিস্তানসহ তবে, পূর্ব পাকিস্তানি বা বাঙালিরা অধস্তন হবে। ১৯৬৭ সালেও দেখি মুসলিম লীগের মুখপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আজাদ* ঐ ইতিহাস নিয়েই চিৎকার করছে "পাকিস্তান ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট কর্মসূচি লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে। আমরা পাকিস্তানিরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমদ্দুনের পরিপন্থী কোনো প্রচেষ্টাই বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথমদিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল। তাই বিলম্বে হইলেও সরকার এই সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জনগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। আমরা সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।"[২৪] এই ছিল পাকিস্তানি মতাদর্শ যার মূল বিষয়-ই ছিল সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বিভেদ।

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর যখন নিজস্ব দল গড়লেন তখন এই 'ইতিহাস ঐতিহ্য'-কেই গ্রহণ করলেন। মুসলিম লীগের একটি অংশ নিয়ে গড়লেন কনভেনশন মুসলিম লীগ কারণ, মুসলিম লীগ পাকিস্তান এনেছে। সুতরাং, পাকিস্তান রাখতে পারে একমাত্র মুসলিম লীগ-ই। পরবর্তীকালে, সামরিক শাসক জে. মুশাররফ মুসলিম লীগ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি। ছাত্র জীবনে আমরা যে ইতিহাস পড়েছি পাকিস্তান আমলে, সেখানে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস প্রায় ছিল না বললেই চলে। এরপর এসেছে ১৯৭১, পাকিস্তানের বর্তমান ইতিহাসে আবার যার কোনো উল্লেখ নেই।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। আইয়ুব খান সচেতনভাবেই ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালের সামরিক শাসকরাও সে ধারা অপরিবর্তিত রাখেন। আব্বাস রশীদ লিখেছেন– "উলেমাগোষ্ঠীর নিকট আইয়ুব খানের নির্ভরশীলতার মধ্যদিয়ে সামরিক বাহিনী এবং সনাতনপন্থী সংগঠনের মাঝে অসম হলেও পারস্পরিক ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে ঐ সম্পর্কগুলো বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তবে সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধি

হিসেবে অগঠিত, অসংঘবদ্ধ উলেমাগোষ্ঠী নয় বরং তাদের স্থান ইতোমধ্যে দখল করে নেয় সুসংগঠিত জামায়াতে ইসলামী। জামাত-ই-ইসলামীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কেবল সমর্থনই করেনি, তাদের কর্মী ও সদস্যরা শান্তি কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।" আব্বাস আরো লিখেছেন, জামাত-ই-ইসলামীর এ সমর্থন সামরিক বাহিনীকে আশ্বস্ত করে এবং বাঙালি ভাব বিরোধী যে প্রচারণা তারা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা তা বিশ্বাস করেছিল। এভাবে 'ইসলামপন্থী' দলগুলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করে পরস্পরকে ব্যবহার করে।

কয়েক বছর আগে আমি পাকিস্তান গিয়েছিলাম। সেখানে নীতি নির্ধারক থেকে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অধিকাংশই স্বীকার করতে চান না যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছে কারণ, 'তারা তা জানতেন না'। এখনো তাদের ধারণা এখানকার বাঙালিরা ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু প্রভাবান্বিত। তাই বাঙালিরা সম পর্যায়ের হতে পারে না। এবং পাকিস্তান ভাঙার জন্য ভারতই দায়ী। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৯৭১ সালের ঘটনাবলী নিয়ে মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান একটি বই লিখেছেন। তাতে বলেছেন, "The Pakistan cause came to be connected with West Pakistan only. Thus the internal disenssions were being fostered to destroy Pakistan and regional affinities were being encouraged and Pakistan patriotism downgraded. The seeds of the crisis between East and West Pakistan, shown by Professors and teachers of the minority community, yielded a flourishing crop. In twenty-four years, the type of education imparted to them together with insistent Indian propaganda change the East Pakistani Muslims to Bengalis. A considerable reaction of young East Pakistan was therefore the first to break away from Pakistan and its basis."

জেনারেল মুকিম উল্লেখ করেছেন এ অঞ্চলের মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমান থেকে বাঙালি হয়ে গেল। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াও শুরু হয় ১৯৪৭ থেকে। পাকিস্তানি আদর্শ প্রবল ছিল। কিন্তু তরুণ, প্রগতিশীলদের মধ্যে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভও জন্ম নিচ্ছিল। ঐ প্রশ্নই তাদের বিদ্ধ করেছিল যে এই পাকিস্তান কি আমরা চেয়েছিলাম? স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের নায়ক তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরিতে এ রূপান্তরের বিষয়টি দেখা যায়। বাঙালি জাতীয়তা বোধের বিকাশ হচ্ছিল সমান্তরালভাবে যদিও পাকিস্তানি আদর্শও প্রবল ছিল এবং একেবারে উপড়ে ফেলা তা সম্ভব হয়নি, বর্তমান অবস্থা তার প্রমাণ। কিন্তু পাকিস্তানি আদর্শের বিপরীত বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিত্ব নিজের স্থান করে নিয়েছে এবং অন্তিমে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের

মাধ্যমে জয়লাভ করেছে। এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর একটি প্রবন্ধে। উদ্ধৃতি খানিকটা দীর্ঘ সত্ত্বেও সংক্ষেপে সামগ্রিক বিষয়টি বোঝার জন্য তা প্রয়োজনীয়। "বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ইতিহাসের ব্যবহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা জরুরি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পাকিস্তানের উচ্ছেদ পর্যন্ত সময়কাল বিশ্লেষণ করলে ইতিহাসবোধের নির্মিতি ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ইতিহাস ব্যবহারের একটা প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, সাবেক পূর্ব বাংলায় সর্বব্যাপ্ত কৃষক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ পর্যায়ে ধর্মজ জাতীয়তাবাদ ক্ষয় করেছে এবং পর্যায়ে পর্যায়ে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী করেছে। ধর্মজ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাঙালি কোলাবরেটর : রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, বিভিন্ন পীর ঘরানার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি পর্যায়ে নিঃশেষ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের হেজিমনি ও পাকিস্তান রাষ্ট্র উত্থিত ধর্মজ জাতীয়তাবাদ সার্বিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং প্রতিরোধকারী ও প্রতিযোগী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের হেজিমনি এবং বাংলাদেশ আন্দোলন উত্থিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের হেজিমনি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মজ জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িকতার বদলে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের বহুত্ববাদিতা কলোনিয়াল ইতিহাসের অবদমনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। এ হচ্ছে পাকিস্তান আমলের উপনিবেশের অধীন একটি জনসমষ্টির ইতিহাস পুনর্দখলের এক লড়াই এবং এই লড়াইয়ে জয়ী একটি জনসমষ্টির নিজস্ব ইতিহাস নির্মাণের লড়াই।"

৪

জেনারেলদের আলোচনা, মনোভঙ্গি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভারত বা হিন্দুকে তারা পাকিস্তানের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। বাঙালি ও হিন্দু সমার্থক। সুতরাং, যা কিছু হয়েছে ১৯৭১ সালে তার জন্য ভারতই দায়ী। অন্যান্য উপাদানও আছে (যা পরে আলোচ্য)। তবে মূল কথা এই–ফজল মুকিম খানের উদ্ধৃতি যা আগে দিয়েছি তা এর উদাহরণ।

জেনারেলদের কাছে, পূর্ববঙ্গ ছিল বাড়তি। তাদের আলোচনার ধাঁচটা এরকম–পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হয়েছে (পাঠকদের বোঝানো যে

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মোহ)। তবে, যতটা বলা হয় ততটা নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল দুর্বল। দক্ষ জনশক্তি ছিল না। পাকিস্তান [কেন্দ্র] কী করবে? যতটুকু করার ততটুকু করা হয়েছে। ফজল মুকিম যেমন লিখেছিলেন, ইসলামাবাদ ঢাকাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত করেছে– এই তত্ত্ব বিশ্বপ্রেস মেনে নিয়েছে। তারা এই 'অতিরঞ্জন' মেনে নেয়ায় তিনি বিস্মিত। ফরমান লিখেছেন, বাঙালিরা ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার কথা ভুলে গেছে। শুধু তাই নয়– "History was sought to be falsified and disowned, presumably in vain as has been."

যে সব জেনারেল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তাদের ভাষ্য, তিনি এখানে যে পদে ছিলেন সে পদে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কাজ করতে চেয়েছেন।

পাকিস্তানে গণ্ডগোল বাধিয়েছে বাঙালিরা। এ ধারণা অধিকাংশ পাকিস্তানির। অনেকে এর বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, পশ্চিমে ছিল সামন্তবাদী কর্তৃত্ব, পূর্ব ছিল তা থেকে মুক্ত। পূর্বের মধ্যবিত্ত এ ধরনের আধিপত্য মানতে রাজি হয়নি। বিরোধটা সেখান থেকে শুরু। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য যেভাবে হাহাকার করেছে পশ্চিমে হাহাকার ততটা ছিল না। গণতন্ত্রের বিষয়টা পাকিস্তানের এলিট শাসকবর্গ কখনো পছন্দ করেনি।

এ বিষয়ে সাহায্য করেছে কিছু পূর্ব ধারণা। জেনারেলরা কেন, পাকিস্তানের খুব কম মানুষই এ ধারণা থেকে মুক্ত। ধারণাটা হলো বাঙালির মুসলমানত্ব নিয়ে সন্দেহ। যাদের নিয়ে আলোচনা করেছি তাদের অধিকাংশই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাঙালির মুসলমানত্ব নিয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালিরা বেশি মুসলমান। কিন্তু যখন তারা লিখেছেন অজান্তেই পূর্ব ধারণায় আক্রান্ত হয়েছেন। ১৯৭১ সালে গণহত্যার সময়ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মনে একই ধারণা কাজ করেছিল।

এ ধারণা গড়তে সাহায্য করেছে পাকিস্তানিদের প্রচণ্ড ভারত ও হিন্দু-বিদ্বেষ। তারা দেখেছে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে মিল বেশি এবং পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু জনসংখ্যাও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি। তাছাড়া বাঙালিরা তেমনভাবে হিন্দু ও ভারত-বিদ্বেষী নয় যেমনভাবে পাকিস্তানিরা বিদ্বেষী। সে কারণে দেখি যে কথাটিই কোনো না কোনোভাবে তারা গুরুত্ব দিয়েছেন আত্মজীবনীতে, তা হলো বাঙালিদের মনমানসিকতা প্রভাবিত করেছিল হিন্দুরা। আর হিন্দুরা তো ভারতীয়দেরই অংশ। ভারত সবসময় পাকিস্তানের শত্রুতা করেছে, পাকিস্তানের বিনাশ চেয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরা

বাঙালি তরুণদের বিভ্রান্ত করেছে তাই পাকিস্তানি চেতনা বাঙালিদের মধ্যে কাজ করতে পারেনি। এবং সে কারণে বাঙালিদের মন চলে গিয়েছিল বিচ্ছিন্নতার দিকে।

কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক–

১. মুসলমানদের বাঙালিরা পছন্দ করত না। পছন্দ করত হিন্দুদের। -ফজল মুকিম খান
২. শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে। তারাই পাকিস্তান বিরোধী প্রচার করে। ফলে পাকিস্তানের পক্ষে সংহতি দানা বাঁধেনি। -সাদুল্লা
৩. পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সব জমিদার [১৯৭১ সালেও]। তারা মুসলমানদের শোষণ করছে। -ঐ
৪. বাঙালিরা ধুতি পরে [অর্থাৎ হিন্দুদের অনুসরণ করে] -ফরমান আলী
৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'মুক্ত' করতে গেলে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ এসেছিল জগন্নাথ [হিন্দু] হল থেকে। -ঐ
৬. ভারত প্রথম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ভাঙার কাজে নিয়োজিত ছিল। -উমর
৭. ১৯৪৭ সালের পরও হিন্দু শিক্ষকরা রয়ে গেছে পূর্ব পাকিস্তানে। -ঐ
৮. বাঙালিরা জারজ [বাস্টার্ড]। -ঐ
৯. বাঙালিরা ছিল প্রচণ্ডভাবে হিন্দু প্রভাবিত। -মতিনউদ্দিন
১০. ২৩ মার্চ ৩২ নং থেকে একদল হিন্দু বেরুলো। -জহির
১১. হিন্দুরা চারপেয়েতে বসে, মুসলমানরা মেঝে। -মিঠা

আগরতলা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল ভারতীয় সাহায্যে। এমনকি ৬ দফাও। ৬ দফাকে সব সময় পাকিস্তানি জেনারেল ও এলিটরা বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিন্ধী বা বালুচিরা এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

১৯৭১ সালের ঘটনাবলির বয়ান করেছেন তারা এভাবে– পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল। বিহারি ও পশ্চিম পাকিস্তানিরা আক্রান্ত ও নিহত হচ্ছিলেন। উপায়ন্তর না দেখে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দু-একটি প্রাণহানি ঘটে, তবে গণহত্যা-জাতীয় কিছু ঘটেনি। ভারত নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আক্রমণ করেছিল পূর্ব পাকিস্তান। জেনারেলরা কেউ-ই যৌথ কমান্ডের বিষয়টি স্বীকার করেননি। পারতপক্ষে মুক্তিবাহিনীর উল্লেখ করেননি।

এ বিষয়টি বারবার ঘুরেফিরে এসেছে এভাবে– আওয়ামী 'গুণ্ডারা'

বিহারিদের, অবাঙালিদের [পশ্চিম পাকিস্তানি] হত্যা করছিল। সৈন্যদের টিটকারি মারছিল। বিদ্রূপ করছিল। তাদের খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ২৫ মার্চ যার বিস্ফোরণ ঘটে। বাঙালিদের পক্ষ থেকেও প্রতিরোধ করা হয়েছিল। ফলে, দু-একটি ঘটনা ঘটে। যুদ্ধে এমনটি ঘটতেই পারে।

মুক্তিযুদ্ধ বলে তেমন কিছু ঘটেনি। ফজল মুকিম যেমনটি লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধ হলো ভারতীয় আগ্রাসন। সাদুল্লা লিখেছেন, মুক্তিযোদ্ধা কারা? ভয় পেয়ে কিছু লোক ভারত গিয়েছিল। ভারত তাদের আটকে রেখে বাধ্য করে যুদ্ধ করতে। মুক্তিরা পাকিস্তান সেনাদের ভয়ে কাবু থাকত। আর গণহত্যা। যে সব স্বেচ্ছাসেবী বা শরণার্থী অবাধ্য হতো ভারত তাদের ও তাদের পরিবারদের হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিত। লুটপাট, ধর্ষণ, গণহত্যা সম্পর্কে তাদের ভাষ্যের কয়েকটি উদাহরণ দিই–

১. এ সব কিছু ভারতীয় প্রচার। ভারতীয়রা যা প্রচার করে তাতে কান না দেয়াই সমীচীন। কারণ এ ক্ষেত্রে " Objectivity, fairness and even reason went down before a thumping to punish and destroy Pakistan"

২. বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে ভারতীয় আর মুক্তিবাহিনী। -ফরমান

আসলে, ভারতের কাছে পরাজয়ের ব্যাপারটা তবুও স্বীকার করা যায়। কিন্তু বাঙালিদের কাছে? অসম্ভব।

জেনারেলদের বিশেষ ক্রোধ রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে বাঙালি রাজনীতিবিদ ও দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতি। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দুর্গতির জন্য এককভাবে রাজনীতিবিদরা দায়ী। আর বাঙালি রাজনীতিবিদরা হচ্ছে 'বাস্টার্ড'। কয়েকটি উদাহরণ দিই–

১. রাজনৈতিক নেতাদের 'misrule and misdeeds' সবকিছুর জন্য দায়ী। -ফজল মুকিম

২. মুজিব হলেন বিশ্বাসঘাতক। -ঐ

৩. ১৯৭০ সালে নির্বাচনের টাকা [আওয়ামী লীগের কাছে] এসেছে ভারত থেকে। -ফরমান

৪. রাজনীতিবিদরা সবসময় দু'মুখো নীতি গ্রহণ করে। -ঐ

৫. মুজিব হলো বাস্টার্ড। -ইয়াহিয়া

৬. তাজউদ্দীন ছিলেন ব্রাহ্মণপুত্র, 'diehard indian'। -ফরমান

৭. পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী রাজনীতিবিদরা। -ঐ

৮. আইয়ুবের ভুল হচ্ছে, রাজনীতিবিদদের তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। -গুল হাসান
৯. শেখ মুজিবকে হিন্দুরা টাকা যোগাত। -ঐ
১০. রাজনীতিবিদরা সৃষ্টিশীল মিথ্যাবাদী। -ঐ

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজনীতিবিদদের ঢালাওভাবে দায়ী করলেও তাদের আক্রোশটা বেশি বাঙালি রাজনীতিবিদদের প্রতি। কোনো বাঙালি রাজনীতিবিদদের প্রতি তারা একটি ভালো বাক্য উচ্চারণ করেনি। ১৯৭১ সালের ঘটনা বিশ্লেষণকালে তারা যতটা না ভূট্টোর প্রতি তার চেয়ে বেশি বঙ্গবন্ধুকে শুধু দায়ী নয় হেয় করেছে। প্রায় ক্ষেত্রে তাকে 'গুণ্ডা', 'বিশ্বাসঘাতক' বা 'জারজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা যে কতটা বর্ণবাদী ছিল মনেপ্রাণে এগুলি তার প্রমাণ।

পাকিস্তান যে ভেঙে গেল তার জন্য বাঙালিরা তো দায়ী-ই তবে, পাকিস্তানে কেউ দায়ী হলে সে হচ্ছে ভূট্টো এবং ইয়াহিয়া। ইয়াহিয়া খান যেহেতু অসম্মানিত, মৃত এবং তার কোনো রাজনৈতিক সাপোর্ট নেই, সেহেতু পাকিস্তান ভাঙার জন্য তাঁকেই প্রধানত দায়ী করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গেই আসে সেনাবাহিনীর কথা।

জেনারেলরা সবাই সামরিক শাসনের বেনিফিশিয়ারি। তা সত্ত্বেও তাদের স্বীকার করতে হয়েছে সামরিক শাসন জনগণের জন্য মঙ্গল বয়ে আনেনি। কিন্তু সামরিক শাসন কেন এলো? কারণ, পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি ও পাকিস্তান ভাঙার জন্য রাজনীতিবিদদের দায়ভারই বেশি। সেনাবাহিনী বরং পাকিস্তানের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে।

যেমন- ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের টর্নেডোর সময় তারা প্রাণপণে খেটেছে কিন্তু কোনো কৃতিত্ব তাদের দেয়া হয়নি। তারা ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য দেখায়নি। বৈধভাবে কেন্দ্রের কর্তৃত্বের অধীনে থেকেছে। আর সৈনিকরা বা জেনারেলরা তো খারাপ কিছু করতে পারে না। এই যেমন, টিক্কা খান, সবাই তাকে ভুল বোঝে। ফরমান লিখেছেন, টিক্কা ছিলেন – "Straight forward, honest, obedient soldier." বা সেনাবাহিনীকে সমালোচনা করার অর্থ শত্রুকে সহযোগিতা করা।

৫

রাষ্ট্রে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ১৯৫০ সাল থেকেই সেনা কর্তৃপক্ষ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা ঠিকই অনুধাবন করেছিল এই আধিপত্য সুদৃঢ় করতে হলে অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে এবং বেআইনীভাবে তারা তা গড়ে তুলেছিল, আয়েশা সিদ্দিকা যাকে 'milbus' বলে উল্লেখ করেছেন।

ক্ষমতা করায়ত্ত করার এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সেনাবাহিনী ১৯৫০ থেকে একধরনের ইমেজ তৈরি করেছে যার বর্ণনা পাওয়া যাবে ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকির বইতে। প্রচারের কয়েকটি উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

১. সেনাবাহিনী ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। অর্থ : অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি তা নয়।
২. সৈনিকরা সহজ, সরল, ধর্মভীরু। অর্থ : অন্যরা তা নয়।
৩. সৈনিকরা মুজাহিদ। তারা ইসলাম ধর্ম রক্ষায় বিশ্বাসী। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হলে বেহেশত। অর্থ : অন্যরা ধর্মের রক্ষক নয়। ভারত কাফের। সুতরাং সেনাবাহিনীকে সবসময় জিহাদী জোশে রাখা। বাংলাদেশে তারা গণহত্যা চালিয়েছিল এই কাফের নিধনের অজুহাতে।
৪. সেনাবাহিনী দেশপ্রেমিক। অর্থ : অন্যরা তেমন নয়। রাজনীতিবিদরা তো নয়ই কারণ তারা নিজের বা নিজদলের প্রতি বিশ্বস্ত।
৫. সৈনিকরা সৎ। অর্থ : অন্যরা দুর্নীতিপরায়ণ।
৬. সেনাবাহিনী কর্মদক্ষ। অর্থ : অন্যরা নয়।

সুতরাং, দেশ চালাবার অধিকার সেনাবাহিনীর। এ কারণেই পাকিস্তানে 'আর্মড ফোর্সেস ডে' নামে একটি বিশেষ দিবস পালিত হয়।

ধর্মের বিষয়টির ওপর সজ্ঞানে জোর দেয়া হয় জিয়াউল হকের সময়। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল কাইউমের লেখা 'জিয়া অ্যান্ড আই' (১৯৯৬) গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। কাইয়ুম ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সোর্ড অব অনার পান। ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি তাঁর ওপর এখন অভিঘাত সৃষ্টি করে যে তিনি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু স্ত্রী পাকিস্তানি হওয়ায় পাকিস্তান থেকে যান। জিয়ার সঙ্গে তিনি একত্রে কাজ করেছেন, ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জিয়া ক্ষমতায় আসার পরই কাইয়ুমকে বলেন, কীভাবে সেনাবাহিনীকে আরো ধর্মের পথে আনা যায় তার পরিকল্পনা দিতে।

কাইয়ুম বিভিন্ন ইউনিটে 'ঈমান, তাকওয়া ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' এর ওপর বক্তৃতা দিতে লাগলেন। জিয়া এ তিনটি শব্দকে সেনাবাহিনীর মূলমন্ত্র করেছিলেন কাইয়ুমের আপত্তি সত্ত্বেও।

আব্বাস রশীদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, জিয়াউল হক সচেতনভাবে একটি মতাদর্শ গড়ে তোলেন এবং জামাত-ই ইসলামী তাকে সাহায্য করে। "ইসলামকে ঐ মতাদর্শে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে সংগঠিত করা নয় বরং তাকে আদর্শহীন করে গড়ে তোলা, তাকে নিরস্ত্র করা। "সামরিক বাহিনী ঐ মতাদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা গ্রহণ করে জামায়াতে ইসলামী থেকে। "যেমন মজলিস-ই-সুরা, কাজী কোর্ট, মসজিদ-স্কুল কর্মসূচি। লাভ-লোকসান ভাগ-বাটোয়ারা কর্মসূচি, জাকাতের উপর গুরুত্ব এবং সত্যিকার ধর্মপালনকারী একজন মুসলিম হিসেবে জিয়াউল হককে প্রচার মাধ্যমে আনার কর্মসূচির মাধ্যমে সামরিক জান্তার ভাবমূর্তিকে ইসলামী বলে প্রচার করা সম্ভব হলো। ফলে তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিরোধ দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব হলো।

হামজা আলাভী লিখেছেন, সৈনিকদের মাঝে "ধর্মীয় মতবাদ, জাত্যাভিমান ও দক্ষিণ পন্থী ধ্যান-ধারণা", বেশি করে ছড়ানো হয়েছে। "সৈনিক ও ছোট অফিসারদের ক্ষেত্রে মতাদর্শের বিষয়টি খুবই জরুরি (কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে নিজ দেশের জনগণকে নিপীড়ন নির্যাতন করতে হয়) এবং তাদের জন্য 'মনের জোর' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তাদের মন-মানসিকতাকে এক ধরনের জাত্যাভিমানের বিকারে পূর্ণ করে দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ইসলামী মতবাদ দিয়ে ও বিরোধীপক্ষরা 'ইসলামের শত্রু' এই আখ্যায় চিহ্নিত করে দিলে ভালো কাজ হয়।"

এক্ষেত্রে 'মিলবাসে'র বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করতে হয়। আয়েশা সিদ্দিকা তাঁর বিখ্যাত বই 'মিলিটারি ইনক্ : ইনসাইড পাকিস্তান'স মিলিটারি ইকোনমি' গ্রন্থে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–" Milbus refers to military capital that is used for the personal benefit of the military fraternity, especially the officer cadre, but is neither record nor part of the defence budget. In this respect, it is a completely independent genre of capital. Its most significant component is entrepreneurial activities that do not fall under the scope of the normal accountability procedures of the state and are mainly for the gratification of military personal and their cronies." [পৃ. ১] উল্লেখ্য, এই সুবিধা সমভাবে বিতাড়িত হয় না, অফিসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আরেকটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিল সেনাবাহিনী যে, শুধু দেশ রক্ষা

নয়, জাতীয় উন্নয়নেও তারা ভূমিকা রাখে। রাজনীতিবিদরা ব্যর্থ হয় তখন বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা নিতে হয়। বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে লিখেছিলেন ফজল মুকিম খান– যে সেনাবাহিনী "is above politics and parties. The performance of its officers and Jawans and the basis of its traditions spring from there readiness to serve the state and the nation in the best way they can do... it has acquired a unique spirit and sense of purpose and has proved itself Pakistan's greatest stabilizing force." [পৃ. ২৩৯-৪০]

সন্তোষ গুপ্ত একটি প্রবন্ধে একটি জরিপের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন– "১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এই দশকে তৃতীয় বিশ্বের ৭৭টি স্বাধীন দেশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে রবার্ট জ্যাকসন বলেন, 'সংক্ষেপে অর্থনীতিক উন্নয়নের মাত্রা কিংবা ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বিশেষে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ সামাজিক পরিবর্তনে কোনো অনন্য ফল রাখতে পারে না।'

পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সামরিক শাসকরা যে সব যুক্তি দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর ফ্রাংকম্যান চার্চের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে হয়। তিনি বলেছিলেন– "আমার বেশ মনে আছে শৈশবকালে তখনও রাজনীতিতে প্রবেশ করিনি, তখন ইউরোপে ফ্যাসিস্টরা রাজনৈতিক দল উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের পক্ষে একই যুক্তি দিয়েছিল। সুতরাং কোনো সামরিক শাসকই রাজনীতি, অর্থনীতি, দুর্নীতি ও প্রশাসন সম্পর্কে নতুন কথা বলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে এশিয়া ও আফ্রিকায় সামরিক স্বৈরশাসকরা অবশ্য কোথাও কোথাও গণতন্ত্রের কথা বলে থাকেন। ফ্যাসিস্টদের সাথে তাদের এই বাহ্যিক পার্থক্যটুকু এসব দেশে জনসাধারণের ঔপনিবেশবাদী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্য হেতু বজায় রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।"

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ বাতাবরণ তৈরি করেছিল একচ্ছত্রভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য। 'মিলবাস' তাদের সে ক্ষমতা যুগিয়েছিল। 'এ মিলবাসের' কারণেই তারা ১৯৭১ সালে ঐ ধরনের ঔদ্ধত্য দেখাতে পেরেছিল। ইতিহাস বলে, যেসব কারণে তারা বারবার ক্ষমতা দখল করেছিল তা কথার কথা এবং এ ধরনের প্রচারণা মিথ্যা। তারা পাকিস্তানের কী করেছে আজকের পাকিস্তান তার প্রমাণ।

এ কারণে বিলাল হাশমী তাঁর প্রবন্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে বিষবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন– "ঔপনিবেশিক যুগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে বীজ জন্ম নিয়েছিল, নয়া উপনিবেশবাদী যুগে তা এক মহীরুহে পরিণত হচ্ছে, স্যার ওলেফ ক্যারো যথার্থই ব্রিটিশ সৃষ্ট এই বিষবৃক্ষের

বীজটাকে চিনতে পেরেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের নতুন যুগে এটা কিরকম বীভৎস এক রূপ নেবে সেটাও যথার্থভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন।"

এ দৃষ্টিভঙ্গি বা এসব উপাদান থেকেই নির্মাণ করা যায় একটি নতুন প্রত্যয় 'পাকিস্তান।' অর্থাৎ সেনাবাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্র দখল করে, রাষ্ট্র ধ্বংস। সামগ্রিকভাবে খারাপ অর্থেও আমরা বলি যে, সে পাকিস্তানি বা পাকিস্তানি মন। আর জেনারেলরা যে আলোচনা করেছেন তা এই পাকিস্তান প্রত্যয় মনে রেখেই।

৬

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গও খানিকটা আলোচনা করতে চাই, না হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ মনে হবে।

১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যা ঘটেছে তার সঙ্গে আমরা পরবর্তী ইতিহাসের মিল খুঁজে পাই। কেন? বাংলাদেশের সামারিক শাসকরাও এ সংজ্ঞাটির বাস্তব রূপায়ণ করেছিলেন নিজের দেশে। এ মনোভঙ্গির অর্থ দাঁড়ায়, আমলাতন্ত্র, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্র-কর্তৃক সিভিল সমাজ ও রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ লুটের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ তা যেভাবেই হোক না কেন। এ কারণে দেখি, সামরিক বাহিনীর (তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অংশ) অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, বীরত্ব দেখিয়েছিলেন কিন্তু অন্তিমে ঐ মনোভঙ্গির বাইরে যেতে পারেননি। কারণ, বেড়ে ওঠার বয়সে তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন পাকিস্তানে, পাকিস্তানি প্রশিক্ষকের কাছে, যৌবনও কাটিয়েছেন সেখানে। বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করে, তারা সেই পাকিস্তান তত্ত্বও প্রচার করেছেন মাতৃভূমিতে। এটাই আমাদের ট্র্যাজেডি।

এই পাকিস্তানি মন বা তত্ত্ব কিভাবে প্রভাবিত করেছিল আমাদের শাসক ও রাজনীতিবিদদের একাংশকে তার কয়েকটি উদাহরণ দিই।

জেনারেল জিয়াউর রহমান আইয়ুব খানের মতো একই ভঙ্গিতে ক্ষমতা দখল করে হাঁ-না ভোট করেন। রাজনৈতিক দলগুলি বিলুপ্ত করেন, পরে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তাদের কাজের অনুমতি দেয়া হয়। শাসনতন্ত্রের মূলধারাগুলো পরিবর্তন করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় সে সব দেশ যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। প্রচারমাধ্যম সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নিজের ও সেনাবাহিনীর ইমেজ বৃদ্ধিতে ব্যবহার।

জিয়াউর রহমান যা করেছেন তার আমলে, তাতে স্পষ্টভাবে বলা যায়

কাকুল ভাবধারা থেকে তিনি বেরুতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধে তার যোগদানটা ছিল দৈব ঘটনা মাত্র। না হলে, মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধার বাতাবরণ তৈরি করে দেশটিকে পাকিস্তান করতে পারেন না। তিনি প্রথমেই ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করলেন সেই প্রাক-১৯৪৭ সালের মুসলমানদের ইতিহাস ইঙ্গিত করে।

ক্ষমতা আরোহণের দু বছর পর জেনারেল জিয়া সংবিধান সংশোধন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ উৎপাটন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শব্দটি স্থাপন করলেন। আপাতত দৃষ্টিতে বিষয়টি তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু, এই একটি শব্দই বাংলাদেশে মানুষকে দুভাগ করে দিয়েছে, জিয়া এই বিভক্তি চেয়েছিলেন তাঁর ক্ষমতার স্বার্থে এবং তার দ্বারা তিনি তাঁর ক্ষমতারোহণের যুক্তি তৈরি করতে চেয়েছিলেন ইতিহাসের আলোকে। এবং এ ঘটনা প্রমাণ করে যে এই জেনারেল জাতির সঙ্গে কত বড় প্রতারণা করেছিলেন। এই ঘটনা আবার অন্যদিকে প্রমাণ করে তিনি বাধ্য হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন যার অনেক প্রমাণ বর্তমান কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার সম্মানের কারণে কেউ তা প্রকাশ করতে চায় না।

১৯৭২ সালে জেনারেল জিয়া সে সময়ের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* লিখেছিলেন, যেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা, "আমার মতে ঠিক সেই দিনই বাঙালি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির।" এখানে লক্ষণীয় 'বাঙালি হৃদয়' ও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' শব্দ দুটি।

এর ঠিক পাঁচ বছর পর, জেনারেল জিয়া 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' অন্তর্ভুক্ত করলেন সংবিধানে সামরিক আইন মারফত বন্দুকের জোরে। তার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করে দিলেন সাংবাদিক খোন্দকার আবদুল হামিদ। ১৯৭৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমীর আলোচনা সভায় এক প্রবন্ধে তিনি বললেন :

"আমাদের জাতীয়তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তা' বলাই এপ্রোপ্রিয়েট বা সঙ্গত। ... এই জাতির রয়েছে গৌরবময় আত্মপরিচয়, নাম-নিশানা, ওয়ারিশী-উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য-ইতিহাস, ঈমান-আমান, যবান-লিসান, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য, সংগঠন ও সবকিছু। বাংলাদেশী জাতির আছে নিজস্ব জীবনবোধ, জীবন ধারা, মনস্তাত্ত্বিক গড়ন-গঠন, ভাবধারা। আছে সমষ্টিগত বিশেষ মনোভঙ্গি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ানুভূতির বন্ধন। এদের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে একই সুখ-দুঃখের সুর, একই আবেগ অনুভূতির ঝঙ্কার। এদের জীবনে

ও মনোজগতে রয়েছে এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্য, যা সারা পৃথিবী থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য দান করেছে এমনকি অন্যান্য দেশের বা অঞ্চলের বাংলাভাষী ও ইসলাম অনুসারীদের থেকেও। ইসলামের কথা বললাম, এ জন্য যে, এদেশের ৮৫ শতাংশ লোকই মুসলিম।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিই বাংলাদেশী জাতীয়তার উপাদান। এগুলি বাকল নয়, আসল সারাংশ। আর এই সারাংশই আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তার আসল শক্তি, ভিত্তি ও বুনিয়াদ।"

এই জাতীয়তাবাদে যুক্ত হয়েছিল ধর্ম আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের এবং সংবিধানের মূল নীতির একটি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা। জিয়াউর রহমান প্রচারিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের মানুষকে স্পষ্টত দুভাগ করেছিল। এই জাতীয়তাবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রচলিত হলো এমন কিছু শব্দ যা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শ্লোগানের বিপরীত। যেমন 'জয় বাংলার' পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। 'আমার সোনার বাংলা'র পরিবর্তে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ।' অথচ জেনারেল জিয়া ১৯৭৫-এর পূর্ব পর্যন্ত 'জয় বাংলা' শব্দটি শুধু ব্যবহারই করতেন না কোনো বাণী বা ভক্তকে স্বাক্ষর দেয়ার পরও লিখতেন 'জয় বাংলা'। এভাবে তিনি নিজের স্থান করে নিতে চাইলেন ক্ষমতা ও বৈধতাসহ।

জিয়াউর রহমান সামরিকায়ন ও পাকিস্তানের যে কাজ শুরু করেছিলেন এরশাদ সে ধারাকে বিকশিত ও পুষ্ট করলেন। তিনি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করলেন। নিজে অধার্মিক হয়েও ধর্মকে ব্যবহার করলেন নিজের আধিপত্য বিস্তারে।

জিয়াউর রহমান এ দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনপ্রতিষ্ঠা করে জামায়েতকে বিকশিত করার পথ করে দেন। বেগম জিয়ার আমলে গণতন্ত্রের বাতাবরণে পাকিস্তানি সামরিক আদর্শটি বলবৎ থাকে যার পরিণতিতে জামায়েত ক্ষমতায় যায় ২০০১ সালে। এ সময়ই ধর্মীয় জঙ্গিবাদ বিকশিত হয়। জেনারেল জিয়া, তার পত্নী ও এরশাদ বাংলাদেশের যে ক্ষতি করেছেন তা পূরণ করতে কয়েক যুগ লেগে যাবে। ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সামরিক সরকার পাকিস্তানি সামরিক কালচারের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে যে 'মিলবাস' শুরু করেছিলেন জেনারেল মঈন তা সম্পন্ন করেন। পাকিস্তানে আই এস আইয়ের মতো বাংলাদেশের ডিজিএফআই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনী নিজেদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে।

আয়েশা সিদ্দিকা তার বইতে প্রশ্ন রেখেছিলেন, পাকিস্তানের 'মিলবাস' দেখেও বাংলাদেশের মানুষ কেন সেখানে 'মিলবাস' গড়তে দিচ্ছে? অর্থাৎ এ

ধারা চললে বাংলাদেশের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।

পাকিস্তানি কায়দায় ১৯৭৫ সালের পর সেনাবাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি নতুন বাক্য চালু করা হয় প্রচারমাধ্যমে যা পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদরাও তোতাপাখির মতো আওড়ে যাচ্ছেন। যেমন–

১. সেনাবাহিনী শৃঙ্খলা সার্বভৌমত্বের প্রতীক। অর্থ : অন্যরা বিশৃঙ্খলা ও অধস্তনতার প্রতীক।

২. সেনাবাহিনীর উল্লেখ করলেই বলা হয়–"এ স্মার্টলি ড্রেসড কনটিনজেন্ট।" অর্থ : সেনাবাহিনী স্মার্ট অন্যরা নয়। পৃথিবীতে পাকিস্তান ছাড়া বোধহয় আর কোথাও সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে এ ধরনের বাক্য উচ্চারিত হয় না।

৩. সৈনিকরা সরল ও সৎ। উদাহরণ, প্রচারণায় জিয়ার ছেঁড়া গেঞ্জি ও ভাঙা স্যুটকেসকে গুরুত্ব দেয়া। এরশাদের সাইকেল চালানো। অর্থ : অন্যরা নয়।

৪. জাঁকালোভাবে সেনা প্যারেড প্রদর্শন। সামরিক জাদুঘর নির্মাণ– লক্ষ করুন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নয়। যদিও এ সেনাবাহিনীর জন্ম মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

৫. রাজনীতিবিদরা সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী। তারা দুর্নীতিবাজ।

এরা বা এদের অনুসারীরা কখনো পাকিস্তানকে দোষারোপ করেননি, করেছেন ভারতকে [অর্থাৎ হিন্দু-ভারত]। বাংলাদেশের যাবতীয় দুর্দশার জন্য এরা দায়ী করেছেন আওয়ামী লীগকে [এর মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনও অন্তর্ভুক্ত, কারণ আওয়ামী লীগ ছিল মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্বকারী দল]। কারণ তাদের মতে, আওয়ামী লীগ ভারতের এজেন্ট। এসব এজেন্ট ও হিন্দুরা ধর্মবিরোধী অর্থাৎ ইসলামবিরোধী। ইসলাম এদের চোখে সবসময় বিপন্ন মনে হয়, ইসলামের ঠিকাদারি তারা নিয়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন করেছিলেন। এসব প্রচারের আড়ালে তারা দেশের সম্পদ লুট করেছেন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের কাছে তা চুঁইয়ে পড়েছে। এভাবে সেনাবাহিনীকে তারা নিজেদের হাতে রেখেছেন। বিচারপতি কায়ানি বলেছিলেন, পাকিস্তানি সৈনিকরা বীর, তারা নিজেদের দেশ জয় করেছে। বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, তারা নিজের দেশও ভেঙেছে। আমাদের শাসকরাও বীর। নিজের দেশ জয় করেছিলেন। কিন্তু দেশের অস্তিত্ব বিনষ্ট করার আগেই বাংলাদেশের সজীব সিভিল সমাজ তাদের হটিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু, সেই পাকিস্তানি তত্ত্ব, যা তারা পরিপুষ্ট করেছিল তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে এবং হচ্ছে এখনো।

২০০৮ সালে শেখ হাসিনার নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর মনে হচ্ছে নতুন প্রজন্ম পাকিস্তান প্রত্যয় ও 'মিলবাস' মেনে নিতে রাজি নয়। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিভিল সমাজ থেকে সশস্ত্রদের প্রতি এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে যা গত তিন দশকে করা হয়নি। এটি অবশ্যই ইতিবাচক দিক। কারণ, সিভিল সমাজের মনে হচ্ছে, আমরা একবারই মানুষের সম্মান পেয়েছিলাম ১৯৭১ সালে যখন নিরস্ত্ররা সমাজের সর্বস্তর থেকে সশস্ত্রদের হটিয়ে দিয়েছিল।

৭

১৯৭১-এর ঘটনাকেই গুরুত্ব দিয়ে যে সব বই বেরিয়েছে তার মধ্যে মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খানের বইটিই বোধহয় প্রথম। ১৯৭৩ সালে ইসলামাবাদ থেকে তাঁর লেখা *পাকিস্তান ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ* বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী-সম্পর্কিত বিভিন্ন বইতে 'পাকিস্তানস ক্রাইসিস' থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বিদেশী যারা লিখেছেন তাদের অনেকের মুখে সুখ্যাতিও শুনেছি বইটির। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান, বাংলাদেশ–কোনো দেশ থেকে বইটির কপি সংগ্রহ করতে পারিনি। পরে সাংবাদিক মতিউর রহমানের কাছ থেকে বইটির ফটোকপি সংগ্রহ করে সাগ্রহে পড়লাম।

২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত প্রায় তিনশো পাতার বই 'পাকিস্তানস ক্রাইসিস' মূলত রচিত হয়েছে ১৯৬৯-১৯৭১–এই সময়টুকু নিয়ে। আর এ কারণেই এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জেনারেল কেন বইটি লিখেছেন? ভূমিকায় তিনি জানাচ্ছেন, এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। ১৯৬৬ সালেই তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যাতে তিনি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ নিয়ে না লেখেন। এর অর্থ, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের বিপর্যয়ের বিশ্লেষণ হয়তো তিনি করেছিলেন যা কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি। সেই থেকে তিনি এসব করা থেকে নিজেকে বিরত রেখে সমাজকর্মে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে আবার বিপর্যয়ের পর বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে তিনি এ বইটি লিখেছেন।

ভূমিকার প্রথমে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন। পাকিস্তানের বিপর্যয় হলো কেন? কী বিপর্যয়, সেটি অবশ্য তিনি উল্লেখ না করলেও আমরা বুঝতে পারি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ ছিল পাকিস্তানের জন্য

বিপর্যয়। অনেকে মনে করেন, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে এ বিপর্যয় হয়েছে। ফজল মুকিম এ কথা মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, ষড়যন্ত্র যদি হয়েও থাকে তা হলে সেক্ষেত্রে দায়ভারটা পাকিস্তানের। নেতা ও মানুষরা ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেই ষড়যন্ত্র হয়। ভারত ও রাশিয়া যদি পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করে থাকে তাহলে পাকিস্তানও তাদের সাহায্য করেছে। তাঁর মতে, "Our own lack of political wisdom and vision of history and our own indifference to what might be our national interest brought the disintegration."

এরপর তিনি মূল বিষয়– গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারত ও ভারত দ্বারা উৎসাহিত বিদেশী রিপোর্টে বাংলাদেশে হত্যা, লুট ও ধর্ষণের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি অনালোচিত থাকুক তা তিনি বা কোনো পাকিস্তানিরা চায় না। তবে, ভারত থেকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা ফিরে এলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যাবে [পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দিরা ফিরে আসার আগে বইটি লেখা]। সৈনিকদের ওপর জেনারেলের এই অগাধ বিশ্বাসে বিস্মিত হতে হয়। তিনি কীভাবে আশা করেছিলেন যাঁরা হত্যা ও ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত তারা তা স্বীকার করবে?

ফজল মুকিম বলছেন, এ বিষয়ে ভারতীয়রা যা প্রচার করে তাতে কান না দেয়াই সমীচীন। পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসনের আগে ভারত অন্যান্য প্রচারের জন্য ১২ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছে। তারা বারবার প্রচার করেছে ইসলামাবাদ ঢাকাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত করেছে। ফজল মুকিম আশ্চর্য হয়েছেন যে, বিশ্ব প্রেস এই অতিরঞ্জন মেনে নিয়েছে। এবং এভাবে পাকিস্তান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 'Unjust impression' গড়ে উঠেছে। পশ্চিম পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালানোর জন্য। এভাবে– "Objectivity, fairness and even reason went down before a thumping to punish and destroy Pakistan." ফজল মুকিম খান ও অন্যান্য সমর-নায়কদের সমস্যাটা ছিল পাকিস্তানকেই তারা বিশ্ব ভাবতেন। আর ফজল মুকিম যদি তা না ভেবে থাকেন, তাহলে ধরে নিতে হবে সারা পৃথিবীর প্রেস মিথ্যাবাদী এবং টেলিভিশন বা বেতারে তখন প্রত্যক্ষদর্শীদের যে রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছে তা ছিল ভেলকিবাজি। এরপর তিনি বিভিন্ন হিসাব দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, গণহত্যা ও গণধর্ষণের কাহিনী আসলে ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, পাকিস্তানে এ বিষয়ে যাদের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলছেন, এসব বিষয় তারা জানেন না। এমনকি জেনারেল নিয়াজী ও রাও ফরমানও তাই

বলেছেন। বিষয়টি আমরা বুঝি। গণহত্যা হয়েছে বললে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ ও সমর-নায়কদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। আর এখানেই আমরা ইঙ্গিত পেয়ে যাই বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর পূর্ব ধারণার।

৮

জেনারেল ফজল মুকিম খানের প্রথম অধ্যায়ের নাম– 'দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়'। এই সময়টুকু হচ্ছে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১। দুটি যুদ্ধকেই লেখক দেখেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসন হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ হলো, "পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন'। এ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য হলো : শুরু থেকেই ভারত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। এবং সবসময় সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ভারত 'failed to achieve her aim, ended in a stalemate and brought no glory to the Indian Armed forces.' Instead of gaining in stature, they suffered a further loss of face." এই মন্তব্য সত্য হলে জিজ্ঞাস্য তাসখন্দ চুক্তি করতে কেন পাকিস্তান বাধ্য হয়েছিল? কেনই-বা ভূট্টো পরবর্তীকালে তাসখন্দ চুক্তিকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন?

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, লেখকের ভাষায় পাকিস্তান তা দূর করতে পারেনি, বরং পুরনো ব্যবস্থাই অব্যাহত থেকেছে।

লেখক অবশ্য একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি যে, পাকিস্তান আন্দোলনে, বাঙালিরা ছিল অগ্রপথিক। যে মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের পুরোধা সেই মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল ঢাকাতেই। কিন্তু জিন্নাহ এবং লিয়াকতের মৃত্যুর পর যাদের কাজ ছিল বাস্তববাদী হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় রাষ্ট্র পরিচালনা করা, তারা তা পারেননি। এরা কারা? এরা হলেন আবদুর রব নিশতার, সোহরাওয়ার্দী, আকরাম খান ও তমিজউদ্দিন খান। লক্ষণীয় যে, এদের অধিকাংশই বাঙালি এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতায় এরা ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। যারা পরিচালনা করেছিল সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং তাদের প্রতিভূ ও সহযোগীদের কথা কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ তারা দায়ী নয়।

এ অধ্যায়ে তিনি আরো বলেছেন, ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছিল সামন্ত শ্রেণীর এবং পূর্ব পাকিস্তানে 'ক্লাসলেস সোসাইটি'র।

পাকিস্তানের যেসব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তারাও এ কথা বলেছেন, তবে শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেননি, বলেছেন পূর্ব বাংলার উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল প্রবল এবং প্রভাবশালী। প্রাক-স্বাধীনতা (১৯৪৭) পর্বে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছিল অনুগত সুতরাং ব্রিটিশরা সব ধরনের চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়োগ দিয়েছে। পূর্ব বাংলার মানুষদের আনুগত্য সম্পর্কে ব্রিটিশরা ছিল সন্দিহান। ফলে এ অঞ্চলের মানুষরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৯৪৭-এর পর তাই দেখা যায় সরকারি চাকরিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো পশ্চিম পাকিস্তানিরা। ঐতিহাসিকভাবেই পূর্ব বাংলা ছিল 'হিন্টারল্যান্ড', এখানে শিল্প গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৭-এর পর পূর্ববাংলা থেকে আধিপত্য বিস্তারকারী হিন্দু ব্যবসায়ী ও কারিগররা চলে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা তা কিনে নেয় বা নতুন শিল্প গড়ে তোলে। তাছাড়া বাঙালিরা সবসময় "Showed certain prejudices against foreign capital and capitalists, particularly Muslim" সবাইকে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি ভাবত কিন্তু তাদের অনেকেই ছিল বহিরাগত, পশ্চিম পাকিস্তানেরও। অর্থাৎ, তিনি যা ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন তা হলো : মুসলমানদের বাঙালিরা পছন্দ করত না। পছন্দ করত কাদের? হিন্দুদের।

ফজল মুকিম বলছেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের মোহ ভাঙল। এটি অবশ্য সত্য। তিনি লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আইয়ুব খানের কাছে হারলেন ফাতেমা জিন্নাহ এবং বাঙালিরা তখন বুঝল এই ব্যবস্থায় তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবে না। সেনাবাহিনী দুই অঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু তখন দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত এবং 'The feeling of uneasiness and loneliness produced by the war started taking root" যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল কেন্দ্রীয় সরকার তা দূর করার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পাকিস্তানের ২৫ বছরের ইতিহাসে দুটি অঞ্চলকে সত্যিকারভাবে একত্রিত করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং সরকারের অনেক নীতি দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ কারণে ফজল মুকিম কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেননি। তাঁর মতে, "The Government case, therefore, went by default, so did that of the western wing. No literature and no white papers were ever issued, and the Government's information media miserably failed. The great strides made in social and economic fields in East Pakistan remained unappreciated." এ কারণেই সৃষ্টি হলো ৬ দফার।

এরপর একটি ইন্টারেস্টিং তত্ত্বের অবতারণা করেছেন ফজল মুকিম খান। তাঁর মতে, শুরু থেকেই ভারতের নীতি ছিল দ্বি-মুখী। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য

তাঁর দ্বার ছিল রুদ্ধ, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল উন্মুক্ত। ১৯৪৭-এ নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি বলে লোক-বদলের যে নীতি গৃহীত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয়নি। ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানে ৮০% সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানদের হাতে এলেও পূর্বাঞ্চলে যেসব সম্পদ রয়ে গেল হিন্দুদের হাতে ক্রমান্বয়ে তারা তা পাচার করল ভারতে। প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা ৭৫০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন টাকা স্মাগল করে বা অন্য উপায়ে নিয়ে যেত ভারতে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাটি ছিল তাই। ১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গের ১২১০টি হাইস্কুল এবং ৬৭ টি কলেজ চলত হিন্দুদের টাকায়। এসব প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-শিক্ষকরা ভারতে প্রকাশিত বইপত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দিত যা ছিল ইন্ডিয়ান প্রপোগাণ্ডায় ভরা। ফলে, পাকিস্তানি কোনো চেতনা পূর্ববঙ্গের তরুণ জেনারেশনদের মধ্যে জাগেনি; পরিণামে 'ইস্ট পাকিস্তানি মুসলিমস'রা রূপান্তরিত হলো বাঙালিতে। এখানে লেখকের মন্তব্যটি দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করতে চাই। কারণ, অধিকাংশ পাকিস্তানি এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে এবং পাঠকদের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমিকা সম্পর্কে পাকিস্তানি তত্ত্বটি পরিষ্কার হবে–
"The Pakistan cause came to be connected with West Pakistan only. Thus the internal disenssions were being fostered to destroy Pakistan, and regional affinities were being encouraged and Pakistani patriotism downgraded. The seeds of the crisis between East and West Pakistan, sown by professors and teachers of the minority community, yielded a flourishing crop. In twenty-four years, the type of education imparted to them together with insistent Indian propaganda changed the East Pakistani Muslims to Bengalis. A considereable reaction of young East Pakistan was therefore the first to break away from Pakistan and it basis"

শুধু তাই নয়, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ এ সময়টুকুতে দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু নেতারা অনুপস্থিত। তারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বরং সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে আত্মনিয়োগ করে। সারা পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং পাকিস্তান-বিনাশী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কেন হিন্দু-নেতারা অনুপস্থিত ছিলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে? উত্তর দিতে হলে ফজল মুকিমকে বলতে হতো, পাকিস্তান সরকার তাদের 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে মনে করত, তাদের দেশ ত্যাগে, আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাংস্কৃতিককর্মীরা যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তাঁর নজর এড়ায়নি। এ বিষয়ে পাকিস্তানে তো বটেই আমাদের এখানেও অনেকে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন।

এরপর এলো আগরতলা মামলা। আইয়ুব খান বাধ্য হলেন ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে। উপসংহারে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে ফজল মুকিমের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা হবে। তিনি বলছেন, স্বাধীনতার প্রথম দশকে রাজনৈতিক নেতাদের 'misrule and misdeed's এর কারণে আইয়ুবের উত্থান কিন্তু অন্তিমে তারাই সমর্থ হয় তাঁকে ধ্বংস করতে। প্রথম দশকে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, লিয়াকত আলি, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। অন্য কথায় প্রথম দশকের প্রথমার্ধে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ছিল। আমলাতন্ত্রের প্রভাবের কারণে তা পারা যায়নি এবং আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবেই আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিলেন। সিভিল সমাজের আধিপত্য যে জেনারেলের পছন্দ নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। অবশ্য হবার কথাও নয়। পাকিস্তানের সব জেনারেলের লেখা আত্মজীবনীতেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রায় সবাই তাদের বইয়ের উপসংহারে বলেছেন পাকিস্তানের বিপর্যয়ের জন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী।

৯

১৯৬৯-৭১ এ সময় কালটুকু কেমন ছিল? যেমনটি হয় সামরিক শাসনামলে তেমনই ছিল, লিখেছেন ফজল মুকিম। ক্ষমতায় ইয়াহিয়ার আরোহণের পর এক বৈঠকে সিএমএলএ-র প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার বলেছিলেন–গতবার সিভিলিয়ানরা ভুল করেছে, দোষ পড়েছে আমাদের। এবার আমরা সব করব, ক্রেডিটও নেব। নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করেছিল সরকারের কর্মপদ্ধতি। অর্থাৎ এবার সামরিক আমলারা নির্দেশ দেবে, অন্য সবাই তা মানবে। ফজল মুকিম কিন্তু তারপর আবার বলছেন, তবে এটা বলাও ঠিক হবে না যে পুরোপুরি তা সামরিক শাসনই ছিল কারণ এর রুলস রেগুলেশন সামরিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণীত হয়নি। বোঝা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনী বা সামরিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি কোনো বিতর্কে জড়াতে চান না এবং সবার ওপরেই তাকে রাখতে চান, যে কারণে ১৯৬৯-৭১ এর ঘটনাবলির জন্য দোষারোপ করেছেন ইয়াহিয়া খান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ চক্রকে, "It should not be mixed up with the HQ CMLA."

ফজল মুকিম লক্ষ করেছেন, ১৯৬৯ সালের পর থেকে পূর্বাঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণা বাড়ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অফিসারদের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি ও সেনাবাহিনীকে একই চোখে দেখা

হতো এবং তাদের প্রতিও ঘৃণা বাড়ছিল। তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কেন এই ঘৃণা বাড়ছে? কারণ, সেনাবাহিনী কি ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় কাজ করে নি? এই ঘৃণা সেনাবাহিনীকেও অবাক করেছে। লেখকের মতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখনও কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য দেখায়নি। তারা বৈধভাবে (শব্দটি লক্ষ করুন, বৈধভাবে) স্থাপিত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনেই থেকেছে। ফজল মুকিমকে এ প্রশ্নটি করা উচিত ছিল, সেনাবাহিনী যদি দেশের প্রতি অনুগতই হয় তাহলে সিভিল রুল উৎখাত করে কিভাবে তাদের প্রতিনিধি আইয়ুব বা ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন? সিভিল শাসন উৎখাত করা বৈধ কি না? ফজল মুকিমরা এ ধরনের মন্তব্য করেন এ কারণে যে, তারা সেনা শাসনের বেনিফিসিয়ারি। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সরল চিত্তে তিনি এসব মন্তব্য করে গেছেন। আসলে, সেনা-কর্তৃক উৎখাতকার্য যে বৈধ তা-ই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

১৯৭০ সালে নির্বাচন হলো। লিখেছেন মুকিম, শেখ মুজিব নির্বাচনে জিতলেন। ইসলামাবাদের শাসকচক্র তা ভাবেনি। ফলে, তারা যে চিন্তাভাবনা করে রেখেছিল নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের জন্য তা পাল্টাতে হলো। আওয়ামী লীগ কিন্তু সবকিছুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এখানে তিনি একটি তথ্য দিয়েছেন যা কোথাও আগে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়নি। তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগের সামরিক পরামর্শক কর্নেল ওসমানী একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে। এর তিনটি পর্যায় ছিল :

প্রথম পর্যায় : রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া, দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য দূর করা এবং সময়-সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করা।

দ্বিতীয় পর্যায় : প্রথম পর্যায় ব্যর্থ হলে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল। এ কারণে বাংলাদেশকে ৬টি সেক্টরে ভাগ করা হলো– ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা; চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা; কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট জেলা; খুলনা, যশোর ও বরিশাল জেলা; দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলা এবং রাজশাহী ও পাবনা জেলা। প্রতিটি সেক্টরের জন্য কমান্ডার ঠিক করা হলো। কমান্ডাররা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মারফত কাজ করবেন। কিন্তু যোগাড়ের ভার থাকবে গণপ্রতিনিধিদের ওপর।

তৃতীয় পর্যায় : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ব্যর্থ হলে জনসাধারণ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার যার জেলার বিপরীতে ভারতীয় ভূখণ্ডে চলে যাবে এবং যাবার সময় পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করবে। বস্তুত দেশ ত্যাগের উদ্দেশ্য হবে, বাংলাদেশ ইস্যুর আন্তর্জাতিককরণ। এরপর শুরু হবে প্রতিরোধ ও গেরিলাযুদ্ধ।

এ ধরনের ইঙ্গিত আরো অনেকে করেছেন। আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী মনে করেন, যুদ্ধের জন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তুত ছিল না। তারা পাকিস্তানের সঙ্গেই সবসময় থাকতে চেয়েছে। বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু উপরোল্লিখিত তথ্য মেনে নিলে ঐ তত্ত্ব নাকচ হয়ে যায়।

লে. জে. ওয়াসিউদ্দিন এ সময় রাওয়ালপিন্ডিতে অফিসার ক্যুরিয়রের মাধ্যমে একটি সংবাদ পাঠিয়েছিলেন–

১. পাকিস্তানের এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্লেন যেতে ভারত বাধা দেবে।

২. ভারত পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করবে যাতে পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তান বড় ধরনের সমাবেশ ঘটাতে না পারে।

ফজল মুকিমকে এসব তথ্য দিয়েছেন তিন জন বাঙালি অফিসার– বিগ্রেডিয়ার এম আর মজুমদার, লে. কর্নেল এ এস বি ইয়াসিন ও সামছুল হাসান। অন্যদের সম্পর্কে জানি না, তবে এটুকু জানি এম আর মজুমদার শুরু থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। যে কারণে তাকে ২৫ মার্চের আগেই গ্রেফতার করা হয়। ফজল মুকিমের মতে, ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত ছিল এবং কিছু সিনিয়র সিভিল ও পুলিশ অফিসারের তা জানা ছিল। পরে সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানি অফিসারদের এ বিষয়ে কনভিন্স করে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।

১৯৭১-এর গোড়ার দিকেও জেনারেল ইয়াহিয়া ঠিক করতে পারছিলেন না যে তিনি কী করবেন। বিভিন্ন মহলের চাপ ছিল তার ওপর। তাছাড়া "Various intelligence agencies had a personal stake in ensuring that Mujib did not come to power." অনেকেই পরামর্শ দিচ্ছিল বাঙালিদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেয়ার জন্য।

জেনারেলের ভাষায় পরামর্শটি ছিল এ রকম– "The killing of a few thousand would not be a high price for keeping the country together. Handing over power to Mujibur Rahman, a proved traitor, would be a blunder and history would never forgive Yahyah Khan for this" পশ্চিম পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনাকালে অনেকে এ তথ্য সমর্থন করেছেন।

২৬ মার্চ পর্যন্ত কী ঘটেছিল, এরপর ফজল মুকিম তার বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি অন্য অনেক বইয়ের মতোই বা বলা যেতে পারে অন্যান্য বইয়ের বিবরণকে সূত্র ধরে ফজল মুকিমের এই বিবরণ, কারণ তার বইটিই প্রথম বেরিয়েছিল। ফজল মুকিমের এই বিবরণের মূল কথা হলো– আইন-শৃঙ্খলা

পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছিল, আওয়ামী লীগ সবাইকে উত্তেজিত করে তুলছিল, বিহারিদের হত্যা করা হচ্ছিল, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা চলছিল। আসলে কী ঘটেছিল তা আমাদের জানা। সুতরাং, এ বিবরণের কতটুকু সত্য, কতটুকু অনুমাননির্ভর তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে, এখানে বিশেষভাবে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। জেনারেলের এই দীর্ঘ বিবরণে জুলফিকার আলি ভূট্টোর উল্লেখ নেই, তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণ নেই, তিনি কীভাবে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুললেন সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই, সেনাবাহিনী কীভাবে ভূট্টোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করল সে বিষয়েও কোনো বক্তব্য নেই। ফজল মুকিমকে ভূট্টো সামরিক সচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

১০

ফজল মুকিম খানের বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়টি ২৫ মার্চের ওপর। ২৫ মার্চের ঘটনার বিবরণ তিনি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য জেনারেলদের বইতেও ২৫ মার্চের উল্লেখ আছে বিভিন্নভাবে। তবে, মনে হয়, পরবর্তীকালে যারা লিখেছেন তাদের অনেকের প্রধান অবলম্বন ছিল ফজল মুকিমের এই বর্ণনা। এ বর্ণনারও কতটুকু সত্যি তা আমরা যারা ঢাকায় ছিলাম তাদের পক্ষে বোঝা সহজ। ফজল মুকিম লিখেছেন, ২৫ মার্চ রাতে, সেনাবাহিনী বিভিন্ন ধরনের বাধা দূর করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিল। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল কেউ গুলি করলে গুলি করার বা প্রতিরোধ করলে তা ভেঙে দেয়ার। এবং বিরোধীদের মনে মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত সৃষ্টি ও রাস্তার জনতা হটাবার জন্য কিছুক্ষণ পর পর আকাশের দিকে গুলি ছোড়ার। শেখ মুজিব পালাননি। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কেন পালাননি তিনি? এ প্রশ্নের জবাবে, ঢাকার স্টেশন কমান্ডারকে শেখ মুজিব বলেছিলেন– 'To save Pakistan'. ফজল মুকিম বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করি। তিনি লিখেছেন, ইকবাল হল থেকে অনেক ভারতীয় অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল এবং উদ্ধার করা হয়েছিল বেশ কিছু অবাঙালি মেয়েকে যাদের পতিতা হিসেবে সেখানে রাখা হয়েছিল। এই অপারেশনে সেনাবাহিনীর পক্ষে মারা গিয়েছিল ৪ জন, ৯৭ জন সিভিলিয়ানকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাবে ১৫০, অন্যান্য হিসাবে ৫০০ জন।

এ বর্ণনা পড়লে মনে হবে, সারাবিশ্বের পত্রপত্রিকা যা লিখেছে বা

সংবাদমাধ্যমে যা প্রচারিত হয়েছে তা ছিল মিথ্যা আর জেনারেল ফজল মুকিম খানের বিবরণ সত্যি। আসলে, জেনারেলদের এ ধরনের ধারণা পাকিস্তানের পতন ত্বরান্বিত করেছে।

ফজল মুকিমের ষষ্ঠ অধ্যায়টি আমাকে বিস্মিত করেছে। এর শিরোনাম 'মুক্তিবাহিনী'। আপনাদের নিশ্চয় ১৯৭১-এর পাকিস্তানি প্রপাগাণ্ডার কথা মনে আছে যেখানে 'মুক্তিবাহিনী' ছিল 'দুষ্কৃতকারী'। পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনী তাই ছিল। জেনারেলরা যখন ১৯৭১-এর যুদ্ধের কথা লিখেছেন তখন পারতপক্ষে 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটির উল্লেখ করেননি। জেনারেল নিয়াজীর বইতে অবশ্য উল্লেখ আছে মুক্তিবাহিনীর। কিন্তু এভাবে অধ্যায়ের শিরোনাম কেউ দেননি। এর একটি কারণ হয়তো হতে পারে যে, জেনারেল খান যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

ফজল মুকিম অবশ্য অধ্যায়ের গোড়াতেই এ কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, ভারতই মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছে। মুক্তিবাহিনীতে কয়েকবার হতাশা দেখা গিয়েছিল কারণ পাকিস্তানি বাহিনীর বিক্রমের কাছে তারা বা ভারতীয় বাহিনীরা সুবিধা করতে পারছিল না। অনেকে ফেরতও আসছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশার সুযোগ নিতে পারেনি। এ ধরনের মন্তব্য স্বাভাবিক হিসেবেই ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অধ্যায়টিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবদানটা তিনি চাপা দিয়ে রাখতে পারেননি।

তিনি অবশ্য বলেছেন, ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকেই সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের অনেক বাহিনী গড়ে উঠেছিল। যেমন, রুশপন্থি জঙ্গী বাহিনী, চীনভক্ত মুক্তি কমিটি, আর্মি ফর লিবারেশন অফ ইস্ট বেঙ্গল, জাতীয় মুক্তি জোট। আমরাও আজকাল এ ধরনের তথ্য পাচ্ছি যে, এক ধরনের নিউক্লিয়াস গড়ে উঠেছিল ষাটের দশকে। তবে, ফজল মুকিম যেভাবে বলছেন, সেভাবে নয় নিশ্চয়। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬৯ সালের ১১ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক চলাকালীন আইয়ুব খান বলেছিলেন মুজিবকে যে, ভারত থেকে কিছু লোক প্রবেশ করছে পূর্ব পাকিস্তানে এবং সৃষ্টি করছে অস্থিতিশীলতার, তারা বন্দুক বিক্রি করছে ৪০ টাকায়। মুকিম যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, এ ধরনের কার্যক্রমের কারণে মানসিকভাবেই অনেক বাঙালি প্রস্তুত ছিল, যে কারণে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে তেমন অসুবিধা হয়নি। লিখেছেন তিনি, পাকিস্তানে অনেকে মুক্তিবাহিনীকে খাটো করে ভারতীয় সেনা, সীমানা রক্ষা-বাহিনীকে ক্রেডিট দিতে চায়। ভারতও প্রথমে তাই করত, পরে দেখল যে, এরকম প্রচারে

তারই ক্ষতি। তিনি বলতে চেয়েছেন, মুক্তিবাহিনীর কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। লিখেই ফেলেছেন এক জায়গায়– "Particularly the EBR had fought with skill, courage and fanaticism which should have surprised no one who knew these units."

১১

এর পরের চারটি অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে– ডিফেন্স প্ল্যানস, ইন্ডিয়ান প্রিপারেশনস, স্টেট অফ দি আর্মি ইন নভেম্বর, ১৯৭১। এসব অধ্যায়গুলি আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। প্রায় জেনারেলদের এ ধরনের আলোচনাগুলি গৎবাধা। আমাদের বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উল্লিখিত শেষ অধ্যায়টি।

নভেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সম্পর্কে মতামত এই যে, এদের মনোবল হ্রাস পাচ্ছিল, ছিল না সমন্বয়, ভুগছিল তা অনিশ্চয়তায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটি হিসাব দিয়েছেন যা অন্য কারো বইতে দেখি নি, হিসাবটি হলো পাকিস্তানি সেনাদের মৃত্যুর হার। মার্চ-এপ্রিলে মৃত্যুর হার ছিল প্রতিদিন ১৫-এর নিচে। মে-জুন মাসে এ হার ছিল প্রতিদিন ৩ জন, জুলাই থেকে আবার মৃত্যুর হার বাড়তে থাকে এবং নভেম্বরে গিয়ে তা দাঁড়ায় ১০০০ জনে।

সেনাবাহিনীর ওপর এর অভিঘাত ছিল প্রচণ্ড, 'ডিমরালাইজিং'। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-সমর হচ্ছে না অথচ গেরিলা আক্রমণে মারা যাচ্ছে এটাতে তারা হতবিহ্বল হয়ে যাচ্ছিল এবং তা "Adding to the strain on the proud army."

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের অনেক কারণ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, এর মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং কিভাবে তা ক্ষতিকর হয়েছে ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। তবে একটি মন্তব্য তিনি করেছেন যা তার কাছে তেমন উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি কিন্তু আমার কাছে হয়েছে। এবং পাকিস্তানিদের পরাজয়ের এটি অন্যতম কারণ বলে মনে হয়েছে। সেটি হলো, দীর্ঘ সময় নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশের কারণে ক্রমান্বয়ে সৈন্যরা বাধ্য হচ্ছিল এমন সব অঞ্চলে থাকতে যা সহজে রক্ষা করা যায়। সব সময় তারা পরিবেষ্টিত এবং আত্মরক্ষার জন্য যে কৌশল দরকার তাও নেই– এ সবই তাদের জন্য সৃষ্টি করেছিল গা শির শির করা ভাব। তাঁর ভাষায়– "They were getting fixed,

with no manoeuvreability left to them. The feeling of being surrounded was creeping in as any laxity on their part was invariably punished by the Mukti Bahini."

'ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করল'– বইয়ের একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম। তারপর 'ঢাকার পতন'। এ দুটি অধ্যায়ের বাঙালি পাঠকদের আকর্ষণ করার মতো কোনো বিত্তান্ত নেই। পরবর্তী তিনটি অধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের যা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। শেষ অধ্যায় 'রিজনস ফর ডিবাকল' বা বিপর্যয়ের কারণটি বরং আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। এটি লিখতে যে তার ভালো লাগেনি সেটা বোঝা যায় অধ্যায়ের শুরুর বাক্যটিতে– "Pakistan was not defeated; it was humilated, which is still worse." এরপর বিস্তারিতভাবে বিপর্যয়ের কারণগুলি তিনি বর্ণনা করেছেন। এগুলি হলো : একটি কার্যকর শাসনতন্ত্র তৈরির ব্যর্থতা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব, জাতীয় বিষয়ে অনিশ্চয়তা, তথ্যমাধ্যম কর্তৃক কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য প্রচারণা। আরো আছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিরক্ষা বিষয়টি জনমানসের অগোচরে রাখা এবং কারো কাছে এদের দায়বদ্ধ না থাকা। এ বিষয়টি সাধারণ সামরিক অফিসাররা অবসর গ্রহণের পর উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, ১৯৭১ সালে সমস্ত ক্ষমতা সিএমএলএ-এর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকাও বিপর্যয়ের মস্ত কারণ। পাকিস্তান ১৯৭১ সালে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে কোনো জাতীয় লক্ষ্য ছাড়া। শুধু তাই নয়, তার মতে, পূর্বপাকিস্তানে যুদ্ধটা হলো শুধু ইয়াহিয়া খান ও তার উপদেষ্টাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য। ঢাকায় আত্মসমর্পণের কারণ হাইকমান্ডের এবং তাদের নিযুক্ত কমান্ডারদের অযোগ্যতা। এরপর পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কিভাবে ঢেলে সাজানো যায় তার উল্লেখ করেছেন তিনি।

কিন্তু এগুলি অর্জিত হবে কিভাবে? এগুলি অর্জিত হবে তাঁর ভাষায়, "Well defined and efficient political institutions for conducting the affairs of state." এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। ২৫ বছরের সৃষ্ট পটভূমিকার জন্য ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে গেল। এ জন্য সবাই কম-বেশি দায়ী তবে বেশি দায়ী রাজনীতিবিদরা। সবকিছু ভুলে তাদের এখন ভালোভাবে দেশ শাসন করতে হবে। "They must ponder earnestly over what great damage they have already done to the country and get down to redemning their past mistake."

ফজল মুকিম খানও শেষাবধি অন্যান্যদের মতো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পাকিস্তান ভাঙার জন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী এবং রাজনীতিবিদদের

পরামর্শ দিয়েছেন। এই যে পরামর্শ দেয়ার এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গায়ের জোরে ভেঙে দেয়াই পাকিস্তানের পতনের কারণ, জেনারেলদের মাথায়ই তা ঢোকেনি। বা বুঝলেও নিজ স্বার্থে তা এজেন্ডার বাইরে রাখতে চান। জেনারেল ফজল মুকিম খানের বইটি তার আরো একটি উদাহরণ।

১২

এই বইটি খুব পরিচিত নয়। আমি মূল বইয়ের একটি ফটোকপি করাতে পেরেছিলাম বছর দশেক আগে। বইটির নাম *ইস্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ*। লিখেছেন ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লা খান, হিলাল ই জুরাত। লাহোরের 'লাহোর ল' টাইমস পাবলিকেশন' বইটি প্রকাশ করেছিল ১৯৭৫ সালে। সাদুল্লা বইটি উৎসর্গ করেছেন 'টু দোজ হুম উই ফেইলড'। দুই পর্বে বইটি বিভক্ত, অধ্যায়ের সংখ্যা ২৮।

সাদুল্লার র‍্যাংক মুক্তিযুদ্ধের সময় কী ছিল তা তিনি উল্লেখ করেননি। তবে তার লেখার সূত্র ধরে অনুমান করছি তা হতে পারে লে. কর্নেল বা কর্নেল। মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতে অবস্থান করেন। পাকিস্তানে ফেরত আসার পর ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন। পাকিস্তানি সামরিক অফিসার যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে ছিলেন এবং যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন তাদের মধ্যে সাদুল্লাহর বইটিই খুব সম্ভব প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। যুদ্ধের স্মৃতি বা সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ ও পরাজয়ের স্মৃতি সব কিছুই তখন উজ্জ্বল (বা ক্ষতটা দগদগে) সে জন্য তার আসল সত্ত্বা অনেকখানি প্রকাশিত এই বইয়ে যা অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়াটা দুষ্কর। একজন পাকিস্তানির মনোভাব আসলে কী পরে অনেকে তা লুকিয়েছেন কিন্তু সাদুল্লাহ সে সময় পাননি। বইটির ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রারম্ভিকের প্রথম অনুচ্ছেদটিই দেখা যাক–

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহ করল। তাদের 'সূনসর' ছিল ভারতীয়রা। বিদ্রোহ তাৎক্ষণিকভাবে দমন করা হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা তাদের জালেই আটকা পড়ে। তারা যে রক্ত জমাট করা অপরাধ করেছিল নিষ্পাপ ও অস্ত্রহীন অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাচ্চাই সাকাই (কাবুলে বিদ্রোহী) আমলে, তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া হতে পারে অনুমান করে পরিবার-পরিজন ও বাক্সপ্যাটরা নিয়ে তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে

যায়। বিদ্রোহ দমিত হলো বটে কিন্তু insurgency-র জন্ম হলো।

বাঙালি সামরিক নেতৃত্ব অবসান হলে তার স্থান গ্রহণ করে ভারতীয় জেনারেল স্টাফ। এপ্রিলের শুরুতে ইন্ডিয়ান ইস্টার্ন কমান্ডকে ভার দেয়া হয় 'Perpetuating Insurgency in East Pakistan." [পৃ. i]

ব্রিগেডিয়ার শাহ বেগ সিং ছিলেন প্রথম কমান্ডার। তিনি সীমান্ত বন্ধ করে দেন যাতে বাস্তুহারারা ভারত ত্যাগ করতে না পারে। বাস্তুহারারা ভারতে থেকে যেতে পারত কিন্তু বেরুতে পারত না। তরুণদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 'enroll' করা হলো। শুরুতে এই স্বেচ্ছাসেবীরা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়েছে। তাদের আত্মীয়স্বজনদের আলাদা করে রাখা হয়েছিল। বলা হচ্ছিল, যাতে তারা অন্নকষ্টে না থাকে, আসলে তাদের রাখা হয়েছিল "Protective custody'-তে। ব্যবস্থাটি ছিল সমায়োচিত।

সাদুল্লা আরো জানাচ্ছেন, স্বেচ্ছাসেবীরা ঘরে ফিরতে চাচ্ছিল কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ভারতীয় অক্টোপাশের নাগপাশে তারা বন্দী। তবে, স্বেচ্ছাসেবীরা অনেকে অনুপ্রবেশ করতে চায়নি, অনেকে অস্ত্র ত্যাগ করল। কিন্তু, তারা তো ভারতীয়দের চেনেনি। ভারতীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনদের শিরচ্ছেদ করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিতে লাগল। নদীতে ভেসে ভেসে তা আসতে লাগল পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তানিরা প্রথমে বুঝতে পারেনি এতসব লাশ আসছে কোথা থেকে? পরে, আওয়ামী লীগ সূত্রেই তা জানা গেল। লীগও অনুপ্রবেশকারীদের বলেছে তারা পক্ষ ত্যাগ করলে তাদের অবস্থা এমন হবে। পুরো বিষয়টির সারসংক্ষেপ বোঝা যাবে এক গ্রেফতারকৃত 'মুক্তি'র মন্তব্যে। 'হায় আল্লাহ! কী যে করি। যুদ্ধ করলে পাকিস্তানিরা হত্যা করবে। না করলে ইন্ডিয়ানরা ধ্বংস করে দেবে।'

সাদুল্লার পুরো বর্ণনা যে ডাহা মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কী ধরনের প্রচারণা চালিয়েছিল তখন, সেটি সাদুল্লার বর্ণনায় পাওয়া যায়। এই প্রচারণা চালানো হয়েছিল সৈন্যদের মধ্যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাদুল্লার ভাষা প্রসঙ্গে বলতে হয়। ভারতীয় প্রসঙ্গ এলে তার ভাষার পরিবর্তন ঘটে। যেমন–

"The Indian octopus had them in their vile and lethal embrace by now." (পৃ. ii) বা "It is bad enough to have 'hostages to fortune', the rebels dear ones were now hostages to 'kali'."

রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনার সময় সরকারি দলিল পড়ার যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা প্রয়োগ না করলে এ ধরনের টেক্সট ব্যবহার ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।

যা হোক, সাদুল্লার মতে, বিদ্রোহীরা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল যদি না ভারতীয়রা তাদের রক্ষা করত। নভেম্বরের দিকে ভারতীয়রা স্বেচ্ছাসেবী তামাশা বন্ধ করে নিজেরাই নেমে পড়ল "...They discarded the force of volunteers fighting in civies and started attacking with regular troops in uniform." (পৃ. iii)

১৩

সাদুল্লার বইয়ের প্রথম পর্বে অধ্যায়ের সংখ্যা ১৫টি। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'গৃহযুদ্ধ'। প্রথম দু'তিনটি অধ্যায় ছাড়া বাকি সব অধ্যায়ই যুদ্ধ সম্পর্কিত।

প্রথম অধ্যায়টি ১৯৭০ সালের সাইক্লোন সম্পর্কিত। পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তারা এই সাইক্লোন সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সাদুল্লার বর্ণনা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। তার মতে, সাইক্লোন হয়েছিল, তবে যে রকম ভয়ংকর হবে মনে করা হয়েছিল তেমন নয়। সিভিল প্রশাসন ত্রাণে ব্যর্থ হলে সেনাদের ডাক পড়ে। কেন্দ্র থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এখানে সেনাদের তেমন টেকনিক্যাল সাপোর্ট ছিল না। কিন্তু পাক সেনারা তো দেশপ্রেমে অদম্য। একটি হেলিকপ্টার ছিল যা চালালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। লে. কর্নেল বাবর সেটি করে উদ্ধার কাজ চালাতে চাইলেন। এ ধরণের ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য কোর্ট মার্শাল হতে পারে। কিন্তু বাবর তার ক্যারিয়ার বা কোর্ট মার্শালের ভয় করেননি। তার দেশের মানুষজন মারা যাবে আর তিনি বসে থাকবেন!

("If hundreds of thousands of our country men are dying for lack of support. I will risk both my neck and career.")

ত্রাণ কাজে সাদুল্লারা কী দেখেছেন? দেখেছেন সিভিল সরকারের ব্যর্থতা। অবলোকন করেছেন সেনাদের দক্ষতা, আন্তরিকতা ও সততা। সাধারণ মানুষ নানা অসুবিধায় ছিল বটে কিন্তু ত্রাণের জন্য বা অর্থের জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল। এমনকি তারা মৃতদেরও কবর দিত না আরো ত্রাণের আশায়।

তারপর এলো নির্বাচন। ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে তারপর তাতে ভাটা পড়ছিল। তবে সংগঠিত ছিল লীগ আর তারা দুটি বিদেশী দেশ থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছিল। সাদুল্লা দেশ দুটির নাম করেন নি, করলে একটি হতো ইন্ডিয়া। এপ্রিলে পটুয়াখালি উদ্ধারের পর বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে সাদুল্লারা ত্রাণের অনেক জিনিসপত্র পেয়েছিলেন। অর্থাৎ, আওয়ামী

লীগ কর্মীরা ১৯৭০ সালেই ত্রাণের জিনিসপত্র সরাচ্ছিল যাতে ১৯৭১ সালে তা কাজে লাগে।

ত্রাণ কাজের সময় শেখ মুজিব সেনাদের প্রশংসা করলেও প্রকাশ্যে তাদের প্রশংসা করা থেকে বিরত থেকেছেন। আওয়ামী কর্মীরা উদ্দাম হয়ে উঠছিল। সরকারের আওয়ামী তোষণ নীতি চরমে উঠেছিল। সাদুল্লা একটি ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। ভোলায় তোফায়েল ত্রাণ দিতে যাবেন। এক হাবিলদার নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তোফায়েল হাবিলদারকে বললেন, তাকে ও তার সঙ্গীদের পাশের গ্রামে পৌঁছে দিতে। হাবিলদার বিনীতভাবে জানালেন, তিনি তার কমান্ডিং অফিসারের জন্য অপেক্ষা করছেন। তোফায়েল তাকে চড় মেরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার থেকে কি তোমার পশ্চিমা কমান্ডার বেশি গুরুত্বপূর্ণ?" তোফায়েল তার সঙ্গীদের ইমপ্রেস করতে চাইছিলেন, দেখাতে চাইছিলেন আর্মি কিছু নয়। সাদুল্লার মন্তব্য–

"He was right. The army was being prostituted in the name of Martial Law." [পৃ. ১৫]

তোফায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও কিছু হয়নি। বরং, পত্র পত্রিকায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলতে লাগল।

সাদুল্লার মূল বক্তব্য, সেনাবাহিনী মানুষের সেবা করেও মানুষের মন পায়নি। 'আওয়ামী লীগ ওয়াজ উইনিং'। সাদুল্লার বিবরণ যদি ঠিক হয়, নিজেকেই তার প্রশ্ন করা উচিত ছিল, তাহলে কারণটা কী? এ প্রশ্ন সেনাবাহিনী নিজেদের কখনও করেনি। আর তা না হলে বলতে হয় সাদুল্লার বিবরণ মিথ্যা। একটি উদাহরণ দিই। প্রায় প্রত্যেক পশ্চিমা সেনা অফিসার ১৯৭০ সালের সাইক্লোনের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন, বেশি ত্রাণ বা টাকা পাওয়ার আশায় বাঙালিরা মৃত আত্মীয়স্বজনদের লাশ দাফন করেনি বা কয়েকবার কবর দিয়েছে। এত বড় জঘন্য মিথ্যা পাকিস্তানিদের বিবরণ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এমনকি সেই সময় প্রকাশিত জামায়াতের মুখপাত্র *দৈনিক সংগ্রামেও*।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'দি রোড টু ডিজাস্টার'। বা বিপর্যয়ের পথে। ঢাকার ১৪ ডিভিশনের কলোনেল স্টাফ হিসেবে ছিলেন সাদুল্লা। ইয়াকুব খান ছিলেন কমান্ডার। তাকে 'গ্রেট টিচার' বলে উল্লেখ করেছেন সাদুল্লা। তিনিই তাদের এ বিষয়ে সচেতন করেছিলেন যে, পূর্ববঙ্গে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। সাদুল্লার ভাষায়, এর তাৎপর্য আমাদের পূর্ব পাকিস্তানি সহকর্মীরা ভালোভাবেই অনুধাবন করেছে।

১৯৭১ চলে এলো। আওয়ামী লীগের হাতে সব কর্তৃত্ব। আর্মি ব্যারাকে

আবদ্ধ। তবে, সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল বিহারিরা। সাদুল্লা লিখেছেন, তাদের জীবন, সম্মান, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সংগঠিত হত্যাকাণ্ড শুরু হলো। বিহারিরা পালাতে লাগল। ঢাকা বিমানবন্দর বাস্তুত্যাগীদের ভিড়ে একাকার। তাদের ক্রোধ সেনাবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। দুটি টিকেটের জন্য একটি গাড়ির হাতবদলের কথাও শোনা গেল। বিমানবন্দরের কাছে ফৌজদের সামনে কিছু অবাঙালিকে হত্যা করা হলো। তাদের অনেকে ক্রোধে মাটিতে রাইফেলের বাট ঠুকতে লাগল কেননা গুলি করার কোনো হুকুম ছিল না।

"It was utterly humiliting." [পৃ. ১৮]

বিহারিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের 'ভায়োলেন্সে'র কথা প্রায় সব পশ্চিম পাকিস্তানিই উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গ পরে বারবার আসবে। শুধু উল্লেখ করতে চাই, যদি মেনেই নিই এরকম হত্যাকাণ্ড হয়েছে তাহলে ২৫ মার্চের ঘটনা কি তার প্রতিশোধ? তাহলে, সেনাবাহিনী বলতে গেলে অখন্ড পাকিস্তানের নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের। সুতরাং, পাকিস্তান রক্ষার যৌক্তিকতা তখন আর সেনাবাহিনী দিতে পারে না। সাদুল্লা এমন একটি তথ্য দিয়েছেন যা অন্য কোনো পাকিস্তানি দেননি। সেটি হলো, এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন জড়ভরত হয়ে বসে থাকার চাইতে। এটি যে ডাহা মিথ্যা তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা ত্রিশলক্ষ হত্যা করতে পারে নির্বিচারে তারা 'কিছু' বিহারি 'হত্যা'র জন্য পদত্যাগ করবে সেটি অকল্পনীয়। তার ভাষায়, 'Some officers offered to resign their commissions rather than suffer this agonizing pantomime.' [পৃ. ১৮]

এবং প্রশ্ন বিহারিদের জন্য যে জেনারেলদের এতো ভালোবাসা সেই জেনারেলরা পাকিস্তান হওয়ার পর তাদের কেন প্রত্যাখ্যান করলেন?

২৪ মার্চ জেনারেল খাদিম হোসেন (জেনারেল অফিসার কমান্ডিং) রাজা সাদুল্লাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে একটি পরিকল্পনার কথা শোনালেন। রাজার ভাষায়, "আমরা ২৫/২৬ তারিখে আঘাত হানব। হয়তো আওয়ামী লীগও প্রস্তুত হচ্ছে। তারাও একটি ডি' ডে ঠিক করেছে। নির্দিষ্ট তারিখ আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু জানি, তাদের সামরিক প্রস্তুতি যা করার ছিল তা হয়নি। আমি ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার গ্যারিসন কমান্ডারদের ব্রিফ করেছি। ফরমান যশোর ও খুলনার কমান্ডারদের ব্রিফ করেছে। আগামীকাল তুমি রংপুরের কমান্ডারকে ব্রিফ করো। রাজশাহীর কমান্ডিং অফিসার গতকাল হজ থেকে ফিরেছে। আমি তাকে বলব কী করতে হবে। রংপুর থেকে ফেরার পথে তাকে

রাজশাহী নামিয়ে দিয়ো।”

পাকিস্তানি সেনাদের ‘অপারেশন সার্চলাইট’ যে প্রস্তুত ছিল তা নিশ্চিত করে এ মন্তব্য। রাও ফরমান আলী আমাদের কাছে সাক্ষাৎকারে ও গ্রন্থে যে লিখেছেন, তিনি শুধু বেসামরিক বিষয় দেখতেন এবং এসবের কিছুই জানেন না, সেটি যে ডাহা মিথ্যা, সাদুল্লার বক্তব্যই তার প্রমাণ।

এরপর আছে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা দখলের বিবরণ। রাজশাহীর কিছু ঘটনাবলির বিবরণ। এ প্রসঙ্গে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বিবরণ। মুর্শিদাবাদ ভারতে, সাদুল্লার খেদোক্তি, “এই মুসলিম এলাকাটিকে কসাই র‍্যাডক্লিফ insatiable হিন্দুদের খিদে মেটাবার জন্য কেটে দিল, এখন তারা আরো বেশি চায়। পুরো পূর্ব পাকিস্তানকেই চায়।”

সাদুল্লার আফসোস, পাকিস্তানিরা যারা তাঁদের ‘দেশের’ জন্য ত্রাণ দিল তাদের পুরস্কার দূরে থাক, মনেই রাখেনি কেউ। অধিকাংশের বক্তব্য, তারা পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারেনি।

সাদুল্লার এই বক্তব্য, যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা নিয়ে। পাকিস্তানিরা কী চোখে তখন সেনাদের বিচার করছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ মন্তব্যে।

সাদুল্লা এরপর বেশ কিছু ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ১৯৭১ সালের পরিস্থিতি বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন– কামালপুর।

কামালপুরে সব সময় হামলা পাল্টা হামলা চলেছে। সাধারণ মানুষ ও সেনাদের সঙ্গে প্রথমদিকে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা মিটে গেছে। জাতীয় লোকেরা সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করছে সেনাবাহিনীদের। ভারতীয়রা আছে অনুপ্রবেশকারির ভূমিকায়। হজরত আলী স্থানীয় লোক। সে আঞ্চলিক কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করে, ভারতীয়রা যা করছে, পাকিস্তানিরা তা করছে না কেন। কমান্ডার বললেন, হুকুম নেই। [সেই কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন ভারতীয়রা অবৈধ কাজ করে, পাকিস্তানিরা করে না]। পাকিস্তানি সেনাদের হুকুম নেই। কিন্তু সে তো পাকিস্তানি সৈন্য নয়। সুতরাং আলী তার সাথীদের নিয়ে ফাঁড়ি পাহারা দিতে চলে গেল। ভারতীয়রা আক্রমণ করল কিন্তু নড়েনি আলী ও সাথীরা। তারা সব শহীদ হলো। কাহিনীর শেষে জানতে পারি তারা ছিল রাজাকার। সাদুল্লার বক্তব্য, ‘শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। তার সাহস বাঙালিদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। তারা ভারতীয়দের রুখে দাঁড়াতে প্রণোদিত হলো।’

ধল্লার চৌধুরী

জুন, ১৯৭১ সালের সাদুল্লা গেছেন টাঙ্গাইল সফরে। এক বৃদ্ধ তার সঙ্গে দেখা

করে জানালেন। "আমি এসেছি ধাল্লা থেকে। আমার বাড়ি মুক্তিরা ঘিরে রেখেছে। সম্পত্তির পরোয়া করি না কিন্তু আমার দুই নাতনী আছে ঘরে। আমি কোথাও কোনো সাহায্য পাচ্ছি না। লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে হাত তুলেছিলাম দেখে আজ আমার এই হেনস্থা।" সাদুল্লা জানালেন, ছেলেবেলায় তিনিও স্লোগান দিয়েছেন 'শেরে বাংলা' জিন্দাবাদ।

ধল্লার লোকটির নাম চৌধুরী আমিনুল হক। সাদুল্লার বাহিনী চৌধুরী ও তার পরিবারকে নিয়ে আসে। সৈন্যরা চলে আসার পর মুক্তিরা বাড়িটি দখল করে নেয়। চৌধুরীও পরে রাজাকার দল নিয়ে বাড়ি উদ্ধার করে। ফের তা দখল হয়ে যায়। এমনিই চলতে থাকে স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত।

নকশি

সাইদু মুক্তাগাছার লোক। সাদুল্লার ভাষায়, ময়মনসিংহে আছে মুক্তাগাছা ম্যানসন। এর মালিক এক নষ্ট হিন্দু জমিদার। তার জমিজমা ময়মনসিংহে, টাকা পয়সা কলকাতায়। এই প্যাটার্নটি সাধারণ। ফরিদপুরেও সাদুল্লা এক বিশাল অট্টালিকা দেখেছিলেন। মালিক এক ধনী হিন্দু অ্যাডভোকেট। তারও জমিজমা ও বাড়ি এখানে, টাকা পয়সা কলকাতায়। মার্শাল ল'র সময়, লিখেছেন সাদুল্লা, "আমরা হিন্দুদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখেছি। তাদের কারো ব্যাংক ব্যালান্স চার অংকের ওপর নয়। অর্থাৎ, তারা টাকা-পয়সা সব পাচার করে ভারতে। সত্তরের নির্বাচনের পর ঐ অ্যাডভোকেট তার বাড়িঘর সারাই করে কারণ এই প্রথমবার দেখা যাচ্ছিল আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। 'হিন্দুরা আবার শাসন করবে।' সাঈদুর বাপদাদারা এদের হাতে নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। বর্তমান জেনারেশন এসব চিন্তা করে না। তাদের পরে পস্তাতে হবে।"

গারো জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে নকশি। সীমান্তবর্তী এলাকা। এর পাহারায় ছিল সুবেদার হাকিম– এক 'rabid' বাঙালি জাতীয়তাবাদী। সে চেয়েছিল অফিসার হতে। আওয়ামী লীগ তাকে আশ্বাস দিয়েছিল অফিসার করবে। শর্ত একটি–পশ্চিমা অফিসারদের মারো।

২৫ মার্চের পর হাকিম অবাঙালিদের হত্যা করল। সাঈদু ছিল তার সঙ্গী। এখানে সাদুল্লা আবার রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার মতে বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিল–

"The Bengalis had forgotten Rabindranath Tagore. A thousand crimes take birth where a single drop of blood is spilled through tyranny."

যা হোক, হাকিম বলল এবার ভারত যেতে হবে। অবাঙালি হত্যা করতে

সাঈদুরের খারাপ লাগেনি কিন্তু ভারত! অসম্ভব, সাঈদু ফিরে এলো মুক্তাগাছা। আগস্টে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। টাঙ্গাইলে ফেরৎ আসা শরণার্থীদের জন্য শান্তি ভবন খোলা হলো। সাঈদু আত্মসমর্পণ করল।

একটি অনুষ্ঠান ও অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন

কাওরাইদ বাণিজ্য কেন্দ্র। বাজার পুনরুজ্জীবন ও বাঙালিদের মাঝে সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য সাদুল্লা কাওরাইদে এক সভার আয়োজন করলেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের অনারারী প্রপাগাণ্ডা সেক্রেটারি ছিলেন ময়মনসিংহের এক কলেজের পরিচিত এক ইংরেজির শিক্ষক। প্রথম বক্তা ছিল একজন ছাত্র– গফরগাঁও-এর আলবদরদের সভাপতি। সভায় ছিল এক প্রাক্তন আওয়ামী লীগ এমপি। তিনি সপ্তাহ দুয়েক হলো প্রকাশ্য হয়েছেন। আর ছিল কাদের সিদ্দিকীর দলের একজন। কাদের সিদ্দিকী তখন আহত, তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ।

সাদুল্লা নিজেও বক্তৃতা দিলেন। বললেন, পাটের ব্যবসা উজ্জীবিত করতে হবে। ঋণ দেয়া হবে। সবাই আশ্বস্ত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করল। তার ভাষায়–

"The stray elements of our nation was getting back into its fold. Pakistan was more profitable. Kaoroid bazar was re-habilitated. The price of jute almost immediately doubled in the local bazar." [পৃ. ৩৬]

সাদুল্লা জানিয়েছেন জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ময়মনসিংহ ছিল বাংলাদেশে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এলাকা। কারণ পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ।

টেঙ্গাবোর ঘটনা

কাওরাইদ আর বানার নদী যেখানে মিশেছে সেখানে টেঙ্গাবো। টেঙ্গাবোর এক মক্তবের শিক্ষক ২০ বছর বয়সী মান্নান। তার প্রতিপক্ষ স্থানীয় জমিদার যে হিন্দু। জমিদার তাকে বলেছিল, মক্তবেই থাকো এর বাইরে পাকিস্তান নিয়ে কথা বলো না। পাকিস্তানিরা তোমাকে রক্ষা করবে না। মান্নানের জবাব, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তাকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী এ খবর পেয়ে টেঙ্গাবো রওয়ানা হয়। এসডিওকে নিয়ে অনেক কষ্টে টেঙ্গাবো "শহীদ" মান্নানের বাসায় পৌঁছে। মান্নানের পরিবার বিস্মিত। সেনা অফিসাররা "শহীদে"র শিশু কন্যাকে আদর করেন। এসডিও ৫০০ টাকা সাহায্য করেন। 'শহীদ' পরিবার উচ্ছ্বসিত।

টেঙ্গাবো যাবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের বর্ণনা করেছেন সাদুল্লা। "এটি হিন্দু অধ্যুষিত ইউনিয়ন। এ ইউনিয়ন থেকে ৬০ জন হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে আর ২০০ হিন্দু মহিলা এম.এ পাস করেছে। একটি

মুসলিম দেশ কিন্তু ১৯৬২ পর্যন্ত সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে পরিচালিত হিন্দু স্কুলে কোনো মুসলমান ভর্তি করা হতো না।"

এ কাহিনীগুলো সাড়ম্বরে বিবৃত করার মাজেজা কী ? মাজেজা একটি। তা হলো : হিন্দু প্রভাবিত আওয়ামী লীগ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হিন্দুরা ভাবছিল আবার তারা মুসলমানদের শাসন করার ক্ষমতা পেতে যাচ্ছে। ভারত তাদের সক্রিয় সহযোগিতা দিচ্ছে। তার লেখায় তাই বারবার 'হিন্দু জমিদারদের' কথা এসেছে। অথচ হিন্দু/মুসলমান জমিদারদের দিন শেষ হয়ে গেছে সেই পঞ্চাশ দশকের শুরুতে।

বাঙালিরা প্রথমে বিভ্রান্ত হলেও পরে ভুল বোঝে, লিখেছেন সাদুল্লা। পাকিস্তানকে অটুট রাখার জন্য বাঙালিরা বিভিন্নভাবে এগিয়ে এসেছে। সহযোগিতা করেছে পাকিস্তানি বাহিনীর। হ্যাঁ, এ কারণে তাদের অনেকে নিহত হয়েছে যে আত্মত্যাগের কথা কেউ মনে রাখেনি।

বাঙালিদের সহায়তায় সেনাবাহিনী শান্তি স্থাপন করতে পেরেছিল। অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, আগস্টে কাওরাইদ বাজারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আর এসব কারণে সাদুল্লার নেতৃত্বে ময়মনসিংহ শান্তির দ্বীপে পরিণত হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে বইটি বেরিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত। বাংলাদেশকে পাকিস্তান করার স্বপ্নে বিভোর তখনও জেনারেলরা। এ বই পাকিস্তানিদের এই ধারণা দিতে চেয়েছে, এখনও সব হারিয়ে যায়নি।

বাংলাদেশ সম্পর্কে তখনও বহির্বিশ্বের মানুষ কমই জানত। যারা এ বই তখন পড়েছে তাদের মধ্যে সে ধারণাই হয়তো সঞ্চারিত হয়েছে।

মূল বিষয় হলো, পাকিস্তান ভারতের কাছে যুদ্ধে হেরেছে বটে কিন্তু আদর্শের লড়াইয়ে তারা পরাজিত।

অভিজ্ঞ মহল খুঁটিয়ে পড়লে দেখবেন যতগুলি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা হয় অতিরঞ্জিত নয় মিথ্যা।

প্রথম কথা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে জমিদার আসবে কোথায়? এর ২০ বছর আগে বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল। পাকিস্তানে জমিদারি প্রথা তখনও ছিল। এক সময়ে হিন্দু জমিদারদের সম্পর্কে যে পূর্ব ধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল তাই রয়ে গেছে সাদুল্লার মাথায়। তার মনে হয়েছে তার দেশে জমিদারি প্রথা থাকলে বাংলাদেশেও আছে। পাকিস্তানিদের অজ্ঞতার বহর কোথায় এটি তার একটি মাপকাঠি হতে পারে।

কালিকচ্ছের যে কথা উল্লেখ করেছেন তা পাকিস্তানি সরকারি উপাত্তেও

পাওয়া যাবে না। আইয়ুব খানের সময়, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো স্কুলে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে না হিন্দুদের কারণে এটি বিশ্বাসযোগ্য?

মুহম্মদ আব্দুশ শাকুরের একটি বই আছে, নাম *ময়মনসিংহে একাত্তর* (ইউ পি এল, ২০০০)। ময়মনসিংহ শহরের চমৎকার বিবরণ আছে সেই গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায়, মানুষ বিহারি ও পাকিস্তানি সেনাদের কারণে আতঙ্কিত। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি। প্রতিদিন নতুন নতুন গুজব একদিকে যেমন মানুষকে আতঙ্কিত করত, তেমনি মুক্তিবাহিনী সম্পর্কিত নানা গুজবও মানুষকে উদ্দীপিত করত। আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে হানা দিতে শুরু করে। সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা তখন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। আব্দুশ শাকুর শুধু নয়, ময়মনসিংহের ওপর (১৯৭১ সাল নিয়ে) আরো অনেক বই পড়েছি। কিন্তু সাদুল্লা বর্ণিত গালগল্পের উল্লেখ কোথাও নেই। বরং শাকুরের বই থেকে দুটি ঘটনার উদাহরণ দিই। তাহলে বোঝা যাবে বাঙালি তৃণমূল পর্যায়ে কী ভাবছিল।

"১৪ আগস্ট। কে একজন এসে খবর দিল, ঈদগা ট্যাঙ্কের মাথায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ভোরবেলা। দেখলাম অনেকেই যাচ্ছে। কিন্তু ভাবখানা যেন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে, অথবা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নিতান্ত ই বেখেয়ালে ওপথে হাঁটছে। পরে ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে টুক করে দেখে নিচ্ছে নিশানখানি।

ফেরার পথে এক আধবুড়ো ভদ্রলোক হাত ধরে টানল, লোকটা অপরিচিত। বলল, "দেখলেন স্যার?"

আমি কোনো কথা বলি না। কী জানি যদি স্পাই-টাই হয়। লোকটি আবার বলল, 'দূর থেকেই দেখছি অনেকক্ষণ ধরে। কাছে যেতে ভয় পাই। কী জানি শালারা আবার মার্ক করে কিনা।'

পরে বলল, 'লক্ষ্য করেছেন স্যার? কী চমৎকার 'কালার' আর কী এক্সেল্যান্ট ম্যাচিং!' । কথা না বলে আমি ফিরে চলি। লোকটা তখন নিচু স্বরে গান ধরেছে :

আমার সোনার বাংলা ,
আমি তোমায় ভালবাসি।

লোকটা স্পাই না পাগল, কে জানে!" (পৃ. ৭৮)

আরেকটি ঘটনা/গুজব/গল্প যাই বলুন না কেন–

"ফরাজী বলতে শুরু করেন, পাকুন্দিয়ার এক রাজকারের ঘটনা। সেদিন ছিল হাটবার। বিক্রির লাগ্য যার যার জিনিস খুল্যা লইয়া বইছে মানুষ। তাগোর

পাশে আস্যা একটা পোঁটলা লইয়া বইলো আরেকজন। নতুন মানুষ দেইখ্যা কেউ কেউ তার মুখের দিকে চায়। মানুষটা কারো দিকে না চাইয়া বাস, পোঁটলাখানি খুলল। আর তক্ষুনি ডরে সবতে চিল্লায়া উঠল।"

'কেন? গ্রেনেড, না এস এল আর, নাকি সাপখোপ ধরে এনেছিল?'

'না, না, ওইগুলা কিচ্ছু না। কান। মানুষের কয়েকজোড়া কাটা কান।'

'কন কী !' আমি মাথা নাড়ি। 'এগুলো স্রেফ গুল।'

ফরাজী কিন্তু উৎসাহ হারান না। বলেন- 'কথাটা আমিও প্রথম প্রথম বিশ্বাস করি নাই । কিন্তু একজন যে নিজ চক্ষেই দেখেছে। তাছাড়া আরেকটা খবর তো শুনছেন বোধ করি। একজন কানকাটা রাজাকার সেদিন হাসপাতালে ভর্তি হইছে।'

'না, তা তো শুনি নাই।'

'আপনে দেখছি কিছু খবর রাখেন না, অথচ টাউনেই থাকেন। খবরটা কিন্তু সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি।'

বললাম,' যাক, ঐ কানওলার কী হলো?'

ফরাজী বলল, 'আসলে তো বিক্রি করতে যায় নাই। কান বিক্রি করবো কেন, আর কান কিনবেই বা কে? গেছে অন্য কারণে। সবে যখন জিগাইলো, কার কান গো? মানুষটায় কয়, 'দেশের দুশমন রাজাকারগো কান।' তখন রাজাকার যারা হাটের মধ্যে টহল দিতাছিল তারা আইস্যা চাপ্যা ধরলো তারে। বাস, তখনই হৈ হৈ কর‍্যা ছুটা আসলো বিশ জনের মতো মুক্তি। সবের হাতেই এস এল আর।'

'তারপর?'

'তারপরে আর কী? হাটের মানুষ তো সব ডরে ভাগলপুর। মুক্তিরা আইসা বাইন্দা নিলো রাজাকার সবকয়টারে। পরে কইলো, কান দিবি না যাবি আমগোর সাথে? কান কাটতে রাজি অয় কেডা কন? তাই মুক্তিবাহিনীর সাথেই মিল্যা গেল তারা।' [পৃ. ১০৬]

নরকে অবস্থান করে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ কীভাবে পরস্পরকে সাহস যোগাত এগুলো তার উদাহরণ। সাদুল্লা যেসব বিবরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাঙালিরা ক্রমেই 'ভুল' বুঝতে পেরে হানাদারদের (তথা পাকিস্তানের) সহযোগী হয়ে উঠছিল তা এইসব ঘটনা প্রমাণ করে না।

১৪

প্রথম পর্বের একাদশ থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধের খণ্ড চিত্র যেগুলোতে জড়িত ছিলেন কর্নেল সাদুল্লা। এগুলো হচ্ছে : কসবা, লাটুমুরা (চাঁদপুর), সালদা নদী, মুকুন্দপুর ও অন্যান্য। স্বাভাবিকভাবেই এগুলিতে এসেছে পাকিস্তানি হানাদারদের শৌর্য বীর্যের কাহিনী। তবে রাজাকারদের সহযোগিতার প্রসঙ্গেও এসেছে নানাভাবে। বস্তুত, আমি যতগুলি বই পড়েছি তাতে দেখেছি এই জেনারেলের বইতেই রাজাকার প্রসঙ্গ এসেছে বিস্ত ারিতভাবে। এর একটিই কারণ, বইটি যুদ্ধের পরপরই লেখা, রাজাকারদের সাহায্য সহযোগিতার কথায় তিনি বিস্মৃত হননি এবং তিনি বইয়ে যত কিছুই লিখুন না কেন, তিনি তো জানেন যে, রাজাকার, আলবদর ছাড়া কেউ তাদের সহযোগী ছিল না।

এইসব যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যেও হিন্দু/ভারত বিদ্বেষ এসেছে কোনো না কোনো ভাবে। তার আগে তার বর্ণিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করি যা পরোক্ষভাবে হানাদারদের অধীনে বাঙালিদের জীবনের চিত্র তুলে ধরে।

নৌকো করে রাতে তারা যাচ্ছেন। একটি নৌকা এগিয়ে আসছে তাদের নৌকার দিকে। নৌকা থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে। নৌকার কাছাকাছি হতেই তারা চ্যালেঞ্জ করলেন। পানিতে কারো ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ হলো। নৌকাটা অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। ফাঁকাগুলি ছোঁড়া হলো কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর এলো না । নৌকার কাছাকাছি হওয়ার পর সাদুল্লার দু-একজন ঐ নৌকায় উঠল। নৌকাটি বেদে নৌকা।

নৌকায় একটি পুরুষ ও একটি শিশু। 'কে কাঁদছিল?' উত্তর নেই। সাদুল্লা বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'নদীতে ঝাপ দিল কে?'

'আমার স্ত্রী।'

সাদুল্লা হতবাক। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সে ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে। সে সাঁতার জানে', নির্লিপ্ত সুরে মাঝি জানাল, 'অপর তীরে পৌঁছে যাবে সে।'

'কিন্তু কাঁদছিল কেন?' উত্তর নেই। জোরাজুরি করার পর বলল, 'আপনারা আসার আগে এরকম একটি দল আমাদের মারধর করে টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে।'

'তাদের পোশাক কেমন ছিল?' সাদুল্লা জিজ্ঞেস করলেন।

'তাদের পোশাক ছিল আপনাদের মতো।'

'মনে হলো কেউ বুঝি আমাকে ছুরি মারল', লিখেছেন সাদুল্লা।

'চল্লিশ' জানাল সে। 'ক'টাকা নিয়েছে?' 'আমি দ্রুত ৪০ টাকা দিয়ে দিলাম তাকে।' এর মধ্যে নৌকা ভর্তি রাজাকাররা এলো। তারা সাদুল্লার নৌকা অনুসরণ করেছিল। কয়েকজন রাজাকার তাকে বাংলায় ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করার পর জানাল, সে মিথ্যাবাদী। তার জিনিসপত্রের দাম ৪০ হতে পারে না। সাদুল্লা তাদের কথায় কর্ণপাত না করে আরো ২০ টাকা দিলেন । তারপর দেখলেন, ছোট একটি ছেলে ঠাণ্ডায় কাঁপছে।

'তোমার নাম কী?' বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন সাদুল্লা।

'বিলাল '। "মনে হলো কেউ আমাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করল। আমার ছোট ছেলের নাম বিলাল। একই বয়সী। ছোট বিলালের পরনে কাপড় নেই, ঠাণ্ডায় কাঁপছে। তার মা নদীর অন্য তীরে কাদায় বসে কাঁদছে। আমি আরো দশ টাকা বিলালের হাতে দিয়ে সরে এলাম। না হলে হয়তো আরো আবেগতাড়িত হয়ে পড়তাম।"

সাদুল্লা এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন নিজের মানবিকতা প্রদর্শনে। কিন্তু সেনাবাহিনীও যে নির্যাতন করছে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল [তিনি যে তা জানতেন না তা নয়] । মহিলারা সেনাদের দেখলেই আতঙ্কিত হতো। কারণ, সেনারা মহিলা পেলেই ধর্ষণ করত। সাদুল্লা প্রথম ৫০ পাতায় যা উল্লেখ করেছেন এই একটি ঘটনা আবার তা নস্যাৎ করে দেয়।

হিন্দু বিদ্বেষের আরেকটি উদাহরণ দিই :

কিশোরগঞ্জের বিটঘরে গেছেন। তার ভাষায়, "স্থানীয় হাইস্কুল পেরুবার সময় আমরা দেখলাম একটি শহীদ মিনার । ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকায় ২/৩ জন ছাত্র মারা যায় [অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্য লক্ষণীয়], ইতোমধ্যে সারা দেশের প্রতিটি স্কুলে 'শহীদ মিনার' গজিয়ে উঠেছে। মিনারের পাদদেশে আছে একটি কবর। সকালে মিনার প্রদক্ষিণ একটি রিচ্যুয়াল। খালি পায়ে, হাতে ফুল নিয়ে প্রভাত ফেরিতে অংশ নিতে হয়। হিন্দুয়ানী না হলেও হিন্দু সংস্কৃতি তো বটে।"

শুধু হিন্দু বিদ্বেষ নয়, ভাষা আন্দোলন ও ভাষা শহীদদের প্রতি তাচ্ছিল্যও লক্ষণীয়। এর সঙ্গে আছে সরাসরি মিথ্যা বলা। শহীদ মিনারের পাদদেশে কবর [প্রতীকী] কোথায়?

১৫

দ্বিতীয় পর্বে অধ্যায়ের সংখ্যা ১১টি [ষোড়শ থেকে ষড়বিংশ] । এই পর্বের নাম 'দি ইন্ডিয়ান ওয়ার' বা ভারতীয় যুদ্ধ। মূলত মিত্র বাহিনীর অন্তিম আক্রমণ

নিয়েই অধ্যায়গুলো রচিত। এখানে বিস্তারিতভাবে যে সব যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হলো : আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জ/ভৈরবের যুদ্ধ।

অন্যান্য সবার মতো এ যুদ্ধকেও তারা ভারতীয় যুদ্ধ বলেছেন। ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যে মুক্তিবাহিনী ছিল এবং এর নাম ছিল মিত্রবাহিনী বা যৌথ বাহিনী এটি তারা কেউ-ই উল্লেখ করেননি। যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করব না, কারণ তা আমাদের মূল আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। যুদ্ধের বর্ণনায় আছে পাকিস্তানি সেনাদের বীরত্ব, অসীম ধৈর্য ও আত্মত্যাগের কথা এবং সেটি স্বাভাবিক। আমি এখানে শুধু আত্মসমর্পণ অংশটির বর্ণনা করব।

সাদুল্লারা ছিলেন তখন ভৈরবে যখন আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা শুনলেন। তারা বিশ্বাস করেননি। ঢাকার সঙ্গে অনেক কষ্টে যোগাযোগের পর শুনলেন, হ্যাঁ সিদ্ধান্ত হয়েছে। "আমরা বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমাদের পরামর্শ নেয়া হয়নি। এমনকি একটি ওয়ার্নিং অর্ডারও আমরা পাইনি।" [পৃ. ১৮৪-৮৫]

উপসংহারে সাদুল্লার যাবতীয় বেদনা প্রকাশিত হয়েছে একটি অনুচ্ছেদে–

"The utter humiliation that followed is too painful to pen. Pakistan had lost the war. We had lost in the East and failed to win in the West. We had already been outmanoeuvred diplomatically, politically and now militarily. We had lost the war without losing in battle [এই লাইনটি মিথ্যা]." Defence of East Pakistan lies in West Pakistan 'neverberated in my mind.' East Pakistan had slumped into 'Bangladesh." [পৃ. ১৮৫]

শেষ দুটি লাইন নিজেকে সান্ত্বনা প্রদানের :

"Some day from the dust through their own effort perhaps they will rise".

১৯৭৫ সাল তো, তাই দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াতে পারবে কিনা। তারও প্রায় ২৫ বছর পর যখন পাকিস্তান যাই, এক পার্টিতে বাওয়ানী পরিবারের একজন আমায় বলেছিলেন, 'স্বাধীন হয়ে তোমরা সঠিক কাজটি করেছিলে।'

বাংলাদেশ সম্পর্কে সাদুল্লা আলাদা ছোট একটি অধ্যায় লিখেছেন। বাঙালি কেমন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে এসব বিষয়ে তার ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তার মতে, বাঙালি সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। বাংলায় দুশো বছরের ব্রিটিশ কুশাসন বাঙালিদের করে তুলেছে অজ্ঞ ও দরিদ্র। চরম দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও আলস্য একটি নষ্ট বৃত্ত যা থেকে বেরুনো মুশকিল। এ বৃত্ত ভাঙ্গার চেষ্টা কেউ করেনি। এর সামাজিক ফল পিতাই হচ্ছেন পরিবার প্রতিপালনের প্রধান।

পূর্ব পাকিস্তানের খুব কম সন্তানই পিতাকে শ্রদ্ধা করে। তার দেয়ার কিছুই নেই। তবুও দুর্বলভাবে তিনি তার কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা করেন। তিনি যদি তা আরোপের চেষ্টা করেন জোরেশোরে তাহলে তা উপেক্ষিত হয় বা অমান্য করা হয়। পরিবারে সবসময়ই বিদ্রোহ হয়। ("Rebellion is rampant in the family" পৃ. ১৮৬)। শিশু বেড়ে ওঠে কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য ছাড়া। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিরোধী হয়ে ওঠে। 'বিদ্রোহী' প্রশংসিত। সুতরাং, অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, কাজী নজরুল ইসলাম এ অঞ্চলে প্রশংসিত। বাঙালি যুবকের কাছের মানুষ তিনি। শেখ মুজিবুর রহমান তাদের একটি যথাযথ শ্লোগান দিয়েছেন– 'জয় বাংলা'। সঙ্গে সঙ্গে তা বিশাল আবেগের খালি জায়গাটা পূরণ করেছে, "কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর এবং জয়ের দিকে এগিয়ে যাও।"

এর পরের ছয় মাস, সাদুল্লার মতে, "নতুন একটি অবকাঠামোর সৃষ্টি হয়।" [পৃ. ১৮০] তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমকালীন কথা । অর্থাৎ পাকিস্তানি ও পাকিস্তানিদের সহযোগী বাঙালি [রাজাকার, আলবদর, আলশামস] এদের শাসনের কথা। তার মতে, ভারতীয় এ আগ্রাসন তা ধ্বংস করে দেয়। হাজার হাজার ক্যাডার [বা তার চেয়েও বেশি]-দের কচুকাটা করে। ["Ruthlessly extermíniting the new cadre by the thousands; may be more"]

বাংলাদেশ স্থাপিত হলো। ভারতীয়রা নতুন একদল লোককে বসাল– অনেককে "সনস অব সয়েল"দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বাক্যটি লক্ষ্য করুন। ভারতীয়রা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাল, বাঙালিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তার পরের লাইন :

"Under international pressure the bulk of Indian army withdrew from Bangladesh". [পৃ. ১৮৮] বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে নয়, আন্তর্জাতিক চাপে ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশ ছেড়েছে। অথচ, আমরা জানি ঐ সময় ভারতকে আন্তর্জাতিক চাপ দেয়ার মতো কেউ ছিল না। এত স্বল্প সময়ে বিদেশী কোনো সেনাদল কোনো দেশ ত্যাগ করেছে এমন কোনো উদাহরণ নেই। শুধু বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ইন্দিরা গান্ধী তা মেনে নিয়েছিলেন। সাদুল্লার মতে, 'বাল্ক' অর্থাৎ অধিকাংশ ভারতীয় সেনা চলে গেছে, তার মানে পুরোটা যায়নি।

উপসংহারে পৌঁছেছেন এভাবে যে, বাংলাদেশে সবাই সবার বিরুদ্ধে। এখন এমন একজন দরকার যিনি সব ভুলে ছিন্নভিন্ন সমাজকে পুনর্গঠন করবেন।

"They need large men, wise and courageous to forget and forgive and restructure their torn society. Benevolence unfortunately is not a

virture of the weak. Nor is wisdom the product of a feeble mind." [পৃ. ১৮৮]

সাদুল্লা বেঁচে আছেন কিনা জানি না । যদি তিনি বেঁচে থাকেন তাহলে নিশ্চয় অনুধাবন করছেন তার সেই শ্লেষ ও করুণা মেশানো ভবিষ্যতবাণী, এখন তার দেশের প্রতি কত বেশি প্রযোজ্য।

উপসংহার অধ্যায়ে তিনি যা লিখেছেন তার পুরোটাই মিথ্যা, অতিরঞ্জিত এবং বিকৃত। একটি বিষয় ঠিক আছে, দ্রোহ কিন্তু সেটি ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নভাবে।

বাঙালির রাষ্ট্রগঠনে দ্রোহ একটি উপাদান।

সবশেষ অধ্যায় 'হাদি : এক রাজাকারের প্রতিকৃতি।' নিয়াজী থেকে সাদুল্লা–কেউই রাজাকারদের ভুলতে পারেননি।

ভৈরব বাজারে হাদির সঙ্গে সাদুল্লার পরিচয়। মেজর আকরাম কার্বাইন হাতে শীর্ণকায় এক লোকের সঙ্গে সাদুল্লার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, এর নাম হাদি। সাদুল্লা পাকিস্তানের অতি অনুগত এই নাগরিকের কথা অনেক শুনেছেন।

হাদি বাঙালি। সাদুল্লার ভাষ্য অনুযায়ী তার বাবা বাঙালি, মুক্তিরা তাকে হত্যা করে যেহেতু তার বাবার মুর্শিদ ছিলেন পাঞ্জাবি। আরেক ভ্রাতা নিহত, বুকে ক্ষত নিয়ে বেঁচে আছে আরেক ভ্রাতা, এক ভাতিজার অবস্থাও তদ্রূপ। ["তিনবার বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দেয়া হয়েছে"]। এই বিবরণ দেখে মনে হয়, পরিবারটি খাস রাজাকার ছিল। সাদুল্লার মতে, হাদির নাম শুনলে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারিদের বুক কেঁপে উঠত। ১৫ জন অনুচর নিয়ে হাদির একটি দল ছিল। তাদের অস্ত্র দিত পাকিস্তান। পোশাক আশাক বেতন দিত হাদি। তাদের শার্টের পকেটের ওপর লেখা থাকত 'আল-হাদি'।

হাদিকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। পাঞ্জাবি হিসেবে সে ভারতীয়দের হাতে বন্দী হয়। পাকিস্তানও পৌঁছে। সাদুল্লা লিখেছেন, অনেকে তাকে ফন্দিবাজ ও জাল [fake and fraud] হিসেবে উল্লেখ করেন কিন্তু সাদুল্লা তা বিশ্বাস করেননি। তার মতে, সে এখন গাজী ও আল্লাহর নামে বাস্তুত্যাগী। "May Allah give him peace and honour in Pakistan, Amen."[পৃ. ১৯০]

আল্লাহর কাছে আমাদেরও প্রার্থনা, এসব নরঘাতক যেন পাকিস্তানেই থাকে।

১৬

সিদ্দিক সালিক পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন প্রভাষক হিসেবে। তারপর যোগ দেন সাংবাদিকতায়। একসময় তাও ত্যাগ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে তিনি ছিলেন মেজর এবং ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকির অধীনে কাজ করেন। জানুয়ারি, ১৯৭০ সালে ঢাকায় আসেন নতুন কর্মক্ষেত্রে, ফিরে যান যুদ্ধবন্দী হিসেবে। পরে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন। ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সফরসঙ্গী হিসেবে ভাওয়ালপুর থেকে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

১৯৭১ সালে সিদ্দিক সালেক ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা। তার ওপরে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি। ১৯৭১ সালের পুরোটা সময় তিনি ছিলেন ঢাকায়। তারপর যুদ্ধবন্দি হিসেবে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করেন।

পাকিস্তান ফিরে তিনি দুটি বই লেখেন। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। সাদুল্লার পর এটিই ১৯৭১ সাল নিয়ে দ্বিতীয় বই। নাম *উইটনেস টু সারেন্ডার'* বইটি বহুল পঠিত। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ওপর রচিত অনেক গ্রন্থে তার বই থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। নাম- *দি উন্ডেড প্রাইড*। যুদ্ধবন্দির স্মৃতিকাহিনী। প্রথম বইটির পুরোটা ১৯৭১ সাল নিয়ে। দ্বিতীয় বইটির প্রথম দু অধ্যায়ে আগের বইয়ের রেশ টানা হয়েছে।

প্রথমে সালিকের *উইটনেস টু সারেন্ডার* নিয়ে আলোচনা করব।

সালিক প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোতে তথ্যসূত্র উল্লেখ করে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন অ্যাকাডেমিক ভঙ্গিতে, সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ করেছেন নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতি। ২৫ মার্চের পর তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বিবৃত হয়েছে।

প্রথমদিকে বইটি পড়লে মনে হতে পারে, কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বুঝি ১৯৭০ সাল থেকে পাকিস্তানের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঘটনার বর্ণনা এমনভাবে দেয়া হয়েছে, আচম্বিতে এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে, তার পক্ষপাত কোন দিকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, পাঠক সতর্ক না হলে সেটি অনুধাবন করা মুশকিল।

প্রথম পর্বের নাম 'রাজনৈতিক'। এই পর্বে অধ্যায়ের সংখ্যা সাতটি।

প্রথম অধ্যায়ে ১৯৭০ সালে তার ঢাকায় আসার কথা বর্ণনা করেছেন। নির্বাচনের আগে মুজিব এল.এফ.ও সম্পর্কে কী সব মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এক সাংবাদিককে মুজিব বলেছিলেন, যেভাবেই হোক

আইয়ুব খান আমাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিয়েছেন। আমি যা চাইব তাতে কেউ না বলতে পারবে না, এমনকী ইয়াহিয়া খানও নয়। এলএফও সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "আমার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচনের পর আমি এলএফও টুকরো টুকরো করে ফেলব।" ইয়াহিয়া খান টেপরেকর্ডকৃত বক্তব্য শুনে বলেছিলেন, "আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমি তাকে দেখে নেব।"

সালিকের বক্তব্য অনুযায়ী দুটি বক্তব্যই টেপরেকর্ডকৃত। এক্ষেত্রে কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই। মুজিবের যেসব মন্তব্যের তিনি উল্লেখ করেছেন সে সময়, মুজিব তা বলে থাকলে নিশ্চয় ২৫ মার্চ পর্যন্ত তিনি অহরহ কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইতেন না। কিন্তু এই মন্তব্য দুটি বইয়ের সুর ঠিক করে দিয়েছে। অর্থাৎ শেখ মুজিব প্রথম থেকেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিলেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘাতের পথে গেছেন। অর্থাৎ ২৫ মার্চ মুজিবেরই সৃষ্টি।

ঢাকায় নানা রকম আশঙ্কা নিয়ে নামলেন সালিক। পরিবার-পরিজন নিয়ে এলেন। থিতু হয়ে বসতে না বসতেই দেখলেন তাদের বাসায় বাঙালিদের এক 'ক্রাউড'। এরা আয়া। ১৯৪৭ সালের আগে যেমন ভারতীয় ভৃত্যরা ব্রিটিশদের বাসায় চাকরি পেলে বর্তে যেত, তেমনি বাঙালিরা এখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাসায় চাকরির জন্য পাগল। এ মন্তব্যেই বোঝা যায় বাঙালিদের কী চোখে তিনি দেখছেন। তবে, পরবর্তী অনুচ্ছেদে লিখেছেন, বাঙালি গরিবরা পশ্চিম পাকিস্তানি গরিবদের থেকেও গরিব। এবং তখন থেকে তিনি অনুধাবন করতে পারলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে শোষণের অভিযোগ করা হয় তার একটি অর্থ আছে। "অপরাধী মনে হলো নিজেকে।" তার ভাষায়–

"I started finding a meaning in the allegations of the economic exploitation of East Pakistan. I felt guilty." [পৃ. ৩]

তার এক পাঞ্জাবি বন্ধু ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে এই গরিবি হালতের কথা জানাতেই তিনি বাঙালিদের অকর্মণ্যতার কথা তুলে ধরে বললেন, একটি জিনিসই তারা পারে সেটি হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করা। তারপর বললেন, এর উল্টোদিকের চিত্র তিনি দেখাবেন।

চৌধুরী ঢাকার সরকারি ইমারতগুলো দেখিয়ে বললেন, ১৯৪৭ সালের আগে এগুলো কিছু ছিল না। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরও ১৯৪৭ সালের পর এগুলো হয়েছে। তাহলে মুজিব যে বলেন, শোষণ হয়েছে তা কীভাবে হয়েছে?

সালিকেরও তাই মনে হলো এবং ভাবতেন, তাহলে মুজিব এত জনপ্রিয় কেন? লক্ষ্য করুন, প্রথমে বাঙালিদের গরিব মনে হয়েছে সালিকের কাছে, অর্থনৈতিক শোষণের কথা মনে হয়েছে। তারপর জনৈক ক্যাপ্টেনের ভাষ্যে তা অসত্য প্রমাণ করলেন।

এরপর রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ ও বিভিন্নজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করেছেন। সর্বত্রই তিনি শুনতে পেয়েছেন, পশ্চিমারা এত বছর শোষণ করছে বাঙালিদের। এর আগে একজন বাঙালি লেখকের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বাঙালিরা ভারতের দিকেই তাকিয়ে থাকে। চলচ্চিত্রের ব্যাপারে সেই লেখক নাকি মন্তব্য করেছিলেন, কলকাতার চলচ্চিত্রের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হোক। আমাদের সাংস্কৃতিক মক্কা থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকি কীভাবে– "...keep the doors open to Calcutta. After all, how can we turn our back on our cultural ka'aba!" [পৃ. ৮]

এ সমস্ত দেখে-শুনে তার মনে হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এ দ্বন্দ্বের কি অবসান হবে না? দুটি অংশ আলাদা হয়ে যাবে? তার তখন মনে হলো দেশের সংহতি একমাত্র রক্ষা করতে পারে ২৫,০০০ সদস্যের জাতীয় সেনাদল।

"The ultimate guarantor of national solidarity." এই বাক্যটিই তোতাপাখির মতো আওড়ে পাকিস্তানি মনে গেথে দেয়া হয়েছে। এবং এখনও তা বিদ্যমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ চিন্তাটা তিনি সম্প্রসারণ করেছেন। এই ২৫ হাজারের মধ্যে বাঙালিরাও আছে। তারা কি অনুগত থাকবে?

চট্টগ্রামের বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের কথা বলেছেন তিনি। মজুমদারের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। তারপর লাঞ্চ করেছিলেন পশ্চিমা এক অফিসারের সঙ্গে। সেই অফিসারটি জানিয়েছিলেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শেষ ব্যাচ যখন করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা সেখানে পাঞ্জাবি অফিসারদের জুতা পালিশ করতে যাচ্ছ না। খুব শীঘ্রই তারা তোমাদের জুতা পালিশ করবে।" ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে চরম বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। মজুমদারকে ২৫ মার্চের আগে ঢাকায় নিয়ে এসে বন্দি করা হয় এবং তারপর তার ওপর চরম নির্যাতন চালান হয়।

জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন ও কর্নেল ওসমানীর কথাও এসেছে। তাদেরও সালিকের মনে হয়েছে একই ভাবধারায় উদ্দীপিত। এসব দেখেই জিওসি

খাদিম হোসেন রাজা বেঙ্গল রেজিমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বাঙালিদের রেজিমেন্টে না রেখে মিশ্র রেজিমেন্ট করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া এ ক্ষেত্রে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেননি।

আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই বীজাণু ছড়াচ্ছিল যা বাঙালি সাধারণ মানুষ ও সেনাদের 'ইনফেক্ট' করছিল। এবং এই বীজাণু সঞ্জীবনে জাতীয় দিবসগুলি দমিয়ে রাখছিল। যেমন, কায়দে আজমের জন্ম-মৃত্যু দিন, পাকিস্তান দিবস ইত্যাদি। লক্ষ্য করুন দুটি শব্দ–বাঙালি জাতীয়তাবাদ হচ্ছে 'virus' এবং মানুষকে তা 'infect' করছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি তার মনোভঙ্গি এ শব্দ দুটিতেই স্পষ্ট। এবং আওয়ামী লীগের কর্মীদের তিনি 'গুণ্ডা' হিসেবে সবখানে চিহ্নিত করেছেন।

চতুর্থ থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত নির্বাচনের শুরু থেকে পরবর্তী পর্যায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে যে নতুন কোনো তথ্য আছে তা নয়। তবে বিবরণটা এরকম– আওয়ামী গুণ্ডাদের জন্য অন্যরা ভালোভাবে প্রচার করতে পারেনি। সামরিক আইন বা এলএফও কেউ মানেনি। কেন্দ্রীয় সরকার ছিল নমিত। ভোটে আওয়ামী লীগ জিতেছে বটে তবে ফরমানের ভাষায় নির্বাচন ছিল 'ফ্রি ফর অল'। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের নির্বাচন সম্পর্কে সব জেনারেলই এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন। নির্বাচনের পর থেকে মুজিব একরকম বন্দী হয়ে গেলেন চরমপন্থার হাতে। সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে মতভেদের শুরু হলো। জুনিয়র একজন অফিসারের মতে, "একটি প্রদেশ সারা দেশের ওপর রাজত্ব করে কীভাবে?" [পঁচিশ বছরের কথা তাদের মনে হয়নি] আরেক দলের মতে, ২৩ বছর আমরা তাদের অধস্তন রেখেছি, এখন তাদের পালা। সবসময় আমরাই ওপরে থাকব তা কীভাবে হয়?

পুরো বিবরণে তিনি দেখিয়েছেন, আওয়ামী লীগের কারণে কীভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। আহসান ইয়াকুব অসহায় হয়ে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে মুজিবও। ইয়াহিয়ার অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ও ঢাকায় না আসা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাল। নামান হলো সেনাবাহিনী। প্রতিদিনই সংঘাত, কার্ফু, গুলি ও নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। মুজিব দুবার আবেদন করলেন সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে গ্রেফতারের জন্য। এ তথ্য অবশ্য আর কারো বইতে পাইনি। ২৮ ফেব্রুয়ারি গভর্নর আহসান মুজিবকে ডেকে পাঠান গভর্নর হাউসে এবং অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা জানান। মুজিব হটেননি। বরং বলেছিলেন, নতুন তারিখ ঘোষণা না করলে অসুবিধা হবে এবং সেটি মার্চের মধ্যে হওয়াই ভালো না হলে দলের চরমপন্থিরা অঘটন ঘটাতে পারে। ফেরার সময় মেজর

জেনারেল ফরমান আলীকে বললেন, 'আমার দুদিকে আগুন। হয় সেনাবাহিনী নয় দলের চরমপন্থিদের হাতে মারা পড়ব। আমাকে গ্রেফতার করেন না কেন? ফোন করবেন, আমি চলে আসব।'

সালিক শফিউল আজমের কথা বেশ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, শফিউল দু'কুলই রাখছিলেন, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের পক্ষে টানছিলেন। মার্চের প্রথম সপ্তাহে সেনা নামানোর অনুরোধ তিনিই করেছিলেন এ বলে যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি এ অনুরোধ রাখছেন। শফিউল আজম আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করছিলেন এ কথা তার শত্রুও বিশ্বাস করবে না।

এখানে আরো দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। ডিসেম্বর [১৯৭০] মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন, গভর্নমেন্ট হাউসে চমৎকার নৈশভোজের পর এক জেনারেল সালিককে জানান, "চিন্তা করো না, ঐ সব কালা বেজন্মাগুলোকে আমাদের শাসন করতে দেব না।"

['Don't worry... we will not allow these black bastards to rule over us." [পৃ. ২৯]

৬ মার্চ রাত দুটোয় ক্যান্টনমেন্টে মুজিবের দুজন প্রতিনিধি জিওসি খাদিম হোসেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার পক্ষে গোয়েন্দা অফিসার জিওসিকে জানালেন, আগামীকাল স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ সাহেবের ওপর চরমপন্থিরা প্রবল চাপ দিচ্ছে। তাদের প্রত্যাখ্যান করার মতো জোর তিনি পাচ্ছেন না। তিনি প্রস্তাব করেছেন, সামরিক বাহিনী তাকে গ্রেফতার করুক। রাজা প্রত্যুত্তরে জানালেন, শেখ সাহেবের মতো জনপ্রিয় নেতা জানেন কী করতে হবে। তাকে বলুন, রেসকোর্সে আমিও থাকব। যদি চরমপন্থিরা কিছু করে আমি তাকে বাঁচাব। কিন্তু তিনি যদি পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কিছু বলেন তাহলে আমি সব গুঁড়িয়ে দেব। সালিকের লেখায় রাজার ভাষ্য–

"... that if he talks against the integrity of Pakistan. I will muster all I can- tanks artillery and machine-gun- to kill all the traitors and, if necessary, raze dacca to the ground. There will be no one to rule, there will be nothing to rule." [পৃ. ৫৩]

এসব বিবরণ কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিরূপণ করা যাবে না। সালিক হয়তো প্রমাণ করতে চাইছেন, শেখ মুজিবকে যেভাবে জাতীয় বীর হিসেবে বাঙালিরা মনে করে তা তিনি ছিলেন না। তিনি সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝে চলছিলেন। এটি সত্য হলে ২৬ মার্চে তাদের অ্যাকশনের যৌক্তিক কোনো ভিত্তি থাকে না। একই সঙ্গে জেনারেলদের আচরণে বোঝা যাচ্ছে, তারা অনেক

আগেই ঠিক করেছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না এবং বাঙালিদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

ঢাকা এলেন ইয়াহিয়া খান। আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। এ বিবরণগুলো মোটামুটি একই রকম। সিদ্দিকির বইতেও তা পাওয়া যাবে। যেমন, প্রথম দিন আলাপের পরই বিমর্ষ হয়ে গেলেন ইয়াহিয়া। সালিকের মন্তব্য : "Amazingly, he had (apparently) failed to see the snake in the grass."

রূপক অর্থে হয়তো এটি ব্যবহৃত কিন্তু 'সাপ' বলতে তো বাঙালিকেই বোঝাচ্ছে। এবং প্রশ্ন উঠতে পারে ইয়াহিয়া যদি এত অবুঝ হন, কিছুই না বোঝেন তা হলে প্রেসিডেন্ট ছিলেন কেন? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বৃথা। তারা ইয়াহিয়া, ভুট্টো বা সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চাশা, দোষ– সেগুলি শুধু হ্রাস করতেই চেয়েছেন। তবে মুজিব সম্পর্কে ইয়াহিয়ার যে উক্তি সিদ্দিকি লিখেছেন, সালিকও তাই উল্লেখ করেছেন–

"The bastard is not behaving. You get ready." [পৃ. ৬২]

টিক্কা খান উঠে তখনই জিওসিকে জানালেন, সালিকের মতে, সেদিনই সেনা অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

তিনি লিখেছেন, মার্চের ২৫ তারিখ পর্যন্ত সেনা এসেছে এটি ঠিক নয়। তার ভাষায়–

"I personally know that no additional troops were flown into Dacca from West Pakistan or from within East Pakistan during the twenty-five days of Mujib's de fecto rule." [পৃ. ৬২] এটি নির্জলা মিথ্যা। অন্যান্য জেনারেলরাই লিখেছেন সিভিল বেশে সেনারা ঢাকা আসছিল।

অপারেশন সার্চলাইট, জানাচ্ছেন সালিক, লিখেছিলেন ফরমান আলী, মার্চের ২০ তারিখ জেনারেল হামিদ ও টিক্কা খান তা দেখে সংশোধন করেন। সেনাকর্মকর্তারা তাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কী ধরনের উচ্চাশা পোষণ করতেন তা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত কথোপকথনে।

পরিকল্পনায় ছিল, বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করা হবে। হামিদ তাতে রাজি নয়, কারণ তাহলে বিশ্বের সেরা বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে।

["...it would destroy one of the finest armies in the world."] [পৃ. ৬৩]

সংশোধিতরূপে বলা হলো, প্যারা মিলিটারিদের নিরস্ত্র করা হবে। পরিকল্পনায় ছিল, আলোচনার সময় যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আসবে তখন তাদের গ্রেফতার করা হবে। ইয়াহিয়া তাতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, "I don't want to go down in history as a traitor to democracy." [পৃ. ৬৪]

সালিক যেহেতু তখন এদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন সেহেতু তার এ বিবরণ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিনি যে লিখেছেন, বিপরীতে জেনারেল ওসমানী প্রস্তুতি নিলেন, সেনা কর্মকর্তাদের প্রস্তুত থাকতে বললেন এবং পরিকল্পনা দিলেন তা ঠিক নয়। কারণ, ২৫ মার্চের পর সব জায়গায় হয় বাধ্য হয়ে নয় স্বেচ্ছায় তারা সেনাবাহিনী ত্যাগ করে যুদ্ধে নেমে পড়েন। ওসমানী উল্লিখিত কোনো পরিকল্পনাই কাজে লাগেনি।

তারপর এলো ২৬ মার্চ। প্রেসিডেন্ট কী বক্তৃতা দেবেন তার খসড়া করে দিয়েছিলেন ফরমান আলী যার মূল উপাদান ছিল–

মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক বলা যাবে না, তিনি দেশপ্রেমিক কিন্তু বন্দী উগ্রবাদীদের হাতে।

কোন অপরাধের জন্য মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাঁকে 'প্রটেকটিভ কাস্টোডিতে' নেয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে কী পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া যেতে পারে পরিষ্কারভাবে তার উল্লেখ থাকবে।

ইয়াহিয়া খসড়াটি নিয়েছিলেন। কিন্তু যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেই শুরু করেছিলেন।

১৭

সালিকের গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব 'রাজনৈতিক-সামরিক' বা 'পলিটিকো মিলিটারি'। এ পর্বে অধ্যায় ৬টি। প্রথম দু'টি অধ্যায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নিয়ে। এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। আমি এখানে তার মনোভঙ্গি ও বিভ্রান্তিগুলো শুধু তুলে ধরব।

অপারেশন সার্চলাইট নিয়ে বিস্তারিত প্রথম লেখাটি সালিকের। পরবর্তীকালে যারা লিখেছেন তারা এর ওপর ভিত্তি করেই লিখেছেন, দু-এক ক্ষেত্রে নতুন তথ্য হয়তো যুক্ত করেছেন।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অপারেশন শুরু হয়। "The gates of hell had been cast open." [পৃ. ৭৫]

জাহান্নামের দরজা খুলে গেল। এর মধ্যে শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা শোনা গেল। অনেকেই এটি সালিকের উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। বইটি পড়ার আগে আমিও করেছি। কিন্তু এখন দেখছি এটি সালিকের উক্তি নয়। এটি ডেভিড লোশাকের 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। সালিক নিজেও জানিয়েছেন তিনি এ ঘোষণা শোনেননি।

অপারেশনের পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিনটি গণকবর দেখেছিলেন কিন্তু তাতে কতজনের লাশ রাখা হয়েছে সে সংখ্যা জানতে পারেননি। তার মতে, সেনা কর্মকর্তাদের মতে, অপারেশন সার্চলাইটে শ'খানেক নিহত হয়েছে। সরকারি হিসাব মতে ৪০। ঢাকায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। রাস্তাঘাটে দু'একটি লাশ দেখেছেন। কিছু ঘরবাড়ি পুড়েছে। তবে, বিদেশি প্রেস যে বলেছে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা ঠিক নয়।

এ নিয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই। সেনাবাহিনীর তাণ্ডব খাটো করে দেখানোর জন্যই যে তিনি এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় নিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। তবে সেনা কর্মকর্তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে পশ্চিমা সেনা কর্মকর্তাদের মনোভাব বোঝা যায়– সেই ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মতামত– "সঠিক এবং ভালোভাবে বাঙালিদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে– অন্তত এক জেনারেশনের জন্য।"

মেজর সালিকের উক্তি– "হ্যাঁ, তারা একটি ভাষাই বোঝে তাহলো শক্তির ভাষা। তাদের ইতিহাস তাই বলে।"

জেনারেল নিয়াজি সদর দপ্তরে যারা নমিত চিন্তার অধিকারী তাদের-ই এসব ঝামেলার জন্য দোষী করেন এবং তার ক্রোধ প্রকাশ করেন বাঙালিদের প্রতি যারা প্রভাবিত হিন্দু ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। এরাই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছে। ["Poured his wrath on the Bengalis, particularly Hindus and the intellectuals- the two classes which in his opinion, nurtured Bengali nationalism."] [পৃ. ৯২]

সালিকের নিজের সম্পর্কে একটি ঘটনাও এই মনোভাব তুলে ধরে। তিনি টি.ভি কর্তৃপক্ষকে বললেন, পাকিস্তান আন্দোলনের নায়ক যারা 'হিন্দু' এবং 'ব্রিটিশ আধিপত্য' থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন তাদের নিয়ে নাটক প্রচারের জন্য। তারা বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি– মওলানা মহম্মদ আলী জোহরকে এই ভার দেয়। তিনি স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরে আহ্বান জানান, স্বাধীনতার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে যেন "Freedom fighters (Mukti Bahini)" প্রস্তুত থাকে। মূল বিষয়টি লক্ষ্য করুন 'হিন্দু'দের থেকে স্বাধীনতা লাভ!

তবে, মাঝে মাঝে তিনি স্বীকার করেছেন, ভুল তথ্যের জন্য গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে।

আল-বদর ও আল-শামসদের নিয়ে লিখেছেন। তার মতে, এরা নিঃস্বার্থ, পাকিস্তানি সেনাদের সাহায্য করতে অতি আগ্রহী। তারা কঠিন কাজ করেছে এবং তার জন্য 'suffer'-ও করেছে। প্রায় ৫,০০০ বা তাদের ওপর নির্ভরশীল সহযোগিরা মুক্তিবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছে।"

"Some of them displayed a sense of sacrifice comparable to the

best troops in the world." [পৃ. ১০৫]

হানাদার বাহিনী যে একটি তামাশার নির্বাচন করেছিল তার বিশদ বর্ণনা আছে। যে আসগর খান এখানে পরিচিত সংবেদনশীল রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনিও ঐ সময় এসেছিলেন তার দলের জন্য আসনের তদবির করতে। অবশ্য তার দলকে কোনো আসন দেয়া হয়নি [আসগর খান তা অস্বীকার করেছেন]। আসগর খানের সঙ্গে কথা বলার সময় সালিকও মুজিব সম্পর্কে 'ট্রেইটর' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন।

তৃতীয় পর্বের নাম 'সামরিক' [মিলিটারি] এ পর্বে অধ্যায়ের সংখ্যা ন'টি। অধিকাংশই বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধের আলোচনা যার মধ্যে আমি যাব না। ঢাকার পতনের শেষ পর্বটিও বিশদভাবে সালিকই প্রথম আলোচনা করেছিলেন। এ বিবরণে দেখা যায়, নিয়াজী ভারত জয় করার বাসনা প্রকাশ করলেও ডিসেম্বরের মধ্যে পাক জেনারেলদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চুপসে যায়। বিভিন্ন এলাকায় পাকবাহিনী ছত্রখান হয়ে যেতে থাকে। নির্দেশের জন্যে রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করেও সময়মতো কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়নি। শেষ মুহূর্ত ফরমানরা আশা করছিলেন যুদ্ধ বিরতি হবে। চীন ও আমেরিকা সাহায্য করবে। কিন্তু যৌথবাহিনীর কমান্ডার সোজাসুজি জানালেন আত্মসমর্পণই করতে হবে। পুতুল গভর্নর ডা. মালেকের সামনে নিয়াজীর কান্নার বিবরণও আছে। আসন্ন আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে অবাঙালিরা ক্যান্টনমেন্টে জমা হতে থাকে। হাজার হাজার বিহারিকে মুক্তি বাহিনী হত্যা করে এবং তাদের যেসব লোমহর্ষক বিবরণ শুনেছেন সালিক তাতে নাকি রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার যোগাড়। তার ভাষায়– "Thousands of them were overtaken by the Mukti-bahini and put to death-I heard hair-raising stories of these atrocities. They were enough to chill the blood and far too numerous to be catalogued here." [পৃ. ২১২]

এটিও যে অসত্য একটি মন্তব্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সালিক একটি নিস্পৃহ ভঙ্গি নিয়ে বইটি লিখেছেন। কিন্তু বিভিন্ন বাক্য গঠন, শব্দ চয়ন এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য স্পষ্ট করে দেয়, নিস্পৃহ ভঙ্গিতে লেখার চেষ্টা করলেও তার পূর্বধারণা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পাকিস্তানি সৈনিকদের এহেন পরাজয় মেনে নিতে পারছেন যেটি খুব স্বাভাবিক। বইয়ের শেষে সেই আর্ত বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে। নিয়াজীকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, শেষ অব্দি লড়লে কি হতো? নিয়াজী বলেছিলেন, ঢাকার রাস্তা লাশের স্তূপে ভরে যেত। মহামারি দেখা দিত। অন্তিমে ফলাফল একই হতো। নিয়াজীর ভাষায়, "আমি ৯০ হাজার বন্দী নিয়ে যাচ্ছি, ৯০,০০০ বিধবা ও ৫ লক্ষ এতিমের মুখোমুখী আমাকে হতে হবে না। ঐ আত্মত্যাগের কোনো মূল্য

নেই।" একদিক থেকে দেখলে নিয়াজীর যুক্তিটি সঠিক। কিন্তু সালিকের মন তা গ্রহণ করেনি। কারণ ৯০ হাজার মারা গেলেও পাকিস্তান সেনাদলের ইতিহাস অন্যরকম ভাবে লেখা হতো, সামরিক ইতিহাসে তা অনুপ্রেরণা যোগাবার মতো একটি অধ্যায় হতো। সালিকের ভাষায়–

"But the history of the Pakistan Army would have been different. It would have written an inspiring chapter in the annals of military operations." [পৃ. ২১৩]

দি উন্ডেড প্রাইডের প্রথম দু অধ্যায়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই যা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দু-একটি মন্তব্য আছে যাতে পাকিস্তানিদের পূর্ব ধারণা ও মনোবাঞ্ছা সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

রমনার মাঠে আত্মসমর্পণে তার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়েছেন সে জন্য নয়। দেশের অর্ধেকটা চলে গেল সে জন্য। তার ভাষায়, "Ignominy and humiliation were imposible to bear." [পৃ. ২]

রমনায় প্রচুর লোক আত্মসমর্পণকারিদের দেখতে এসেছে। তাদের মধ্যে, সালিকের মনে হয়েছে এমন অনেক নারী-পুরুষ আছেন যারা ভারতের কুৎসিত আধিপত্য দেখে আফশোষ করছে পাকিস্তান ভাঙার। তারা জানে, দলটি উন্মাদের।

এই কষ্ট কল্পনা [সান্ত্বনা] আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন পরের কয়েক পৃষ্ঠায়। লিখেছেন, সিলেট, রংপুর, এবং রাজশাহীতে অনুগত পাকিস্তানিদের গাড়ির পেছনে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নেয়া হয়েছে। যারা চিহ্নিত তাদের জ্যান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে। এছাড়া 'সেক্স ম্যানিয়ক'রা নিষ্পাপ মহিলা ও কুমারি মেয়েদের সতীত্ব হরণ করেছে। লুট চলছে। এসব অত্যাচার নিবারণের জন্য কেউ নেই।

২৫ মার্চের পর সিদ্দিক সালিকরা যা করছেন তার বেশি তিনি চিন্তা করতে পারেননি। হ্যাঁ, লুট হয়েছে, হত্যাও হয়েছে কিন্তু যে স্কেলে যে ধরনের নির্যাতনের কথা বলেছেন সংবাদ মাধ্যমেও তা দেখিনি।

উপসংহারে একটি বাক্যই বলে দেয়, তাদের মূল বিকারটি কী? সেটি হলো ভারত। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা এই ভারত বিকার রোগটি সাফল্যের সঙ্গে তাদের সেনাবাহিনীতে এবং জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। পাকিস্তানিদের মনে হয়েছে, পাকিস্তান যেহেতু পরাজিত সেহেতু এখন তো তা ভারতের সঙ্গে মিশে গেছে। সালিক লিখেছেন– "Now that Bharat and Bangladesh are one, the trains can run straight from Sylhet and Rangpur, through India, to Wagah and Husseiniwala on West

Pakistan border." [পৃ. ১৩]

আজ ৩৮ বছর হয়ে গেছে, রমনায় আত্মসমর্পণের পর, সিদ্দিক সালেকও মারা গেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ তেমনই আছে। বরং তাদের মাতৃভূমিই আজ ছিন্নভিন্ন হওয়ার পথে।

১৮

দুটি আলাদা ধরনের বইয়ের আলোচনা করব এখন। বই দুটি যিনি লিখেছেন, পাকিস্তানি রাজনীতিতে তিনিও ব্যতিক্রমী। তাঁর নাম এম আসগর খান, প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান, এয়ার মার্শাল।

১৯২১ সালে কাশ্মীরের জম্মুতে তাঁর জন্ম। দেরাদুনের প্রিন্স অব ওয়েলস রয়াল ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজে পড়াশোনা করে ১৯৩৯ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে তাঁকে 'রয়াল ডেকান হর্সে' কমিশন দেয়া হয়।

১৯৪৭ সালে তাঁকে রিসালপুরে বিমান প্রশিক্ষণ কলেজে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান।

১৯৬৮ সালে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। গড়ে তোলেন তেহেরিক ই-ইশতিকলাল পার্টি, পাকিস্তানে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র উদ্ধারে সেই থেকে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু পাকিস্তান রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেননি। আর পারবেন বলেও মনে হয় না। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান দমনপীড়নের বিরুদ্ধে যে কজন প্রতিবাদ করেছিলেন তার মধ্যে আসগর খান একজন। এজন্য নিজ দেশে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। আসগর খান কেন পারলেন না রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে। করাচির ডন পত্রিকায় আর্দেশির কওয়াসজি (২১.৭.২০০২) লিখেছিলেন :

"As an old-time officer and a gentleman to his fingertips, as an honest man of moderate means, and as a man who genuinely wished to do good by the poverty-stricken, uneducated of this country, there was no way, no way at all, that Air Marshal Asghar Khan could succeed as a politician of Pakistan, given the environment, the atmosphere that prevails and the mindset of the majority."

আসগর খানের প্রথম বইটির নাম– *জেনারেলস ইন পলিটিকস : পাকিস্তান*

১৯৫৮-১৯৭২। দ্বিতীয় বইটির নাম *উই হ্যাভ লার্নড নাথিং ফ্রম হিস্ট্রি*। এ বইটির সময়কাল ১৯৭০ থেকে ২০০২। বলা যেতে পারে ১৯৫৮ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত সময়কালে পাকিস্তানের রাজনীতির কথা লিখেছেন নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে। পটভূমিও আছে। সে হিসাব ধরলে গত ৬০/৭০ বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

বই দুটির ধরন মোটামুটি একই। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপই বিপর্যয়ের কারণ। রাজনীতিবিদদের শঠতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথাও আছে। সামরিক বাহিনীর কেউ যদি পাকিস্তান বা বাংলাদেশের হয় তাহলে সিভিলিয়ানদের সন্দেহমুক্ত হওয়া অসম্ভব। তাকে মতলববাজ মনে হবেই যদিও তা মুখে প্রকাশ করা হবে না। আসগর খানের বই পড়েছি, তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছি, ঢাকায় আসার পর তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, তিনি পাকিস্তানি বটে, আগাগোড়া তাই থাকবেন, তবে, আপাদমস্তক ভদ্রলোক, সৎ এবং সোজা কথার মানুষ। শুধু তাই নয় উচ্চ মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন মানুষ। আমি কাওয়াসজীর সঙ্গে একমত কেন না গত পাঁচ দশকে রাজনীতিতে তিনি প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর অবস্থানও প্রান্তিক। এর কারণ, রাজনীতিতে কখন পিছু হটতে হয়, কখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হয়, কখন মিথ্যা বলতে হয় তা আসগর খানের জানা নেই। কিন্তু এর অন্য একটি দিকও আছে। পাকিস্তান ভ্রমণকালে দেখেছি, আসগর খানের রাজনীতির শত্রু-মিত্র সবই তাকে শ্রদ্ধা করে। কারণ, তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অসৎ, অশুভ কিছু করেননি।

আসগর খানের প্রথম বইটি বেরিয়েছিল ১৯৮৩ সালে। তখন আমরাও সামরিক শাসনের অধীনে। তিনি একজন পাকিস্তানি জেনারেল, কোনো না কোনো ভাবে বেনিফিশিয়ারি তো বটেই। ১৯৭১ সাল সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দেখে বলা যেতে পারে পাকিস্তানি জেনারেলদের লেখা বইগুলির মধ্যে এটি ব্যতিক্রম। এই বইয়ের প্রথম ৫১ পাতা আমাদের ঘটনাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় বইটির তৃতীয় অধ্যায় আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। দুটি বইয়ে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনাবলিতে স্বাভাবিক ভাবে খানিকটা পুনরাবৃত্তি আছে। আবার নতুন তথ্যও আছে। আমি ধারাবাহিকভাবে প্রথমে বই দুটির বক্তব্য তুলে ধরব।

প্রথম বইয়ের ভূমিকার শুরুতে তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, পাকিস্তানের সৃষ্টি গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের কারণে। সামরিক বিজয়ের কারণে তা সৃষ্টি হয়নি বা দখলও করা হয়নি। কোনো জেনারেলও এর

স্থপতি নন। এর স্থপতি হচ্ছে গৃহহারা লক্ষ লক্ষ লোক। এবং তারা কখনও ভাবেনি পাকিস্তান ভবিষ্যতে শাসিত হবে জেনারেলদের একটি ক্ষুদ্র চক্রের দ্বারা। তাঁর এই উক্তি-ই বইটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তোলে। সামরিক শাসন বা জেনারেলদের বিরুদ্ধেই তাঁর বই।

আসগর খান লিখেছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই দুই অঞ্চলের বৈষম্য চোখে পড়ছিল। পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে সবখানে ছিল তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সেনাবাহিনীতে ৮৫ ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি যার মধ্যে আবার পাঞ্জাবিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরেকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেনাবাহিনী যখন প্রথম ক্ষমতা দখল করে পাঞ্জাবে তখন তেমন প্রতিক্রিয়া হয়নি কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হয়েছে। করাচি এবং পরে ইসলামাবাদে বসে যখন শাসকরা অগণতান্ত্রিক সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখন পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এর কারণ, পশ্চিম পাকিস্তান ছিল সমান্ততন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা, অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তান ছিল তা থেকে মুক্ত এবং অধিক গণতন্ত্রমনা। তাঁর ভাষায়, "The people of the eastern wing were sensitive and politically more conscious than those living in West Pakistan who were suffering under the age old domination of feudal lords and serfdom of tribal sardars."

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আরও একটি পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করতে চাই যা কারো বইতে দেখিনি এমনকি বাঙালি গবেষকদের বইয়েও। তিনি লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের অসন্তুষ্টি একনায়কতন্ত্রের ব্রেক হিসেবে কাজ করছিল এবং মানুষকে গণতন্ত্রমুখি করছিল। এবং এ কারণে শাসকগোষ্ঠী ভেবেছিল, পূর্ব পাকিস্তান না থাকলেই পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে– "They would be better off without the eastern half of the country."

পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের বিবরণ দিয়েছেন যা অন্য বইতে পাওয়া যাবে না। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই যাতে স্পষ্ট হবে পশ্চিম পাকিস্তানি সবাই তাদের স্বার্থের ব্যাপারে এককাট্টা ছিল, তিনি বিচারপতিই হোন আর সৈনিকই হোন। বিচারপতি মোহাম্মদ মুনিরের ঘটনাটি তার উদাহরণ।

গুরুত্বপূর্ণ এক সভায় আইয়ুব খান বিচারপতি মুনিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জনসমর্থিত একটি নতুন শাসন গ্রহণের প্রক্রিয়া কী হতে পারে? বিচারপতি মুনির বললেন, বিষয়টা খুব সোজা। আগে গ্রিসে 'Public acclaim' এর মাধ্যমে শাসনতন্ত্র গৃহীত হতো। এভাবে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তা খবরের কাগজে প্রকাশিত হবে এবং তারপর আইয়ুব করাচি,

ঢাকা, লাহোর এবং পেশোয়ার জনসভা করবেন। এবং পাবলিককে জিজ্ঞেস করবেন, নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণে তারা রাজি কি না। উত্তর হবে– হ্যাঁ। এই প্রধান বিচারপতিই পরবর্তীকালে বলেছিলেন সামরিক আইন বৈধ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের বিচারপতিরাও ১৯৭৮ সালে এক রায়ে বলেছিলেন, সামরিক আইন শাসনতন্ত্রের ওপরে। ভাগ্যিস তারা বলেন নি, তাদের উপাধির মাঝে মেজর জেনারেল বা লে. জেনারেল উপাধিটিও থাকা উচিত।

ইস্কান্দার মির্জা ও তার হবু বেয়াইয়ের এক টেলিফোন কথোপকথনের টেপের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। এ ব্যাপারে তাকে সমর্থন করেছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। মির্জা থেকে পদত্যাগপত্র নিয়ে আসার জন্য আইয়ুব খান আসগর খানকেও অনুরোধ করেন। আসগর ছিলেন তখন বিমানবাহিনীর প্রধান। আসগর খান যেতে রাজি হননি। অবশ্যি পরদিন তিনি বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন মির্জা দম্পতিকে বিদায় দিতে। দেখলেন মির্জা দম্পতির পাশে এক ক্যাপ্টেন বসে আছে পা,দুটি সামনের টেবিলের ওপর তুলে। আসগর খান তাকে ধমক দিয়ে রুম থেকে বের করে দিলেন বটে কিন্তু তখনই তাঁর মনে হলো সেনাবাহিনী রাজনীতিতে এলে পরিস্থিতি এমনই হবে। তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাবে কারণ তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই বড় হওয়া সত্ত্বেও আসগর খানের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি– "The conduct of this officer typifies the dangers inherent in the involvement of the armed forces in politics. When power is wielded by the Defence services, it is untimely exercised by people who both by experience and temperement, are the least suited for this role. Since they are not responsible to the people. their arrogance finds expression in ways that are more harmful than the one typified by the ill manners of a young officer at Mauripur airfield on that October morning."

বাংলাদেশে যারা পাকিস্তানি কায়দায় ক্ষমতা দখল করেছিল তাদের ঔদ্ধত্যের কথা নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের। ১৯৬৯-এর দিকে, আসগর খান ইঙ্গিত করেছেন ইয়াহিয়া ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। তিনি ছিলেন সামরিক গোয়েন্দা দফতরের প্রধান। আইয়ুবকে তিনি ভুল সব তথ্য দিচ্ছিলেন। বা আইয়ুব যা শুনতে চান তাই বলছিলেন। এ তথ্যটি অবশ্য নতুন। এরপর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করেন।

আসগর খান লিখেছেন, পশ্চিমপাকিস্তানে তিনিই একমাত্র এর বিরোধিতা করেছিলেন। অন্যদিকে, জুলফিকার আলি ভুট্টো সামরিক শাসনকে স্বাগত

জানিয়েছিলেন। এখানেই দুজনের ব্যক্তিচরিত্রের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপর তিনি প্রাক ১৯৭০-এর ঘটনাবলির বর্ণনা দিয়েছেন যা আমাদের সবার কম-বেশি জানা।

১৯

দ্বিতীয় বইয়ের শুরুতে আছে তিনি কেন এবং কীভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন তার বিবরণ। তিনি লিখেছেন, ১৯৬৯ সালে যখন ফের সামরিক আইন জারি হলো, তখন একমাত্র তিনিই প্রতিবাদ করেছিলেন। অন্যদিকে ভূট্টো ছিলেন একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি সামরিক আইনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ভূট্টোর কাছে ক্ষমতায় যাওয়াটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। চতুর ছিলেন তিনি, জানতেন পরবর্তী ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করবেন জেনারেলরা, সে জন্য তাদের সঙ্গে এক ধরনের আঁতাত গড়ে তুলতে চাইলেন তিনি।

বাঙালিরা, তাঁর মতে, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য অনেক করেছে। শাসনতান্ত্রিক পরিষদে লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার, মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের আসন ছেড়ে দিয়েছে। তার সেই বাঙালিদের সঙ্গে তারা কী করল আর। লিখেছেন তিনি–

"১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ভূট্টো তাকে বলেছিলেন, নির্বাচন বাদ দিতে। সৈনিক ইয়াহিয়া খান ও রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলি ভূট্টো ভালো টিম হবে এবং একসঙ্গে তারা দেশ শাসন করতে পারবে। ইয়াহিয়ার মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা মন্দ না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারটা কী হবে? ভূট্টো বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান কোনো সমস্যা নয়। সেখানে হাজার বিশেক লোক খতম করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রস্তাবে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হলো। ইয়াহিয়া বললেন, হোয়াট ক্যান ওয়ান সে টু সাচ এ সাজেশন।"

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় গেলেন। মুজিবের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনাও হলো। ইয়াহিয়া ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, মুজিব হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

এরপর সিনে এলেন ভূট্টো। ইয়াহিয়া খান গেলেন লারকানা। সেখানেই সিদ্ধান্ত হলো মুজিব যদি তাঁর স্ট্যান্ড থেকে না সরেন তা হলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক জান্তার বৈঠকে এই

সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। লিখেছেন তিনি,

"মার্চের প্রথম সপ্তাহেই আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। রওয়ানা হওয়ার আগে ভুট্টোকে জানিয়েছিলাম ঢাকা যাচ্ছি। তিনি আমাকে করাচি হয়ে যেতে বললেন। করাচি গেলাম কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে আমার তিনটি মিটিং হয়েছে। মুজিব জানিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চিত যে, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না এবং পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগ করবেন। তিনি বলছিলেন, পাকিস্তানের জন্য যখন তারা আন্দোলন করেন তখন ভুট্টো-ইয়াহিয়া কোথায় ছিল?"

"বাঙালিদের তারা কখনও মানুষ মনে করেনি।" আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন তিনি। "মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি যাননি। কেন যান নি, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা তাঁর ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের ধারণা হয়েছিল পশ্চিমপাকিস্তান গেলে তাঁকে হত্যা করা হবে। তা হলে ভবিষ্যতটা কী? তিনি বললেন, ইয়াহিয়া খান প্রথমে ঢাকা আসবে, তারপর আসবেন এম এম আহমদ এবং তারপর ভুট্টো। ইয়াহিয়া খান এরপর সামরিকবাহিনী লেলিয়ে দেবেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। যদি গ্রেফতার করা না হয় তাহলে, পাকিস্তানি বাহিনী অথবা তাঁর লোকেরাই তাঁকে হত্যা করবে। আশ্চর্য নয় কি তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছে।"

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর দু'বার ঢাকা গিয়েছিলেন আসগর খান। লিখেছেন, যা দেখেছেন তাতে আরো বেদনাবোধ করেছেন। জামায়াতে ইসলাম এক 'রিডিকুলাস আর্গুমেন্ট' দিচ্ছিল যে, ভোটে যেহেতু তাদের স্থান ছিল আওয়ামী লীগের পরে, সুতরাং তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। যে সব রাজনীতিবিদ একমাস আগেও বলেছিলেন, মুবিজকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, তারা তখন আওয়ামী লীগকে হেনস্থা করার জন্য ইয়াহিয়াকে সমর্থন করছিল।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. মালিকের সঙ্গেও দেখা করলেন তার আহ্বানে। আসগর খানের দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখা ঠিক করেছিল পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে তারা অংশ নেবে। ডা. মালিক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি নির্বাচন করতে চান? আসগর খান জানালেন, যেহেতু সরকার নির্বাচন ঘোষণা করেছে সেহেতু তার পার্টি মনে করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা দরকার।

এখানে একটু খটকা লাগে। যিনি গণতন্ত্রের পক্ষে, ২৬ মার্চ কী হয়েছে

বাংলাদেশে তার খবরাখবর রাখেন এবং নির্বাচন যে সামরিকতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার কৌশল তা তিনি অনুধাবন করেননি?

ডা. মালিক আসগর খানকে জানালেন, তার দলের দু-একজনকে তিনি মন্ত্রী বানাবেন। তারপর, তিনি কীভাবে গভর্নর হলেন সে কাহিনী বিধৃত করলেন।

টিক্কা খান একদিন তাকে গভর্নর হাউসে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, প্রেসিডেন্ট তাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ডা. মালিক জানালেন, কোনো অবস্থাতেই তিনি গভর্নর হবেন না। তবে, বিদায় নেয়ার আগে বললেন, একটা দিন তিনি ভেবে দেখবেন। সেদিন রাত দুটোয় এক ঐশী বাণী শুনলেন। পরদিন ভোরে নামাজ পড়ে গভর্নর হাউসে টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করে জানালেন তিনি প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে সাড়া দেবেন।

ডা. মালিক কীভাবে মন্ত্রী বানান তার বিবরণও দিলেন। পছন্দমতো লোকদের তালিকা তিনি তৈরি করেন, গোয়েন্দাদের রিপোর্ট নেন। তারপর বিবেচনা করেন। আসগর খানকে আবারও তার অফার জানালেন। আসগর খান ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তিনি চাকরির জন্য আসেননি। নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে এসেছেন। পরে অবশ্য আসগর খান সেই উপনির্বাচনে অংশগ্রহণে বিরত থেকে ঠিক সিদ্ধান্তটিই নিয়েছিলেন।

ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডি ফেরার পর তার স্কুল জীবনের বন্ধু জেনারেল গুল হাসান খানের সঙ্গে এক পার্টিতে দেখা। গুল তখন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ। গুলও তখন থেকে ঢাকা থেকে ফিরেছেন। দুজনেই স্বীকার করলেন ঢাকার অবস্থা ভালো না। গুল বললেন, এ সংকট থেকে বেরুনোর একটিই উপায় আছে। সেটি কী, জানতে চাইলেন আসগর। গুল জানালেন, যুদ্ধ শুরু করা যাতে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করা যায়।

আসগর খান লিখেছেন, পরবর্তীকালে তার মনে হয়েছে, গুল সামরিক জান্তার চিন্তাই প্রকাশ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল হয়তো, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে আমেরিকা এসে তাদের রক্ষা করবে।

আসগর খান ২৫ মার্চের পর ঢাকা আসেন প্রথমে জুলাই এবং তারপর অক্টোবরে। ঢাকা থেকে ফিরে ১৮ জুলাই তিনি প্রেসিডেন্টকে একটি চিঠি লিখে জানান, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পাকিস্তান বাঁচানো যাবে না। লিখেছিলেন তিনি– "...You are no doubt aware that ever since the event of March, I have differed with your Government about the best method of tackling this problem. I am, however, anxious, as many of our country-men are that a policy should be adopted which is both practical as well as enduring, a policy that has a reasonable chance of success."

ইয়াহিয়া খান যখন এবোটাবাদ যান তখন আসগর খান তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পরামর্শ দেন, ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের। ইয়াহিয়া এ পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। বরং বলেছিলেন ফিলিপাইনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল মালেককে তিনি ঢাকায় গভর্নর করে পাঠাবেন। আসগর খান বললেন, বাঙালিরা তাঁকে ইয়াহিয়ার 'স্টুজ' বলে বিবেচনা করবে। ইয়াহিয়া বললেন, মালেক কেবিনেটে থাকার সময় পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতেন। আসগর জানালেন, কেবিনেটে থেকে কথা বলা একব্যাপার আর গভর্নর হয়ে যাওয়া আলাদা ব্যাপার। এবং এতে পরিস্থিতির কোনো বদল হবে না, বরং অবনতি হবে।

আসগর খান লিখেছেন, গভর্নর মালিককে ৩ নভেম্বর দীর্ঘ এক চিঠি লেখেন, এতে তিনি জানান– "...I have maintained that the will of the people must be allowed free expression, that the people alone could keep the country together, that the political problems should be solved politically and not by force, that the democratically elected representatives of the people have the right to administer the country, and that any approach alien to these principles will create further complications from which we may not be able to extricate ourselves."

আসগর খান আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন চিঠিতে। উন্নয়নশীল যেকোনো দেশের সরকারের জন্যই মন্তব্যটি প্রযোজ্য। তাঁর ভাষায়ই উল্লেখ করি– "It is a familiar phenomenon that governments start believing that their interest are synonymous with the interests of the country and that all criticism and dissent as anti-state."

২০

১৯৯৮ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মালমশলা যোগাড়ের জন্য যখন পাকিস্তান যাই তখন আসগর খানের সঙ্গে দেখা করি। ঐ সময় তাঁর প্রথম বইটি মাত্র পড়া ছিল। আমার মনে হয়েছিল, তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিলে হয়তো নতুন কোনো তথ্য বেরিয়ে আসবে। একজন যখন বই লেখেন তখন সতর্ক থাকেন। যখন কথা বলেন তখন ততটা সতর্ক থাকেন না।

আমি এবং মহিউদ্দিন আহমদ ইসলামাবাদে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম এক সন্ধ্যায়। সাদরে গ্রহণ করেছিলেন আমাদের। এবং আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিছু কিছু উত্তর তাঁর বইতে আগেই লিখেছেন। পুনরাবৃত্তি

খানিকটা আছে। তবুও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য সমগ্র সাক্ষাৎকারটিই উদ্ধৃত করলাম।

এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খানের সাক্ষাতকার

* আমি ১৯৭০-এর ঘটনাবলির ওপর আপনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমে ১৯৭০-এর নির্বাচন ও পরে অন্যান্য প্রসঙ্গ।

** পাকিস্তানের নির্বাচনে আমাদের কারচুপির রেকর্ড রয়েছে। আমি মনে করি সে হিসেবে বিগত ৩০ বছরে এটা ছিল শেষ ও এমন নির্বাচন যাতে কারচুপি হয়নি। অবশ্য ইয়াহিয়া খান মনে করেছিলেন, এই নির্বাচনের পরিণামে একটা বিভক্ত সংসদ পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক দলাদলির অবস্থাও হবে তথৈবচ। ফলে নির্বাচনের ব্যালট ঘুরে রাজনৈতিক দলগুলি আসবে অল্পস্বল্প ক্ষমতা নিয়ে। কোনো দলই নিরঙ্কুশ রায় পাবে না। আর সেই ফাঁকে তিনি তাঁর প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন। প্রধানত আমি এ সবের আলোকেই মনে করি, ইয়াহিয়া খান সচেতনভাবেই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন হতে দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের আদর্শ। এখন সে আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ায় তার ফলও পাওয়া যায়। অথচ সে ফল ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

*নির্বাচনী ফলাফল তার জন্য সমস্যা ছিল?

** আমার তো তাই মনে হয়। এটিই ছিল প্রধান সমস্যা। এ-সমস্যার জন্ম হয় নির্বাচনের ফলে। নির্বাচনে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল অধিকাংশ আসন জয় করে জাতীয় পরিষদে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এটি ইয়াহিয়ার জন্য ছিল সমস্যা। তিনি তার নিজস্ব পথে সে সমস্যা কাটানোর চেষ্টা করেন।

* আপনি আপনার আগেকার লেখা একটি *বই জেনারেলস ইন পলিটিক্সে* এবং তার পরের অন্যান্য বই ও লেখাতে সে কথাই বলেছেন। আপনার অভিমত ও দৃষ্টিকোণ বেশ পরিচিত। সে জন্য এসবের বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে ১৯৭০-এর সেই সময়ে যে কোটারি বা চক্র ক্ষমতা তথা শাসন পরিচালনা করত তাদের চিন্তাধারায় মূলত গলদটা কোথায় ছিল? সেটি কোথায় বলে আপনি মনে করেন? আপনি এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতোমধ্যেই দিয়েছেন। তবে আজকের এই সময়ে নানা নতুন অন্তর্দৃষ্টিমূলক নেপথ্য জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে আপনি কি এ বিষয়ে স্মৃতির আলোকে কিছু বলবেন?

** প্রথমেই ওদের যা দরকার ছিল সেটা হলো ক্ষমতায় থাকা। দ্বিতীয়

জিনিসটি পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও সত্যি। তারা বাঙালিদেরকে ক্ষমতা দেবার কথা ভাবতেই পারেনি। আমরা এখানে ছিলাম একটা সামন্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু আপনাদের পূর্ব পাকিস্তানে এই সামন্তের সংখ্যা ছিল নিহায়তই নগণ্য। সামন্ত প্রভুরা এখানে ছিল গভীর শিকড় গেড়ে, প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েম করে। এখানকার বিরাজমান সামন্তবাদী মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রের সরকারকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের এই প্রভাবশালী সামন্তবাদী মানসিকতায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য। শুধু তাই নয়, তাদের এরকম অনুভূতিও ছিল যে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া হলে এক মধ্যবিত্ত চরিত্রের সরকার ক্ষমতাসীন হবে। আর এ চরিত্রের সরকার ক্ষমতায় এলে তাদের এখানে কী সব পরিবর্তন হতে পারে সে নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন ছিল। কারণ তেমন পরিবর্তন হলে তারা তাদের বিরাট বিরাট জমিদারি হারাবে। আর যা-ই হোক এটা তারা মেনে নিতে পারে না। এ এক আংশিক কারণ, যে জন্য সেনাবাহিনীর হাতে ছিল নিয়ন্ত্রণের লাগামটি। সামন্তরাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করছিল– ওটা তারা ছেড়ে দিতে পারে না। আমার ধারণা, এই দুটি জিনিস সম্মিলিতভাবে তাদের সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণ তৈরি করে।

* তাই আমরা এখন সরার আগে জানতে চাই, পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? আমরা জানতে চাই ২৫ মার্চে যেসব ঘটনা ঘটে সে ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কী?

** আমার মনে হয়েছিল যা কিছু ঘটেছে তা একান্তই গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছুই নয়। এসব অর্থহীন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষমতা চেয়েছে, যে ক্ষমতা তারা কখনো ভোগ করেনি। আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বেশ কয়েক দফা কথা বলেছি। তাঁর সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্কই ছিল। নির্বাচনের আগে যে কারণেই হোক তিনি ছয় দফা কার্যক্রম নিয়ে হাজির হন যা বহু পশ্চিম পাকিস্তানির কাছে বিচ্ছিন্নতার এক কর্মসূচি বলেই মনে হয়। আসলে সেগুলি তা ছিল না বরং আমার ধারণা, নির্বাচনের পর সেগুলি তিনি সংশোধন করতেন গোটা পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ হাতে পাওয়ার পর। তিনি পাকিস্তানের মাত্র অর্ধেকটা চাইবেন– এর কোনো অর্থ হতে পারে না। ব্যাপারটি তিনি বেশ কয়েক দফা স্পষ্ট করেই বলেছেন আমাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা এক ধরনের প্রচারণার প্রভাবে এমনই আচ্ছন্ন ছিল যে, তারা ক্ষমতাই ছাড়তে চায়নি। তারা মনে করতে থাকে, ওরা বিচ্ছিন্নতা চায়। তাই ওরা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ধারণার পক্ষপাতী ছিল।

সাধারণভাবে লোকজন এটাকে বেশ একটা ভালো আইডিয়া বলে বিবেচনা করতে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবিকপক্ষেই ছিল এক ভয়ানক পাগলামি। এমনকি, সামরিক দিক থেকেও এসব ছিল একান্ত অর্থহীন। এ ছিল করাচি-চট্টগ্রামের মধ্যকার ব্যাপার, যা ছিল সাগরপথে প্রধান যোগাযোগ পথ। কেননা আমাদের দেশের দুই অংশের মধ্যে আকাশপথে সরাসরি কোনো যোগসূত্র ছিল না। এটা কতকটা ছিল করাচির মতো দূর যেন ফ্রান্সের দক্ষিণ থেকে এক সামরিক অভিযান চালানোর মতো যা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। পাকিস্তানের মানুষকে এ ধরনের প্রচারণার আপ্তবাক্যে ভোলানো হয়– বোঝানো হয় অবস্থা তেমন বেগতিক হলে চীন, চাই কি মার্কিন সপ্তম নৌবহর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। এসব কথাবার্তা নেহায়তই মোটা মাথার উর্বর কল্পনা। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কোনোই অঙ্গীকার ছিল না। চীনের বিশ্বাস ছিল আমরা এমন এক ব্যক্তির শাসনে আছি যার মাথায় গোবর ভরা, অপদার্থ এক কাণ্ডজ্ঞানহীন বদমাশ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা নরপশুও বটে। এখানে ক্ষমতায় যারা ছিল তাদের কিছু বাস্তবতার উপলব্ধি দেবার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। কিন্তু নিরেট গর্দভের মতো ওরা সব কিছুকে লেজে-গোবরে করে ফেলে।

* আমরা জানি, আপনি কাজটা করছিলেন একান্তই একা একা।

** প্রায় তাই। আমার ওপর ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। আমাকে মারধর করা হয়। আমাকে বলা হয়, আমি নাকি এখানে বাঙালিদের চর। এখানকার মানুষ যেন বদ্ধ পাগল হয়ে যায়। ওরা বুঝতেই পারেনি।

* এখানকার পত্রিকা তখন কী ধরনের ভূমিকা পালন করে বলে আপনি মনে করেন? কেননা, যোগাযোগ মাধ্যমগুলি– সরকারি ইলেকট্রোনিক মাধ্যমগুলি ও ট্রাস্ট পত্রিকাগুলি সরকার নিয়ন্ত্রিত হলেও কিছু স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সংবাদপত্র ছিল। তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

** ঐ সময় পত্রপত্রিকা খুব একটা ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী ছিল বলে আমি মনে করি না। তবে এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পত্রপত্রিকা তাদের ভূমিকা পালন করেছে বা করেনি– সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারা একটি ভূমিকা পালন করেছে ঠিকই। তবে তাদের ভাবখানা ছিল এই যে, ২৫ বছর ধরে যে পূর্ব পাকিস্তান কখনো ক্ষমতার অবস্থানে ছিল না, সেই পূর্ব পাকিস্তান ও শেখ মুজিবুর রহমান কেমন করে পশ্চিম পাকিস্তানকে শাসন করবে তা বোধগম্য নয়। তাদের এ মনোভাব বড়ই বিচিত্র। দেশের জনসংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের বাঙালি তথা পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করতে দেয়া

হচ্ছে না– বিষয়টি বিব্রতকর। কিন্তু ওরা তাদের মনস্তত্ত্বের বিশেষ গঠনের কারণে বাঙালির শাসন মেনে নিতে পারেনি।

* আপনি রফি রাজার উল্লেখ করেছেন। আমরা এর আগে তার সাথে কথা বলেছি। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, তিনি যেন সেনাবাহিনীকে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সেনাবাহিনীর ধারণা ছিল, এই বেঁটে চেহারার লোকগুলি আর যা-ই হোক সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় যাওয়াকে ঠেকাতে পারবে না। এর পিছনে আরো একটা ধারণা ছিল এই যে, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ঐ সময়ে সামরিক আইন দিয়ে ঠেকানো গিয়েছিল। আইয়ুব খানের ক্ষমতা থেকে বিদায় নেবার প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া সামরিক আইন জারি করে। তাদের ধারণা, তা যদি ১৯৬৯-এ সম্ভব হয়ে থাকে তবে ১৯৭১-এ বা একই জিনিস সম্ভব কেন হবে না! এ ছিল তাদের যুক্তি। ২৫ মার্চে সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট শুরু করার নেপথ্যে এ ধরনের চিন্তাধারাই ক্রিয়াশীল ছিল। আপনি কি এ রকম আলোকেই ঘটনাগুলিকে দেখতে চান?

** মোটেও না। আমি তো বলি অন্য কথা। সেনাবাহিনী আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল? এ কথাই কি রফি রেজা বলতে চেয়েছেন? তার এ গোটা ধারণাই ভুল। আদৌ ঠিক নয়। আমি নিজে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, সে কথা বোধহয় আপনাদের মনে আছে। সেনাবাহিনী আমাকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আর আন্দোলন তো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, তারা গণতন্ত্র চেয়েছিল। তারা ছিল আইয়ুবিরোধী, আর....

* আইয়ুব শাহীর পতনের সাথে সাথে আন্দোলন আপনা আপনি...?

** রাওয়ালপিন্ডির ইসলামাবাদে তখন আমরা গোলটেবিল বৈঠকে বসেছিলাম। বৈঠকে ওরা.. আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে সম্মত হন। ইয়াহিয়া খান এ অবকাশে ক্ষমতায় গিয়ে অন্য জেনারেলরা গতানুগতিকভাবে যা করে থাকে সেভাবেই দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। জনগণও তা মেনে নিল এই ভেবে যে, ইয়াহিয়া তো তাহলে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকবেন না। কাজেই আন্দোলনটি ছিল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে, অন্য কারও বিরুদ্ধে নয়। আর এ কথাও আদৌ ঠিক নয় যে, এ আন্দোলনে সেনাবাহিনীর কিছু করার ছিল, কারো বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিছু লোক সব সময়ই থাকে যারা মনে করে এখানে যা কিছুই ঘটুক না কেন তার নেপথ্যে কোনো একজনের হাত রয়েছেই। আসলে এ আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী যাঁরা তাঁরা উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন যে, জনসাধারণই এই আন্দোলন চেয়েছিল। তারা তখনকার শাসকগোষ্ঠীর বিরোধী ছিল।

* সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আপনি অনেকদিন কাটিয়েছেন। আপনি মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়েছেন?

** জ্বি, আমি কয়েকবারই সেখানেই গিয়েছি।

* এখন অন্য কথায় আসি? পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু শিক্ষক ছিলেন সে কথা বোধহয় আপনি জানেন। এখানে এরকম একটা প্রচারণা সে সময়ে চালানো হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভারতীয় চর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আপনি এ বিষয়টিকে কী চোখে দেখেন...?

** দেখুন, এখানে একটা যুক্তির বিষয়ও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু ছিল এ কথা সত্যি। তাই সেখানে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস করবে–এও স্বাভাবিক। তবে আপনি এই যে প্রচারণার কথা বললেন, ওরা পূর্ব পাকিস্তানে যা করেছে তার যৌক্তিকতা খাড়া করার জন্যই এটা করা হয়েছে। আমাদের এখানকার সমাজে হিন্দুর তেমন অস্তিত্ব নেই। কাজেই এ ধরনের প্রচারণা এখানে পাত্তা পেতে সক্ষম হয়। যে ব্যবস্থা তখন ওখানে নেয়া হচ্ছিল তাকে যৌক্তিকতা দেবার জন্যই এ প্রচারণার অবতারণা। ইয়াহিয়া খান যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার সমর্থনেই এ প্রচারণা চলে।

* আপনার কি ধারণা, ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছিল সেসব ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানিরা জানত অর্থাৎ মার্চ থেকে ডিসেম্বর অবধি যা ঘটে?

** সরকার ঐ সময়ে যতটুকু তাদের জানতে দিয়েছে ততটুকুই। কেননা তখনকার সংবাদপত্রের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে তা জনসাধারণকে বলা হয়নি। আর আমার মতো লোক–বলতে গেলে শুধু আমি একাই যখন সামরিক অ্যাকশন চলছিল সেই সময়ে চার-পাঁচবার পূর্ব পাকিস্তানে যাই। আমি সেখানকার অবস্থা দেখে ফিরে আসি ও এখানকার জনসাধারণকে জানানোর জন্য আমি জনসভা করার চেষ্টা করি। কিন্তু জনমত বদলানোর কাজটি অসম্ভব রকমের এক বিশাল কাজ। সংবাদপত্র আমার পক্ষে থাকলেও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। আর পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা অনড় ধারণা তো ছিলই। সেই সাথে ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের হাতে হস্তান্তর করা বাঞ্ছনীয় নয়–এ রকম মতবাদও ছিল। এক্ষেত্রে ভুট্টোর এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় বলেন যে, তিনি সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসতে প্রস্তুত নন। আমি মনে করি, তিনি কিছুটা গণতন্ত্রসম্মত আচরণ করলে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হলে পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু তিনি তা করেননি, করার মনোভাব ছিল না। ইয়াহিয়াও ছিলেন ক্ষমতা আঁকড়ে। এ দুয়ের সম্মিলিত কারণেই যা ছিল অনিবার্য তা ঘটে যায়।

* পাকিস্তানি সংবাদপত্রে এখন একটা বিতর্ক চলেছে সেটা বোধ হয় লক্ষ করেছেন আপনি। নানা জিনিসই আলোচিত হচ্ছে। কোনো কোনো খবরের কাগজ ও সাময়িকীতে আমরা লক্ষ করেছি নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলিতে দুই দেশের মধ্যে কোন কোন ধরনের বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ার অনুকূলে লেখার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে নিবিড়তর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে, আর সেজন্য কী কী করা যেতে পারে সে, কথাও বলা হচ্ছে। আবার এ সম্পর্কে এও বলা হচ্ছে, যেমন কিছুদিন আগে আইএ রহমান এবং আরো অনেকে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে একাত্তরে সেজন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

** তাতে উনিশ-বিশ তো আমি কিছু দেখি না। আমি তো মনে করি উভয়পক্ষই মন্দ আচরণ করেছে এই ধারণায় যে, উভয় তরফই নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে। আমি মনে করি ন্যায়ত একথা বলা যায় না যে, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীই এমন আচরণ করেছে, তারাই সবকিছুর নিষ্পত্তি করেছে। তারা বিভিন্ন সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করেছে এমনভাবে যেগুলি কোনো না কোনোভাবে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার তাঁবেদার। তবে সে যা-ই হোক ওখানকার গোটা জনসাধারণ যথার্থই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায়। আর এও ঠিক, তারা খারাপ আচরণও করে। আমি মনে করি, পূর্ব পাকিস্তানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

* আমার তো মনে হয় পাকিস্তানের বর্তমান [তৎকালীন] প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সে ধরনের একটা বিবৃতি দিয়েছেন ইতোমধ্যে।

** আমার জানা নেই কোন স্তরে তেমন দাবি জানানো হয়েছে। আমার তো মনে হয়, পররাষ্ট্র দফতরের কেউ এমন কথা বলে থাকবে, প্রধানমন্ত্রী বলেননি। আমি এ ব্যাপারে একটি লেখা লিখেছিলাম কর্তৃপক্ষীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে। কথাটা তুলেছিলাম হামুদুর রহমান কমিশনের অর্থহীনতা নিয়ে। আমাদের মতে, এ এক উদ্ভট, হাস্যকর প্রয়াস। আমাকে কমিশনে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কমিশনের এজলাসে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে অস্বীকৃতি জানাই। আমি এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে লিখেছি এই বলে যে, আপনার তদন্তের ব্যাপারটির কোনো সার্থকতা নেই। কেননা, আপনাকে তো কার্যত বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের কারণ বের

করতে। তাহলে তার পিঠে আমি তো পাল্টা প্রশ্ন তুলতেই পারি, পশ্চিম পাকিস্তানে তাহলে সেনাবাহিনী কেন আত্মমর্পণ করেছিল? সে প্রশ্নও তো থেকে যায়। ওর ভালো জবাব হয়তো রয়েছে, কেননা, পেট্রোল-গোলাবারুদে টান পড়েছিল। তবে সেটা কোনো সমস্যা নয়। সঙ্কট কেন তৈরি হলো– সেটাই ধাঁধা। রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কী ছিল? সে যা-ই হোক, যেহেতু আপনাকে সে এখতিয়ার দেয়া হয়নি সেহেতু আপনার তদন্তের কোনোই অর্থ নেই। আমি ওখানে গেলে কিছু ইউটোপিয়ার দেখা মিলবে মাত্র। তাই আমি কমিশনের এজলাসে গিয়ে দাঁড়াব না। আমি আমার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে জাস্টিস হামুদুর রহমান বললেন, 'ভাবছেন কেন, আপনার সবকিছুই তদন্ত করে দেখব।' আমি বললাম, 'মাই লর্ড, আপনি হয়তো সবকিছুই দেখবেন, মহাবিশ্ব নিরীক্ষণ হয়তো বা করবেন, কিন্তু সনদে আপনাকে যে এখতিয়ার ঠিক করে দেয়া হয়েছে সেখানেই যে ঠেকে যেতে হবে, আর এটি তখন নিশ্চিত ছিল যে কমিশনের রিপোর্ট কখনো আলোর মুখ দেখবে না। আর ঘটেছেও তাই। আমরা এ রকমের তদন্ত করেছি আর তাতে এই রয়েছে।

* তদন্ত হবার কোনো সম্ভাবনা আছে?

** আমার ধারণা, নেই। আমরা দেশের অর্ধেক হারিয়েছি। ৯৩ হাজার সৈনিক আমাদের যুদ্ধবন্দি হয়েছে। আর এ সবের কোনো তদন্ত হয়নি। আমি এসব বিষয়ের ওপর একটা লেখা লিখেছিলাম। তাতে বলেছিলাম, আমার মতে সামরিক পরাজয় নিয়ে কোনো তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল তার কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। কোনো সার্থকতা ছিল না সে অভিযানের, কেননা ঐ পরিস্থিতিতে কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষেই পূর্ব পাকিস্তান জয় করা সম্ভব নয়। বরং তদন্ত হতে হবে, যে সামরিক তৎপরতা চালানো হলো তার রাজনৈতিক হেতুগুলি কী, আর কী উদ্দেশ্যে তা করা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলিরই বা কী ভূমিকা ছিল সেইসব বিষয়ে। যে জাতি তার অতীত থেকে শিক্ষা নেয় না...।

* স্বতন্ত্র গবেষণা এ বিষয়ে হয়েছে কি বলতে পারেন? কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা এ ধরনের কোনো কিছু...?

** এ ধরনের কোনো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা-সমীক্ষার কথা আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে অবশ্য সেনাবাহিনীর একটা প্রভাব কাজ করে। তারা এ ধরনের তদন্ত-গবেষণা হতে দেবে না এ কারণে যে, এতে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কতখানি উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়বে সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত নয়। তাই আমি জানি না, কেউ এ বিষয়ে খোঁজখবর করেছে কী না বা করতে চায় কি না, জানতে

চায় কি না তখন কীসব ঘটেছে, কেন ঘটেছে। আমি মনে করি, লোকে কী করেছে সে ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের তদন্ত করে দেখা উচিত। ওসব কাজ ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী ঘটনা ও মহড়া। আমার বিশ্বাস, আমরা কী কী ভুল করেছি সেগুলি অনুসন্ধান করে না দেখার মতো নির্বোধের কাজ করা আমাদের উচিত হবে না। নীতির দিক থেকে আমি বলব, এসব কাজ অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাসুলভ হয়েছে। আমরা এ কথাগুলিই তখনো জোরগলায় বলেছিলাম। আমি এ কথা বলি না যে, পূর্ব পাকিস্তানিরা–বাংলাদেশীরা বিশ্বস্ত বা অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়... আমি মনে করি...

* তাহলে কীসের কারণে এ সঙ্কট দেখা দেয় বলে আপনি মনে করেন? আমরা বলতে চাই–ওরা এমন করেছে...কীভাবে এ সবের শুরু?

** আপনিই তো বলেছেন প্রচারণার কথা। বলেছেন, হিন্দু সংস্কৃতি ও আরো সব কথা... এক ধরনের মানসিকতা, মনোভাবের কথা। সেনাবাহিনী ছিল তখন সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে। এসব সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু আমার জানা নেই। কিন্তু প্রচারণা চলেছে, তেমন কথাবার্তা বলা হয়েছে। এতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই যে, নিদারুণ দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, আর দু'তরফ থেকেই তা ঘটানো হয়েছে। কেউ এ কথা বুকে হাত রেখে বলতে পারে না যে, কোনো পশ্চিম পাকিস্তানিকে হত্যা করা হয়নি কোনো বিহারি মারা যায়নি। উভয় তরফেই বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। আমি মনে করি, আমরা বেশি দায়ী কেননা আমরাই এসব কাজকারবার শুরু করেছিলাম। আমরা সেখানে ক্ষমতায় ছিলাম। আর তাই আমি আরো মনে করি, সেখানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খারাপ আচারণ করেছি আমরা, আমরা আমাদের ধ্বংস করেছি, আর গোটা তথ্যমাধ্যম আমাদের সবকিছুই ছেঁকে তুলে দেখিয়েছে। যা হোক, আমি এসব নিয়ে তেমন ঘেঁটে দেখিনি, তার সূচনাও করিনি, তবে আলোচনা শুরু হয়েছে। আমি কিছু লিখেছি এ বিষয়ে। আমি বলি, আমি করিনি তবে এটা হলে ভালো কাজ হবে। আমাদের উচিত হবে সম্ভব হলে এসব ভুলে যাওয়া–তাতে পরস্পরের কাছে আসার হয়তো সুবিধা হতে পারে। দেখুন, আমার মতো অনেক মানুষ এখানে আছেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে সে সবের জন্য খুবই দুঃখিত। আর তাঁরা নিজেদেরকে পূর্ব পাকিস্তানিদের খুব ঘনিষ্ঠ বলেও মনে করেন। আমি নিজে অন্তত পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা দেশ বলে মনে করি না।

* আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এয়ার মার্শাল আসগর খান। আপনি আমাদেরকে অনেকখানি সময় দিয়েছেন।

আসগর খান ১৯৭১ সালের জন্য ভূট্টো ইয়াহিয়াকে দায়ী করেছেন। বাঙালিদের প্রতি অবিচারের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গ যখন আলোচিত হচ্ছিল তখন তিনি বললেন, "তাতে উনিশ-বিশ তো আমি কিছু দেখি না। আমি তো মনে করি উভয়পক্ষই মন্দ আচরণ করেছে এই ধারণায় যে, উভয় তরফই নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে। আমি মনে করি ন্যায়ত একথা বলা যায় না যে, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীই এমন আচরণ করেছে। তারাই সবকিছুর নিষ্পত্তি করেছে।"

দু'পক্ষ শব্দটি আমার কান এড়ায় না। গণহত্যার কথা বললে, পাকিস্তানের সবাই কেমন যেন ডিফেনসিভে চলে যায়। বলতে হয়, অপরপক্ষও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাই অন্তিমে আমার মনে হয়, যত সহানুভূতি বা মানবিকতাই আমরা প্রদর্শন করি না কেন পরস্পরের প্রতি, অন্তিমে একজন পাকিস্তানি জেনারেল পাকিস্তানিই আর একজন বাঙালি বাঙালিই।

২১

মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হুসাইন মালিক ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে। যখন যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেননি ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান হবে। পাকিস্তান হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই তিনি অপশন দেন পাকিস্তানের পক্ষে। ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি রওয়ানা দেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। দশজন অফিসারের একটি দল রওয়ানা হয়েছিল ঢাকার পথে। তাদের একজন মেজর এসজি এমএম পীরজাদা পরবর্তীকালে লে. জেনারেল হয়েছিলেন এবং ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খানের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ছিলেন।

প্রথমে তারা পৌঁছেন চাটগাঁ। সেখানে তাদের অভ্যর্থনা জানান আঞ্চলিক সেনা কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আইয়ুব খান। চাটগাঁর মানুষও তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ঢাকায় পৌঁছলে ঢাকার মানুষজনও তাদের দিয়েছিলেন 'গ্র্যান্ড রিসেপশন।' উল্লেখ্য, দশজনের মধ্যে মালিক ছিলেন কনিষ্ঠতম।

ক্যান্টনমেন্ট ছিল তখন তেজগাঁয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত, প্রায় পরিত্যক্ত কিছু কুটির নিয়ে ছিল ক্যান্টনমেন্ট। সামান্য কিছু সৈন্য ছিল তখন এবং এই ক্ষুদ্র বাহিনীই নিয়োজিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান রক্ষায়।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষজনের তখনকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন মালিক

কয়েক কথায়। কিন্তু তাতেই ফুটে উঠেছে এ ভূখণ্ডের একটি রূপ। অধিকাংশ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা ছিলেন অবাঙালি। বাঙালিদের তারা হেয় চোখে দেখতেন এবং আলাদা থাকতেন। লিখেছেন তিনি, "They maintained their social contact in their own circles and treated the locals as Niggers same as the Britishers used to call them." তাঁর মতে, বাঙালিদের শুধু প্রভু বদলেছিল, ব্রিটিশদের বদলে প্রভু হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যারা ছিল পূর্ববর্তীদের থেকেও খারাপ।

মালিক লিখেছেন, বাঙালিরা "affectionate and unsophiticated people." শহর এবং গ্রামাঞ্চলে মাদ্রাসা নেটওয়ার্কের কারণে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানকার মানুষজন ইসলাম সম্পর্কে বেশি জানতেন। তাদের অবজ্ঞা করা হলে তারা স্পর্শকাতর হয়ে উঠত। আবার সমান মর্যাদা দিলে তারা ছিল 'ডিপেন্ডেবল ও হেলপফুল'। দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা বাঙালিদের বিনয়কে ভুল বুঝত। তারা মনে করত বাঙালি নতজানু ও কাপুরুষ এবং বাঙালিদের প্রতি দুর্ব্যবহার করলেই কাজ আদায় সম্ভব। বাঙালিদের এমন চিত্র আর কোনো জেনারেলের বইতে পাওয়া যায় না।

আইয়ুব খানের অধীনে ছিল দুটি ইনফেনট্রি ব্যাটালিয়ন। তাকে প্রায়ই মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হতো, রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শও চাওয়া হতো। মালিক লিখেছেন, এটা ছিল একধরনের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তাঁর মতে, "They did so sheer out of sincerety and not because General Ayub was intellectually a more superior person and they needed his advice to run the government." আইয়ুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তাঁর প্রধান দুর্বলতা ছিল লোভ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা।

মালিক যা উল্লেখ করেন নি, কিন্তু যা বলা যেতে পারে, তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানে তাঁকে রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মচারীরা অত্যধিক মর্যাদা দেয়ায় ক্ষমতার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি রাজনীতিবিদ ও আমলাদের দুর্বলতা জানতেন এবং মনে করতেন শক্তি এবং ছলচাতুরির বলে তিনি তাদের নিজ আয়ত্তে রাখতে পারবেন। হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের অবস্থান তাকে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল।

মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে এসেছিলেন ঢাকায়। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত জিন্নাহর সেই বিখ্যাত ভাষণ সম্পর্কে তিনি যেতথ্য দিয়েছেন, প্রচলিত তথ্যের সঙ্গে তার মিল নেই। প্রচলিত তথ্য হলো, রমনা রেসকোর্সে এক ভাষণে জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং সঙ্গে সঙ্গে তার

প্রতিবাদ হয়েছিল। মালিক বলেছেন, জিন্নাহর উক্তির প্রতিবাদ সেখানে হয়নি– "When he decleared that the state Language shall be Urdu. There was not a even murmur from any quarter. They had come there not to question his decision but only to have glimpse of their beloved leader."

অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক পি সি চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিকথায় অন্য একটি তথ্য জানাচ্ছেন। কার্জন হলে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। মঞ্চে জিন্নাহর পাশে বসেছিলেন তিনি। বক্তৃতার এক পর্যায়ে জিন্নাহ ঘোষণা করেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একটি ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিন ধরনের স্লোগান দেয়া হয় যা– "Reiterated their faith in the unity of Pakistan, the leadership of Jannah, and their determination to have Bengali as a state language-" জিন্নাহ রমনায় বক্তৃতা করেছিলেন ২১ মার্চ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ মার্চ। রমনার জনসভায় প্রতিবাদ হলে কি জিন্নাহ একই উক্তি আবার করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে? আর প্রতিবাদ জনসভায় হওয়া থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে সেই পরিস্থিতিতে হওয়া বেশি যৌক্তিক। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যারা গবেষণা করছেন তারাই এ সম্পর্কে ভালো বলতে পারবেন।

সেনাজীবনের বিবরণও দিয়েছেন মালিক। একজন দ্বিতীয় লেফটেন্যান্টের মাসিক বেতন ছিল তখন প্রায় ৪০০ টাকা। তাতে তার ভালোভাবে চলে যেত। যদিও থাকতেন তারা কুটিরে কিন্তু তা ছিল পরিচ্ছন্ন আরামদায়ক। ক্ষমতার স্বাদ সেনাবাহিনী তখন পায় নি, তাদের দায়িত্ব ছিল শুধু সীমান্ত রক্ষা করা এবং তাতেই তারা সন্তুষ্ট। সিলেটেও কিছুদিন ছিলেন মালিক, তারপর ১৯৫০ সালে ফিরে যান পশ্চিম পাকিস্তান।

ঐ সময়ের পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তিনি যে বিবরণ রেখে গেছেন তাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পূর্ব ও পশ্চিমে ফাটল ধরছিল। অকপটে তিনি সে বর্ণনা দিয়েছেন। করাচি ফেরার আগে কয়েকদিন ছিলেন তিনি ব্যবসায়ী সদরি ইস্পাহানির বাসায়। ইস্পাহানি প্রায়ই বলতেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কে আরো বেশি "Social contact and fair dealing" থাকা উচিত। না হলে তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকবে না। এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনোভাবেই কলোনি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তাদের "home land" হিসেবেই এ অঞ্চলকে বিবেচনা করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তান ছিল তখন অরক্ষিত। এর কোনো বিমান বা নৌবাহিনী ছিল না অথচ বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগ অর্জন করত পূর্ব পাকিস্তান। বলা হতো, ভারতীয় বাহিনী যদি

ঢাকা দখল করে তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের বাহিনী দিল্লি অধিকার করবে। সে কারণে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করবে না। বলা হতো তার ভাষায়– "The defence of East Pakistan lies in West Pakistan the usual lofty talk and a bogus theory which miserably failed in 1971." মালিক লিখেছেন, ভারত ঢাকা পৌঁছেছিল কিন্তু পাকিস্তানবাহিনী ওয়াগা সীমান্তও পেরুতে পারেনি। বরং, "আমাদের ভূখণ্ডের একটা বড় অংশ আমরা হারিয়েছি।" মালিক অবাক হয়ে লিখেছেন, পূর্বপাকিস্তানের প্রতি এই যে বৈষম্য তার জন্য ১৯৫৮ পর্যন্ত কোনো অনুযোগ বাঙালিরা জানায়নি। এদিক থেকে দেখলে, "They showed more sense of patriotism than could be expected from any regional unit of a Federal state."

চতুর্থ অধ্যায়ে মালিক আইয়ুব খানের ক্ষমতারোহণ, পাকিস্তানি বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং বাঙালি সৈনিকদের সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। এসব তথ্য দিয়ে তিনি পাকিস্তানের ভাঙনটি বুঝতে চেয়েছেন। অন্য কোনো জেনারেল এত আবেগহীন ভাবে এসব তথ্য প্রদান করেননি।

১৯৫১ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ হন। জ্যেষ্ঠতার তালিকায় আইয়ুব খানের স্থান ছিল দশম কিন্তু সেনাধ্যক্ষের পদটি তিনি পেলেন, মালিক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের কারণে। এ তথ্য কেউ আগে জানাননি। এতে বোঝা যাচ্ছে আইয়ুব খানের 'ঢাকা কানেকশন' কাজে লেগেছিল। অবশ্য, বাঙালিরা তখন নিশ্চয় বুঝতে পারেননি তারা কী বিপদ ডেকে আনছেন।

২২

আইয়ুব খান ক্রমেই ক্ষমতার দিকে এগোতে লাগলেন। ১৯৫৮ সালে দেশ যখন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলেন। এ কাজটি করে মালিক জানাচ্ছেন, দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিকাশে তিনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ক্ষতি করলেন। সেনাপতিরা তখন বোঝেননি যে, পাকিস্তান ভাঙনের বীজ তারা বপন করলেন। কারণ, "The lust for power is often so tempting for such small minds that for their personal ambitions and greed they are always prepared to sacrifice the national interest as long as their own purpose is served."

সামরিক শাসন জারির পর সেনাবাহিনীর আনুগত্য কাগজে-কলমে রইল দেশের প্রতি, আসল আনুগত্য রইল সেনাধ্যক্ষের প্রতি। মালিক জানাচ্ছেন

এটিই ছিল সমস্যার মূল। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি তখন আংকারায় পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত। এক পার্টিতে ব্রিটিশ এয়ার ফোর্সের অ্যাটাচের স্ত্রী তার স্বামীকে বলেছিলেন, "ডার্লিং আমাদের দেশে মার্শাল ল হতে পারে না।" তার স্বামী হেসে বলেছিলেন, "হতে পারে, কিন্তু যিনি এ ঘোষণা করবেন সারা দেশের লোক তাকে পাগল বলবে।" তাঁর মতে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণে এ বিষয়টি ছিল না। এটি "Deliberately ignored and the central governments gave no protection to those who showed reluctance to obey the illegal orders of this superiors."

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে, ১৯৭৫ থেকে বাংলাদেশে যতগুলি আর্মি ক্যু হয়েছে তার প্রতিটির নেতা ছিলেন পাকিস্তান প্রশিক্ষিত। এদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও পাকিস্তানি প্রশিক্ষণের বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এ-বিষয়ে ভূমিকায়ই আলোকপাত করেছি।

১৯৫৪ সালে মালিককে কাকুলে মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষক করা হয়। সেখানে তার ছাত্র হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের পরবর্তীকালের চারজন—মেজর জেনারেল মান্নান সিদ্দিকি, মোহাম্মদ জান, ওয়াজিউল্লাহ ও নূরউদ্দিন। তিনি জানাচ্ছেন, বাঙালি ক্যাডেটদের উপেক্ষা করা হতো, "Their number had reduce due to shunting out as duds." মালিক লিখেছেন, এরা যে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে উন্নতি করেছে তাই প্রমাণ করে যে অন্যদের থেকে এরা অযোগ্য ছিলেন না।

২৩

১৯৬৩ সালে ১৫ বছর পর মালিক ফিরলেন পূর্ব পাকিস্তানে। কুমিল্লায় ছিল তার পোস্টিং। তিনি লিখেছেন, ১৫ বছরেও পূর্ব পাকিস্তানের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি তবে কুর্মিটোলায় নতুন ক্যান্টনমেন্টের উন্নতি হয়েছে। তাও বোধ হয় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য। কারণ তখন পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই-কি-তিনটি ব্যাটেলিয়ন মাত্র গড়ে তোলা হয়েছে। যে কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই বুঝতে পারতেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের তখনও 'নিগার' মনে করে। সাধারণ মানুষ ছিল গরিব। কিছু ধনী ছিল যার মধ্যে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা।

এখানে মালিক বাঙালিদের সম্পর্কে পাকিস্তানিদের সেই পূর্ব ধারণার

উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, যা কিছু পূর্ব পাকিস্তানে ঘটেছে তার জন্যে হিন্দুরা দায়ী এটি বলা প্রতারণার সামিল। তার ভাষায় "To Say that whatever happened in East Pakistan was because of Hindu progaganda amounts to deceiving one self."

রাজনীতি সম্পর্কে যাদের সাধারণ জ্ঞান আছে তারাও বুঝতে পারছিলেন ভাঙন ধরেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালিরা ঘৃণা করত। বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু তাদের সাথে ব্যবহার করা হতো আমেরিকার নিগ্রোদের মতো। "This position of second class citizenship, they were not prepared to accept long."

মালিক এখানে একটি রূপক ব্যবহার করেছেন। ইব্রাহিম লোদির অত্যাচারে টিকতে না পেরে তার চাচা দৌলত খান বাবরের সাথে মিত্রতা করেন। বাঙালিরা দেখছিল স্বাধীনতার সাথে প্রভু বদল যা তারা চায়নি। বিদেশী শাসক থেকে মুক্ত হওয়া যায়নি এবং হয়তো আগরতলা ষড়যন্ত্র ছিল সেদিকে একটি পদক্ষেপ কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমপাকিস্তানি শাসকদের উৎখাত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সে কারণে, "Mujib in fact, was not a traitor. He was a great patriot for his own people."

মালিক লিখেছেন, ১৯৬৫-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যদি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হতো তাহলে ফাতিমা জিন্নাহ জিততেন। আইয়ুব জিতলেন বটে কিন্তু ফাতিমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের ৪০% ভোট পেয়েছিলেন। এই ফলাফলই বিরোধীদলের আন্দোলনের সূত্রপাত করে যা অন্তিমে আইয়ুব খানের পতন ডেকে এনেছিল। ঐ সময়ই মালিক প্রমোশন পেয়ে কর্নেল হলেন কিন্তু সেনাবাহিনীতে তখন চলছিল ওপরওয়ালাকে খুশি করার প্রতিযোগিতা। ওপরওয়ালাকে খুশি না করলে তখন ওপরে ওঠা ছিল মুশকিল। "Ever since our higher military leadership got involved in politics, their priorities changed."

নয় থেকে চৌদ্দ অধ্যায় পর্যন্ত মালিক পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন যা আমাদের জন্যে প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক হলো সেনাবাহিনী ও সামরিক শাসন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন। সামরিকবাহিনী বিশেষ করে ক্ষমতা দখলের পর তা অনুধাবন করা যায়। মন্তব্য করেছেন তিনি, সামরিক শাসনকে বাইরে থেকে যতটা দৃঢ় ও স্থিতিশীল মনে হয় আসলে তা নয়। এ ধরনের সরকার বরং সবচেয়ে দুর্বল সরকার। যতদিন চলে ভালো চলে, একটু গড়বড় হলেই তার ভিত্তি কেঁপে ওঠে। ভালো-মন্দ বৈঠকের পর পশ্চিম

পাকিস্তানে জনপ্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেছেন এবং তাশখন্দের জন্য আইয়ুব খানকেই দোষী করেছেন।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর মালিক আঙ্কারায় পাকিস্তান দূতাবাসে চাকরি করেছেন। ১৯৬৯ সালে ফেরত আসেন করাচি। তখন সামরিক আইন। প্লেন থেকে নামার পর খুব খাতির-যত্ন করে তাঁকে ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো। মালিক লিখেছেন, তিনি তখন বিগ্রেডিয়ারও হননি। সামরিক শাসনে এ ধরনের বাড়তি সুবিধা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। লিখেছেন তিনি, "Such are the privileges of Martial law which knowingly or unknowingly army officers keep availing and when they get used to it. most of them become corrupt."

১৯৭১ সালে তাঁকে সদর দফতরে বদলি করা হয়। চিফ অফ স্টাফ হামিদকে তিনি জানালেন, মনে হচ্ছে যুদ্ধ আসন্ন। সুতরাং সদর দফতর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা তিনি পছন্দ করবেন। মালিক তখন ব্রিগেডিয়ার। পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো পোস্ট ছিল না। হামিদ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তান যেতে রাজি কি না। মালিক বলবেন, পূর্বপাকিস্তানও তো পাকিস্তান। সুতরাং যাব না কেন? এ উত্তর খুব খুশি করল হামিদকে, কারণ ঐ সময় পূর্বপাকিস্তান যেতে কেউ রাজি ছিল না। এবং পূর্ব পাকিস্তানে কারো পোস্টিং হলে হাসপাতালে আশ্রয় নিত যাতে পোস্টিং-অর্ডার ক্যানসেল হয়। সামরিক সচিবকে ঐ সময় একটি চিঠি ইস্যু করে নির্দেশ দিতে হয়েছিল যে, একবার পোস্টিং হলে তা বাধ্যতামূলক। বাতিল করা যাবে না।

মালিকের বিবরণ থেকে বোঝা যায় ১৯৭১ সালে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সামরিকবাহিনীর অফিসাররা কমবেশি সবাই জানতেন। ঐ সরকারের নীতিনির্ধারক এবং সামরিক ব্যক্তিবর্গ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে কী হচ্ছিল তারা তা জানতেন না। বক্তব্যটি যে-মিথ্যা ছিল তা বলাই বাহুল্য। মালিকের বিবরণ এর দালিলিক প্রমাণ। মালিক আরো লিখেছেন, তাঁর মার কাছ থেকে যখন তিনি বিদায় নিতে গেলেন তখন তাঁর মা কান্না শুরু করলেন। মালিকের মতে তা স্বাভাবিক কারণ, "Everybody knew the risks involved for going to East Pakistan in those days."

১৬ নভেম্বর (১৯৭১) মালিক পৌঁছলেন ঢাকায়। ১৭ নভেম্বর তাঁকে বগুড়ায় পাঠানো হলো ২০৫ ব্রিগেডের অধিনায়ক হিসেবে। পরের দিন মালিককে নির্দেশ দেয়া হলো লালমনিরহাট যেতে। কারণ জেনারেল নিয়াজী সেখানে যাবেন। মালিক লিখেছেন, "প্রথম দর্শনে নিয়াজীকে

'আনসফিসটিকেটেড সোলজার' মনে হতে পারে। আমি নিজেও তার অনেক অশ্লীল জোকস পছন্দ করিনি। কিন্তু দেখলাম কথা বলে সৈন্যদের তিনি উজ্জীবীত করতে পারেন এবং মনে হলো সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণে।"

৩ ডিসেম্বরের আগেই হিলি সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু হয়। মালিক জানাচ্ছেন, ৩ ডিসেম্বর সরকারিভাবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার একসপ্তাহ আগে থেকেই সংঘর্ষ শুরু হয়। ৩ তারিখ তারা ইয়াহিয়ার জিহাদে যোগ দেয়ার ডাক শুনলেন বেতারে। বক্তৃতায় সোমনাথ মন্দির ও সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে হয়তো কোনো রেফারেন্স ছিল। কারণ, মালিক মন্তব্য করেছেন, ইয়াহিয়া খান জানেন না সোমনাথ মন্দির যিনি দখল করেছিলেন তিনি ছিলেন সাচ্চা মুসলমান, ইয়াহিয়া খানের মতো মদ্যপ বা লম্পট নন।

যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হলো ৭ ডিসেম্বর। জিওসিকে সঙ্গে নিয়ে মালিক রওয়ানা হলেন বগুড়ার দিকে। পীরগঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছতেই ভারতীয় ট্যাংক বহরের সামনে পড়ে গেলেন। মালিক বিস্মিত, কারণ করতোয়া পেরিয়ে এদিকটায় আসা দুরূহ। যা হোক তারা দুজন ও পথপ্রদর্শক লাফিয়ে নেমে পালাতে লাগলেন। তাদের ড্রাইভারকে গ্রেফতার করা হয়। ড্রাইভার থেকে মালিকদের খবর পেয়ে ভারতীয়রা তাদের খোঁজ শুরু করে। মালিক ও জিওসি এরই মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। পরে জিওসি তাকে জানিয়েছিলেন, এক বৃদ্ধ তাকে তার কুটিরে আশ্রয় দিয়েছিল, 'মুক্তি'রা সে কুটির সার্চ করতে এলে বৃদ্ধ তাদের জানায় যে, তার ঘরে কেউ নেই। মালিক যে জায়গায় ছিলেন সেখান থেকে বগুড়া ৪০ মাইল আর রংপুর ২৪ মাইল। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। স্থানীয় এক বাঙালির কাছে সাহায্য চাইলেন। বাঙালি জানান, পীরগঞ্জে পাকিস্তানি কিছু সৈন্য আছে। মালিক তাকে গাইড হতে বললেন। সন্ধ্যায় পীরগঞ্জ পৌঁছলেন। সে জায়গা খালি। আবার সে ব্যক্তির বাড়িতে ফিরে এলেন। খানিকপর আবার মালিক সেই বাঙালি গাইড নিয়ে চলা শুরু করেন পাকিস্তানি সৈন্যদের খোঁজে। পথে একদল বাঙালির সঙ্গে দেখা। গাইড তাদের সঙ্গে কথা বলল। ২০ মাইল দূরে দরগায় নাকি তারা কিছু পাকিস্তানি সৈন্য দেখেছে, হেঁটে দরগা পৌঁছে তিনি একদল পাকিস্তানি সৈন্য পেলেন। সেখান থেকে জিপ নিয়ে আবার রংপুর এলেন। জিওসির সঙ্গে দেখা হলো। কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে তারা পীরগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলেন ভারতীয় আক্রমণ রুখতে। প্রায় ১৮ ঘণ্টা রুখেছিলেন। তারপর পিছু হটতে হয়। মালিক বগুড়ায় তার সদর দফতরে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। ৯ তারিখ তিনটি জিপের কনভয় নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন বগুড়া। ৯ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সংঘর্ষের

বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যা যুদ্ধ বিশারদদের হয়তো কাজে লাগবে। ১২ তারিখ মহাস্থানের কাছে করতোয়া পার হয়ে দেখেন একদল সৈন্য ফিরে আসছে। ক্রুদ্ধ হলেন মালিক তাদের পলায়ন দেখে। সেখানেই তিনি কমান্ডিং অফিসারকে পদচ্যুত করে এক বক্তৃতায় সৈন্যদের বলেন, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বিশ্বাস করে তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যে কাফিরদের আক্রমণে তারা ফিরে আসছে। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, বগুড়ার দিকে যদি কাউকে ফিরে আসতে দেখা যায় তাকে গুলি করা হবে। মালিক জানিয়েছেন, ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ৭৫ ভাগ ক্যাজুয়ালিটি না হওয়া পর্যন্ত ডিফেনসিভ পজিশন কেউ ছাড়তে পারবে না। কিন্তু সে নির্দেশ কেউ মানেনি। মালিক বগুড়ার আশপাশের কিছু পজিশন পরিদর্শন করে সদরে ফেরার পর ব্রিফিংকালে এক অফিসার জানালেন, ইতোমধ্যে কয়েকজন অফিসারকে হিলাল-ই-জুরাত দেয়া হয়েছে। এরা হলেন, লে. জে. নিয়াজী, মে জে. রহিম, মে. জে. আনসারি, রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ এবং মে. জে. জামশেদ। মালিক বলেছেন, আরো অনেক অফিসার তখন যুদ্ধ করে মরছেন কিন্তু মেডেল পাচ্ছেন বড়রা। শুধু তাই নয়, অনেক জায়গায় ভেড়ার পালের মতো পাকিস্তানি সৈন্যরা পালাচ্ছে আর তারা মেডেল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন। লিখেছেন তিনি, "What justification was there, to give Hilal-E-Jurat to officers for killing their own contrymen whereas in actual war against the Indians they had made no significant contribution and at the end, most of the so-called heroes prefered to surrender to save their own lives."

এই বাক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বীকার করেছেন, তার দেশের সেনাবাহিনী তার দেশের লোকদের হত্যা করছে। সাংবাদিক আই.এ. রেহমান আমাকে বলেছিলেন, গণহত্যার কথা বাদ দিন। পাকিস্তানি সৈন্য যদি একটি লোককেও হত্যা করে থাকে সেটি হত্যা এবং অপরাধ। জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবও বলেছিলেন, শেষ আশ্রয় হিসেবে সাধারণ মানুষ যায় সেনাবাহিনীর কাছে। আর যদি কোনো দেশে নিজেদের সেনাবাহিনী দেখে লোকজন পালায় তখন সে সেনাবাহিনী সম্পর্কে আর কী বলা যায়!

১৪ ডিসেম্বর বিকেল থেকে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু হলো। মালিক নিজেও লক্ষ্য করলেন তাঁর অধস্তনদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছে। খবর পেলেন অনেকে আত্মসমর্পণের কথা ভাবছে। আত্মসমর্পণের কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। ঠিক করলেন কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে "ফ্রন্টলাইন" পরিদর্শনে যাবেন। সন্ধ্যা ৬টায় ৮ম বালুচ রেজিমেন্টের কাছে পৌঁছলেন। বললেন, মুসলমান হিসেবে তারা কিভাবে কাফেরদের কাছে

আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করছে? ঠিক করলেন রাতটা তাদের সঙ্গেই কাটাবেন।

১৫ তারিখ পুরো দিনরাত তুমুল সংঘর্ষ হলো, ১৬ তারিখ এক অফিসার তাকে জানালেন, বিবিসিতে শুনেছেন জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছেন। এদিকে যৌথবাহিনীও গোলাগুলি বন্ধ করে মাইকে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করছিল। ১৪ তারিখে গোলাতে মালিকের সিগন্যালব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায় সদরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। ভেবে দেখলেন, বগুড়ায় সদরে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্য রাস্তা দিয়ে সে জায়গা থেকে বের হয়ে যাওয়া যায় কি না ভাবছিলেন মালিক। ৬০/৭০ জন সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলেন। খানিকটা এগোতেই ভারতীয় বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। তবুও তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না। কিন্তু তাঁর এক মেজর সাদা রুমাল দেখিয়ে আত্মসমর্পণের সিগন্যাল দিল। সাথে সাথে আরো কয়েকজন। একজন ল্যান্সনায়েককে নিয়ে কোনোরকমে সরে ২০০/৩০০ গজ দূরে কয়েকটি কুঁড়ে দেখতে পেলেন। এরকম একটা কুঁড়েতে জোর করে ঢুকে পড়লেন। তখন প্রায় দশটা বাজে। ৬ টা পর্যন্ত রইলেন সেখানে।

সন্ধ্যার সময় মালিক ও ল্যান্সনায়েক আশরাফ তাদের টুপি-ব্যাজ ইত্যাদি খুলে ফেলে গায়ে চাদর জড়িয়ে নিলেন। ঘরের একজন প্রৌঢ়কে বললেন, তাদের পথ দেখাতে। তাঁর কোনো ভয় করছিল না কারণ তাঁর মতে তিনি কোনো অন্যায় করেননি। একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। বগুড়ায় জয়েন করেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বিনা তদন্তে কোনো বাঙালিকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কয়েকদিন পর ৭/৮ জন বাঙালিকে ধরে আনা হলো। একজন অফিসার জানাল, তারা 'মুক্তি', সুতরাং ব্যবস্থা নেয়া হোক। মালিক জিজ্ঞেস করলেন, প্রমাণ কী? একজন বলল, তাদের একটি দল যখন যাচ্ছিল তখন গুলি ছোড়া হয়েছে তাদের ওপর। সুতরাং গ্রাম সার্চ করে তারা এদের পেয়েছে। মালিক বললেন, তখন এরা কী করছিল? জবাব পেলেন, নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম করছিল। "এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করা হয়?" এ প্রশ্নের জবাব পেলেন, "গুলি করা হয়।" মালিক তাদের ছেড়ে দিলেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলাম বলে, যে অন্যের ওপর দয়া দেখায় না সে নিজেও দয়া পায় না।

এ বিবরণে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। অফিসার তাকে জানিয়েছিল, কাউকে ধরে আনলেই গুলি করা হতো। প্রতিটি সেনাছাউনিতে প্রতিদিন এরকম ধরে এনে গুলি করলে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা কত দাঁড়াবে? এ কথা উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, বাংলাদেশে যত বলা হয় তত মানুষ মারা যায় নি– এমন

একটা কথা ইদানীং বলার চেষ্টা করা হয়।

শান্তাহার ৪০ মাইল দূর। মালিকের কাছে কোনো ম্যাপ, কম্পাস কিছু নেই। রাত ৮টার দিকে রওয়ানা হলেন শান্তাহারের দিকে। পথে ভারতীয় পেট্রোল চ্যালেঞ্জ করলে তিনি গুলি করলেন। এ ফাঁকে দেখলেন তার বাঙালি গাইড কেটে পড়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল বগুড়ার পশ্চিমে শান্তাহার। রেললাইন খুঁজতে লাগলেন তিনি। খুঁজতে খুঁজতে এক কুটিরে পৌঁছলেন। বাড়ির মালিক 'ভালো মুসলমান'। পানি খেতে চাইলে তাকে পানি দেয়া হলো। সারাদিন তিনি খাননি। কিন্তু চাষির ঘরে কিছু ছিল না। তিনি আবার হাঁটা শুরু করলেন। ভোর ৪টায় কাহালুর কাছে এক গ্রামের পরিত্যক্ত এক কুঁড়েতে আশ্রয় নিলেন। সকালে অজু করে নামাজ পড়ার সময় স্থানীয় কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে দেখা। একজন তাঁকে নাগাজ পড়ার জন্যে মাদুর এনে দিল। মালিক মন্তব্য করেছেন, "That again shows that despite what we had done to them, the fraternal feelings of Islam were still there."

অন্যান্য সেনাপতি মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল বর্ণনা করতে গিয়ে হত্যা, লুট, ধর্ষণের কথা এড়িয়ে গেছেন বা কিছু জানেন না, এমন ভাব করেছেন। তোজাম্মেল হুসাইন মালিক যে সময় বগুড়া পৌঁছেছেন তখন তাঁর অনেক কিছুই অজানা থাকার কথা। তা সত্ত্বেও যেটুকু জেনেছিলেন নিশ্চয় তাঁর কাছে ভয়াবহ মনে হয়েছিল। না হলে এ উক্তি করতেন না যে 'হোয়াট উই হ্যাড ডান টু দেম।'

নামাজ পড়ে জামাতের কাউকে কোথাও পাওয়া যাবে কি না জানতে চাইলেন। একজন বলল, সামনের মাদ্রাসায় গিয়ে খোঁজ নিতে। মাদ্রাসার শিক্ষক তাকে গাইড দিতে পারলেন না কিন্তু কিছু মুড়ি দিলেন। কিছুদূর এগোতেই মুক্তিবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলল। তিনি ও আশরাফ গুলি করেছিলেন। কিন্তু আশরাফ নিহত হয় এবং তারপরই দেখেন ৭/৮ 'মুক্তি' ও লাঠি হাতে স্থানীয় লোকজন তাকে ঘিরে ফেলেছে। লাঠির বাড়ি পড়তে লাগল মাথায়। একসময় তিনি বললেন, 'আমি ব্রিগেড কমান্ডার, আমাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেলে পুরস্কার পাবে।" ব্রিগেড কমান্ডার শুনে মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় লোকদের চলে যেতে বলল এবং তাঁকে সম্মানের সঙ্গে কাহালু নিয়ে গেল। পরদিন যে মুক্তিসেনা তাকে গ্রেফতার করেছিলেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি বালুচি?

"হ্যাঁ", উত্তর দিলেন মালিক।

"চিন্তার কারণ নেই। আমার ছেলেকেও ধরা হয়েছিল কিন্তু বালুচিরা

তাকে বাঁচিয়েছে। আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।" মালিকের মনে হলো, কয়েকদিন আগে তিনি যাদের মুক্তি দিয়েছিলেন তাদের কেউই হয়তো হবে এই মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।

মালিককে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হলো। তিনি খুশি যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়নি। তারপর ভারতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে কাটিয়ে তিনি পাকিস্তান ফিরে যান। মেজর জেনারেল হন। কিছুদিন পর তাঁকে অবসর দেয়া হয়। জামাতে ইসলামীর তিনি ভক্ত ছিলেন যদিও তাতে যোগ দেননি। জিয়াউল হক আমলে জিয়াউল হককে উৎখাত করার দায়ে গ্রেফতার হন। ২৪ থেকে ৪০ অধ্যায় পর্যন্ত এসব কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। এসব আমাদের রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় দেখে আলোচনা করা হলো না।

তিনি লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ঠিকই ছিল কিন্তু কেউ তা কার্যকর করেনি। জেনারেল নিয়াজীকে তিনি পাকিস্তানের পরাজয়ের জন্যে দোষী করেননি। লিখেছেন, নিয়াজী নামী কেউ ছিলেন না বটে তবে 'কাপুরুষ ছিলেন না।' তাঁর মতে, আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়াজীর একার নয়, এটি সব জেনারেলের একটি 'সিন্ডিকেট সলিউশন।' জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ জেনারেল রহিমকে তাদের মুখপত্র হিসেবে ইয়াহিয়ার কাছে পাঠাবার কথা হয়েছিল। এটি সম্ভব হলে, তাঁর মতে হামদুর রহমান কমিশন হতো না।

মালিক সামরিকবাহিনীর কথাই বলেছেন তাঁর বইতে, রাজনীতি বা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আলোচনা করেননি। তিনি একটি কথা অবশ্য বারবার বলেছেন যে, সামরিক শাসনই সবকিছুর জন্যে দায়ী। ইয়াহিয়াকেও তিনি দায়ী করেছেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে ইয়াহিয়ার পুত্রের বিয়ে হয় ধুমধাম করে। অনেকে তখন বলেছিলেন, রোম যখন পুড়ছে তখন নিরো বাঁশি বাজাচ্ছেন। তিনি পাকিস্তান ভাঙার জন্যে এই জেনারেলদের দায়ী করেছেন এবং তারা যে গণহত্যা করেছে তাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তাঁর ভাষায় উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

"I must say most of our senior officers had very slavish mentality. They knew the things were going wrong and often kept cribbing about it-yet they took no steps to dislodge Yahyah Khan who in any case was a usurper and had no legal right to be where he was. Their attitude was that of a mercenary soldier. They were only concerned with thier own bread and butter. It never pricked their conscience that hundred of their own countrymen were being massacred by these butchers only because they wanted to stay in power at all costs. In fact most of the senior generals were as much to be blamed for the break up of Pakistan as

Yahyah Khan himself............"

যে ফ্রেমের আলোকে বইটি আলোচনা করেছি সে ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, তোজাম্মল হুসাইন মালিকের *দি স্টোরি অফ মাই স্ট্রাগল* ব্যতিক্রম। নিজের পেশাকে সমালোচনার সাহস তিনি দেখিয়েছেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চিত্রটিও সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। যারা আত্মজীবনী লিখেছেন, তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াই করেছেন। কিন্তু মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে কোথাও বিরূপ মন্তব্য করেননি। তবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ অন্তিমে তাঁর কাছে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা থাকেনি। কারণ, এ সত্যটি কোন পাকিস্তানিরই মনস্তাত্ত্বিকভাবে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

২৪

পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের নীতিনির্ধারক বা জড়িত যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তাদের মধ্যে জেনারেল রাও ফরমান আলীকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং আবেগহীন মনে হয়েছে। তিনি ঠাণ্ডা মাথার লোক, বুঝেসুঝে কাজ করেছেন। অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বার্থ দেখেছেন। শীর্ণকায় বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার লোক রাও ফরমান আলী। কথাবার্তা বলেন নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে। ১৯৭১ সালের সম্পূর্ণ সময় তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে। পূর্বপাকিস্তানের সে সময়কালের ঘটনাবলি তিনি জানতেন না, এ কথাটা তিনি যতই বলার চেষ্টা করুন-না কেন তা যে সত্য নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ কথাটাই তিনি আমাদের বলতে চেয়েছেন, তাঁর বইতে তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে ক'জন পাকিস্তানি জেনারেল লিখেছেন তাদের মধ্যে জেনারেল রাও ফরমান আলী খানের বইটি গুরুত্বপূর্ণ। বইটির নাম *হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড*। গুণগতভাবেও অন্য জেনারেলদের থেকে তার বইটি উন্নত, অন্তত রচনাশৈলী, বিন্যাসের দিক থেকে। বোঝা যায়, তিনি পড়াশোনা করতেন, দূরদর্শী ছিলেন এবং চতুরও। ফরমানের এ-বই লেখার মূল কারণ, তিনি ইয়াহিয়া ও টিক্কা খানের ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। নিয়াজীর সঙ্গেও যুদ্ধকালীন সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে গণহত্যার, বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়দায়িত্ব তার ওপরই বর্তিয়েছে। এ দায়দায়িত্ব ও অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই তাকে রচনা করতে

হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটি।

বইটি কেন তিনি লিখলেন, এ সম্পর্কে ফরমান আলির ভাষ্য, "অন্য অনেকে যা দেখেছেন বা দেখতে পেরেছেন, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি। সেনাবাহিনীর একজন লে. কর্নেল হিসেবে ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আমার প্রথম সংক্ষিপ্ত সফরকালে এবং পরে অসামরিক প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালে আমি ছিলাম এই বিয়োগান্ত নাটকের সূচনা, বিকাশ ও মঞ্চায়নের প্রত্যক্ষদর্শী।" শুধু তাই নয়, "অন্য আরো সৈনিকের মতো এটা আমারও দুর্ভাগ্য যাদেরকে ১৯৭১ সালে ট্রাজেডিতে টেনেহিঁচড়ে জড়িত করা হয়েছিল।" তিনি আরো লিখেছেন, "যখন পেছন ফিরে দেখি, আমি দেখতে পাই বিপুল পৈশাচিকতা আমার চোখের সামনে উঠে আসছে।" অথচ পাঠক যখন বইটি পড়বেন তখন লক্ষ্য করবেন, এ পৈশাচিকতার কারণ যে পাকিস্তানি বাহিনী তা অস্বীকার করা হয়েছে।

জেনারেল ফরমান লিখেছেন, "আমার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ঘটনা ও স্রোতধারাকে উন্মাদ, আবেগ ও সংবেদনহীন পাগলামোকে পাশাপাশি সাজানো এবং ধূর্ত নেতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা ও তাদের সেইসব প্রতারণামূলক স্লোগান ও অঙ্গীকারের প্রকৃতি উদঘাটন করা যা পাকিস্তানের ভাঙন ঘটিয়েছে এবং যার পর পর এসেছে এই ঘৃণ্য নাটকের প্রধান অভিনেতাদের বিনাশ।" এখানেও সেনাবাহিনীর কথা, তাদের ভূমিকা, দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।

একই মুখবন্ধে আবার তিনি কিছু বাস্তব সত্যও তুলে ধরেছেন। যেমন লিখেছেন– 'মুসলিম-মানসই এমন যে, তা বীরত্বপূর্ণ বাগাড়ম্বর ও অতিরঞ্জন দাবি করতে ভালোবাসে।" জেনারেলদের বইগুলি তার প্রমাণ। "সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ নেয়া হলে আমরা ঢাকার ঘটনাপ্রবাহকে সহজেই রক্ষা করতে পারতাম– যার পরিণতি ছিল আত্মসমর্পণ। আমার কথাটি হলো, আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেব, না হলে অতীত-ভুলের পুনরাবৃত্তির জন্য আমাদেরকে নিন্দিত হতে হবে।" একজন বাস্তববাদীর কথা, যা রাজনীতিবিদরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের বহু আগ থেকেই বলছিলেন।

মুখবন্ধের উপসংহারে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। লিখেছেন তিনি, "আমরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখেছি, এখন আরেকটি দেখছি সিন্ধুতে– যদিও এটা অতটা বিপজ্জনক নয়। এর মীমাংসা করতে হবে

রাজনৈতিক পন্থায় এবং আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপের মাধ্যমে। শক্তিপ্রয়োগ বিপরীত ফল ঘটাবে... আমরা প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানকে রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালনা করছি। জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন উদার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব এবং জনগণের মন তৈরি করার জন্য শিক্ষামূলক পদক্ষেপ।"

ফরমান আলি বলেছেন, "আমাদের সমাজের সকল অংশই জ্ঞাতসারে বা অন্য কোনোভাবে পাকিস্তানের ভাঙন ঘটানোয় অবদান রেখেছে। রাজনীতিবিদ, সাধারণ আমলা, পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতা, সংবাদপত্র এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ কেউই গঠনমূলক পথে তাদের ভূমিকা পালন করেনি, বরং তারা আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে।" কিন্তু মূল বইয়ে এর কোনো প্রতিফলন পাওয়া যাবে না শুধু শেষের দু'লাইনের বক্তব্য ছাড়া।

এভাবে ফরমান আলির কাহিনী এগিয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি তিনি বুঝেছেন, বুঝতেনও; কিন্তু সেগুলি তিনি সুচতুরভাবে অস্বীকার করে গেছেন। তাই ফরমান আলির বই শেষ করলে আমরা দেখব, তাতে অতিরঞ্জন আছে, অর্ধসত্য আছে, আবার সত্যও আছে। এবং এ সব কিছু তিনি এমনভাবে মিলিয়েছেন যে, তার লেখা পাঠকের কাছে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। এ কৌশল তার জন্য ভালো, কিন্তু ইতিহাস বা ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। তবে ঝাড়াই-বাছাইয়ের পরও এ বইয়ের এমন কিছু তথ্য বা জানার বিষয় আছে যা ১৯৭১ সালের ইতিহাস রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জেনারেল ফরমানের বলার ভঙ্গিটিও উল্লেখ্য। এমন এক ভঙ্গিতে তিনি লিখেছেন যা পড়ে মনে হবে, আসলে বাঙালিদের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ নেই। ঘটনাচক্রে ১৯৭১ সালে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন মাত্র। শেখ মুজিবের সঙ্গে যে তার সুসম্পর্ক ছিল এ কথা বারবার উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। এর মাধ্যমে তিনি এই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, যার সঙ্গে স্বয়ং মুজিবের সুসম্পর্ক সেই লোক কতটা খারাপ হতে পারে?

আমি এখন সংক্ষেপে বইয়ের মূল বিষয় ও জেনারেল ফরমান আলির মনোভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

২৫

পাকিস্তানি জেনারেলদের মধ্যে রাও ফরমান আলী সবচেয়ে বেশিদিন ছিলেন বাংলাদেশে। একপর্যায়ে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। সামরিক আইন

জারির পর, সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে তিনি বেসামরিক প্রশাসনের দেখাশোনা বেশি করেছেন। স্বভাবতই অন্য জেনারেলরা তাকে প্রভাবশালী মনে করতেন এবং ভাবতেন তিনি ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠজন। জে. জিয়াউল হকের অন্যতম সহকর্মী জেনারেল আরিফও লিখেছেন তার স্মৃতিকথায়– ফরমান ছিলেন ইয়াহিয়ার প্রিয়পাত্র যার কথায় প্রেসিডেন্ট গুরুত্ব দিতেন এবং তিনি যে প্রভাবশালী ছিলেন তার প্রমাণ তার নিয়োগ। ঘনিষ্ঠ যে তিনি ছিলেন তা বোঝা যায় তার স্মৃতিকথা পড়লেও। যদিও বারবার তিনি একথা লিখতে ভুল করেননি যে, 'পূর্ব পাকিস্তান' সম্পর্ক তার পরামর্শগুলি প্রেসিডেন্ট বা জেনারেল হামিদ ও পীরজাদা কেউ-ই রাখেননি।

পাকিস্তানের অন্য জেনারেলদের লেখা বই থেকে ফরমানের বইটি ভিন্ন ধরনের। এ বই পড়ে বোঝা যায়, তিনি বেসামরিক জগতের খবরাখবর রাখতেন, পড়াশোনাও করতেন এবং দুবার ভেবে কদম ফেলতেন। অন্য জেনারেলদের মতো বাঙালিদের সম্পর্কেও তার কিছু পূর্ব ধারণা ছিল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোথাও কোথাও তা প্রকাশও পেয়েছে। এ পূর্ব ধারণার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পূর্ব ধারণা থাকলে যে কোনো সিদ্ধান্তে পূর্ব ধারণা প্রভাব ফেলে এবং ফরমান তার লেখায় সচেতনভাবে একটা ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছেন। তাকে একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা খেয়াল রাখতে হয়েছে, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে তার দৃষ্টিভঙ্গি নমিত ছিল তাও দেখাতে হয়েছে। সেজন্য দেখি, পূর্ব পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গিও তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এর আরো একটি কারণ থাকতে পারে। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন, রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। তবে, আরেকটি বিষয় বাদ দেওয়া যায় না। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ আনা হয়েছে যে কারণে হয়তো তিনি অমনভাবে লিখেছেন, অনেকের সঙ্গে কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন, যার সত্যতা এখন নির্ণয় করা যাবে না। তার ভঙ্গিটা এরকম– পাকিস্তান এক ছিল। যে কোনো কারণেই হোক দুপক্ষের যুদ্ধ হয়েছে যার জন্য মূলত রাজনীতিবিদরাই দায়ী। দুপক্ষই হত্যাকাণ্ড করেছে। কিন্তু আমরা তো একসময় একসঙ্গে ছিলাম। আমরা তো জানি, যা ঘটেছে তার অনেকটাই অতিরঞ্জিত। এরকম একটা ভাব আছে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ কি ঠিক? অনেক বর্ণনায় অর্ধসত্য আছে। ফলে ইংরেজিতে লেখা এ বই পড়ে ধারণা অন্যরকম হতে পারে।

বাঙালিদের সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ব ধারণা কী ছিল তা বিধৃত হয়েছে ফরমান আলির বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম লাইনেই। লিখেছেন তিনি, ছোটবেলা থেকে বাঙালিদের সম্পর্কে যে কথা শুনেছেন তা হচ্ছে বাঙালি বাবু, বাঙালি জাদু এবং ভুখা বাঙালি। বাঙালি বাবু অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালি কেরানিকুল, আরো নির্দিষ্টভাবে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু-কেরানিকুল যাদের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত ব্রিটিশদের হয়ে তারা পুরানো শাসক মুসলমানদের যাঁতাকলে পিষছে। বাঙালি জাদু শুনে এসেছেন, পশ্চিমা কেউ বাঙাল গেলে থেকে যায়। কেন? এ কারণে এক ধরনের ভয় ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা ও বাঙালিদের সম্পর্কে। আর বাঙালি ভুখা। প্রাকৃতিক কারণে বাংলায় সবসময় খাদ্যের অভাব থাকে এবং বাঙালিরা ভুখা থাকে যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ১৯৪৩ সালে, মন্বন্তরের সময়।

১৯৬২ সালে ফরমান তৃতীয়বারের মতো এবং পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথমবারের মতো পূর্ববাংলায় আসেন এবং আশ্চর্য হয়ে যান এ কারণে যে, বাঙালিরা তখন ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা ভুলে গেছে, বরং বলাবলি করছে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিরা জানত না যে, কেন্দ্রীয় সরকার শোষণ, নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং বাঙালিদের মনোভাব বদলে গেছে।

দ্বিতীয়বার পূর্ব বাংলায় এসে ফরমান কিছুদিন ছিলেন। তখনও এ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। দেয়ালে দেয়ালে আইয়ুববিরোধী স্লোগান, মোনেম খানের প্রতি ঘৃণা। কেননা তিনি আইয়ুবের ধামাধরা। হ্যাঁ, পাকিস্তানের উন্নতি হচ্ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের জিএনপিও বাড়ছিল কিন্তু মানসিক মিল আর ছিল না।

১৯৬৭ সালে ঢাকায় তিনি নিয়োগ পান। তার আগে তাকে ডিডিএমও নিয়োগ করা হয়। এখানে একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন যাতে সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় বাঙালিদের সম্পর্কে। অবশ্য, একথা তিনি স্বীকার করেননি।

ঘটনাটি এরকম। লে. কর্নেল ওসমানী ছিলেন তার সিনিয়র ও ডিডিএমও। ফরমান তার কাছে চার্জ বুঝে নিতে গেলে দেখেন যে, ওসমানীর কাছে কোনো ফাইলই যেত না। চাপরাশিরাও তাঁকে অবজ্ঞা করত। তাঁর অফিস ছিল ধূলিপড়া ম্লান-বিবর্ণ, অথচ মিলিটারি অপারেশন বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ। ফরমান লিখেছেন, পাকিস্তান বাহিনীতেও তাঁকে প্রমোশনের যোগ্য মনে করা হয়নি। হয়তো বাঙালি বলেই তাঁকে বিশ্বাস করা হতো না। কথাটি সত্য এবং নিজের অজান্তেই তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

১৯৬৭ সালে এখানে এসে তার মনে হয়েছিল, পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের দাবি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা চলছে। উর্দু ভাষা ও উর্দু ভাষাভাষীদের প্রতি ঘৃণা উপচে পড়ছে। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ এবং জনগণের ওপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। হরতালের সময় ছাত্ররা যদি বলত পাখি উড়বে না আকাশে, তাহলে পাখিও তা মেনে চলত। একটি পোস্টারের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। পোস্টারে ছিল, পাগড়ি পরা বলিষ্ঠ একটি লোক ক্ষুদ্রকায় ধুতি পরা একজনকে আলিঙ্গন করছে, হাতে তার লুকানো একটি ছুরি অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতক। পাঠক এখানে ছোট একটি শব্দ 'ধুতি' শব্দটি লক্ষ্য করুন অর্থাৎ বাঙালিরা হিন্দু অর্থাৎ ভারতের দাস। এর ভিত্তি সেই পূর্ব ধারণা। কারণ এত বছর বাংলাদেশে থেকে ফরমান আলি ধুতি ও লুঙ্গির পার্থক্য বুঝতে পারেন নি, তা কি আশ্চর্য নয়? ফরমান লিখেছেন, ইসলাম ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে যে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল বোধহয় তার আর অবশিষ্ট ছিল না। তার ভাষায় : "It had electrified the entire man of Bhooka Bengali with rage against a distant cousin West Pakistan for supposedly having snatched away everything from him. History was sought to be falsified and disowned, presumably in vain as has been testified by the two decades that have passed since Pakistan's breakup." এ অনুচ্ছেদের সঙ্গে তাঁর পূর্বের অনেক অনুচ্ছেদের মিল নেই। ওসমানীর ঘটনাটি তো তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। এখানে ইতিহাস অতিরঞ্জনের বা মিথ্যা কথনের কোনো অবকাশ নেই।

এরপর কিন্তু তিনি আবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈষম্য থাকলেই অসন্তোষ থাকবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিক সত্য তিনি উল্লেখ করেননি। তারপর জানাচ্ছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা যা তার ভাষায় সত্য ছিল। এ মামলা করার সময় তিনি আসামির তালিকা থেকে শেখ মুজিবের নাম বাদ দিতে বলেছিলেন, কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধান মেজর জেনারেল আকবর মুজিবের নাম অন্তর্ভুক্ত করে বলেছিলেন, এর ফলে "লোকে তাঁর চামড়া তুলে নেবে।" না, তার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয় নি, বরং ইতিহাস উল্টোটা বলে। আগরতলা মামলা যে ঠিক ছিল তা প্রমাণে তিনি লেখক মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রীর একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েছেন ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চের 'পূর্বদেশ' থেকে। চিঠিটা আমি দেখিনি তবে ফরমান আলির ইংরেজি উদ্ধৃতি থেকে অনুবাদটি এরকম : "প্রিয় স্বামী... তুমি আজ আমার সঙ্গে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তোমার অবদানের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, কিভাবে ছদ্মনামে করাচি থেকে ঢাকায় এসে আগরতলা

সীমান্তে ভারতীয় ও বাঙালি অফিসারদের নিয়ে তুমি দেখা করেছিলে ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব পি.এন. ওঝার সঙ্গে। অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য তুমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করেছিলে... ।” তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ভারত কতিপয় বাঙালির সাহায্যে অনেকদিন থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। অবশ্য, শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে তিনি কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। “এই সময়ই ভূট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।” এ উক্তি থেকে ধরে নিতে পারি ১৯৭১ সালের পটভূমিকা তখন থেকেই সৃষ্টি হচ্ছিল।

ফরমান আলির বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৭০ সালের নির্বাচন। এখানে তার একটি উক্তি মনে রাখার মতো। কিভাবে নির্বিকারে মিথ্যাকে যুক্ত করতে হয় ন্যারেটিভের সঙ্গে তার একটি প্রমাণ ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে তার কয়েকটি উক্তি। তিনি লিখেছেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রচুর টাকা খরচ করেছে এবং সে টাকা এসেছে ভারত থেকে। ১৯৭০-এ আমরা যারা ছিলাম বাংলাদেশে তাদের কি তা মনে হয়েছে? এসব উক্তির কারণ, এ সিদ্ধান্তে পাঠককে নিয়ে যাওয়া যে, ১৯৭১ সালের পুরো ব্যাপারটা ছিল ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপের ব্যাপার। সেই পূর্ব ধারণা! তিনি আরো লিখেছেন, এ সময় ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কারণ শেখ সাহেব ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট করবেন।

এ প্রসঙ্গে অজান্তে রাও কিছু তথ্য দিয়েছেন যা থেকে বোঝা যায় সামরিক বাহিনী গোপনে কিভাবে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। নির্বাচনে সেনাবাহিনী ডানপন্থি দলগুলিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। পরে শেখ মুজিব তা জানতে পেরে অনুযোগ করায় রাও বলেছিলেন, পার্লামেন্টে ডানপন্থি কিছু সদস্য গেলে র‍্যাডিক্যালদের হাত থেকে মুজিব মুক্তি পাবেন। তারপর বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিল। তাদের নেতারাই তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। রাও আগে যেসব মন্তব্য করেছেন, এ মন্তব্য তার বিপরীত। তবে কেন এ পর্যায়ে তিনি এই উক্তি করেছেন তা বোঝা যায়। কারণ এরপর থেকে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের খালি দোষারোপ করেছেন।

তিনি বলেছেন, রাজনীতিবিদরা সবসময় দুমুখো নীতি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, মওলানা ভাসানী ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে একটি বৈঠকের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ভাসানীর আন্দোলনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় মওলানা বলেছিলেন,

"আপনি গদিতে বসে আছেন, বসে থাকুন। আমরা আন্দোলনকারী, আন্দোলন করেই যাব। আপনার গদিতে আপনি থাকুন।" পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রদের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কোনো ধারণাই নেই। তারপর অবশ্য একটি সত্য মন্তব্য করেছেন। তার ভাষায় : "The Army had been ruling over East Pakistan for a long time. All political leaders wanted to get rid of them, and probably rightly so. Army has no right to rule. They may come in to restore law and order but they should handover power to the civilian authority as soon as possible."

২৬

নির্বাচন চুকে-বুকে গেল। আওয়ামী লীগের "অফিসিয়াল স্ট্যান্স" ছিল শাসনতান্ত্রিক। শুধু তাই নয়, ছয় দফার ক্ষেত্রে মুজিব নমনীয় হতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু ভূট্টো নমনীয়তা দেখাতে রাজি হন নি, বরং ইয়াহিয়ার মনকে তিনি বিষিয়ে তুলেছিলেন। ১৭ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ভূট্টোর আমন্ত্রণে লারকানায় যান। ভূট্টো বলেছিলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে ইয়াহিয়ার উচিত মুজিবের আনুগত্য পরীক্ষা করা। যদি এই স্থগিতকরণের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন তাহলে বুঝতে হবে_তিনি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নন। ভূট্টো কি ছিলেন এ উক্তি তার প্রমাণ।

১৯ ফেব্রুয়ারি ফরমান ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ সময় ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন। ইয়াহিয়া বলেছিলেন : "I am going to sort out that Bastard." I said, "Sir, he is no longer a bastard. He is an elected representative of the people and he represent whole of Pakistan. I recommend that you handover power to Mujib. I assure that he will be the most unpopular man in East Pakistan within six months."

যিনি রাজনীতিবিদদের সমালোচনায় মুখর তিনি মুজিবের পক্ষে ওকালতি করবেন। ভাবতেই অবাক লাগে! এ মন্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের উপায় নেই। এমনও হতে পারে, রাও এ মন্তব্যে দেখাতে চেয়েছেন তিনি ছিলেন শাসনতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে।

অন্যদিকে, ফরমান লিখেছেন, জেনারেলরা ভূট্টোকে চাপের মুখে রাখছিল যাতে মুজিব ক্ষমতায় যেতে না পারেন। ভূট্টোর সঙ্গে অনেকদিন ধরে

জেনারেলদের সখ্য ছিল। উপর্যুক্ত এই দুই উক্তিতে ফরমান এই ইঙ্গিতই করতে চেয়েছেন যে, তিনি অন্য জেনারেলদের মতো রক্তপিপাসু নন। তিনি আলাদা! এভাবে তিনি পাঠককে তৈরি করতে থাকেন যাতে বাংলাদেশের গণহত্যার সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা বিশ্বাসযোগ্য না হয়। "That Punjabi Army circle put pressure on Bhutto to ensure that power does not go to Mujib is quite plausable and significant by itself. It does not have to be Farman Ali's defence."

২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামবাদে বৈঠক হয়েছিল এম.এল.এ.দের। এডমিরাল আহসান, লে. জেনারেল ইয়াকুব ও মে. জেনারেল ফরমান একমত হয়েছিলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না হওয়ার অর্থ সামরিক হস্তক্ষেপ অর্থাৎ তা হলে বিশৃঙ্খলা হবে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করবে এ বিষয়ে একমত হয়ে তাঁরা ইয়াহিয়াকে লিখেছিলেন। ঢাকায় ফিরে আহসান আওয়ামী নেতৃবৃন্দদের ডেকে জানালেন যে, ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে।

তিনি তাজউদ্দীন ও মুজিবের কিছু মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তিনি তাজউদ্দনীকে অপছন্দ করতেন, তার আরো উদাহরণ দেয়া যাবে। এ ক্রোধের কারণ, তাজউদ্দীন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে তা সফল করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি মুজিবকে সবসময় নমনীয় দেখাতে চেয়েছেন। এটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন যে মুজিব যদি র‍্যাডিক্যালদের থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন তাহলে ১৯৭১ হতো না। কিন্তু কিছু বিষয় যে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা ফরমানের মাথায় আসেনি। ইতিহাসের অনিবার্য স্রোতে অনেক সময় ব্যক্তি তুচ্ছ হয়ে যায়।

আহসান, ইয়াকুব ও ফরমান জাতীয় পরিষদ স্থগিতের ঘোষণা শুনে ইসলামাবাদে জেনারেল হামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাকে অনুরোধ জানালেন নতুন তারিখ ঘোষণার জন্য। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, এ ঘোষণার পরও মুজিব শান্ত ছিলেন এবং বলেছিলেন, "এ নিয়ে আমি কোনো ঘটনা সৃষ্টি করব না যদি আমাকে নতুন কোনো তারিখ দেওয়া হয়। যদি নতুন তারিখটি সামনের মাসে (মার্চ) হয়, আমি পরিস্থিতি সামলাতে পারব। এপ্রিল হলে কষ্টকর হবে। কিন্তু স্থগিতকরণটি যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য হয় তাহলে পরিস্থিতি সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।" মুজিব বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করেছিলেন। ইসলামাবাদ থেকে কোনো উত্তর এলো না। ফরমান এ প্রসঙ্গে ঠিকই লিখেছেন, ১ তারিখ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলা যেতে পারে পাকিস্তান ভেঙে গেল।

এরই মাঝে নাটকীয়ভাবে গভর্নর আহসানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো। ঐদিন আহসান ইয়াকুব ও ফরমান বসে আলাপ করছেন। এমন সময় পীরজাদার ফোন। আহসান ফোন ধরলেন। কিন্তু পীরজাদা চাইলেন ইয়াকুবকে। আহসান ইয়াকুবকে ফোন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফোন রেখে ইয়াকুব বললেন, "এখন আমিই গভর্নর।" আহসান বললেন, "ঠিক আছে, আমি গভর্নর হাউস ছেড়ে দিচ্ছি।" ইয়াকুব কিছুই বললেন না। ফরমানের কাছে বিষয়টি ভালো লাগেনি। কারণ ইয়াকুব আহসানকে কোনো সমবেদনা জানাননি। ছয় তারিখ আহসান যখন চলে যান তখন তাঁর স্টাফদের চোখে ছিল পানি।

এরপর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে লুটপাট শুরু হলো, লিখেছেন ফরমান। এবং এক্ষেত্রে ফরমান বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন অন্যান্য পাকিস্তানির মতো। লিখেছেন তিনি, "The act of kidnapping and raping of non-local young girls and throwing of children into burning house were never heard of in Pakistan since its inception. But this is what was actually happening."

পাঠক, এ ধরনের কোনো ঘটনা কি ঘটেছিল? কিন্তু ফরমান কেন অতিরঞ্জন করেছেন? কারণ এভাবে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার যৌক্তিকতা খুঁজেছেন অর্থাৎ এসব কারণে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল এবং ২৫ মার্চ হস্তক্ষেপ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

আহসান চলে যাওয়ার পর ইয়াকুবের বাসায় একদিন রাতে খেতে গেছেন ফরমান। জেনারেল খাদিমও ছিলেন সেখানে। এ-সময় পীরজাদার ফোন। তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসতে পারবেন না। ইয়াকুব বললেন, তা হলে যেন তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। ফরমান ও খাদিমও বললেন ইয়াকুবকে, এ সঙ্গে যেন তাদের পদত্যাগপত্রও গ্রহণ করা হয়।

জেনারেল খাদিম ও ফরমান আলির এরপর পাকিস্তান যাবার কথা। ফরমান ভাবলেন, যাবার আগে মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাবেন যাতে তাঁর সর্বশেষ অবস্থান জানা যায়। মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পাকিস্তানকে কি বাঁচানো সম্ভব?" মুজিব বললেন, "সম্ভব, যদি আমার কথা শোনা হয়। আমরা এখনও আলোচনায় প্রস্তুত।" এমন সময় পর্দার ওপাশ থেকে যেন কে সরে গেলেন! তাজউদ্দীন! মুজিব তাঁকে ডাকলেন। ফরমান তাকে একই প্রশ্ন করলেন। তাজউদ্দীন বললেন, দেশ জুড়ে যে বর্বরতা চলছে তার কারণ ভুট্টো। তার সঙ্গে বসা যাবে না। পাকিস্তান বাঁচানো সম্ভব যদি দুটি পরিষদ হয়। দুটি পরিষদ আলাদাভাবে নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। তারপর একসঙ্গে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। ফরমানের

ভাষায়, এককথায় কনফেডারেশন। এরপর তাজউদ্দীন সম্পর্কে তার মন্তব্য : "Tajuddin, the die-hard Pro-Indian Awami Leaguer, came in and sat down. He hated West Pakistan and perhaps Pakistan itself. He was reputed to have been a Hindu up to the age of 8. I do not think this story was correct but it revealed his mental make-up." কেন এ ধরনের মন্তব্য তা আগেই উল্লেখ করেছি।

অন্যদিকে, এর বিপরীতে হত্যাকারী জেনারেল টিক্কা সম্পর্কে তার মন্তব্য দেখুন, "He was a straightforward, honest and obedient soldier, a man with determination and a strong will."

৭ মার্চ থেকে এখানে অদৃশ্য সরকার চালু হলো। ১৫ তারিখ ইয়াহিয়া এলেন ঢাকায়। ফরমানের আলোচনায় ইয়াহিয়া এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন তা ফরমানকে চমকিত করছিল। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, যেখানে জাতির পিতারই (জিন্নাহ) দুটি পাকিস্তানের ব্যাপারে আপত্তি ছিল না সেখানে এই আইডিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করার তিনি কে?

২১ তারিখ ঢাকায় আলোচনা শুরু হলো। মুজিব একবারও সরাসরি ভূট্টোর সঙ্গে কথা বলেননি। ইয়াহিয়ার মাধ্যমেই কথাবার্তা চলেছে।

২৭

২৫ তারিখের অপারেশন সার্চলাইটের ব্যাপারে জেনারেল খাদিম ও জেনারেল ফরমান ইচ্ছুক ছিলেন না। এ কথা ফরমান যেমন লিখেছেন, অন্য জেনারেলরাও তা উল্লেখ করেছেন। সালিকও লিখেছেন, "এ-দুজনের ব্যাপারে সদর দফতরের আস্থা ছিল না।" জেনারেল হামিদ দুজনের স্ত্রীর সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেন। পরে দুজনেই জানান তারা আদেশ পালন করবেন।

অন্যদিকে অপারেশন সার্চলাইট সম্বন্ধে তদানিন্তন সিভিল সার্ভেন্ট হাসান জহির তার *The Separation of East Pakistan* বইতে বলেছেন : "Major General Farman Ali was the executor of Dhaka part of 'Searchlight.' He succeeded in 'shock action' by concentrated and indiscrimination firing on target areas...." অর্থাৎ মেজর জেনারেল ফরমান আলি ছিলেন অপারেশন সার্চলাইট অর্থাৎ পঁচিশে মার্চে ঢাকা অংশের কালোরাতের বিভীষিকার হোতা। ব্রিগেডিয়ার জেড. এ. খানও প্রায় একই কথা লিখেছেন।

কিন্তু ২৫ মার্চের রাত সম্পর্কে ফরমান যখন বর্ণনা দেন তখন তিনি

অন্যান্য পাকিস্তানি জেনারেলের মতোই সত্য গোপন করেন এবং এমন ভাষ্য তৈরি করেন যা পাকিস্তানিদের বিবেক শান্ত করতে পারে কিন্তু আমাদের নয়।

লিখেছেন তিনি, কথা ছিল শুধু নেতাদের ধরা হবে এবং কোনো রক্তপাত হবে না। কিন্তু এ নির্দেশও ছিল ইয়াহিয়া করাচি না পৌঁছা পর্যন্ত যেন অপারেশন শুরু করা না হয়। কারণ তাদের ধারণা ছিল তাহলে ভারতীয় জঙ্গিবিমান প্রেসিডেন্টের প্লেন আটকে দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট পালালেন। জেনারেলরা ভাবলেন, কেউ জানল না, কিন্তু ফরমান জানাচ্ছেন, বিমানবন্দর থেকে উইং কমান্ডার খোন্দকার পালিয়ে যাওয়া দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুজিবকে তা জানিয়ে দেন। সালিকও তাই লিখেছেন। তারা বলতে চাচ্ছেন, এভাবে আওয়ামী লীগ সতর্ক হয়ে যায় এবং প্রস্তুতি নেয়।

ফরমান জানাচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করলে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ এসেছিল জগন্নাথ হল থেকে। কারণ সেখানে হিন্দুরা থাকত এবং তারা ছিল পাকিস্তানবিদ্বেষী। তাহলে প্রশ্ন, মুসলমান ছাত্ররা কি পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল? কেউ-কেউ বলেন, লিখেছেন ফরমান, যে সৈন্যদের হাতে ছাত্ররা নিহত হয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নও করা উচিত, লিখেছেন তিনি : "When does a student cease to be a student? The answer that a student ceases to be student when he carries arms should clear the Army of the charge; all those who were killed were carrying arms, had refused to stop firing and accept order to surrender."

পাকিস্তানি সব জেনারেলই ২৫ মার্চ এভাবে দেখেছেন। জেনারেল আরিফ তো ২৫ মার্চের কথাই উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন, ২৫-২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা পূর্বপাকিস্তানের সেনানিবাসগুলিতে যেসব পশ্চিম পাকিস্তানি ছিল তাদের পরিবারপরিজনসহ ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল। চাটগাঁয় ২৫ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিহারিদের হত্যা করা হয়। এ কারণে সৈন্যদের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি হয় এবং যখন স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয় তখন দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে 'বেশি বল প্রয়োগকারী' কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ফরমান আলিও গণহত্যার পক্ষে এ ধরনের ওকালতি করেছেন। জানিয়েছেন, গৃহযুদ্ধের সময় দুপক্ষই জন্তু হয়ে যায়। 'গৃহযুদ্ধ' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন যা অনেকে করেননি। আবার এও লিখেছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী জাতীয় সেনাবাহিনীর মতো আচরণ করতে পারেনি। কেন পারেনি তার একটি যুক্তিও অবশ্য তিনি দাঁড় করিয়েছেন। "Some of its members exceeded their authority and killed a number of civil and police officials without proper

trial. The army was not able to control Biharis in taking revenge when badly affected areas were liberated by them."

২৮

রাও ফরমান আলী তারপর একটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন ভারতীয় কারসাজির ব্যাপারে। এ বিষয়ে জেনারেলরা একমত ছিলেন যে, পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্ত ভারত ১৯৪৭ সাল থেকেই করছে এবং এই যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে তাও ভারতীয় চক্রান্ত। এই ইল্যুশন থেকে পাক-জেনারেলরা কখনও মুক্ত হতে পারেননি।

ফরমান আলিকে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর সিভিলিয়ান কাজ-কর্ম দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, সবসময় তিনি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ছিলেন। শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগ তিনিই গ্রহণ করেন। এজন্য নূরুল আমীন, গোলাম আযম, ফরিদ আহমদ প্রমুখকে ডেকে পাঠালেন। তাদের সম্পর্কে ফরমান আলির মন্তব্য– খাঁটি অনুগত পাকিস্তানি। এদের দিয়ে বাঙালিদের তিনি জয় করতে চাচ্ছিলেন। অনেক সেনা অফিসারও তাই চেয়েছিলেন। শুধু তারা বুঝতে পারেননি যে, কাজটি অসম্ভব। ফরমান লিখেছেন, কাজটি সম্ভব হতো যদি না জেনারেল নিয়াজী অন্যরকম চাইতেন। নিয়াজী "Wanted to change the racial character." নিয়াজীর সঙ্গে ফরমানের বনাবনি হয়নি কখনও। ঐ সময় ফরমান লিখেছেন, বাঙালি, পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারি–সবাই নাস্তানুবাদ হচ্ছিল তার কাছে– এই তিন পর্যায়েই ছিল পাকিস্তানি। যেমন কুমিল্লার ডিসির স্ত্রী এলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা (অর্থাৎ সৈন্যরা) তার স্বামীকে হত্যা করেছে। তাঁর ভাই ছিল সঙ্গে এবং তার বউ পশ্চিম পাকিস্তানি। বউয়ের আত্মীয়-স্বজনকে আবার চাঁটগার বাঙালিরা মেরে ফেলেছে।

"জোড় হাতে কাঁপতে কাঁপতে" টাঙ্গাইলের ডি.সি. এলেন দেখা করতে। পশ্চিমপাকিস্তানি একজন সহকারী কমিশনারকে হত্যার পিছনে তাঁর হাত ছিল। ফরমান তাঁকে আবার কাজে পাঠালেন এবং তারপর "তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।" ফরিদপুর, পটুয়াখালীর ডি.সি-কে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করল। ফরমান তাঁদের ছেড়ে দিতে বললেন। তারা শুনল না। তিনি গভর্নর টিক্কাকে হস্তক্ষেপ করতে বললেন। ফরমান যেটা বলতে চেয়েছিলেন তা হলো : পূর্বপাকিস্তানে যা চলছিল তা তার পছন্দ ছিল না। তার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তিনি করছিলেন। কারণ তার "heart was bleeding." কিন্তু নিয়াজীর জন্য কিছু

করা সম্ভব ছিল না। জেনারেলদের এই পছন্দ-অপছন্দ পরে পাকিস্তানি রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে। ভূট্টোর সময় টিক্কা ও ফরমান উচ্চপদ পেয়েছিলেন। নিয়াজী নাজেহাল হয়েছিলেন। সুতরাং ফরমানের বই পড়ার সময় এটি মনে রাখা উচিত।

নিয়াজী সম্পর্কে ফরমান লিখেছেন, তিনি নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতেন। বাঙালিদের তিনি জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে টিক্কা ভালো প্রশাসক ছিলেন বটে কিন্তু রাজনীতিবিদ ছিলেন না। এ সময় জে. হামিদ এলেন ঢাকায়। রাও অনুরোধ জানালেন তাকে যেন পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়। জে. হামিদ তা শুনলেন না, বরং তাকে মেজর জেনারেল করে রাজনৈতিক বিষয়ের ভার দেয়া হলো। ফরমানের মনে হয়েছে, মার্চের শুরুতে সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা সমর্থন না করায় তাকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া হলো। অন্যদিকে নিয়াজী যা-তা ব্যবহার করছিলেন, গুজব রটেছিল যে, তিনি মেয়েমানুষ নিয়েই থাকতে ভালোবাসতেন। ঐ সময় পাকিস্তান এখানে আওয়ামী লীগের খালি আসনগুলিতে উপনির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। এই নির্বাচন সেনাবাহিনীই করেছিল, এককথায় কে কতটা আসন পাবে তাও তারা ঠিক করে দিয়েছিল। সিদ্দিক সালেকও এই কথা উল্লেখ করেছেন। 'ডানপন্থি দলগুলি যেহেতু পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেছিল তাই "তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করতে চাইছিলেন। আসন ছিল স্বল্প, কিন্তু আকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।"

কিন্তু 'নির্বাচনে'ও সংকট মোচন হয়নি। কারণ প্রতিটি পর্যায়ই বিপক্ষে চলে যাচ্ছিল, উল্লেখ করেছেন ফরমান আলি। একবার তিনি টিক্কা খান ও যোগাযোগ সচিব-এর সঙ্গে আলাপ করছিলেন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে কিভাবে খাদ্যশস্য পাঠানো যেতে পারে সে বিষয়ে। তারা ঠিক করেছিলেন রেলে করে চাঁদপুর দিয়ে পাঠাবেন। দুদিন পর দেখা গেল চাঁদপুরে রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ এ তথ্যটি যোগাযোগ সচিব পাচার করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে প্রেসিডেন্ট বা জেনারেরলরা থোড়াই কেয়ার করছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপার। ফরমান ঠিকই লিখেছেন, "The power to be of the future had already written off East Pakistan and were only planning for West Pakistan."

২৯

এর পরের অধ্যায়গুলিতে ফরমান মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা, পাকিস্তানিদের ভয় ও হতাশার কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এখানে তার পুনরুল্লেখ করলাম না।

জেনারেল ফরমান লিখেছেন, আত্মসমর্পণে বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে তিনি রাজি ছিলেন না, নিয়াজীকেও তিনি তাই বলেছিলেন। কিন্তু নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে সই করলেন। অবশ্য, নিয়াজী উল্টো কথা বলেছেন।

যুদ্ধবন্দি হিসেবে তারপর যাত্রা। কলকাতায় পৌঁছার পর অ্যাডমিরাল শরিফ নিয়াজীকে বলেছিলেন, "তুমি-না কলকাতায় আসতে চেয়েছিলে? এখন পৌঁছে গেছ কলকাতায়।" নিয়াজী প্রায়-ই বড়াই করে বলতেন, সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি পৌঁছে যাবেন কলকাতায়।

আগেই উল্লেখ করেছি, জেনারেল ফরমান কিছু সত্য, কিছু অর্ধসত্য ও কিছু মিথ্যা মিলিয়ে বইটি রচনা করেছেন। কারণ তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলা যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে তার সঙ্গে তার যোগ নেই। কারণ তিনি যুক্ত ছিলেন বেসামরিক কর্মের সঙ্গে, বরং তিনি সিভিলিয়ানদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। যেমন, লিখেছেন, মশিউর রহমান, আতাউর রহমান খান প্রমুখকে তিনি রক্ষা করেছেন। হয়তো এ-কারণেই তারা সামরিক শাসকদের ভক্ত ছিলেন। সাঈদুল হাসানকে হত্যার পর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন এবং বাঙালির প্রতি তার এই সহানুভূতি নাকি জান্তা পছন্দ করেনি।

১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে ফরমান জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তরে তিনি বললেন, "আমার বইতে আমিও এ-প্রসঙ্গে লিখেছি। কাজী জাফর সেই সময় তার এক বক্তৃতায় (১৯৭১ সালের ঠিক আগে) বলেছিলেন, বাংলাদেশের সবুজ লাল হয়ে যাবে। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন লাল ঝাণ্ডার প্রভাব পড়বে। তার বক্তৃতায় এই লাইনটিই আমি লিখে রেখেছিলাম। সেই লাইনের মানে এই করা হয়েছে। মুজিবকেও এ কথা বলা হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেননি।"

"কিন্তু ঢাকার পতনের পর", বললাম আমি, "গভর্নমেন্ট হাউসে আপনার হাতে লেখা একটি তালিকা পাওয়া গেছে বুদ্ধিজীবীদের।"

"ঐ সময় অনেকে আমার কাছে এসে নানা জনের কথা বলত। যাদের বিরুদ্ধে বলত তাদের নাম আমি শুধু টুকে রেখেছিলাম।"

হামুদুর রহমান কমিশনও এই অভিযোগ বিচার করেছিল। ফরমানকে

সবাই এই দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে। সেটা স্বাভাবিক। কারণ ফরমান দায়ী হলে যুদ্ধটাকেই স্বীকার করে নেয়া হয়। বরং তিনি লিখেছেন, "আমার আশংকা, পূর্ববর্তী আদেশকে বাতিল করে সম্ভবত নতুন আদেশ জারি করা হয়নি এবং কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমি আজও পর্যন্ত জানি না যে, কোথায় তাদের রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তাদেরকে এমন কোথাও বন্দি করা হয়েছিল, যেখানে প্রহরায় ছিল মুজাহিদরা। আত্মসমর্পণের পর ঢাকা গ্যারিসনের কমান্ডাররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারা মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ মুক্তিবাহিনী নির্দয়ভাবে মুজাহিদদের হত্যা করছিল। পাকিস্তান আর্মিকে দুর্নাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী কিংবা ইন্ডিয়ান আর্মিও বন্দি ব্যক্তিদের হত্যা করে থাকতে পারে। ভারতীয়রা ইতোমধ্যেই ঢাকা দখল করে নিয়েছিল।" ["They could have been killed by any body except the Pakistan army as it had already surrendered on 16th December."]

অর্থাৎ তিনি তো ননই, পাকিস্তান হানাদারবাহিনীও নয়, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল মুক্তিবাহিনী অথবা ভারতীয় বাহিনী। এ যে কত বড় মিথ্যাচার তা বলাই বাহুল্য। তিনি কি ভুলে গেছেন বুদ্ধিজীবীদের শুধু ১৪ ডিসেম্বর নয়, এর আগে থেকে হত্যা করা হচ্ছিল?

৩০

তাহলে, পুরো বিষয়টির জন্য কে দায়ী? ফরমানের ভাষায় অবশ্যই, রাজনীতিবিদরা। এ ধরনের মন্তব্যের সঙ্গে আমরা অপরিচিত নই। গত পঞ্চাশ বছর, অধিকাংশ সময় আমরা দেখেছি জেনারেলরা রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করেন। তা না করলে তাদের শাসনের যৌক্তিকতা থাকে না।

তিনি লিখেছেন, "ছয় দফার ওপর ভিত্তি করে প্রচারণা চালাতে গিয়ে মুজিব ও তাঁর দল কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করেছিলেন, কিভাবে পশ্চিমের ভাইদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ভাবাবেগ ও অনুভূতিকে উস্কে দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে সরকারের সকল কার্যক্রম দখল করে নিয়েছিলেন। এটা ছিল এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ, যার বিরুদ্ধে আর্মিকে অ্যাকশানে যেতে হয়েছিল, এরপর ঘটেছিল ভারতীয় হস্তক্ষেপ, যার পরিণাম ছিল আমাদের দেশের ভাঙন।"

শুরুতে যে পূর্ব ধারণার কথা বলেছিলাম, অন্তিমে দেখুন সে ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল ফরমান উপসংহার টানছেন অর্থাৎ সবকিছুর জন্য ভারতীয় ও বাঙালি রাজনীতিবিদরা দায়ী। তবে, এ মন্তব্যকে জোরদার করার জন্য ভুট্টোকেও তিনি খানিকটা দায়ী করেছিলেন। বেশি নয়, কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে পাকিস্তান ফেরার পর ভুট্টোর অধীনে তিনি আবার উচ্চপদ পেয়েছিলেন।

আর হ্যাঁ, জেনারেলদের কয়েকজন দায়ী। যেমন নিয়াজী আর জেনারেল ইয়াহিয়া। তার ভাষায় "ওপরে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার দায়িত্বকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। যা কিছু ঘটছে তার সব কিছুর জন্যই সম্পূর্ণরূপে তিনি দায়ী ছিলেন শুধু আর্মিকে সমালোচনা ও দোষারোপ করার প্রবণতাটুকু ছাড়া।" সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও জেনারেলদের পক্ষ সমর্থন করার জন্যই এই বই। তিনি বলেছেন "একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্মিকে সমালোচনা ও দোষারোপ করার অর্থ হলো আমাদের শত্রুর অশুভ উদ্দেশ্যকে সাহায্য করা। ["...the tendency to criticize and blame the army, as an institution, can only help the evil intentions of our enemy."]

রাও ফরমান আলীর বইটি পড়ার পর মনে হয়েছিল সুযোগ পেলে একবার তার সাক্ষাৎকার নেব। ১৯৯৮ সালে সে সুযোগ হয়েছিল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের আমেনা সৈয়দ ফরমান আলির সঙ্গে আমার ও মহিউদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

রাওয়ালপিন্ডির খুরশিদ আলম রোডে ছোট একতলা ছিমছাম বাড়ি ফরমান আলির। সামনে এক টুকরো সবুজ লন। চারদিকে মৌসুমি ফুলের কেয়ারি। তার বর্ণচ্ছটায় চারদিক উজ্জ্বল। শান্ত্রি গিয়ে খবর দিল। ফরমান বেরিয়ে এলেন।

সত্যি বলতে কী তাকে দেখে আমি খানিকটা হতাশই হলাম। আমার ধারণায় ছিল, দেখব, হৃষ্টপুষ্ট এক সেনা অফিসার যার মুখে থাকে নির্বোধ হাসি আর চোখে ক্রুরতা। কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শীর্ণকায়, বয়সের ভারে খানিকটা ন্যুব্জ এক ব্যক্তি। যেন অবসরপ্রাপ্ত কোনো স্কুল বা কলেজ শিক্ষক। জীবনের ভারে যেন ক্লান্ত।

রাও ফরমান আলী সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, তিনি অসুস্থ, জ্বরাক্রান্ত, কিন্তু, আমরা এসেছি এত দূর থেকে তাই তিনি আমাদের

সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি ড্রইংরুমটি দেখছিলাম। ছিমছাম সাজান। চীনা একটি স্ক্রলও ঝুলছে একদিকে। ফরমানকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানালাম। তিনি বললেন, তার আপত্তি নেই। আমি লোকটিকে দেখছিলাম। এ লোকটি, বলা হয়ে থাকে, আমাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত। গণহত্যার একজন পরিকল্পনাকারী। আমি তার পাশে বসে আছি। এতদিন যে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের কথা বলছি, মনের বাসনাও ছিল যা, তা চেপে চুপচাপ বসে আছি। ফরমান কী ভাবছিলেন জানি না। তিনি মৃদু স্বরে কথা বলছিলেন। এ স্বর এবং বলার ঢং কোনো সৈনিকের নয়, বরং ক্লান্ত কোনো অধ্যাপকের।

আমাদের নেয়া সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত হলো। বইতে নয় এ সাক্ষাৎকারেই তিনি শুধু গণহত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। পরে আমি আলতাফ গওহর ও আসগর খানের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছি। গওহর ইঙ্গিতে জানিয়েছেন ফরমান বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত। ঢাকার প্রাক্তন কমিশনার (১৯৭১) আলমদার রাজা আমাদের উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "আপনারা ফরমান আলির সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে তো কথাই বলা যাবে না।" এয়ার মার্শাল হেসে বলেছেন। "এইসব লোক এখন এ ধরনের কত কথা বলবে।"

৩১

জেনারেল রাও ফারমান আলির সাক্ষাৎকার

প্র: তখন (১৯৭০) সামরিক আইনের প্রশাসন চলছিল, আর আপনি ছিলেন বেসামরিক বিষয়ের দায়িত্বে?

উ: বেসামরিক বিষয় অবশ্যই। সচিবালয় থেকে গভর্নর হাউসে আসত এমন সকল নথিই আমার কাছেই প্রথমে আসত। গভর্নর হাউসে দায়িত্ব পালন করতাম আমি। আমার হাত ঘুরে নথি যেত গভর্নরের কাছে। এ নথি বা ফাইলগুলি সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নথি। তাতে আমার করার কিছু থাকত না। মাঝে মাঝে আমি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতাম। আমার পর্যায়ে একজন সাধারণ অফিসার হিসেবে যে জেনারেল ভারপ্রাপ্ত গভর্নর হিসেবে কাজ করছেন তাঁর কাছে এ রকম কিছু প্রশ্ন তোলার এখতিয়ার ছিল। জিওসি তথা জেনারেলের কাজ ছিল কম্যান্ড দেওয়া, কাজেই বেশ অনেক কিছুর দায়িত্বই আমার ওপর ছিল।

প্র: আপনার জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজটি কি আসলে জনগণের

নিরাপত্তা ছিল?

উ: ক্ষমতার লীলাখেলার ধারণায় জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজ-কারবার আমি করছিলাম না। আমি এই ধারণা ও অর্থে জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কাজ করছিলাম যে, দেশকে এক থাকতে হবে, এর সংহতি রক্ষা করতে হবে। এটিই জাতীয় নিরাপত্তা। এর অর্থ আমি পূর্ব পাকিস্তানে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার রাজনৈতিক দিকগুলির দেখাশোনা করতাম। কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি। তখনকার দিনে সামরিক আইন জারির আগে বাস্তবিকপক্ষেই ছাত্ররা রাজনীতি নিজেদের হাতে নিয়েছিল। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের আমলে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। তাই রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ ছিল না। এ পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হয়। ছাত্ররা রাজনীতি করতে থাকে। আর আমি এ ছাত্রদের বিষয়ে ব্যাপৃত থাকি।

প্র: এই ছাত্রদের ব্যাপার দেখতে গিয়ে মূলত আপনার কর্মসূচি কী ছিল?

উ: কাজটি ছিল ছাত্রদেরকে সপক্ষে নিয়ে এসে তাদের মন জয় করার। এ কাজটি ছিল ছাত্রসম্প্রদায়ের যত বেশি সংখ্যক সম্ভব সদস্যকে সপক্ষে নিয়ে আসার, শ্রমিকদের বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। প্রশাসনকে সঠিক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য আমি প্রচুর সময় ব্যয় করেছি। আমার মতে, এ অধিকার রয়েছে প্রতিটি প্রশাসনের। অনেক জিনিসকেই ঠিক করে আনা যায়। প্রশাসনের দিক থেকে অনেক কিছু ঠিকঠাক চলে না বলেই হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় আর সে-জন্য মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একই পটভূমিতে দেখা দিয়ে থাকে শ্রম-সমস্যা। এসব সমস্যা দেখা দেয় সামরিক আইন জারি হবার আগে। এ সমস্যাগুলির সমাধানের দরকার ছিল। সেজন্য আমি ছাত্র ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় বসে সবকিছু সমাধানের চেষ্টা করি।

প্র: এসব সমস্যার জন্য ঐ সময় কে দায়ী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

উ: দেখুন, খুবই জটিল সমস্যা এটি। আপনি যদি শ্রম-সমস্যার কথাই তোলেন, তার সাথে জড়িয়ে আছে জনসংখ্যা সমস্যা। আপনি তো আর সবাইকে কাজ বা চাকরি দিতে পারেন না। কিন্তু যারা চাকরিতে ইতোমধ্যে ছিল, তাদের স্বার্থই তারা দেখছিল। কাজেই একে বলা চলে একটা দুষ্টচক্র। এটি ভাঙা সম্ভব তখনই যখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমবিক্ষোভ দেখা দেয়, ছাত্ররাও এতে শামিল হয়। আর যেমনটি আমি বলেছি, ছাত্ররা এসবের পথ ধরে একসময় রাজনীতিতে এসে পড়ে। এভাবেই ছাত্ররা কার্যত গোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে নিয়েছিল। তারা যাচ্ছে

তাই করছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল বা হলে পুলিশকে যেতে দেওয়া হয়নি। শুধু ছাত্রাবাস তো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয়েই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটা উঁচু গাছ ছিল। আমরা ওটায় দিনে ৫ বার উঠে পর্যবেক্ষণ করতাম। আর তারা যা খুশি তাই করত।

প্র: তাহলে আপনার এই নিয়োগটি বেশ গুরুত্বপূর্ণই ছিল, মানে আমি এটা বলতে চাইছি, কেননা, আপনি তো ইয়াহিয়া খানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই না?

উ: সত্যিকার অর্থে ঠিক তা নয়... তিনি আমার সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন না। কেননা, কখনও আমি মদ্যপান করি না, মাতাল হইনি। সুরা স্পর্শ করিনি আমি কখনও। না, কখনও আমি ঐ দলভুক্ত ছিলাম না। দ্বিতীয়ত, আমি ছিলাম জুনিয়র পদমর্যাদার লোক। আমার পদোন্নতি ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। আমি অন্য ছয়জনের আগে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি লাভ করি।....

প্র: আপনি মার্শাল ল কালচারেরই লোক! আপনি যদি গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের কথা বলেন, বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা, সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের কথা তাহলে সেক্ষেত্রে যে জনসমষ্টিকে চিরকালই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে জানেন, তারাই তো পাবে আইন পরিষদে সর্বোচ্চসংখ্যক আসন... আর তাই...

উ: জ্বি হ্যাঁ, এ কথাটিই আমি শেষ পর্যন্ত বলতে চেয়েছি, অন্তত উপলব্ধি করেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি মনে করি, আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম, গোড়ার দিকে এগুলি আদৌ আমার চিন্তায়ই আসেনি। কিন্তু যখন ওখানকার পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজ করতে শুরু করলাম তখন আমার গোটা ধারণাই বদলে গেল। এর আগে আমি একজন প্রশাসক মাত্র ছিলাম। নানা বিষয় আসত। আমি সিদ্ধান্ত দিতাম। এরপর যখন পরিস্থিতির ছবি বদলাতে শুরু করল, প্রশাসক হিসেবে প্রত্যক্ষ করলাম যা ঘটে যাচ্ছে যা গোড়াতে আমি বুঝিনি। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলি, আমার ওখানকার দায়িত্বের গোড়ার দিকে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের একটি শাখা খোলা হয়েছিল। আমি তার উদ্বোধন করেছিলাম। আর সে অনুষ্ঠানে আমি বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। ঐ ভাষণের বক্তব্যে আমার মনে হয় আমি বলেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানিরা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তবে তখন আমার জানা ছিল না, একজন হিন্দু-নেতা সেখানে বসে আছেন।

প্র: আপনার বইতে আপনি...

উ: এমনকি আমি এ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারিনি যে গোটা সমাজেই তারা মিশে আছে। ঠিক নয়, বরং আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝি ও বিশ্বাস করি

যে, হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানের মন-মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে।

প্র: আপনার বইয়ে আপনি এও উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তাজউদ্দীন আহমদ হিন্দু-চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। আমার মনে হয় এই জিনিসটি ঐ ধারণারই অংশবিশেষ। আর তাই আপনি ধরে নিয়েছেন, জনাব তাজউদ্দীনের পরিবার ছিল...

উ: না ঠিক তা নয়। তবে তাজউদ্দীন পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন। মুজিব তা ছিলেন না। মোশতাক খোন্দকার পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন না।

প্র: তার মানে আপনি বলতে চান, তাজউদ্দীন ছিলেন বাংলাদেশবাদী, বাঙালির পক্ষ সমর্থক?

উ: না, এ ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু আলাদা। আপনি বাঙালিবাদী হতে পারেন। প্রত্যেকেরই তাই হওয়া উচিত। যা আলাদা আমি বলেছি তা হলো তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিলেন। আর সকলে তা চায়নি।

প্র: তাই! এজন্যই আপনি... তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন বইয়ে?

উ: অন্যদের তুলনায় তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে তাই আমার মনোভাব ছিল প্রবল, অন্যেরা সঠিক পক্ষেই ছিল।

প্র: অথচ '৪৭-এর এই সেই বাঙালি জনগোষ্ঠী যারা তখনকার পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিল যাদের মধ্যে আপনি হিন্দুর আধিক্য দেখেছেন, দেখেছেন আমাদের দেশে হিন্দু বেশি এখন এরা যদি হিন্দু-প্রভাবিতই হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব তারা পাকিস্তানের প্রস্তাব করত না।

উ: আসলে এ নিয়েই আমি শুরু করতে চেয়েছিলাম। আমার বইতেও আমি কিন্তু বলেছি যে, কী ঘটেছিল যার জন্য পূর্ববাংলার শতকরা ৮৫ জন মুসলমান পাকিস্তানের জন্য ভোট দিয়েছিল। যদি তারা এভাবে কাজ না করত কি হতো? এই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে। তাই পাকিস্তানের এই সৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া কিছু নয়। বরং পাকিস্তানের হেফাজত করার স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের।

প্র: ঠিক তাই।

উ: নয় কি?

প্র: কেবল যখন তারা.....

উ: কেবল যখন তারা ভাবল যে, সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের সাথে ন্যায্য আচরণ করছে না, ওরা তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলি দিচ্ছে না। এসব বিষয়ে আমি বাঙালিদের পক্ষে। প্রাপ্য অধিকারগুলির জন্য তাদের প্রশ্ন তোলার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ভাঙার প্রয়াসে আমি তাদের সাথে নেই।

আমার ধারণা ও চিন্তায় আমি মনে করি তাদের কাজটা ঠিক হয়নি। এর কারণ, আপনারা বোধ করি জানেন যে, উপমহাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের গোটা কাল-পরিধি জুড়ে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তাটুকু পূর্ব পাকিস্তানিরাই পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় বেশি উপলব্ধি করেছিল, পাকিস্তান যারা সৃষ্টি করেন– সেই পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তানিরা করেনি... ভারতের মুসলিমরাও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিল।

প্র: আপনি কি মনে করেন না, পাকিস্তানের জন্য অনুভূতির বিষয়টিকে বাঙালিদের ন্যায্য অনুভূতিকে পাশ কাটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? এর কারণ, দেশের বনেদী শাসকগোষ্ঠীও ছিল সেনাবাহিনীর ভেতরেই যারা পাকিস্তানের ঠিকাদারি নিয়েছিল। তারাই ঠিক করেছিল, পাকিস্তানকে কেমন করে চালাতে হবে। আর সে কারণে ক্ষমতার সেই কাঠামোর মধ্যে বাঙালিদের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। আমি একথাই বলতে চাচ্ছি, বাঙালিদের মাঝে শেষ বন্ধনের ধারণা ও জ্ঞানের বিষয়টির কি কোনো যৌক্তিকতাই ছিল না?

উ: ঠিক, তাদের ঐ ধরনের চিন্তাভাবনা একান্তই সঠিক ছিল। আমি এর পরও বলি, তাদের সে অধিকার ছিল, তাদের শাসনের অধিকার থাকা উচিত ছিল কিংবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে ক্ষমতা তাদেরকেই দিতে হবে। আমি তখনও এটি মনে করতাম, এখনও করি এ দুটি জিনিসের মধ্যেকার পার্থক্য হলো আমার মতে এই যে, যে কোনো অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর তাদের নিজ অধিকার চাইবার বৈধতা আছে। তা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তারা যে কাঠামো (রাষ্ট্রকাঠামো) নিজেরা তৈরি করেছে তা ভাঙা, পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলা সঠিক নয় যদিও ধারণার অমিল হতেই পারে।

প্র: ঠিক।

উ: আমি বলি, পূর্ব পাকিস্তানিরা পাকিস্তান ভাঙে নি, ভেঙেছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। তবে আমি মনে করি এর মধ্যেও বাস্তবতা আছে যে, উভয় তরফের ভুলের কারণে পাকিস্তান ভেঙেছে। পূর্ব পাকিস্তান কিছু ভুল করেছে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভুল করেছে। আর দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু অন্যায় বা ভুল করেছে যা পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ঠিক নয়। আমি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে বিষয়টি খোলসা করে বোঝাতে পেরেছি।

প্র: ৬-দফা সম্পর্কে আপনার মত কী?

উ: কথা ছিল ছয়দফার সংশোধন করে তা নমনীয় করে তুলে ধরবেন কেননা, ওটা কোনো কুরআনী কানুন তো ছিল না। ৬-দফা আর যাই হোক বেহেশত থেকে আসেনি। আর এও আমাদের জানা ছিল আওয়ামী লীগের

ভেতরেই কিছু লোক ছিল যাদের মধ্যে ছয়দফার বিষয়গুলির ধারণা নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুজিব যদি কম ভোট পেতেন তাহলে তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই সবকিছু করার অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পেতেন। কিন্তু কল্পনাতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেলেন তিনি। মাত্র দুটি আসনে হারতে হয় তাঁকে। আর এর পরিণতিতে তিনি ৬-দফার দাবিদারদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। কাজেই ছয়দফার প্রশ্নে সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর রইল না। ৬-দফা চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠল। ৬-দফা হয়ে গেল মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন– এ জাতীয় অনিবার্য কিছু। অথচ রাজনীতিতে লেনদেনমূলক আলাপ-আলোচনা চলছিল এমন সময়ে এটি হওয়া উচিত ছিল না। আর যুগপৎ আমি ভূট্টোর বিরুদ্ধে কী বলেছিলাম তাও আপনাদেরকে জেনে রাখার অনুরোধ জানাব। কাজেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাকে অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হয়েছিল। আমি তাদের সমালোচনাও যেমন করিনি তাদের প্রতি সমর্থনও জানাইনি। আমি বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করেছি ও সব তরফকে বলেছি আপনারা একত্রে আলোচনায় বসুন। এই তারা আসলে কারা? তারা পূর্ব পাকিস্তানিই বটে, ওরা পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ ছিল না।

প্র: আপনি ডানপন্থিদের কথা, নুরুল আমীনের কথা বলছেন? গোলাম আজম?

উ: ওরা সকলেই ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। তাই এ ধরনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিস্থিতি না হলে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের একটা সমাধান আমরা খুঁজে পেতাম। শেখ মুজিবের দল যদি সকল আসন না পেত তাহলে আমরা তাঁকে চাপ দিতে সক্ষম হতাম।

প্র: তাহলে এখন আপনারা দেখছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন না, সরকারের কর্তব্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া? কী কারণে, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না?

উ: উচিত কথা নিঃসন্দেহে।

প্র: তাহলে তারপর কি ঘটে গেল?

উ: অন্তত আমার তরফ থেকে আমি বলতে পারি, আমি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে চেয়েছিলাম এমনকি শেখ মুজিব জেলে থাকার পরেও। ঐ সময় অন্য কেউ একজন প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। সে কথা আমি জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম...।

আমার ধারণা ছিল নির্বাচনের পর বিভিন্ন দফা নিয়ে কিছু সমঝোতার পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে, কিন্তু বাস্তবে তার বদলে দেখা গেল সমঝোতা নয় সংঘাত শুরু হয়েছে। ঐ সময় থেকে উভয় তরফে মনে সুগভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে। শেখ মুজিব ভূট্টোকে বিশ্বাস করেননি। ভূট্টো বিশ্বাস করেননি শেখ মুজিবকে। আমার তো মনে পড়ে শেখ মুজিব নিজে আমাকে বলেছিলেন– সেই রাতে ভূট্টো শেখ মুজিবের দাবি প্রত্যাখ্যানের পর আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাদের দুজনের আলোচনায় কি হলো?

প্র: আপনি তথাকথিত লারকানা পরিকল্পনার কথা জানতেন? আপনার মতে, কখন এসব ঘটেছিল?

উ: আমি এর কিছু জানতাম না। জেনারেল উমর আমাকে এ সম্পর্কে সামান্য ছিটেফোঁটা জানিয়েছিলেন। তাই আমি সরাসরি যা জানতাম শুধু সে সব কথাই আমার বইয়ে লিখেছি।

প্র: ঠিক আছে, পরে জেনারেল উমর আপনাকে কি বলেছিলেন?

উ: তিনি আমাকে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকা থেকে ফেরার পর তাঁরা লারকানায় যান। এর আগে ঢাকায় জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিব হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। তবে লারকানায়, ভূট্টো ইয়াহিয়াকে বলেন, আপনি তো মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, আমি নই, জনসাধারণই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। পরে কিছু কথাবার্তার পর তিনি তাঁকে বলেন যে, মুজিবের স্বদেশপ্রেম যাচাই করতে হবে আর সে যাচাই পরীক্ষাটি হবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। এতে যদি তিনি প্রতিক্রিয়া দেখান তাহলে তিনি দেশপ্রেমিক নন, যদি না দেখান, তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি। আমার লেখা বইতে আমি সম্ভবত উল্লেখ করেছি যে, যদি বিপরীত পরিস্থিতি যাচাই হিসেবে আসত তাহলে কী ঘটত সে সম্পর্কে আমি ঐ সময় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বলেছি...।

প্র: তার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উ: দেখুন, আপনি যখন... মানে কাজ করেন...

প্র: গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে...?

উ: কিংবা বলুন রাজনীতি। তখন নানাদিক থেকে চাপ ছিল। তার ওপর জেনারেলদের চাপ এত প্রবল ছিল যে, তিনি কার্যত আমাকে বলেই ফেলেন দ্যাখো, আমি.... আমি পশ্চিম পাকিস্তানে চললাম। তবে আমার ধারণা, আমি বোধ হয় একটা চরম অবস্থায় পৌঁছেছি। এ কথা বলছি কেননা, ভূট্টো

প্রধানমন্ত্রী হবার খায়েশ প্রকাশ করেছিলেন অথচ দেশ একটা। দুজন প্রধানমন্ত্রী হতে হলে দুটো দেশ দরকার। তিনি নিজে একজন মার্কিন সাংবাদিকের কাছে দুই প্রধানমন্ত্রীর কথা বলেছিলেন। আর পরে সে কথা অস্বীকার করেছিলেন।

প্র: কে? জনাব ভূট্টো?

উ: জনাব ভূট্টোই বলেছিলেন ও পরে সেটি অস্বীকার করেছিলেন। এ ঘটনা বেশ অনেকটা গোড়ার দিকে ঘটে। কিন্তু এটিই তখনকার চিন্তা-ভাবনায় দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ শান্তি সমঝোতার বদলে মোকাবিলা, সংঘাত শুরু হয়ে যায়। আমি আমার স্মৃতিচারণে আরও কিছুটা পেছনে চলে যাচ্ছি যখন মুজিব বিবৃতি দিয়েছিলেন, ভূট্টোও একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন আর এ ভাবে বিবৃতির পিঠে বিবৃতি দেওয়া চলতে থাকে। মুজিবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তার তেমন বাধ্যবাধকতা বা দায় ছিল না। তিনি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভূট্টো যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন সেটি বোধহয় তাকেই সাজে। দেখুন, একজন রাজনীতিক স্বাভাবিকভাবে যা করেন তিনি তাই করেছিলেন। তার জায়গায় আপনি– কিংবা পুরানো আমলের মুসলিম নেতাদের কথাই ভাবুন। তাদের পক্ষেই তার মনোভাব সম্ভব। তাঁরা মুজিবকে স্বীকার করে নিতে পারলে ল্যাঠাই চুকে যেত। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন তাঁরা নিজ দলকে বাঁচিয়ে রাখতে। একটা কিছুর জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জীইয়ে রাখতে না পারলে এ দল ভেঙে যাবার ঝুঁকি থাকে– নেতাকে আক্রমণাত্মক হতে হয়। ভূট্টো এ কাজটি করতে গিয়েই বাড়াবাড়ি করে সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হাম উধার, তুম উধার'। নাহলে আমি যাকে পাব, যা কিছু পাব টুকরো করে ফেলব। আমার ধারণা... যা বলতে চাচ্ছি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। যদি না করে থাকেন, আমাকে আরও বলতে হবে।

প্র: কাজেই যেভাবে হোক, আলোচনা ব্যর্থ হোক সেটিই ছিল ইচ্ছে। আর এ ভাবেই কি আপনি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চান?

উ: আলোচনার ব্যাপারে ইয়াহিয়া যদ্দুর সম্পর্কিত সে সম্পর্কে এ কথাই বলা যায়– তিনি প্রথমে আলোচনা বৈঠকের জন্য ১৬ মার্চ পৌছান বলেই আমার মনে পড়ে। আমার আলোচনায় দুই ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এক, আমি নিজে আর দুই বিমানবাহিনীর অফিসার মাসুদ, ৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধের বীর নায়ক। আমরা ঐ আলোচনা বৈঠকে কোনো কথা বলিনি। জেনারেল শাহ্ আলি কিছু বলছিলেন, তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। আমি তাকে বলেছিলাম, স্যার, এমন এক নীতি অনুসরণ করা ঠিক নয় যাতে পূর্ব পাকিস্তান আমাদের ছেড়ে যায়। আমরা এখন তাঁর "ভেঙে যাওয়া" শব্দগুলি ব্যবহার করিনি।

প্র: আপনি কুসংস্কারের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?

উ: আর তিনি বললেন, জাতির জনক জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি ছিলেন। আমি তখন সেটি মেনে নিইনি। এখন এসব থেকে একান্ত ই পরিস্কার যে, জেনারেল একটি রফা মেনে নেবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি, ভূট্টো ও মুজিব.... আমার ধারণা কোনোরকমে একটা সমাধানে উপনীত হয়েছিলেন। আমি ১০ মার্চের সন্ধ্যায় মুজিবকে টেলিফোন করে জানতে চাইলাম, ভাই কুছ হুয়া? আপনারা জানেন, মুজিবের সাথে আমার বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ছিল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী হব, পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন মন্ত্রী হবে, পুর্ব পাকিস্তান থেকে হবে পাঁচজন। আমি বললাম, খুবই খুশি হলাম শুনে। কিন্তু পরের দিন সকালে সেখানে ভূট্টোর উদয় হলো, তিনি সবকিছু ভেঙেচুরে মিসমার করে দিলেন।

প্র: এ ঘটনা ২০ মার্চের।

উ: ঠিকই ধরেছেন। তিনি বললেন, আপনারা সামরিক আইন তুলে দিতে পারেন না। তাহলে পাকিস্তান ফেডারেশনকে আর একত্রে রাখা যাবে না। তখন দেশে কোনো শাসনতন্ত্রও ছিল না। সামরিক আইন তুলে দেওয়ার ব্যাপারে এ ছিল ভূট্টোর আপত্তি। একই বছরের নভেম্বরে, ভারতীয় আক্রমণ শুরুর ঠিক আগে লাহোরে ইয়াহিয়ার সাথে দেখা হয়। ওখানে পিপল্স পার্টি তাকে এক সামরিক আইন আদেশের আওতায় এ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানায়। আমি বললাম, দেখুন ওরা কিভাবে বদলে গেছে? এ কাজটিই কি একবছর আগে করা যেত না? এ অবস্থা, আমি মনে করতে পারি, পূর্ব পাকিস্তানের বহু লোকের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় তাতে দেখতে পাই– এমন একটা ধারণাই শেকড় গাড়ছে যে, সিঙ্গাপুর স্বাধীন থাকতে পারলে বাংলাদেশ কেন স্বাধীন দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানেও তখন একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত তখন এরকম একমত প্রকাশ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেললে পূর্বপাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর বাস্তবসম্মত ও টেকসই হয়ে উঠবে। এ ধরনের জিনিসের চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা কমিশনের মাথাতেও ছিল। কাজেই এরকম বহু ধরনের জিনিস পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়ে। আর তার পরিণতিতে জনসাধারণ যৌক্তিক বিচার-বিবেচনার বিষয়টি বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় আবেগানুভূতি অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে। আমি আমার বইয়ে এ অবস্থার উল্লেখ করে বলেছি, এমনও একটা সময় আসে, কেউ-কেউ বলতে থাকে ঐ হারামজাদাকে আমরা আমাদের ওপর শাসন

চালাতে দেব না। এ কথার জবাবে আমি বলেছিলাম, ওরা যদি হারামজাদা হয় তাহলে ওদের কাছে আমরাও হারামজাদা। আমি আরও বলেছিলাম, আমাদের সামনে একটা আশার সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। অনেকে সে ধরনের আশাবাদীও ছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে পশ্চিম পাকিস্তানে এমন লোক ছিল যারা পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ ভাবত।

প্র: হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তান একটা দায় বোঝা!

উ: হ্যাঁ, সেটি এখনও ভাবা হয়। তবে প্রশ্ন, তাহলে কেন আমরা এখনও বলি আমরা পূর্ব পাকিস্তান হারিয়েছি? বরং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে হারিয়েছে। কেননা ওরাই তো আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্র: জেনারেল, আমরা আপনাকে ২৪, ২৫ ও ২৬ মার্চের কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কখন 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কেন করা হয়েছিল?

উ: প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল ১৯ মার্চে, আলোচনা বৈঠকের পরে। আমি সবকিছুতে তুষ্টই ছিলাম। কিন্তু ২০ তারিখে এসে আমাদের এরকম একটা উপলব্ধি জন্মায়, কোনো কোনো জায়গায় ভুল ঘটেছে। ২৫ মার্চেই আমার ধারণা অপারেশনের শুরু। এটাকে বাংলাদেশ দিবস বা অন্য যা-কিছুই হোক ধরা যেতে পারে।

প্র: ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস।

উ: ২৩ মার্চের পাকিস্তান দিবসে আমার মনে হয় মুজিব এসেছিলেন একটা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে। ঐ দিন তাঁর বাড়ির সামনে এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব ঐ কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন এবং বলা যায়, বাংলাদেশ ঘোষণা করেন। কিন্তু ঐ সময় নাগাদ আমাদের হাতে, এমনকি আমাদের সদর দপ্তরে তেমন কোনো তথ্য ছিল না। প্রেসিডেন্ট হাউসে আলোচনা চলছিল নিজস্ব কায়দায়। ওখানে ছিলেন, আমার যদ্দুর মনে পড়ে, প্রেসিডেন্ট, পীরজাদা, কর্নেল ইলিয়াস, জনাব আহসান, জনাব হামিদ এবং আরও ২/১ জন। কিন্তু তারা সকলে সবকিছু গোপন রাখছিলেন। আমি ও জিওসি এসবের বাইরে ছিলাম। আমাদের হাতে কোনো কাজ ছিল না। আমরা গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। আমরা প্রেসিডেন্ট হাউসে কী হচ্ছে তা জানার জন্য জেনারেল টিক্কাকে বলি কেননা ওখানে কী হচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গ আমাদের জানা ছিল না। শুধু আমরা এটুকুই জানতাম, একটা কিছু গোলমাল কোথাও হয়েছে। সে কথা আমি আমার

কথাবার্তায়ও বলেছি। অন্তত আবছা আবছা হলেও গোলমালের আভাস পেয়েছিলাম তাই টিক্কা সেখানে গেলেন। ফিরে এসে তিনি জানালেন, একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেছে, দর কষাকষির আলোচনা ভালো চলছে না। সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা কিছু করতেই হবে। ঐ দিন কী ঘটছিল... আমাদের ফিরে যেতে হবে– তারিখ বদলানো হলো, ঘোষণাও দেওয়া হলো, ঢাকায় একটা ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করা গেল। আমরা পুরনো ঢাকার নওয়াবগঞ্জে লোকজনকে হত্যার খবর পেলাম। সেখানে সেনাবাহিনী পৌঁছে গেছে। ওখানে একটি বড় আকারের সমাবেশ হয়। আর ঐ সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ সরকার চালাবে। তাজউদ্দীন কার্যত সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। তিনি ব্যাঙ্ক ও কার্যত সকলের প্রতি নির্দেশ জারি করলেন। সেনাবাহিনী তখন ব্যারাকের মধ্যেই ছিল। এমনকি তারা সেনানিবাসগুলির বাইরে যেতে পারছিল না, বাজারঘাট থেকে কিছু কিনতেও পারছিল না, কোনো ঠিকাদারও সেনাবাহিনীকে এমনকি শবজি পর্যন্ত সরবরাহ করছিল না, শবজির সরবরাহর আনতে হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। আর পূর্বপাকিস্তানের সকলে ভাবছিল এভাবে যত জাহাজ আসছিল তার প্রতিটিতে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হচ্ছিল। অথচ বাস্তবিকপক্ষে, এগুলিতে আলু, পিঁয়াজের মতো রেশনসামগ্রী আনা হচ্ছিল। এ জাহাজে বলতে গেলে...।

প্র: পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হয় নি?

উ: ২৬...

প্র: ২৬ মার্চের আগে পূর্ব পাকিস্তানে ৯০ হাজার সৈন্য ছিল... না, ক্রমে সৈন্য সংখ্যা এ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল?

উ: না, এটি একেবারেই এক আলাদা প্রশ্ন। ২৬ মার্চের প্রথম ব্যাটালিয়ন সৈন্য পৌঁছায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। ২৫ মার্চের পর।

প্র: তাহলে এখন আপনি আমাদেরকে– "অপারেশন সার্চলাইট'-এর বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ আকারে বলতে পারেন। এর যে টার্গেট বা লক্ষ্য ছিল তার উদ্দেশ্য হলো...

উ: উদ্দেশ্যের কথাই বলি। পরিকল্পনাটি প্রণীত হয় একটা সময় ধরে। এতে নিরূপণ করা হয় কী ধরনের অভিযান সফল হবে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, অমৃতসরে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ চালায়। ঐ আক্রমণে তারা ট্যাঙ্ক, মর্টার কিংবা যা পারে ব্যবহার করে। শুধু তারা ঐ অভিযানে বিমান ব্যবহার করেনি। তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ভাঙতেও সক্ষম হয় এজন্য

যে, সেখানে একটা প্রতিরোধ ছিল। যখন সেনাবাহিনীকে নামানো হয় সেনাবাহিনীর কাজ আর বেসামরিক ব্যাপার থাকে না। ঐ অবস্থায় সেনাবাহিনী সফল হয় বা হবার চেষ্টা করে। আর সেটি সাধারণ পা টেনে টেনে ধীর গতিতে একটা সময় নিয়ে চলে না। পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সময় সান্ধ্য আইন, সামরিক আইন সবকিছুই তাদের কার্যকারিতা হারিয়েছিল। কেউ সামরিক আইন মানছিল না। পূর্ব পাকিস্তান সরকার নামক ব্যবস্থা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা আমরা ৭ মার্চের কথায় চলে এসেছি। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। আর পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর জন্য বেসামরিক সমর্থন থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিল। সেনাবাহিনীকে, আরেক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। আমরা আবেগানুভূতির বিষয়টি বিবেচনায় না এনে আমার মতে ভুল করেছি। আমরা সেনাবাহিনীর অনুভূতি বুঝে উঠতে পারিনি। ফলে যা ঘটেছিল তা হলো বহু জায়গায় তাদের মারধর করা হচ্ছিল, সেনা অফিসারদের লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল। ওরা বাইরে বেরুতে পারছিল না। ফলে, ক্ষোভ-ক্রোধমিশ্রিত আবেগ-উত্তেজনা পুঞ্জীভূত, ধূমায়িত হয়ে উঠছিল– আমরা এক সরকারের সেনাবাহিনী, আমরা এমনকি, বাজার থেকে মাংসও কিনতে পারব না! এ অবস্থায় পরিকল্পনা ছিল একেবারে সোজা। আমরা কারফিউ বসাব আর গিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার করব।

প্র: কিন্তু এর আগে আপনি বলেছেন, ১৯ মার্চ তখন ভূট্টো আপনাদের বলেছিলেন, সব জিনিসের মিটমাট হয়ে গেছে...।

উ: ভূট্টো বলেননি, বলেছিলেন মুজিব।

প্র: ভূট্টো নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছিলেন।

উ: কিন্তু তিনি তা করেননি। ইয়াহিয়া খান হলেও ভূট্টো সম্মত হননি, ভূট্টো এসেই তো–!

প্র: ইঙ্গিত দিলেন, আর তাতেই–।

উ: বেশ, সেটিই ধরুন না, কেননা, পাকিস্তানে ফিরে আসার পর ভূট্টোর সাথে আমার দেখা হয়! এর আগে আর কখনও তার সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে ভূট্টোর সাথে দেখা করার জন্য একজন ব্রিগেডিয়ার ছিল অতি নগণ্য। তার সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। তাই যা বলছিলাম, সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দ্বিতীয় দিন আমি বলব, ঢাকার অধিবাসীরা পরিস্থিতির জন্য ভালোরকমে তৈরি ছিল। এই তৈরির ভাব ছিল ৭ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত। অসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, রাজাকার, মুজাহিদ, আনসার সবকিছুই ছিল। এরা সকলেই ঐ সময়

সরকারের কমান্ডে ছিল। এই সরকার কোনো ঘোষিত সরকার না হলেও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। রেডিও স্টেশন দখল করে নিতে যাচ্ছিল এ সরকার। রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘরগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল, অন্যান্য কাজও সারা হয়েছিল, সৈন্যদের তল্লাসী পরিকল্পনাও দেখানো হয়েছিল। রাজনীতিক নেতাদেরকেই কেবল গ্রেফতার করার বিষয় স্থির হয়েছিল যাতে কোনো জনগোলযোগ হাঙ্গামা বেধে না যায়। কিছুই না ঘটে। তবে সন্ধ্যার পর রাত ১১টার দিকে ইয়াহিয়া চলে যান। সূর্যাস্তের পর যখন তখনও ভালো করে আঁধার জমাট বাঁধেনি, তখন ইয়াহিয়া ছোট্ট কারে বিমানবন্দরে পৌঁছান ও ২৫ মার্চের সে রাতে ঢাকা ছেড়ে যান। তবে তিনি জানতেন না যে, এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খোন্দকার ঐ সময় বিমানবন্দরে ছিলেন। আমার ধারণা তিনি পরের দিন এসেছিলেন, তিনি ঐ সময় শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা জানান। এ সময় শেখ মুজিবের বাড়িতে আওয়ামী লীগের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমাদের ধারণা ছিল আমরা গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করব। কাজটা সোজা আর সহজ– দুই-ই হবে। তবে এর আগে আমি কিছু কথা বলে নিতে চাই। এসব আলোচনা যখন চলছিল তখন সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অফিসার সিদ্দিক সালিককে আমি একটা কাগজ দিই। সিদ্দিক সালিক ছিলেন লিয়াজোঁ অফিসারও বটে। তিনি গভর্নর হাউসে যাচ্ছিলেন। ঐ কাগজে আমি দুটি ত্বরিৎ কার্যকৌশল বা কার্যব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলাম। বলেছিলাম, ক্ষমতা বা শক্তি থাকতে হবে তবে একটা রাজনৈতিক সমাধানও দিতে হবে। এগুলি করুন, রাজনৈতিক সমাধান দিন। এগুলি করতে হবে অনতিবিলম্বে আমাদের তালিকার লোকগুলিকে গ্রেপ্তারের পর পরই। প্রেসিডেন্টকে সেখানে গিয়ে গবেষণা করতে হবে যে, ছয় দফার বদলে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির আট দফা মেনে নেওয়া হবে। আপনারা হয়তো জানেন, এই ছয় দফা–এগুলি কার্যত একই শুধু পার্থক্য এই যে, একটি খুবই চরম ও অন্যটি বেশ মৃদু, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একই রকমের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের উদ্দেশ্যসাধক। তাই যখন সামরিক আইন সদর দপ্তরে শেখ মুজিবকে নিয়ে কী করা যাবে– এই আলোচনা চলছিল তখন আমি প্রস্তাব দেই যে তাঁকে হত্যা করা উচিত হবে না কেননা এসসি তাঁর বাড়িতে হানা দিতে যাচ্ছে। এতে ওরা খুশিই বোধ হলো। আমি বললাম শেখ মুজিবকে হেফাজতে নিতে হবে ও তারপরে এ কথা বললাম ঘোষণা করতে হবে আমরা তাঁকে হেফাজতে নিয়ে চরমপন্থিদের থেকে তাঁকে আলাদা করেছি। তবে তাঁকে জনসাধারণ থেকে আমরা আলাদা করিনি। আলাদা করেছি সেইসব লোকদের

কাছ থেকে যারা স্বাধীনতা চায়। আমার প্রস্তাবের প্রথমাংশে শেখ মুজিবকে হত্যা করা যাবে না- এটি গৃহীত হয় কিন্তু একই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ-যুগপৎ একটি রাজনৈতিক সমাধানের কথা ঘোষণা করতে হবে- এটি গৃহীত হয় নি, বাস্তবায়িতও হয়নি। আমার মনে হয় না যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আদৌ এ প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন বা সেজন্য সময় দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এখন এরপর আমি ও জিওসি দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আর সকলে অন্য অবস্থান নেয়। আমাদেরকে হয়রানিতে পড়তে হয় এ কারণে। এরপর আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে যাই। জেনারেল হামিদ ও জেনারেল খাদেমের ওখানেও যাই। আমরা দুজন একত্রে ছিলাম। এ কারণে যে, আমি গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ওরা আমাদের জানাল, আমরা সামরিক ব্যবস্থা নিতে ভয় পাচ্ছি। আমরা দুজন- আমি ও খাদেম এই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী ছিলাম। আমাদের স্ত্রীদেরও এসব কথা ওরা জানাল যে, আমরা সামরিক ব্যবস্থা নিতে চাই না। আমি বললাম, স্যার আমি আমার জীবনের জন্য ভীত নই, আমি পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন ও কেননা এসবের পর আর পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না। এসব কাজ করলে একদিন একই সত্বার পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন তুমি এসবে ছিলে? এখন আমরা সামরিক অফিসার হিসেবে পদত্যাগ করতে পারি না। সাহেবজাদা ইয়াকুব এ কাজটি করে 'বদনাম' কুড়িয়েছেন আর বহুদিন তাঁর সবকিছু কুয়াশাবৃত, অস্পস্ট ছিল। এমনকি এখনও এমন লোক আছে যে তাঁকে 'কাপুরুষ' মনে করে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি তা ছিলেন না, তাঁর একটা দৃঢ়, স্বকীয় বিশ্বাস ছিল, থাকতেও পারে। কিন্তু আমরা যা বিবেচনায় রেখেছিলাম তা হলো, ধরুন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রকৃত যুদ্ধে এমন এক অবস্থানে আক্রমণ চালানোর জন্য আদেশ দিচ্ছি যে আক্রমণ বা যুদ্ধে আমি জানি, প্রাণ হারাব, সৈনিকদের প্রাণহানি ঘটবে। কিন্তু তার পরেও আমি আক্রমণ চালাব কেননা, ওপরের নির্দেশ রয়েছে আমার ওপরে।

প্র: সেনাবাহিনীতে কি এমন বিধি নেই যার আওতায় কোনো নির্দেশ, নির্বোধ পাগলসুলভ হলে তা অগ্রাহ্য করা যাবে?

উ: নেই, অন্তত এ ধারণা নেই।

প্র: বলতে চাই, আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানে তারা বলছে, পাগলসুলভ ক্ষেত্রে আপনি এ আদেশ বাস্তবায়িত না করার অধিকার বেছে নিতে পারেন।

উ: এ হলো যুদ্ধ অপরাধীদের ব্যাপার-এ হলো বিজ্ঞ বিচারক

মহোদয়দের অভিমত মাত্র.... জার্মান সেনাবাহিনীর কোনো জেনারেল কি...

প্র: জার্মান সেনাবাহিনী নয়। এ ধরনের একটি বক্তব্য কোনো এক ট্রাইবুনাল গ্রহণ করেছিল।

উ: হতে পারে। তবে এটি স্বাভাবিক নয় যে, কোনো কিছু করতে বলা হলে ও তা পালিত না হলে ঐ জেনারেল পদে ইস্তফা দেবেন। আর ঘটনাক্রমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আমি জিওসি ছিলাম না।

প্র: আমার মনে পড়ে, জেনারেল নিয়াজী লিখেছেনও– টিক্কা খান আদেশ দিয়েছিলেন যে, চেঙ্গিজ খান বুখারা ও হালাকু খান বাগদাদে যে বর্বরতা চালিয়েছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে তার চেয়েও নির্মম হতে হবে। আমি এদেশের মানুষ চাই না, শুধু মাটি চাই। তিনি নিজে এও বলেন যে, জেনারেল রাও ফারমান আলি ও ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব অননুকরণীয়ভাবে সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন আর আপনি তো আপনার ডাইরিতে লিখেইছিলেন যে, সবুজ দেশ পূর্ব পাকিস্তানকে লাল রঙে রাঙাতে হবে।

উ: দুটো ভিন্ন জিনিস। আমি দুঃখিত এ কথা বলার জন্য যে, জেনারেল নিয়াজী একজন মিথ্যাবাদী। তবে আসুন সবুজ পূর্ব পাকিস্তানকে লাল রঙে রঙিন করার কথায় আসি।

প্র: জেনারেল নিয়াজীর বইটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

উ: তিনি অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। এর বেশি বলার আমার কিছুই নেই। কেননা, এটি সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ মিথ্যা, তিনি নিজে বইটি লেখেননি। আপনি তাকে ঐ বইটির একটিমাত্র পৃষ্ঠা লিখতে বলুন আবার, আমি মেনে নেব বইটি তারই লেখা। জনসাধারণ তো আর খোঁজ রাখে না, রাখবেও না, আর তাই তারা এইসব বই লিখেছেন তাদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী। জেনারেল টিক্কা কখনও একথা বলেননি। আমার বিশ্বাসও, তিনি একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন গভর্নর হিসেবে। দুর্ভাগ্য তার, সে জন্য তার বালুচিস্তানের ও পূর্ব পাকিস্তানের কথাই বলে– তার দুর্নাম জুটেছে। তার সাথে দেখা হলে, দেখবেন তিনি একজন চমৎকার মানুষ।

প্র: আপনি কি তার সাথে দেখা করতে বলেন?

উ: তার অবস্থা ভালো নয়। ভয়ানক অসুস্থ তিনি।

প্র: তা নিয়াজী কী বলেছিলেন?

উ: নিয়াজী যেদিন দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেদিন পরিষ্কার বলেছিলেন তার কথা। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে তাতে বসে তিনি বলেছিলেন, রুশদের সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে দুশমনের দেশে রয়েছি। বর্মায় আমরা রেশন

যোগাড় করতাম জমি থেকে। গবাদিপশু পাওয়া যেত কিন্তু তা ছিল সীমিত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তিনি এমন ব্যক্তিদের একজন যিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বলছেন দুশমনের দেশ। আমরা কখনও একে দুশমনের দেশ ভাবিনি। আমাদের কাছে ওটা ছিল পাকিস্তান। তিনি আরও সব ভয়ঙ্কর কথাবার্তা বলেছিলেন– তিনি বলেছিলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নর গোষ্ঠী পরিচয় বদলে দেব। অর্থাৎ নিয়াজী ছিলেন কিছুটা চতুর ব্যক্তি। যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন, খুবই চমৎকার যেমনটি তার সাথে আপনাদের বৈঠকে মনে হয়ে থাকবে। এসব আদেশ আপনাদেরকে তিনি দেখিয়েও থাকতে পারেন। তবে যে ব্যক্তি এসব আদেশ তাদের জন্য লিখে দিয়েছেন আর তিনি তাতে সই করেছেন, সেই ব্যক্তিই লিখেছেন তার বই। কিন্তু তার আদেশের সেই বাস্তবায়ন ছিল ভয়ঙ্কর।

প্র: বলা হয়ে থাকে, আপনি রাজাকারবাহিনী গড়েছিলেন। কাজেই ইপিসিএএফ বা সিভিল আর্মড ফোর্সেস গঠন সম্পর্কে কি কিছু বলতে পারেন?

উ: আমার ধারণা এ বাহিনী গঠন করেছিল মার্শাল ল সদর দপ্তর।

প্র: এটি কার মস্তিষ্কজাত?

উ: ফোর্স কমান্ডান্টরা অবশ্যই...।

প্র: এ সময়ে ফোর্স কমান্ডান্ট কে ছিলেন?

উ: নিয়াজী। তিনি দাবি করেন, শামস ও বদররা হাতিয়ার।

প্র: তার বইও তাদের উদ্দেশে নিবেদিত।

উ: তিনি তাদের স্রষ্টা, ব্যবহারকারী, আর আমি মনে করি, অন্য যে কেউ এটি করত।

প্র: পরিস্থিতি ছিল যুদ্ধাবস্থা। নিয়াজী তার বইতে বলেছেন যে, আল-বদর ও আল-শামস-এর নেতাদেরকে যুদ্ধবন্দিদের সাথে ফিরিয়ে আনা হয়?

উ: আমি জানি না।

প্র: কিছুই জানেন না, আপনি?

উ: দেখুন, ঘটনা হলো এই যে, আমার কর্তৃত্বই ভেঙে পড়েছিল, আমি বস্তুত আর কেউ-ই ছিলাম না। যদ্দুর মনে পড়ে ১৩ তারিখে গভর্নর মালিক পদত্যাগ করেন। আমি গভর্নর হাউসে ছিলাম। ভারতীয় আক্রমণের মুখে তিনি পদে ইস্তফা দেন। এরপর আমার কোনো কাজ ছিল না, কেউ আর ছিলাম না আমি।

প্র: এ ঘটনা '৭১-এর ১৩ ডিসেম্বরের। তাই ১৩/১৪ ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদেরকে...

উ: হ্যাঁ, হতে পারে। ঠিক ধরেছেন আপনি। নিয়াজী ওদের হত্যার জন্য দোষ দেয়... বস্তুত ওরা সকলেই এ জন্য আমাকেই দোষারোপ করে।

প্র: আন্তর্জাতিক তথ্যমাধ্যমগুলি এবং পাশ্চাত্যের ও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তথ্যমাধ্যমও তো আপনাকেই দায়ী করেছে, কেন?

উ: ব্যক্তি হিসেবে আমি জানি না, একাই ছিলাম তখন আমি... কাজেই।

প্র: তারা প্রমাণ দিয়েছে আর কেউই সেগুলি এপর্যন্ত অস্বীকার করেনি।

উ: আমি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এসব দেখিনি।

প্র: বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে অক্টোবরে শুরু হয়। কেননা ঢাকার নটরডেম-এর কাছে একজন ডাক্তারকে হত্যা করা হয়। আমি বলি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড আগেই শুরু হয়, ১৪ ডিসেম্বর সেই সব হত্যালীলার চূড়ান্ত পরিণতি। এ গেল একদিক। আরেকটি কথা হলো এই যে, আপনি বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। নিয়াজী নিয়োজিত ছিলেন রণাঙ্গনের দেখাশোনায়।

উ: না, তিনি ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক।

প্র: আপনি ছিলেন বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্বে। যেমন, গোলাম আজম ও মাওলানা মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আপনার। তারা আপনার সাথে বৈঠকে মিলিত হতো, আপনার পরামর্শ নিত আর এমন হতে পারে যা হয়ত জানি না, পরামর্শ-অনুযায়ী কাজও করত। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যায় কোনো কিছুই আপনার অবগতির বাইরে হতে পারে না। আপনি কি এসবের সাথে একমত?

উ: কেন?

প্র: কেননা আপনিই তো...

উ: কিছুই না বলতে কি হত্যাকে বোঝায়?

প্র: এ তো সবকিছুরই অন্তর্ভুক্ত, প্রশাসনও?

উ: না, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর অবস্থা বদলে যায়। সামরিক আইন শেষ শক্তি হিসেবে কাজ করতে থাকে। গভর্নর হাউসের কোনো নিজস্ব অবস্থান আর ছিল না। কেননা, গভর্নর হাউসের নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র সচিবালয়, পুলিশ ও রাজাকারের ওপর বজায় ছিল। সেনাবাহিনী, ইপিসিএএফ ছিল সামরিক আইন প্রশাসক ও কোর কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে, এমনকি আমার অধীনে নয়।

প্র: তাহলে ও সবের জন্য দায়ী জেনারেল নিয়াজী?

উ: জেনারেল নিয়াজী আইন-শৃঙ্খলার জন্য দায়ী ছিলেন।

প্র: রেখে আসা ঐতিহ্য বলে...

উঃ সত্যি। আমি আপনাকে বলেছি, জেনারেল সামশের যিনি পিলখানায় সিএএফও-এর দায়িত্বে ছিলেন তিনি আমাকে তার সাথে দেখা করতে বলেন। তিনি জানান, আমাদেরকে জেনারেল নিয়াজীর সাথে দেখা করতে যেতে হবে। জেনারেল নিয়াজীর সাথে সাধারণত আমার কখনও কোনো বৈঠক হয়নি। আমি বললাম, ঠিক আছে আজই আমরা যাব, পরিস্থিতি তো ভালো নয়। পিলখানায় পৌছুতে দেখলাম কিছুটা আঁধার নেমেছে। ওখানে কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ করলাম। আমি তাকে বললাম, আমি কেন তোমার গাড়িতে যাচ্ছি আর এ গাড়িগুলি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? তিনি বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাচ্ছি আর সেজন্যেই গাড়িগুলি এখানে। যাবার পথে তিনি আমাকে বললেন, কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমি জানতে চাইলাম, কেন? তিনি বললেন, কথাটা নিয়াজীকেই তুমি জিজ্ঞেস কর। আমরা নিয়াজীর দপ্তরে যেতে তিনি বললেন, তোমার মত কি? আমি বললাম, স্যার, কাউকে গ্রেপ্তারের সময় এটি নয়। আপনাদেরকে বরং দেখতে হবে কত বেশি লোক আপনার সাথে আছেন।

প্রঃ এ কত তারিখের কথা?

উঃ ৯ ডিসেম্বরের। আত্মসমর্পণের ঠিক আগে ৯ কিংবা ১০ ডিসেম্বরের। আমি বললাম, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা ঠিক হবে না। সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি নিয়াজির ওখান থেকে ফিরে এলাম। ১৬ বা ১৭ ডিসেম্বর সকালে ভারতীয় জেনারেল ও আর ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি বললেন, আপনার আদেশে এই লোকগুলি প্রাণ হারিয়েছে। আমি জবাবে বললাম, কিন্তু আমি আমার আদেশ কার্যকর করতে হলে তো পরিস্থিতি-অনুযায়ী আমাকেই তো সেটি করতে হয়, সেটি কী করে সম্ভব? কাকে আমি সে আদেশ দিয়েছি? আমি একা গিয়ে লোকগুলিকে হত্যা করতে পারি? আমার তো কোনো সৈন্য ছিল না!

প্রঃ ঐ লোকগুলি কারা ছিল?

উঃ ওরা সবাই ছিল বুদ্ধিজীবী...

প্রঃ বাংলাদেশ দখলমুক্ত হওয়ার পর বঙ্গভবন মানে গভর্নর হাউসে কিছু লিখিত দলিল পাওয়া যায়। তাতে যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে তাদের নামের একটা তালিকা পাওয়া যায় যা আপনার হাতের লেখা।

উঃ আমার লেখা নয়। গভর্নর হাউসে তখন অনেক লোক আমার কাছে আসত দেখা করার জন্য। ওরা আমাকে এ-ধরনের তালিকা দিত। আমি কখনও...

প্র: কিন্তু তা দিত কেন? কী কারণে?

উ: ওরা ছিল পাকিস্তানবিরোধী। তাই ওদের ওসব আমি রেখে দিতাম বটে তবে সেগুলির ওপর কোনো অ্যাকশন নিতাম না। আর এইসব তালিকা কোর কমান্ডারকেও দেওয়া হতো। এই লোকগুলি এখানে-সেখানে নানা জায়গায় যাতায়াত করত। তাদের দেওয়া এসব কোনো গোয়েন্দা তথ্য ছিল না কিন্তু ওদের কাজ ছিল সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নেওয়া।

প্র: কিন্তু রাও সাব, আপনি তো নিরপেক্ষ তথ্যমাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে ছিলেন, তাই নয় কি?

উ: কিন্তু... আপনিই বলুন, কোনো ব্যক্তির একার পক্ষে ১৬ ডিসেম্বরের রাতে যাওয়া ও...

প্র: না, না, ঘটনা তো ঘটে ১২, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর রাতে।

উ: না, আমার কোনো ধারণা নেই। তবে আমি আপনাদেরকে একজন সম্পর্কে বলব যাঁর কথা জেনারেল নিয়াজীও বলেছেন। আমার মনে পড়ে তিনি হয়তো ছিলেন বিবিসি প্রতিনিধি। ঘটনা এই যে, ৭ ডিসেম্বর বিবিসি এই বলে খবর প্রচার করে যে, জেনারেল নিয়াজী পালিয়ে গেছেন আর রাও ফরমান তার জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন আসলে এটি সম্ভব ছিল না কেননা, আমি ছিলাম জুনিয়র পদে। কোর হেডকোয়ার্টার থেকে আমার কাছে টেলিফোন আসে। তাতে বলা হয়, কে এই লোকটা দেখ, তাকে বলো এরকম খবর তার দেওয়া উচিৎ হয়নি বা প্রকাশ করবে না। সে অনুযায়ী আমি বিবিসি সংবাদদাতাকে টেলিফোন করি। সম্ভবত ঐ সংবাদদাতার টেলিফোনের সাথে সিস্টেম রেকর্ডার ছিল। তবে সে যা-ই হোক, লোকে জানত না যে, আমি সেনাবাহিনীর লোক হলেও সেখানে দুটি আলাদা সত্ত্বার অস্তিত্ব রয়েছে। সেনাবাহিনীর আদেশ কার্যকর করার ব্যাপারে আমার আদৌ কোনো গরজ ছিল না। কেননা আমি সেনাবাহিনীর অধীনে ছিলাম না। আমি সেই সংবাদদাতাকে তাই বললাম যে, 'কে ভাই দেখিয়ে, সেনাবাহিনী হয়তো আপনার বিরুদ্ধে খুব কড়া অ্যাকশন নিতে পারে, আমি আপনাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যেই বলছি, আপনি এ ধরনের খবর আর বাইরে পাঠাবেন না।' আর এটাই আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহার করেছে সেটা আন্তর্জাতিক তথ্যমাধ্যমগুলি। এসব মাধ্যমে আরও বলা হয়, রাও ফরমান আলী শুধু কাজটাই করেন নি, তাঁকে শাসিয়েছেনও। আমি তাঁকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, না, আসলে যা ঘটেছিল তা হলো সরকারের একজন সাবেক সচিব। তিনি ছিলেন গভর্নরের সচিব, হুসেন বা এই নামের কেউ। তিনি আমার সাথে দেখা করে জানান,

অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন। আমি বললাম, কে গ্রেপ্তার হয়েছে বলুন? তিনি জানালেন। লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে অথচ আমি সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। এখন আপনাদেরকে আমি জানাই যে, তখন সেনাবাহিনীর নিজস্ব একটা জেল ছিল, যা আমাদের কারও জানা ছিল না। তারা লোকজন ধরে সেই জেলে ভরে রাখছিল। আমরা গভর্নর হাউজের কেউ এ ব্যাপারে জানতাম না। আমরা জানতাম যে তাদের একটা জেল আছে বটে কিন্তু সে জেল সেনাবাহিনীর লোকেরা যে সব অপরাধ করে সেসবের জন্য। ওটা ছিল তাদের কথামতো তাদের জেলখানা। বুদ্ধিজীবীদেরই হয়ে আমার পক্ষে তাদের খোঁজখবর নেবার ও তাদের সাথে আমি দেখা করতে আমার পক্ষে কেমন করে যাওয়া সম্ভব?

প্র: জেনারেল নিয়াজী এ দাবিও করেছেন যে– আর আপনি তো জানেনই যে, আপনার বই আগে আর পরে বই বেরিয়েছে নিয়াজীর। এখন তিনি তো পুরোপুরি দোষ আপনার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছেন। কাজেই উপায় বলতে তো হাতে থাকে আপনার আরেকটা বই লেখা, লিখে ব্যাখ্যা করা–

উ: না, তবে আমার মনে হয় আমি যখন ভারতে ছিলাম ঘটনা তখন যা ঘটে তা হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনী আমার বিরুদ্ধে কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমার বিচার করার ব্যাপারে বেশ একপায়ে খাড়াই ছিল। তারা ইপিআর থেকে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার বশির। তাদের সবাইকে এই বলে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে; যারা জেনারেল ফরমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে সবার আগে পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে দেওয়া হবে। তাদেরকে কৃতিত্ব দিতেই হয় এজন্যে যে, তাদের একজন এতে সাড়া দিয়ে জানায় যে, ফরমান খারাপ কিছুই করেননি। আমিও এ মুহূর্তে দাবি করে বলছি আমি কোনো কিছু খারাপ কাজ করিনি। আমি সবার আগে পাকিস্তানকে হেফাজত করার চেষ্টা করেছি আর সেটা করেছি কাউকে হত্যা না করে। কেউ যদি দাবি করতে পারে আমি একজনকেও হত্যা করেছি আপনারা আমাকে ফাঁসি-কাঠে লটকে দিতে পারেন। আমি এ প্রস্তাব দিয়েছিলাম জব্বলপুরে এমআইআরসিপির কাছে। বলেছিলাম, আমাকে একবার মেহেরবাণী করে ঢাকায় নিয়ে চলুন ও ৫ মিনিটের জন্য হলেও মুজিবের সাথে দেখা করতে দিন। তারপর যদি তিনি আমাকে আলিঙ্গন না করেন তাহলে আপনারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে-তাই করতে পারেন।

প্র: এই এমআইআরসিপি কী?

উ: আসলে ওটা বলতে আন্তর্জাতিক রেডক্রস বোঝায়।

প্র: তাই নাকি? বেশ।

উ: জব্বলপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডেপুটি ডিডিএআই, লেসলি আমার সাক্ষাৎকার নেন আর সেই সময় আমাকে বলেন, জেনারেল আপনার বিরুদ্ধে ২০০ লোক হত্যার অভিযোগ রয়েছে...

প্র: আপনি এসব জিজ্ঞাসাবাদের কথা আপনার বইতেই বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আমার তো মনে হয় ঐখানেই যেন এখন জেনারেল নিয়াজী বসে রয়েছেন। নিয়াজীকেও কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?

উ: বেশ তো তাহলে ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আমি কি ঐসব লোকের গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করি নি? আর তা যদি আমি করে থাকি আমার তাদের হত্যা করার কথা নয়। তবে সে যা-ই হোক কি আমার ছিল? শুধু ছিল পুলিশ।

প্র: আপনি তো জেনারেল হিসেবে আদেশ দিতেই পারেন?

উ: কিন্তু কাকে?

প্র: না, অভিযোগ আছে এ কাজ করেছে আল-বদর ও আল-শামস!

উ: না, ওদের উপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

প্র: রাজাকারদের ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না!

উ: এ নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হতো সামরিক আইন সদর দপ্তর থেকে।

প্র: সামরিক আইন সদরদপ্তর ওদের কাজে লাগত?

উ: আর ওদের কাজে লাগাতে হলে সেটা করতেন জেনারেল নিয়াজী। আওয়ামী লীগের লোকজনের সাথেই আমার সুসম্পর্ক ছিল। তবে ওরা তখন কোলকাতায় চলে যায়। আমার বেশিরভাগ সময় কাটে যারা তখনও পূর্ব পাকিস্তানে ছিল এমন এক বিপুল সংখ্যক লোকের সাথে সম্পর্ক রক্ষায়। আমার অনুমান ওদের সংখ্যা ছিল ৪২/৪৩ জনের মতো। ওরা ছিল এমএনএ। আমি চেষ্টা করছিলাম যোগাযোগ করতে...।

প্র: ওখানে তো তখন নতুন এমএনএ নির্বাচিত হয়েছে। কেননা, আপনারা নির্বাচন তো করেছিলেন।

উ: সেটা অনেক পরের কথা। অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। আমার তো মনে হয় আমরা এ কথায় পরে আসতে পারি, তার আগে নিশ্চয়ই বিষয়টা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়? অবশ্য আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে। আপনারা আমার কথায় নির্ভর করতে পারেন।

প্র: না, না, ঠিক আছে। দেখুন, এরকম কথা তো উঠতেই পারে, উঠেছেও। কিন্তু আমি তো আর সেখানে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে বসিনি। আমি আবারও বলি, ঐ নয় মাসে... আপনি কি জানতেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী

তখন বহু লোককে হত্যা করেছে, বহু নারী তাদের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে, ওরা শিশুহত্যা করেছে? এটা করা হচ্ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জ্ঞাতসারে, পরিকল্পিতভাবে?

উঃ জ্বি হ্যাঁ। ঐ সময় আমি চেষ্টা করেছিলাম ব্যবস্থা নিতে। আমি সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান জেনারেল আবদুল হামিদকে একথা বলেছিলাম ও কিছু কিছু লোকের নামও তাঁকে বলেছিলাম যাদেরকে সেনাবাহিনী হত্যা করে তাদেরকে বন্দি করার পর। এসব নামের মধ্যে সাইদুজ্জামান...।

প্রঃ সেনাবাহিনীর লোকের দুই-একজনকে ধরেনি বা হত্যা করে নি, সেকথা আমি বলছি না। আমি বলতে চাই এভাবে বহু লোক বন্দি হয়েছে, বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে... এদের সংখ্যা অনেক বেশি, গণহত্যা।

উঃ ঠিক নয়। গণহত্যা হয়েছে আমি সেকথা মেনে নিচ্ছি না। সামরিক পরিভাষায় গণহত্যার ব্যাখ্যা রয়েছে। গণহত্যা হয় তখনই যখন আপনি কোনো রকম কারণ ছাড়াই মানুষ মারতে শুরু করেন।

প্রঃ তার মানে তাহলে কোনো যুদ্ধই হচ্ছিল না বসনিয়া কিংবা হারজেগোভিনায়।

উঃ ওটা অবশ্য গণহত্যা।

প্রঃ জাতিগোষ্ঠীগত মানুষকে এভাবে মেরে সাফ করা 'নাসল বদলা দেনা'র মতোই খারাপ কাজ।

উঃ উওতো খায়র হোগা। আমি মনে করি না তিনি সেটি করেছিলেন। আমার অন্তত জানা নেই। আমার ধারণা তিনি তা করেননি। তিনি শুধুই হয়তো আলগা জবানে কথা বলছিলেন। তবে আমি মনে করি না ওটা ঘটেছিল, যেখানে সম্ভব...। সামরিক আইন হলো বেসামরিক আইন ভেঙে পড়ার চূড়ান্ত পরিণতি। আর সে রকম অবস্থাতেই সামরিক আইন আসে। আর সামরিক আইন ব্যর্থ হলে সামরিক কার্যব্যবস্থা তার জায়গা নেয়। সামরিক আইন ব্যর্থ হবার পর অর্থাৎ আমি বলতে চাই, আমরা– আমি ও গভর্নর ব্যর্থ হবার পর সেনাবাহিনী আমাদের জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে কিন্তু এই সেনাশাসনই পূর্ব পাকিস্তান নয়মাস অস্তিত্বশীল ছিল, গভর্নরের শাসন নয়।

প্রঃ তার মানে বলতে চান বসনিয়া-হারজেগোভিনায় যা ঘটেছে তা গণহত্যা, তাহলে আপনাদের সামরিক ব্যবস্থা কেন গণহত্যা হবে না?

উঃ আমি দাবি করি, ওটা গণহত্যা ছিল না। ওতে বেশি প্রাণহানি ঘটেনি।

প্রঃ তাহলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার তামাম তথ্যমাধ্যম যা বলেছে তা ভুল?

উঃ না, না, সেকথা সত্যি নয় যে আমরা যারা ঢাকায় ছিলাম তারা বলেছে

ঘটনা গণহত্যা ছিল না। গণহত্যা চালানো হয় একটা মতলব নিয়ে, মতলব নিয়ে মানুষ মারা হয়। আর আমাদের কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলব আমরা সেনাবাহিনী থেকে আলাদা ছিলাম।

প্র: আপনারা উভয়েই ছিলেন জেনারেল, তাহলে কেন...?

উ: না, না, অনেক জেনারেলই তো ছিল।

প্র: না, আপনারা সেনাবাহিনী থেকে আলাদা কেউ ছিলেন না তবে আমি জানতে চাই, আপনার কি জানা ছিল না যে, পূর্বপাকিস্তানে তখন ঐ সব ঘটনা ঘটে চলেছে?

উ: আপনারা যে মাত্রায় বলছেন সেই মাত্রায় নয়।

প্র: আচ্ছা সে কথা যাক।

উ: ওটা হলো আমার অভিমত।

প্র: আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র এসব ঘটনার খবর প্রচার করেছিল?

উ: জ্বি! ইয়াহিয়া ওদের বের করে দেন বলেই আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা, রেডিও-টিভি চটে যায়। ইয়াহিয়ার কাজটি ঠিক হয় নি! ওরা ওদের মতো ছিল।

প্র: আসলে ওদেরকে বের করে দেওয়া তো আর ঠিক হয়নি ওরা কার্যত ফিরে আসে ও বিস্তারিত আলোকচিত্রসহকারে তখনকার অবস্থার খবর পরিবেশনও করে। ফটোগ্রাফ ও আরও সবকিছু উপকরণসহকারেই ওরা ঐসব খবর দেয়। আমি বলতে চাই, এখন তো আপনার কাছে তখনকার নেপথ্যে থাকা ব্যাপারগুলি পরিষ্কার। এখন যদি অনেকে আপনার এই দাবি মেনে নিতে তৈরিও থাকে যে, এমনকি হত্যাকাণ্ডের শতকরা একশতাংশের জন্যেও আপনি বা আপনারা দায়ী নন.. এই দাবি আপনি করেছেন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তবু কেউ-না-কেউ তো এটা করেছে সে বিষয়ে তো আপনার এখন সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই?

উ: তবে কোন পরিস্থিতিতে যেই সেনাবাহিনী আইনের সীমা অতিক্রম করে থাকুক সে তার জন্য দায়ী তবে গোটা অবস্থাটাও বিবেচনায় নেওয়া দরকার... এ যুক্তি মেনে নিতে হবে।

প্র: জেনারেল নিয়াজী যদি তখন যুদ্ধে লড়েই থাকেন আর সেটি যদি যুদ্ধাবস্থা হয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধে যে এসব ঘটনা ঘটে সেটা কারও বোধগম্য হবে না তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে কথা হলো এই যে, আপনি পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন, নিয়াজীর কথায় তিনি তখন অবস্থান করছিলেন দুশমনের দেশে। স্পষ্টতই তিনি যুদ্ধে লড়ছিলেন। আমি বলতে চাই যে, যদি তর্কের খাতিরে হলেও ওটা মেনে নেওয়া হয়, আমি আর যা-ই হোক বিশ্বাস করতে পারছি না

যে, ঐ সময়কার একজন সক্রিয় জেনারেল হিসেবে আপনি এত ব্যাপক আকারের হত্যাকাণ্ডের কথা জানতেন না।

উ: আমি ২০ লাখ লোক নিহত হওয়ার হিসাব মেনে নিতে পারি না।

প্র: না, আমরা ওটা নিয়ে তো তর্কাতর্কিতে যেতে চাচ্ছি না।

উ: সংখ্যা ৪০/৫০ হাজারের মতো হবে।

প্র: তাহলে আপনার বিবেচনায় এই ৪০/৫০ হাজার বিরাট সংখ্যা নয়?

উ: না, এটা...।

প্র: সেনাবাহিনী নিরীহ, নির্দোষ লোকদের হত্যা করেছে।

উ: জ্বি হ্যাঁ, সংখ্যাটি বিরাট। আমি স্বীকার করছি সংখ্যাটি সত্যিই বিরাট। তবে একই সাথে বলব ৭ থেকে ২৮ তারিখের ভেতরে কি সব ঘটেছে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে। এক বিপুল সংখ্যক লোক তখন প্রাণ হারায়। ওদের শনাক্ত করা যায়। আমাদের ইপিআর-এর সব পশ্চিম পাকিস্তানি এনসিওকে হত্যা করা হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল জেসিওকে হত্যা করা হয়। পাবনায় ঘেরাও করে রাখা সকল সৈন্যকে জবাই করা হয়।

প্র: নিয়াজী এই বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি ২০০০ অফিসার হত্যার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী, বলবেন?

উ: সেনাবাহিনীর অফিসার নয়।

প্র: সেনাবাহিনীর অফিসার ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এ সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় কোনো খবর প্রকাশিত হলো না কেন? অন্তত পাকিস্তানি ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় সে খবর তো ছাপা হওয়া উচিৎ ছিল?

উ: ২০০০?

প্র: জ্বি, দুই-তিন হাজার বা এরকম। এটা ঘটে ৭ থেকে ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী সকল সেনাবাহিনী অফিসারদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ ও হত্যা করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উ: যে সেনা অফিসারদের হত্যা করা হয় তাদের খবর আমি জানি। সেটাই আমি আপনাদেরকে বলছি। ঢাকা অঞ্চলে সেনাবাহিনীর দুজন অফিসারকে হত্যা করা হয়। এদের একজন হলো ক্যাডেট কলেজের কম্যান্ডান্ট ও সেন্টার কম্যান্ডান্ট জানজুয়া। জানজুয়াকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দুই অফিসারের একজনের স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন, তার গর্ভস্থ সন্তান বের করে ফেলা হয়। এরকম কিছু ঘটনা আছে। বগুড়ায় একটা ছোট সামরিক অস্ত্র-গুদাম ছিল। সেটির দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন একজন মেজর।

তাকে হত্যা করা হয়। হত্যা করার পর তার মাথা নিয়ে ওরা ফুটবল খেলে আর তার স্ত্রীকে সে দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

প্র: কখন?

উ: এই সময়ে। ৭ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে। এক বিরাট সংখ্যক বিহারিকে হত্যা করা হয়।

প্র: সৈয়দপুরে।

উ: আমি বলছি, কেয়া নাম হ্যায়... কি জায়গাটার নাম, মনে আসছে না। তবে এক বিপুলসংখ্যক বিহারিকে হত্যা করা হয়। শহরের একটি এলাকায় ৫০০ নারী ও শিশুর লাশ পাওয়া যায়। তাদের পরিবারের পুরুষ লোকদের হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। একজন পশ্চিম পাকিস্তানি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও আইবি প্রধানের জামাতাকে টাঙ্গাইলে টানাহ্যাঁচড়া করে মারা হয় ও যশোর এলাকায় দুজন অফিসারকে হত্যা করা হয়।

প্র: তাহলে কি একে বলা যাবে... এ ছিল একধরনের প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড?

উ: না, তা নয়। এ ঘটনা ঘটে ৭ ও ২৩ মার্চের মধ্যে যখন ওরা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তার আগে কিছুই ঘটেনি।

প্র: তাহলে ঐ ঘটনা কেন পাকিস্তানি সংবাদপত্রে ছাপা হলো না? পূর্ব পাকিস্তানি সংবাদপত্রেও কেন ছাপা হলো না? তখন আমরা তো ঢাকাতেই ছিলাম। আমরা একাগ্র মনোযোগ নিয়ে তখন পূর্ব পাকিস্তান সব জায়গার খবরের কাগজই পড়তাম।

উ: কিন্তু ভাসানী তো চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের রেলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছিল... এ-কথা কি সত্যি নয়?

প্র: ২৫ মার্চের পরে?

উ: না, ২৫ মার্চের আগে।

প্র: না, তারা বেশ আগে নিহত হয়েছিল। তা সে যা-ই হোক, এসব পরিস্থিতির জন্য আপনার কি কোনো অনুশোচনা জাগে?

উ: জাগে, সেটা এমনকি এখানেও। একটিমাত্র দিনের ভেতর আমার সাথে তিন ব্যক্তি বা দলের সাথে ঐ সময় দেখা হয়। একজন হলেন কুমিল্লায় তখনকার ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী, বিহারি মহিলাদের এক প্রতিনিধিদল ও পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের একটি প্রতিনিধিদল। আমি তখন অবস্থা দেখে কাঁদছিলাম কেননা, আমি তো মনে-প্রাণে একজন পাকিস্তানি! পশ্চিম পাকিস্তানি

বা পূর্ব পাকিস্তানি আমার কাছে তো সবাই সমান!

প্র: গোটা ঐ সময়টার মানে আপনার নিজের কার্যকলাপ, সেনাবাহিনীর নেওয়া ব্যবস্থা... এগুলির জন্য কোনো অনভূতি....?

উ: অত্যন্ত বেদনাদায়ক! এরকমটা ঘটা উচিত ছিল না।

প্র: আপনি কি এজন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুশোচনা বোধ করেন?

উ: আমি যা করতে পারতাম তা করতে পারিনি বলে...

প্র: শুধু সেসব কাজই করেছেন যা আপনার করা উচিত ছিল না, তাই নয় কি?

উ: না, আমি যা-ই করেছি সেটা করেছি আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্যে ও বিবেকের তাড়নায়। আমার ধারণা, আমার তখনকার কাজ নিয়ে আমার কোনো অনুশোচনা নেই। তবে আমার এমন একটা অনুভূতি আছে যে, তখন ইস্তফা দিতে পারলেই বোধহয় ভালো ছিল। আপনারা জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবেন যে আমি সেটা চাইলেও তিনি আমাকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন যে, তোমার এ জন্য কোর্ট মার্শাল হতে পারে।

প্র: তা বাংলাদেশের মানুষের জন্য আপনার কোনো বার্তা আছে কি?

উ: দেখুন, আমি পাকিস্তানি। আমি এখনও মনে করি, পাকিস্তানের সৃষ্টি যদি ঠিক হয়ে থাকে, পাকিস্তানকে হেফাজত করতে চাওয়াও বেঠিক হতে পারে না। যদি পাকিস্তানের সৃষ্টি না হতো, কখনও বাংলাদেশের অভ্যুদয় হতো না।

প্র: তার (জেনারেল নিয়াজীর) বইতে তিনি যা লিখেছেন তার বক্তব্য হলো আপনিই নিয়াজীর পতনের জন্য দায়ী। মানে আমি বলতে চাই, তিনি আত্মসমর্পণ করতে চাননি। কিন্তু আপনি সকল কলকাঠি ঘুরিয়েছেন।

উ: আচ্ছা! তাহলে রুশদের নিয়ে বকওয়াজ! কিন্তু তা কি সম্ভব? তাহলে সেটা হবে ইতিহাসের প্রথম ঘটনা যার আওতায় একজন বেসামরিক লোক একজন জেনারেলকে সারেন্ডার করিয়েছে।

প্র: তাহলে আত্মসমর্পণের দলিলটির খসড়া আপনি লিখলেন কেন?

উ: আমি লিখিনি।

প্র: আপনি তো বার্তা পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘে, তাই না?

উ: ওটার খসড়া তৈরি করেছিলেন ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান সচিব সৈয়দ মুজাফফর হুসেন ও গভর্নর। মুজাফফর এটির খসড়া লিখেছিলেন আর আমি ও মুজাফফর হুসেন দুজনে একত্রে সেটি নিয়ে যাই জেনারেল নিয়াজীর কাছে। তাকে আমরা বলি যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই মর্মে

বার্তা পাঠিয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে আপনারা আপনাদের বিবেচনামতো ব্যবস্থা নিতে পারেন। এর আগে জেনারেল নিয়াজী পশ্চিম পাকিস্তানে দু'দুটি সঙ্কেত বা বার্তা পাঠিয়েছিলেন তিনি কি তার বরাত দিয়েছেন? সে বার্তায় তিনি বলেছিলেন, আমি লড়াই চালিয়ে যেতে পারি এখনও।

প্র: আমার ধারণা এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে জেনারেল গুল হাসানের বইতে।

উ: তিনি বলতেই পারেন যে, তিনি আরও দুদিন বা আরও কয়েকটা দিনের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। এখন যদি প্রমাণিত হয় যে আপনি মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন তাহলে আমাকে আর নন্দঘোষ বানানো কেন? আমি বরং চেষ্টা করছিলাম যাতে অস্ত্রবিরতি হয় আত্মসমর্পণ নয়। অস্ত্রবিরতি আত্মসমর্পণের চেয়ে ঢের ভালো। কাশ্মীরে ভারতীয়রা অস্ত্রবিরতি করেছে আর ওরা আজও সেখানে আছে। আমরা তো একটা অস্ত্রবিরতি করতে পারতাম।

প্র: ঠিক ব্যাপারটা ওরকম নয় কারণ ভূট্টো জাতিসংঘে ঐ সময়ে যখন যান তখন অস্ত্রবিরতির চেষ্টা করেছিলেন।

উ: না, তিনি তা করেননি। বরং তিনি সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেছিলেন। অন্যথায় একটা অস্ত্রবিরতি সম্ভব ছিল, আমরা সবাই একসাথে বসে আলোচনা করে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সরকার গঠনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতাম। তাই আমার মতে অস্ত্রবিরতি সম্ভব হলে আর আত্মসমর্পণের প্রশ্নই উঠত না। অবমাননাকর অবস্থা হতো না, যা কিছু ঘটেছে তা ঘটত না। পূর্ব ও পশ্চিম একসাথে বসতে পারত আর তারপর একটা সমাধানও হয়তো পাওয়া যেত। তবে ভারতীয় বাহিনী ঢাকায়, পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণের মেজাজমর্জি পাল্টে যায়, অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে যদিও ঠিক জানি না তা কেন। আপনাদের মনে থাকতেও পারে কেননা বিষয়টির চর্চা করছেন এখন আপনারা, আবার না-ও পারে যে, এরকম একটা অনুভূতি প্রভাব ফেলে যে, হয়তো পাকিস্তানি বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে ভারতীয় বাহিনী দিয়ে।

প্র: না, না, তা নয়! বরং আমরা খুশি ছিলাম এ কারণে যে ওরা আমাদেরকে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে লড়তে সাহায্য করেছেন। কেননা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে চলেছিল তখন। আমরা ঐ সময় ঢাকায় ছিলাম। ঐ সময় ঐ সব ঘটনা ঘটছিল আর সে কারণেই অনুভূতি ছিল ভিন্নধরনের। আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন। ছিলেন ক্ষমতার আসনে।

আপনাদের অনুভূতি আমাদের সাথে এক হবার কথা নয়। আমরা তা বুঝি। তবে কথা হলো, ইদানীং পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় একটা বিতর্ক চলছে। কেউ একজন লিখেছেন যে, বাংলাদেশে যা ঘটানো হয়েছে সেসবের জন্য পাকিস্তান সরকারের উচিত পাকিস্তান সরকারের ক্ষমা চাওয়া। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী, বলবেন?

উ: আমার মতে ব্যাপারটা পারস্পরিক হওয়া উচিত।

প্র: কেন তা হওয়া উচিত?

উ: আমার ধারণা, উভয় তরফই ভুল করেছে!

প্র: তার মানে আপনার কথার ব্যাখ্যা হলো উভয় তরফই ভুল করেছে?

উ: উভয় পক্ষই। পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তার তিনটি পর্যায় রয়েছে : এক. পূর্ব পাকিস্তানকে নিজের কলোনি মনে করা পশ্চিম পাকিস্তানের একেবারেই ঠিক হয়নি; পূর্বপাকিস্তানিদের ক্ষমতা না দেওয়া বা ক্ষমতায় অংশীদার না করা ভুল হয়েছে। দুই. পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয় তা ছিল মাত্রাছাড়া; আর তিন. পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে ভুল করেছে।

প্র: তা হলে কী করতে হবে আর কে করবে প্রথমে সেটা?

উ: প্রথমে আমাদের স্থির করতে হবে, আমাদের পাকিস্তানের মানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কে আমাদের ধারণা পুরানো দিনগুলিতে কী ছিল।

প্র: এটা হবার নয়। আমার মনে হয় না যে সেটা এখন আর সম্ভব। সে-যুগ হয়েছে বাসি। এখন আপনি আর সেই পুরানো ধারণা নিয়ে বসে থাকতে পারেন না।

উ: আমি আসলে বলতে চাই, আমরা এখনও অভিন্ন বিপদেই আছি যে বিপদ, যে আশঙ্কা পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ছিল। যদি আমাদের সে উপলব্ধি থাকে তাহলে এক না হতে পারলেও আমাদের একে অন্যের আরও কাছাকাছি আসা উচিত। এক রাষ্ট্র আমরা হয়তো হতে পারব না। আমার মতে জনাব সোহরাওয়ার্দী হয়তো বা এ ব্যাপারে সঠিক চিন্তা-ভাবনার অধিকারী ছিলেন। তবে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোটি নেই। যদি আপনাদের এমন কোনো উপলব্ধি থেকে থাকে যে, হিন্দুরা ভারতে আধিপত্যশীল। আমাদেরকে ভারতীয় নয় বরং সে হিন্দু মানসিকতার আধিপত্যে পড়তে হবে, ওরা আমাদেরকে দেখবে অচ্ছুত, ম্লেচ্ছ হিসেবে যেমনটি তারা আমাদের দেখে এসেছে। অতীতেও তাহলে তেমন এক প্রেক্ষাপটে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার...

এমন একটি মনোভাব বা অনুভূতি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। আর সেটায় যদি আমাদের পারস্পরিক স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে আমাদের উভয় তরফের উচিত হবে এ বিষয়ে একমত হওয়া যে আমরা নিভৃতে একপক্ষ বলব, আমাদের মাফ করে দিন, অন্যপক্ষ বলবে আমরাও দুঃখিত। কেননা, আমরা যা করেছি তার জন্য কোনো পক্ষকে একতরফাভাবে অপরাধের জন্য সাফ কবুল করতে না বলে বরং এটায় একটা রাজনৈতিক ভাষা দেবার দরকার রয়ে গেছে। তবে পষ্টাপষ্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমার প্রার্থনার আনুষ্ঠানিকতা বা এ ধরনের কিছু বলা পশ্চিম পাকিস্তানের সামর্থ্যে না-ও কুলোতে পারে। যেমন, আমি বলতে পারি, আমি দুঃখিত, মেহেরবানি করে আমাকে মাফ করো, ভাই!

৩২

উল্লিখিত বইগুলিতে জেনারেল গুলাম উমরের নাম পেলাম যিনি ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটির সচিব ছিলেন। তিনি কোনো আত্মজীবনী লেখেননি। ১৯৯৮ সালে করাচি গেলে তার সঙ্গে দেখা করে ১৯৭১ নিয়ে আলাপ করি। তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে আগে যে ইতিহাসতত্ত্বের আলাপ করেছি তার কোনো অমিল নেই। শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে নিজের কৃতকর্ম ঢাকার জন্য অতিরঞ্জন করছেন বা সত্য লুকিয়েছেন যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সত্য যাচাইয়ের জন্য তখন সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে আলাপ করেছি। তখন পাওয়া যাচ্ছে অন্য তথ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করব মেজর জেনারেল (অব) গুলাম উমরের প্রদত্ত ১৯৭১ সম্পর্কিত তথ্যাবলি। তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর আমার মনে হয়েছে, পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের 'পূর্ব পাকিস্তান' ও বাঙালিদের সম্পর্কে কিছু পূর্ব ধারণা আছে যা থেকে তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বদলাতে পারবেন না। এবং এই পূর্ব ধারণাই তাদের সমস্ত রচনার ভিত্তি যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

করাচির খায়াবান শেহারে মেজর জেনারেল গুলাম উমরের বাড়ি। দরজায় একজন নয় দুজন সশস্ত্র শান্ত্রি। উমর সত্তর পেরিয়েছেন কিন্তু এখনও সুস্থ ও সবল, শুধু একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। তার বাড়িটি চমৎকারভাবে সাজানো-গোছানো, লনের একপাশ ফুলে ভরা। উমর জানালেন, এগুলির সব কৃতিত্ব তার পুত্রবধূর।

উমর আমাকে ও মহিউদ্দিন আহমদকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এত

দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এ বিষয়ে আর কাউকে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। এক ধরনের অপরাধবোধ হয়তো কাজ করছে শেষ বয়সে। বারবার বলছিলেন, আমরা আসার আগে তিনি কোরআন পড়ছিলেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করছিলেন। খুব একটা হামদরদি ভাব দেখাচ্ছিলেন। ফরমাল ইন্টারভিউর মাঝে মাঝে টেপ বন্ধ করে ইনফর্মাল আলাপও হচ্ছিল। আমি সেগুলির নোট রেখেছিলাম আলাদা করে।

এখানে প্রথমে তার সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত করছি। এখানে তিনি তার জীবন কাহিনী বিবৃত করেছেন। তারপর ফর্মাল সাক্ষাৎকার।

আগেই উল্লেখ করেছি, উমরের সাক্ষাৎকারের মাঝে মাঝে কিছু নোট নিয়েছিলাম যা সাক্ষাৎকারে উল্লিখিত হয়নি। এখানে কয়েকটি বিষয়ে তার মতামত তুলে ধরছি–

(ক) "ভারত", বললেন উমর, "শুরু থেকেই পাকিস্তান ভাঙার নীতি গ্রহণ করেছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানে সে কাজ শুরু করেছিল।" নিজের অজান্তেই হেসে ফেললাম। জানতে চাইলাম, "ভারতীয় এই এজেন্ডার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এজেন্ডা কি ছিল?" জেনারেল উমর সরাসরি এর উত্তর দিলেন না। বললেন, "আমরা ইনটেগ্রেডেট স্টেট হিসেবে বিকশিত হইনি। হয় আমরা এর অর্থ বুঝিনি অথবা নিজেদের স্বার্থ দেখেছি। নিজেদের স্বার্থ অর্থাৎ ফিউডাল লর্ডদের স্বার্থ। যেমন, দুই অঞ্চলের বৈষম্য থাকার কথা ছিল না; কথা ছিল না সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল বালুচ বিভিন্ন নামের রেজিমেন্ট থাকার। বাঙালিদের আমরা হেয় চোখে দেখতাম; নিজেদের বলতাম মার্শাল জাতি কিন্তু পৃথিবীতে মার্শাল জাতি বলে কিছু নেই। নিরাপত্তার মানেও আমরা বুঝিনি। বন্দুক দিয়ে কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়? এই যে আমরা এত টাকা খরচ করছি ডিফেন্সের পিছে তা দিয়ে কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে?"

(খ) ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রসঙ্গে উমর জানালেন, হ্যাঁ, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। নানাজন নানা দাবি করেছিলেন। যেমন, নুরুল আমীন চেয়েছিলেন তিন কোটি টাকা। "নির্বাচনের পর" জানালেন উমর, "আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বললাম, আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। একবার পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আসুন। তিনি মোটামুটি রাজি হলেন। খন্দকার মোশতাক আমাকে জানালেন, মুজিব ভয় পাচ্ছেন পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে। কারণ তাঁর ধারণা তাঁকে সেখানে খুন করা হতে পারে। এটা জেনে আমি তাঁকে বললাম, আমার এক ছেলে

লেফটেন্যান্ট। সে আপনার সঙ্গে থাকবে। এই গ্যারান্টি আমি আপনাকে দিচ্ছি। তারপর দেখা করলাম ভূট্টোর সঙ্গে। বললাম, মুজিব চান ঢাকায় সেশন হোক। ভূট্টো রাজি হলেন।"

আমরা জানি এরপর লারকানায় ইয়াহিয়া-ভূট্টো বৈঠক হয় এবং দৃশ্যপট বদলে যায়। উমরও স্বীকার করেছেন, আগরতলা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন মুজিব প্রাইম মিনিস্টার হবেন কিন্তু তারপর সব বদলে গেল। উমর সে বৈঠকে ছিলেন না। তাকে ছাড়া নাকি সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি শুনেছেন, ইয়াহিয়াকে নাকি ভূট্টো বলেছিলেন, তাকে রিটায়ার করিয়ে দিতে।

উমর, মনে হলো, ভূট্টোর ওপর খানিকটা ক্ষুব্ধ। তিনি জানালেন, ঐ সময় ক্ষমতার শীর্ষে জেনারেল গুল হাসান ও পীরজাদা ছিলেন শক্তিশালী। যারা চেয়েছিলেন ভূট্টো ক্ষমতায় আসুক, তা হলে তারাই হবেন সর্বেসর্বা।

"পিপলস পার্টি ওয়াজনট ইন্টারেস্টেড ইন ইস্ট পাকিস্তান", দৃঢ়ভাবে জানালেন উমর, "ভূট্টো শুধু পাকিস্তান ভাঙতে চায় নি, আর্মিরও সর্বনাশ করতে চেয়েছে।" ভূট্টোর কি কোন ক্যান্ডিটেন্ট ছিল পূর্ব পাকিস্তানে? না। কিন্তু মুজিবের ক্যান্ডিটেট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। আসলে ভূট্টো কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়েই যেতে চায়নি। একটি ঘটনা বলি : একটু থেমে বললেন, উমর, "১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় একটু ঝামেলা হচ্ছিল। জেনারেল ইয়াকুব থেকে এই খবর যখন জানতে পারলাম তখন আমি ছিলাম করাচিতে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও ছিলেন করাচিতে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি ভূট্টোও আছেন সেখানে। ইয়াহিয়া আমাকে বললেন, ইয়াকুবকে খবর পাঠাও– বি ফার্ম বাট জাস্ট। ভূট্টো বাধা দিয়ে বললেন, না আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া উচিত। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মি. ভূট্টোকে অথরিটি দিয়েছেন আমাকে নির্দেশ দেয়ার। প্রেসিডেন্ট কিছু বললেন না।"

(গ) তারপর হঠাৎ তিনি আবার ভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। ভারত তো সবসময় পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছে। ১৯৪৭ সালে মাইগ্রেশন হলেও পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা থেকে গিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের শিশু-কিশোরদের তারা অ্যান্টিপাকিস্তান করে তুলেছিলেন। আমার মনে হলো এই কথাটি যেন কোথায় পড়েছি বা শুনেছি। মনে পড়ল রাও ফরমান আলীও তার বইয়ে সেই একই কথা লিখেছেন, যার মূল কথা হলো বাঙালিরা হিন্দুদের চিন্তায় প্রভাবান্বিত হয়ে পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের

দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, "ইকবালের সঙ্গে তো আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনা চলে না।"

জেনারেল উমর সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে জানালেন, ১৯৭১ সালের মার্চের পর পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছিল তিনি জানতেন না। এ ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ তিনি। অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, "আপনি ছিলেন ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ, নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব, আর আপনি কিছুই জানতেন না।"

"না, কিছুই জানতাম না," জানালেন উমর, "নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল বটে কিন্তু কোনো মিটিং ডাকা হতো না। দেখুন, পূর্ব পাকিস্তানের লোক বহুত পেয়ারে, সাচ্চা মুসলমান। ১৯৭১ সালে কয়েকজন লোক পলিসি ডিকটেট করেছে, সাধারণ মুসলমানরা নয়।"

নিয়াজীর বইয়ের প্রসঙ্গ তুলে আমি জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলাম, "নিয়াজী লিখেছেন, আপনারা ঢাকায় তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন?" "ইটস নট কারেক্ট", উত্তেজিত হয়ে গেল তার গলার স্বর। "নিয়াজী লুট করেছে, সোনা পাচার করেছে তার চরিত্রও খারাপ। হি ওয়ান্টস টু জাস্টিফাই হিমসেলফ। সে ব্যালান্সড পার্সন ছিল না। সে-সময় সিনিয়র জেনারেলরা কেউ পূর্ব পাকিস্তানে যেতে রাজি ছিলেন না। সে জন্য নিয়াজীকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল।"

মেজর জেনারেল গোলাম উমরের সাক্ষাৎকার

সোমবার, ১১ জানুয়ারি, ১৯৯৯, জেনারেল উমরের নিজের কথা

আমার জন্ম মদনগঞ্জে, বাবার কর্মস্থলে। ওটা আমাদের নিজেদের পৈতৃক গ্রাম নয়। আসলে আমাদের বাড়ি ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার এক গ্রামে। আজকের উত্তর প্রদেশ, সেকালের মধ্য প্রদেশ বা ইউনাইটেড প্রভিন্স বা ইউপি। আমার পড়াশোনা প্রধানত আলিগড়ে। আমি সেখান থেকেই অনার্সে উত্তীর্ণ হই। এরপর আমি তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ভাষায় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আরো একটি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করি। এই দুটি ডিগ্রি আমি অর্জন করি সেনাবাহিনীর কমিশন পাবার পর। এই পড়াশোনায় আমার কয়েক বছর কেটে যায়। নিজ প্রয়াস ও যত্নে আমি এসব পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণও হই।

আলীগড়ে ছাত্রাবস্থায় কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে

আমার সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে একটি ঘটনার কথা আমি আপনাদের বলি। তখন ১৯৪০ সাল। লাহোরে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশন নির্ধারিত হয়েছে। ঐ অধিবেশনেই পাকিস্তান প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাব) গৃহীত হয়। একটি বিশেষ ট্রেন যাবে দিল্লি থেকে লাহোরে, মুসলিম নেতাদের নিয়ে। আমি আগেই বলেছি আমি তখন ছাত্র। সেই ট্রেনে আমিও যাই, আলিগড়ের একজন ছাত্র হিসেবে। সেনাবাহিনীতে আমার যোগ দেয়ার বিষয়টিও কৌতূহলোদ্দীপক। আমি তখন ঠিক সোলজার বা সৈনিক কেমন তা দেখিনি। আমাদের পরিবারের কেউ সেনাবাহিনীতে ছিল না। একদিন আমরা দশ-বারোজনের মতো সহপাঠী মিলে গেলাম কায়েদ-ই-আজমের সাথে দেখা করতে। সে সময় তাঁর সফরসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন ঢাকার খাজা হাসান আসকারি। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের এখানে অনেক ছেলেই তো সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে, আমরাও কি যোগ দেব? আপনি আমাদের পরামর্শ দিতে পারেন? প্রবীণ নেতা আমাদের বললেন, 'দেখ, ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জানানো মুসলিম লীগের নীতি নয়। ভারতে ব্রিটিশ সম্রাটের যে রাজপ্রতিনিধি রয়েছেন সেই ভাইসরয়ের পরামর্শদাতা পরিষদে আমাদের যেসব মুসলিম প্রতিনিধি রয়েছে তাদেরকে ঐ পরিষদ থেকে ইস্তফা দেবার জন্য আমরা তাদের বলতে যাচ্ছি, তাদেরকে ঐ সাথে ব্রিটিশ সরকারের দেয়া সকল খেতাব-উপাধিও ছাড়তে হবে। তবে বলতে গেলে ভারতের সেনাবাহিনীতে তেমন মুসলিম নেই, অন্যান্য ভারতীয়রাও সংখ্যায় খুবই কম, হাতে গোনা কিছু জায়গীরদার জাতীয় ভূস্বামীর কিছু ছেলে সেখানে রয়েছে। বিষয়টি অন্যভাবে ভেবে দেখার অবকাশ আছে। সাধারণ মুসলমান ঘরের ছেলেরা কার্যত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নেই।' এখানে বলে রাখি, এই ভদ্রলোকই ঐ সময় ভারতীয় আইনসভায় প্রস্তাব তোলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আরো বেশি সংখ্যায় ভারতীয়দের নিতে হবে। এ ঘটনা ১৯২০-এর। এ আলোকে আমরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেব কি না তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি ক্ষুব্ধস্বরেই বললেন, 'তোমাদেরকে ওরা নেবে বলে মনে হয় না। এরকম জিনিস তো ওদের কেতাবে নেই। ওরা মুসলমানদের নেবে না, সাধারণ কাউকে ওরা নেবে না, ওরা নিলে নেবে ভূস্বামী-জায়গীরদার-সুবিধাভোগীদের সন্তানকে।' তবে তিনি বলেন, পাকিস্তান কায়েম হলে তখন পাকিস্তানের জন্য একটি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে, আর সেনাবাহিনী রাতারাতি একদিনে গড়ে ওঠে না। আর সেরা অভিজ্ঞতা হলো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায় সায় পেয়ে আমরা ১২ বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে ফিরে গেলাম। সেখানে আমাদের

স্বাস্থ্য ও শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা করলেন ড. নুরুদ্দীন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। কড়াকড়িভাবে পুরোপুরি পরীক্ষা শেষে আমাদেরকে আরো একটি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হলো। সে-ও এক মজার অভিজ্ঞতা। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এক সহপাঠী ছিল, নাম নূরে আলম হুসেন খান চৌধুরী। ভূগোলে মাস্টার্স ছিল সে। সে সময় এ বিষয়টিতে গোটা উপমহাদেশ জুড়ে শুধু হিন্দুদেরই একচ্ছত্র এখতিয়ার। যা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনীর রিক্রুটিং টিম এসেছে। রীতিমতো হুলস্থুল ব্যাপার! ছেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের রীতিমতো আকাল। ইংরেজ ছাড়াও আরো অনেকে সেখানে আসন নিয়েছেন। তাঁদেরই একজন আচম্বিতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন আমাদের চৌধুরীর দিকে। তা মি. চৌধুরী, আপনি কি বলতে পারেন আফ্রিকার অবস্থানটা ভূগোলের ঠিক কোথায়? চৌধুরী কান লাল করে জবাব দিল, 'এমন একটা প্রশ্ন আমার শিক্ষার জন্য রীতিমতো অবমাননাকর মনে হচ্ছে, জনাব। পাকচক্রে আমি ভূগোলে মাস্টার্স, আর আমাকে এহেন প্রশ্ন!' আরে না না, কিছু মনে করবেন না মি. চৌধুরী। আলাপ তো একটা কিছু দিয়ে শুরু করতে হয়! তাই আর কি! যা হোক, আমাদের সেদিনকার কথাবার্তার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে চৌধুরী। সেদিন আমাদের গোটা আলোচনার বিষয় ছিল সেনাবাহিনীতে কমিশনের বুনিয়াদ। ঐ জমায়েতে সেদিন বহু লোক জড়ো হয়েছিল। ওরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ–নানা জায়গা থেকে এসেছে, বসে আছে চারধারে। আবার প্রশ্নবাণ শুরু হলো একই ধারায়। আচ্ছা, আপনার কি জানা আছে, আপনার মান্যবর পিতা ভাক্কারের নওয়াব বাহাদুর তাঁর তালুকের অধিকারী হয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে প্রাইভেট সোলজার হিসেবে কাজ করার বদৌলতে? আপনি কি প্রাইভেট সৈনিকের পদ, না ভাইসরয়ের কমিশন গ্রহণ করবেন? সে জবাব দিল, না। আমি এই কলেজের ছাত্র হিসেবেই আপনাদের সাথে কথা বলতে এসেছি। বলাবাহুল্য, আমার নিজের অভিজ্ঞতাও হয় এ রকমই। ১৯৪৭ সালে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যে মনোভাব ছিল তা কার্যত অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। তখনো নিরাপত্তার (ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের) প্রশ্ন, এ ধরনের আরো কিছু প্রশ্ন ছিল। যা হোক, এবার পালা এলো আমার। প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান? আমি বললাম, এখন যুদ্ধ চলছে, এসব রণাঙ্গনে দায়িত্ব পড়েছে রাজার, প্রধানমন্ত্রীর, রাজপ্রতিনিধির। আমিও তাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই, আমার দায়িত্ব পালনের জন্য। আমি সেজন্য তৈরি হয়েই এসেছি, অর্থও চাই। আর যা-ই হোক আমি রুশ পক্ষে যোগ দিতে চাই না। বিশ্বাস করুন, সেদিন আমাদের

সবাইকেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া হয়। কেউ বাদ পড়েনি। সেটা ১৯৩৯-৪০-এর কথা। তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে আমাকে যেতেও হয়েছে। ইতোমধ্যে যুদ্ধ শেষের বছর ঘুরতেই জন্ম হলো পাকিস্তানের। আমরা সেনাবাহিনী ছেড়ে যেতে পারতাম, থাকতেও পারতাম। সে অপশন আমাদের দেয়া হয়েছিল। আমরা থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা লাহোরে রওনা হয়ে গেলাম। আমরা পাকিস্তানে পরবর্তীকালে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করি। তবে আমি মনে করি, ওতে কোনো কাজই হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে এ রকম সংস্থা আছে। তার সাথে আমাদের এ কাউন্সিলের কোনোই সম্পর্ক নেই। দরকার ছিল, এ রকম সংগঠন হবে শাসনতন্ত্রের অঙ্গ, যা আইন দিয়ে হবে। তা ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। কোনো সমন্বয় বা এ ধরনের কিছু ছিল না এ প্রতিষ্ঠানে। এক পর্যায়ে ভূট্টোকে আমরা দেশের নেতৃত্বে নিয়ে আসি। তিনি ক্ষমতায় এসে ঘর সাফ করলেন না। তিনি আমাকে আটক দশা থেকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। তিনি আমার সহযোগিতা চাইতেন। আমার জিজ্ঞাসা ছিল কিসের সহযোগিতা? যাক! এরপর এলো আরেক সামরিক আইন। জেনারেল জিয়া বারংবার আমাকে বললেন তাঁর সাথে যোগ দিতে। আমি না করে দিই। তবে আমি পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ডিফেন্স স্টাডিজের চেয়ারম্যান পদটি গ্রহণ করি। এক. পদটি ছিল অবৈতনিক। দুই. এটি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কেননা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত স্বশাসিত হয়ে থাকে। এটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাই। গবেষণা হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে। এটি গবেষণা কাজ করবে পররাষ্ট্রনীতি ও উদ্ভাবনা ও বিবর্তন সম্পর্কে। ১৯৫০-এ একটি চিন্তানুশীলন ও পরিকল্পনা সেল গঠন করা হয় ব্যবহারিক দেশজ তত্ত্বের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে, গবেষণা ও সমীক্ষামূলক বিশ্লেষণের জন্য। এর নেপথ্যে যে প্রেরণাটি কাজ করে তা হলো, আমরা সাবেক ব্রিটিশ মতবাদ ও সংগঠন পদ্ধতি অনুসরণ করছিলাম। আর তার পর আমরা মার্কিন মডেল অনুসরণ করতে শুরু করি। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা গেল, ব্রিটিশ-মার্কিন কোনো পদ্ধতিই আমাদের পরিস্থিতির উপযোগী নয়। তাই একটা তাগিদ ছিল : পাকিস্তানকে অবশ্যই তার স্বকীয় সামরিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে হবে। ১৯৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে আমাকে ঐ প্রতিষ্ঠানে নেয়া হয়। আমি তখন থেকে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে শুরু করি। উদ্দেশ্য—কী পরিবেশ, কী সম্পদ, কী অবস্থা রয়েছে তা দেখা। আমি আসলে আর যে কারও তুলনায় বেশি করেই দেশের মানুষের প্রতিভা ও সম্ভাবনা যাচাই করি। আমি এরকম কাজে পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি জায়গায়

যাই। এর মধ্যে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের সাতটি জেলাও রয়েছে। আমি সেখানে কী পরিস্থিতি বিরাজ করছে সে বিষয়ে কিছুটা বিশদ সমীক্ষাও করি। আমার তাৎক্ষণিক ও তখনকার কাজ ছিল, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিরক্ষা ও অন্য আরো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু নীতি অনুসন্ধান।

সাক্ষাৎকার

* আপনি তখন কোথায় ছিলেন যখন বোঝা যাচ্ছিল দেশে সামরিক আইন আসছে? আপনি তো ১৯৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে গিয়েছিলেন?

** সামরিক আইন জারি হয় ঐ ফেব্রুয়ারিতে।

* না, অক্টোবরে।

** সঠিক বলেছেন আপনি। তবে তার আগেই লাহোরে সামরিক আইন জারি হয়।

* ঠিক।

** এভাবেই সূচনা! কাজেই আপনারা বুঝতেই পারছেন, তখন দেশে সামরিক আইন নেই যেমন বলতে পারছেন না, আবার সেটা আসছে তাও বলতে পারছেন না–এমন একটা অবস্থা। তবে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হবার দিকেই মোড় দিচ্ছিল। ১৯৫২-তেও লাহোরে সামরিক আইন জারি করা হয়।

* অবস্থার অবনতির দিকে যাচ্ছিল?

** অবস্থার অবনতি হোক না হোক, সেনাবাহিনীতে কিছু একটা ঘটছিল। আর সেটাই শুরু। তারপর থেকে আমরা একের পর এক সামরিক আইনের পথ ধরে চলতে থাকি। আমাকে স্বাভাবিক কারণে ভয়ানক ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে কোনো না কোনো কারণে শোকর গোজার যে, আমি সামরিক সমস্যাগুলি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি অঞ্চলওয়ারিভাবেই বুঝেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার গতিক সুবিধার নয়। যদি তার উপকূলে দুশমন বাহিনী অবতরণ করে, করাচী থেকে তেমন কী আর করা যাবে? তাই আমি একটি দিকেই আমার মনোনিবেশ কেন্দ্রীভূত করি। আপনারা বোধ হয় জানেন না, দেশের তিনটি স্টাফ কলেজই আমার হাতে গড়া। আর এর ফলে ১৯৬২-তে গড়ে ওঠে অশ্বারোহী রেজিমেন্ট। আর তার মধ্যে আইয়ুব খানের সামরিক আইনের তিন-চার বছর কেটে যায়।

ইতোমধ্যে ওপরওয়ালার কাছ থেকে ডাক আসে। জেনারেল মূসা আমাকে ডেকে পাঠান। আমি হাজির হলে আমাকে চায়ে আপ্যায়িত করে

জানালেন, তোমাকে পূর্ব পাকিস্তানে পোস্টিং দেয়া হলো। এভাবে আমি ঢাকায় বদলি হলাম। আমার ইউনিট হলো সামরিক আইন শাখা। গেলাম সেখানে। জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন ছিলেন আমাদের অফিসার কম্যান্ডিং। আমি সেখানে যোগ দিতে কর্নেল নগোদা বললেন, প্লিজ বসুন। আমি বললাম, স্যার আমাকে তো জিএসও (জেনারেল স্টাফ অফিসার) হিসেবে পাঠানো হয়েছে, সামরিক আইন ইউনিটে আমার তো তেমন বেশি কিছু করার নেই। আমাকে অন্য কোথাও...। তাঁর সদয় সম্মতি মিললো, আমার জায়গায় দেয়া হলো আরেক কর্নেলকে, কর্নেল লিয়াকতকে। আর আমি আমার স্বকীয় কাজে মনোনিবেশ করলাম, যে কাজটা স্বভাবতই নতুন কিছু ছিল না। তবে আমার আরো গভীরে যাবার সুযোগ হলো। আমি আবিষ্কার করলাম গোটা পূর্ব পাকিস্তানে কোনো গোলন্দাজ রেজিমেন্ট নেই। এমনকি, রেজিমেন্ট কাঠামোর বাইরেও এর কোনো বিকল্প নেই। মাত্র একটা মর্টার ব্যাটালিয়ন ছিল। আর মর্টার ব্যাটারির ১০০০ গজ দূরে হতে হবে পদাতিক বাহিনীর অবস্থান। যা হোক, ট্যাঙ্ক ব্যবহারের প্রশ্নে আমার অভিমত ছিল, জামালপুর এলাকা ট্যাঙ্ক যুদ্ধের উপযোগী। পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে এ বিষয়টি আমার নজরে আসে। কিন্তু ওরা বলল, না এলাকাটি তো নয়ই, গোটা পূর্ব পাকিস্তানই ট্যাঙ্ক লড়াইয়ের উপযুক্ত নয়। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টও ছিল না।

* তাহলে আপনার মতে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষাযোগ্য ছিল না?

** না, তখন প্রতিরক্ষাযোগ্য ছিল না।

* ছিল না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার কোনো প্রস্তুতি ছিল কি?

** বলছি। কোনো জায়গাকে রক্ষা করতে হলে দুটি জিনিসের দরকার। এক. আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে, এলাকাটি অবশিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কি না। তা না হলে এলাকাটি যদি দূরে হয়, তাহলেও দুটি জিনিসের কথা ভাবতে হবে–কতকালের জন্য আপনি দেশের ঐ অংশটি রক্ষা করতে চান। আর সেই মেয়াদের জন্য জায়গাটি রক্ষা করতে হলে তার জন্য সম্পদ-উপকরণ থাকতে হবে। পরিতাপের বিষয়, আমরা সব সময়ই বলে এসেছি পূর্বের প্রতিরক্ষার চাবিকাঠি রয়েছে পশ্চিমে।

* ওটা তাদের কৃতিত্বই বটে।

** একটা ভিত্তিহীন তত্ত্ব! দৃশ্যত এটি কোনো থিওরিই নয়। আমরা বাস্তব একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছি। যুদ্ধে আসে, এটা কোনো আলাদা ধারণা নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করছেন তখন যুদ্ধের সম্ভাবনাটি আমলে না নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করবেন তা হয় না।

পাকিস্তান কি দিল্লি-আগ্রা দখলের পরিকল্পনা করবে, না তার নিজ আঞ্চলিক ভূখণ্ডের সীমানা রক্ষা করবে?

* পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে—এই থিওরির উদ্‌গাতা কে বলতে পারেন? এর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে?

** এ অতিকথার সূচনা ব্রিটিশ অফিসারদের কাছ থেকে। তখন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সব পদের নেতৃত্বে ছিল ব্রিটিশ অফিসাররা। আপনারা জানেন, পাকিস্তান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল মেসারবি। সেকেন্ড ইন্ড কমান্ডও ছিলেন ব্রিটিশ, তাঁর নাম মনে নেই। তৃতীয় জন ছিলেন আইয়ুব খান। তাই এ তত্ত্বের ঘোঁট পাকানো শুরু হয় সেই সময়ে। আপনারা দেখুন, দেশের দুই অংশের মধ্যে ছিল এক হাজার মাইলেরও বেশি ব্যবধান। এ বিষয়টিও সমানভাবে বিবেচিত হওয়া দরকার ছিল। এই এক হাজার মাইল এলাকা যদি আপনার জন্য বৈরী হয়ে ওঠে তাহলে কী হবে? দ্বিতীয়ত, এসব নিয়ে পরিকল্পনা হতে হলে তা কেবল উদ্দেশ্যভিত্তিক নয়, প্রকৃত অবস্থাও বাস্তবতার নিরিখে হওয়া উচিত।

* প্রয়োজনের কথা বলছেন?

** এখন আপনারা যদি বলেন এক হাজার মাইলের ভারতীয় অঞ্চল আমাদের প্রতি বৈরী হবে না, তাহলে তত্ত্বের তর্কাতর্কিই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের কি সে সততা ও সাধুতার সামর্থ্য আছে? যদি না থাকে, কীভাবে তার সে সামর্থ্য গড়ে তোলা যায়? মাঝে দূতিয়ালি করে, রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে, সম্পর্ক রচনা করে, এমন আরো ব্যবস্থা নিয়ে। কিন্তু হয়েছে কি শেষাবধি? আপনারা জানেন, এক সময় আমাদের বিমান ভারতের ওপর দিয়ে চলাচল করতে পারত না, আমাদের সুদূর শ্রীলঙ্কা ঘুরে যেতে হতো। তাই আমি জেনারেল মুফতি ওয়াসিউদ্দিনকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, দয়া করে একটা বৈঠক ডাকুন এ বিষয়ে। ওয়াসিউদ্দিন শুনে ভড়কেই গেলেন, বললেন, আমরা তো কিছু করতে পারব না। আমি বললাম, এটাই তো স্যার আপনার কাজ। তিনি বললেন, না কাজটা তো তোমার। তো ঠিক আছে, ওটা আমার দায়িত্ব। তবে আরো ভালো হয়, তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করো আমি জবাব দেব। তারপর তো প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এলেন। ঢাকায় কথা হলো। তিনি আমার প্রস্তাবে সবুজ সঙ্কেত দিলেন। চিফ অব স্টাফ জেনারেল মূসাও। গোটা ক্যারিয়ার আমার এভাবে কেটেছে।

আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসার পর সিরিয়াস চিন্তা করেছি যদি যুদ্ধ বাধে, আর ভারত যদি আক্রমণ চালায় তাহলে সে কেমন করে আক্রমণ করবে তা

বুঝার চেষ্টা করি। ভারত প্রথমেই বড় আকারের বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করবে না, পরের দিন বড় রকমের আক্রমণ চালাবে। কেননা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হয় বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়নের আলোকে। আমি সে অনুরোধ বার বার জানিয়ে এসেছি। পরে আমি তত্ত্ব গড়তে শুরু করি। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পশ্চিম দেবে না। এটি বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে। কি সেই সামর্থ্য যা আপনি পূর্ব পাকিস্তানকে দিতে চান? পূর্ব পাকিস্তান কি ততক্ষণ টিকে থাকবে যতক্ষণ আপনি পরিকল্পনা করতে থাকবেন? আর ইতোমধ্যে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য একটা কিছু করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কী অ্যাকশন নেয়া হচ্ছে সেটিও বিবেচ্য। আমি দেখতে চাই ভুট্টোর প্রভাব এতখানি বেশি হোক যা পূর্ব পাকিস্তানকেও শেষ করবে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব থাকতে হবে। এটি একটি খুবই বড় মাপের জিজ্ঞাসা, যার জবাব নেই। এর জন্য বিশাল পরিসরে আলোচনার দরকার। তাই স্যার, আপনাদের এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কিন্তু আমি যে ১৯৬২-তে কাজ করছিলাম তার যৌক্তিকতাটি কী? পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ট্যাঙ্ক ছিল না। এর কোনো যুক্তি থাকতে পারে? কর্তাব্যক্তি বললেন, ট্যাঙ্ক চলবে কি পূর্ব পাকিস্তানে? আমি বলেছিলাম, আপনি হেলিকপ্টারে চলুন, আমি বোটে যাব, আমি আপনাকে বেশ কিছু এলাকা দেখাব যেখানে নানান ধরনের ট্যাঙ্ক–অন্তত ছোট আকারের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা যায়। এ রকম এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে, জামালপুর, রংপুর ও আরো এলাকা। কিন্তু হলে হবে কী, একটা গোটা রেজিমেন্ট কিন্তু একটি মাত্র ট্যাঙ্ক নেই! গোলন্দাজ বাহিনীর কথাই ধরুন, পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে মাত্র একটি মাউন্টেড আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন। আর এই মাউন্টেড আর্টিলারি কেবল ১০০০ মাইল দূরে থেকে পদাতিক সেনাদের কাভার দিতে পারে। তাও শুধুমাত্র সম্মুখ রণাঙ্গনে, ভেতরের গভীর এলাকার যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। তাই কর্তারা তখন ফিরে গিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের অর্ডার দেন। আর আমার যদি ঠিক ঠিক মনে থেকে থাকে, তার কম্যান্ডে ছিলেন ওয়াসিউদ্দিন। একটা মহাব্যাধির জন্য ব্যবস্থাটি ছিল যে সিন্ধুতে বিন্দু।

এ সময় আমাকে জানানো হলো, আমার সময় ফুরিয়েছে, এখানে, সময় হয়েছে ইংল্যান্ডের জয়েন্ট স্টাফ কলেজে যাবার। আমি বেশ উতলা হয়ে পড়লাম। আমি এখানে সপরিবারে ছিলাম ছয় মাস। তখনো কিছু সময় হাতে ছিল, মনে করেছিলাম অন্তত আমি দেখে যাই যে রেজিমেন্টটি এসে পৌঁছাল। যা হোক আমি আবার এখানে এসে সেসব অভিজ্ঞতার কথা বলার সুযোগও পেয়েছি। বলেছি, বাংলাদেশের মুসলমান মাগরেবি পাকিস্তানের মুসলমানের

চেয়ে উত্তম, খুবই প্রিয়ভাজন তারা, আমার ধারণা এ রকমই। আর তারা আমার কাছে স্বাগত। ওরা আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি তাদের মাঝে।

এর মধ্যে ট্যাঙ্ক যাচ্ছে। আমার কথায় কিছু কাজ হয়েছে। ইতোমধ্যে জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের পোস্টিং হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। তিনি গেলেন কম্যান্ড নিতে। ইয়াহিয়া এলেন, তাঁর বার্তা সেদিন এসেছিল, তুমি থেকে যাও, পরের কোর্সে যাচ্ছ তুমি। আমি আসি, কেননা পূর্ব পাকিস্তানের তেমন কিছুই আমি জানি না। তিনি এলেন, আমি তাঁকে এখানকার সশস্ত্র বাহিনীর একটা চিত্র দিয়ে বললাম, আমি রাজনীতি সম্পর্কে জানি না। তবে আপনি এখানকার সেনাধিনায়ক, সে হিসেবে আমি আপনাকে বলতে পারি এটুকুই, অনেক প্রশ্নের জবাব আপনার জানার রয়েছে, আপনার জন্য রয়েছে তাই অনেক মাথাব্যথারও কারণ। আমার এখানে তিন-চার বছর থেকে যেতে আপত্তি নেই। সেখানে তো মাত্র আমার থাকতে হচ্ছে ছয় মাস! এভাবে পরে নানা ঘটনার মিছিল চলতে থাকে। আমি আপনাদের আগে বলেছি, আমার পারিবারিক কোনো সামরিক পটভূমি ছিল না। আমার বাপ-দাদারা চাকুরে ছিলেন, আমার নানা লিখেছিলেন *রাবিতুল আলামিন* নামে একটি গ্রন্থ যা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। সেটি ছিল সেকালের অন্যতম বিখ্যাত রচনা। আমারও লেখার অভ্যাস বরাবরের। আমি কিছু নিবন্ধ লিখেছি, খুব একটা আপত্তিকর কিছু নয়, নির্দোষই। এক সময় লেখার প্রবল আগ্রহ ছিল আমার। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। আমাকে সরকারও সেভাবে গড়েনি, কেননা সে দেশটির সৃষ্টিই হয়নি তখনো! আল্লাহর নেহাত মেহেরবানি! আমি তো সেই ভক্তিতে ওযু করে নামাজ-মোনাজাত করতাম, আর সেটি লক্ষ্য করে ফিল্ড মার্শাল আমাকে দেখতে না পেলে, হাল্কা রসিকতা করেই বলতেন, মৌলবি যে কোথায় গেল এলাহি মালুম! এ রকম আরো অনেক কিছু। এরপরে এলো দেশে (পাকিস্তান) সামরিক আইন। এই সামরিক আইন বা শাসন জারির হবার পরে আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি হয়। আর এর ঝাড়া চার বছর পর যখন আমি পূর্ব প্যাকিস্তানে আসি–তখনো সে সামরিক আইন রয়েছে। ওটা তখনো তুলে নেয়া হয়নি। সামরিক আইনের পরিবেশে থেকে আমার মনে এমন একটা ধারণাই দানা বেঁধে ওঠে যে, পাকিস্তানের তো পত্তন হয়েছিল একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৬-এর অবিভক্ত ভারতজোড়া নির্বাচনে মানুষ রায় দিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে। নিখিল উপমহাদেশের সকল মানুষ, এমনকি যেসব অঞ্চল পাকিস্তানে পড়বে না, এমন সব অঞ্চলের মানুষ সবাই একজোটে ভোট দিয়েছিল

পাকিস্তানের পক্ষে। মাদ্রাজ প্রদেশের শতকরা শতজন মুসলমানই ভোট দেয় পাকিস্তানের পক্ষে। ভোট দেয় বোম্বাই, ইউপির মানুষ। আর বাংলার মানুষের সাড়ার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি এক প্রক্রিয়ায় একটি গোটা দেশ পাওয়া। দেশের মানুষ সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে সরে যায় কী করে? সত্যিই আমরা সরে গিয়েছিলাম। আর সেই থেকে শুরু অশুভ সবকিছুর। পাকিস্তান গণতন্ত্র থেকে সরে যেতে থাকে। অবশ্য এ প্রক্রিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বেশি করেই বিশ্বাস করতেন। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে যে দেশ কায়েম হয়েছে সে দেশ সামরিক আইনের বিধানে চলতে পারে না। আমার মতে, তাঁদের সে ধারণা অত্যন্ত সঠিক। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ তেমন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিপ্রবণ ছিল না। এর কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ভূস্বামী সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য। সামরিক আইন তাদের জন্য ছিল সুবিধাজনক। এর আরেকটি নেপথ্য কারণও হতে পারে, দেশের দুই অংশ পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যকার অতীত বিভেদ। আর ভারত সেটি ধরে ফেলতে সময় নেয়নি। সে চাতুর্য ও ধূর্ততা তার ছিল, আমি আপনাদের এ কথা বলছি। এ শুধু আমার বিশ্বাস মাত্র নয়, পূর্ব পাকিস্তানে অনেকেরই এ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা ছিল। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই ভারত নানা ফন্দি-ফিকির শুরু করে দেয় পাকিস্তানকে বরবাদ করতে। এটা করতে তারা তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে : এক. প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা; দুই. আর ঐ বিচ্ছিন্নতা পর্বে চলবে পাকিস্তান জুড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, পূর্ব পাকিস্তানকে যেভাবে হোক ভেঙে দিতে হবে। তিন. দুই পরাশক্তির একটি শক্তিকে এ অঞ্চলে জড়িত করতে হবে। সেটি ষোলোকলায় পূর্ণ হয় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি করার পর। দ্বিতীয় পরাশক্তিকেও আনতে হবে নেপথ্য সমর্থনে; এ কাজে দ্বিতীয় পরাশক্তি হয়তো সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না। কেবল কিছু বিবৃতি দেবে। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ছিল ঠিক এ রকম যা তাদের দেশের নানা লেখা, সূত্র ইত্যাদি থেকে এখন বেরিয়ে আসছে। ২৫ বছরের পরিক্রমায় তারা এসব অবস্থা তৈরি করেছে। ভারত ১৯৬৫-র যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে আপনারা ছয় ঘণ্টার বেশি সে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন না। পেশাদার সৈনিক হিসেবে আমার তাই ধারণা। ছয় ঘণ্টাও নয়। আমার ধারণা : পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের তখন এ রকম একটা ধারণা হয় যে তাদের ভূখণ্ড রক্ষা, হেফাজত করার জন্য কেউ নেই। আর, জনাব, আমার মতে, সেটি এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি যদ্দূর এ বিষয়ে

ভেবে দেখেছি তা হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তান ঐ যেদিন প্রতিরক্ষার দিক থেকে নিজেকে এতিম ভাবতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই আমরা শুধু একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করিনি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে আরো দূরে চলে গেছি। আর সামরিক আইন চলতেই থেকেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনো কোনো পর্যায়েই সামাজিক বিষয়ে পরিপূর্ণ অংশীদার হবার উপলব্ধি পায়নি। আমার বক্তব্য হলো, একাত্তর একদিনে আসেনি, আসলে ওপরে যেসব বিষয় আমি আলোচনা করেছি সেগুলি একত্রে আবাহন করে নিয়ে এসেছে একাত্তরকে। আমি বাষট্টির আগে পূর্ব পাকিস্তানে যাইনি। এখানে পোস্টিং হবার পর নানাভাবে অনেক কিছুই আমার কানে আসে। ওখানকার কিছু কিছু বেসামরিক আমলা আমাকে অনেক খবর দেয়। ওদের অনেকের মনোভাব অবশ্য সুবিধাজনক ছিল না। তবু তাদের মাধ্যমেই ছিটেফোঁটা অনেক কিছুই জানা যেত। ওদের মতে পূর্ব পাকিস্তান বরবাদ হয়ে যাবে। তবে আসল কথা ছিল এই যে, হয়তো আমরা দুটি লোকে কিছু খারাপ কাজ করেছি, এখন দেখা গেল যে দশজন খারাপ লোক আসার পর তাদের আগে আমার নামটাই ফলাও করে বসিয়ে দিয়ে তারা নেপথ্যে চলে গেছে। সামরিক আইন আমলে আরো একটি জিনিস ঘটে। সামরিক আইনের আওতায় যদি দু-চারজনে কিছু করেও থাকে তাতে দেখা গেল রীতিমতো দশজনে মিলে সেটাকে মহামারী করে তুলেছে। আমরা আলাদা হয়ে গেছি কিন্তু আমরা সে ব্যাধিতে ভুগছি আজও। পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র ভারত করেছিল– আর আমরা অঘোর, অচেতন হয়ে ছিলাম, আমাদের সে আচ্ছন্নতা থেকে আমরা আজও বেরিয়ে আসতে পারিনি। আমার এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির পরদিন থেকেই তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল এক ও একক। আর তারা সেজন্য তিনটি অবস্থা বা পর্যায় নির্ধারণ করেছিল। এ কাজ করবে তারা ৫০ বছরে রকমই ঠিক ছিল। প্রস্তুতিও ছিল সে রকম। তাদের বাজি আগেই ফলেছে। আপনারা ১৯৭১-এর পরিস্থিতি খেয়াল করুন। পরিস্থিতি কী ছিল, তা আপনারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। আপনারা সে সময়ে ছিলেন লেলিহান বিভীষিকায়। আমি ঠিক বলিনি?

* ঠিকই বলেছেন আপনি।

** এখন আপনারা আমাকে যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন করুন, চ্যালেঞ্জ জানান, আমি তৈরি। আপনাদের হয়তো আবেগপ্রবণতার কারণে মনে নেই আমি আপনাদেরকে গোড়াতেই সব খুলে বলেছি। আমি জানি আপনারা এসেছেন আর সেজন্য আমি আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। নানা রকম সংশয় ছিল আমার।

* আমরা বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের গোটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সীমিত ধরনের। আর আপনারা দাবি করেছিলেন যে, ব্যবস্থা একটা আছে। পূর্ব পাকিস্তান বলেছিল, সে ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা চলে না। কাজেই এ পরিণামে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মনে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। আর সেটি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। অথচ তাতে পশ্চিম পাকিস্তানে সেদিন কোনো চিত্তবিকার ঘটেনি।

** সত্যিই উচিত ছিল।

* কিন্তু আপনি কি মনে করেন, আমরা বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পেরেছি? আমি বলি, এখানে প্রশ্ন হলো, আপনি বলেছেন, সেই পয়লা দিনটি থেকেই আপনি বা আপনারা জানতেন যে, আমাদের এখানকার প্রতিরক্ষার সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। আর ভারত নাকি পূর্ব পাকিস্তান ভাঙার তেভাগা ব্যবস্থাপত্র তৈরিই রেখেছে। তাহলে ভারতের এহেন চক্রান্তের চাক ভেঙে দেবার ব্যাপার নিশ্চিত করার জন্য পাকিস্তান সরকার কী প্রস্তুতি রেখেছিল?

** আপনি যা বলছেন তার সবকিছুর সাথেই আমি একমত। আমি শুধু বলি, আমাদের দরকার ছিল মাত্র একটি জিনিসের আর সেটাই সার জিনিস। সেটি থাকলে আমি সেদিনও ছিলাম, আর আজও আমি অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় বলতে পারি, আল্লাহ্ বাংলাদেশকে কায়েম রাখুন, যদি সেদিন জাতীয় পর্যায়ে সংহতি থাকত, যদি বিভেদ-বিরোধ না থাকত তাহলে ওদের পাকিস্তান ভাঙার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত শতক কে শতকের কালপরিক্রমায়। ওরা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান কোথাও হামলা করার সাহস করত না। ওরা তো ওদের যা করার তা করবেই কিন্তু আমাদের তরফে বড় কথাটি তো জিইয়ে ছিল, হিমায়িত হয়েছিল সেই মৌলিক প্রশ্ন, একটি সুসংহত জাতি হিসেবে কি সত্যিই আমাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল? আমাকে পরিতাপের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, তা ঘটেনি।

* আপনি বলেছেন, তখনকার নেতৃত্ব দেশ শাসনের প্রক্রিয়াটি ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

** এক্ষেত্রে আমার জবাব একটু কড়া আর তা হলো, হয় তাঁরা ব্যাপারটা সত্যিই বোঝেননি, নইলে তাঁদের নিজ হীনস্বার্থেই তাঁরা তা করেননি।

* তা তাঁদের সেই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থটি কী ছিল?

** সেই কায়েমি স্বার্থেই ধারক ও বাহক ছিল এ অঞ্চলের সামন্ত জমিদার শ্রেণী। আর সরকার গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মির্জা কিংবা সামরিক আইন যা-ই হোক, আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই গোটা ভূস্বামী সামন্ত শ্রেণীটি বরাবরই এদের সমর্থন করেছে। আজকে এদেশের আইন পরিষদে কিছু

সাধারণ লোক থাকলেও সেখানে এখনো সেই সামন্ত ভূস্বামীদেরই আধিপত্য। ফারুক লেঘারির কথাই ধরুন, তাঁর জমিদারিতে তো রীতিমতো প্রাইভেট জেল রয়েছে। আর সেই জেল বা বন্দিখানায় কত লোক যাচ্ছে, তারা আদৌ বেঁচে আছে কি না তার কোনো পাত্তাই মেলে না। হয়তো কোনোদিন তবু নির্বাচন হলে এরাই নির্বাচিত হবে। আর দেশের মানুষের শিক্ষার সচেতনতার কথা বলছেন? ওটা কোথাও নেই! আপনি প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন বলেই বলছি, আমরা এখন এসব প্রশ্নেই বিতর্ক করে চলেছি। দেখুন, মূল বিষয়টি হলো : নিরাপত্তা বলতে এর সর্বাঙ্গীন ধারণায় এ দিয়ে কী বোঝায় তা উপলব্ধি করতে, বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। নিরাপত্তা কেবল ট্যাঙ্ক, কামান আর বিমানের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না।

* আপনি কাকে নিরাপত্তা বলতে চাচ্ছেন?

** দেশের অভ্যন্তরের এমন বহু বিষয় যা নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

* আপনি কি সেগুলিকে অসামরিক বিষয় বলে উল্লেখ করবেন?

** আমি সে কথাই বলতে চাচ্ছি। আমরা অবশ্য আজও এ বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে চাচ্ছি না। দেখুন, আজ এদেশে কী ঘটে চলেছে! হয়তো আমার কথা এ মুহূর্তে আপনাদের বিবেচ্য বিষয় ও এখতিয়ারের জন্য উপযোগী না-ও মনে হতে পারে, তবু আপনাদের কাছে বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক হবে বলে আমি মনে করি। আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে বছরে ১৩০ বিলিয়ন ডলার খরচ করছি। আর দায় পরিশোধ খাতে ব্যয় হচ্ছে সে তুলনায় ১৮৬ বিলিয়ন ডলার। প্রতিরক্ষার ওপর এর রয়েছে সরাসরি প্রভাব। আর এ দুয়ে মিলে যে সম্পদ যায় তারপর আর এমনকি একটি রুপিও থাকে না দেশের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য, আর সে জন্য বাইরে থেকে ধার-কর্জ-ভিক্ষা করতেই হয়। আপনি কি বলবেন এতে নিরাপত্তা আসে? তা সে যা-ই হোক আমরা আবার আমাদের নির্ধারিত আলোচনায় ফিরে আসি। আপনাদের আরো কিছু কি জানার আছে?

* আমার গুটি কয়েক প্রশ্ন রয়েছে, তবু আপনিই বলুন।

** ঐ একই কথা, আপনারাই আমাকে জিজ্ঞেস করুন আর আমি বলে যেতেই থাকি, সেটাই সবচেয়ে ভালো।

* দেখুন যা কিছু ঘটে গেছে সেই একাত্তরের ইতিহাসের বর্ণনায় এখানে-সেখানে নানা কিছু গলদ-ত্রুটি-ফাঁক-অভাব রয়ে গেছে। সেটা খালি চোখেই ধরা পড়ে।

** জানতে চান তো, আমি সামরিক এলাকার লোক তো, তাই আমাকে জিজ্ঞেস যখন করছেনই তখন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করুন, আমার জবাব দিতে সুবিধা হবে। আমি জবাব দেবার মতো অবস্থায় থাকলে অবশ্যই জবাব দেব। আমার জবাব দেবার বা না দেবার ইচ্ছা, অভিরুচি ছাড়াই আমি আপনারা যা জানতে চান বলার চেষ্টা করব। তবে এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যার সাথে আমার নাম জড়িত–যদিও তেমন কোনো ধারণা আমার নেই। আর তেমন কিছুর ওপর আমি কিছু বললে তা নিহায়তই গপ্পো ফাঁদাই হয়ে যাবে। আপনারা একটি সিরিয়াস ধরনের বই লিখছেন, বইটি প্রামাণ্য প্রকৃতির আর সেজন্য আমি কিছু কথা বলছি, মন্তব্য করছি। ঠিক আছে, আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করতেও পারেন, না-ও পারেন। কিন্তু আমি নিজে কোনো বই লেখার কথা ভাবি না। কেন না, বই লেখা হচ্ছে, আর লেখকরা তাঁদের মতো করে রায় দেবার জন্য সত্যকে সেভাবেই বিকৃত করছেন। আমার কথা হলো, যা বাস্তব, যা সত্যি তাকে বিকৃত করা উচিত নয়। বাস্তবে ব্যাখ্যা আর আপনার ব্যাখ্যায় মিল না হতে পারে, আর আমার ব্যাখ্যাও আলাদা হতে পারে। আমার কাছে দু-তিনজন প্রকাশক এসেছিলেন, অনুরোধ করেছিলেন, বই লিখুন। আমি তাঁদেরকে বলেছি, আমি না হয় লিখলাম, কিন্তু আমাদের ঘরানায় তো এখানে এমন রীতি চল রয়েছে যে, একজন (লেখক) হয়তো বললেন যে, জেনারেল উমরের রেল স্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল, আরেকজন বললেন, না, তাঁর রেল স্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল না। কেউ বলল, তিনি আদৌ রেল স্টেশনে যাননি। এখন আপনি এ নিয়ে কোমর বেঁধে তর্কে নামতে পারেন। তুমুল কাণ্ড হবে, পরিশেষে যা দাঁড়াবে তা হলো, আপনি বলবেন, আমি সেখানে তো আদৌ যাইনি কখনো। তার পাল্টা বলা হবে, দুবছর আগে আপনার সাথে ঝগড়া হয়েছিল তখন আপনি একবার স্টেশনে গিয়েছিলেন। আর এতে কিছু লোক বলবে, গেছে তো ভালো কাজই করেছে, কেউ বলবে, কাজটা মোটেও ভালো হয়নি। শেষে উপসংহার হবে, আরে, কী সব বলাবলি হচ্ছে, এ সবের সারবস্তু তো আদৌ কিছুই নেই, ছাড় এসব তর্ক। আসলে ফালতু কিছু নয়, আমরা এ মুহূর্তে ইতিহাসের এক সিরিয়াস বিষয়–এক বিয়োগান্তক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি...।

* আমরা ইয়াহিয়া খান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে জিওসি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল আর আপনিও...

** আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করা হয়নি।

* না, না, ইয়াহিয়া খানকেই পোস্টিং দেয়া হয়েছিল... তবে আপনিও পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সময় একবার ছিলেন। ইয়াহিয়া খান আপনাকে ডেকে

এনেছিলেন।

** না, আমাকে ডাকা হয়নি, আমাকে আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্য বলা হয়েছিল।

* তারপর কী ঘটে?

** ছয় মাস থাকার পর আমি ইংল্যান্ডে যাই।

* আপনি চলে গেলেন?

** আমি ইংল্যান্ডে চলে যাই। আমি কেবল পূর্ব পাকিস্তানে আমার থাকার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করেছিলাম। এর বেশি কিছু নয়। তবে ঐ সময়টার অবকাশে আমি ইয়াহিয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ফাঁক-ফোকড়, অভাব নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হই। আমি কথাগুলি তাঁর কাছে পাড়ি অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশলে। তাঁকে বলি, জেনারেল আপনি তো রয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে। আমি এ আলোচনা করছি, আপনি পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি সেকথা মনে রেখেই। ধরুন, ভারত আক্রমণ করল। আসুন, এক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক যুদ্ধ পরিস্থিতির আলোকে বিচার-বিবেচনা করে দেখি। ধরে নিই আমাদের দুশমন পক্ষ আমাদের তুলনায় ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি শক্তিধর। আর এই রণদৃশ্যপটে পূর্ব পাকিস্তান নিঃসঙ্গ, একাকী। পশ্চিম পাকিস্তানেও সেই একই অবস্থা। এভাবে গোটা দেশ যখন... এসব কথাবার্তায় তিনি কিছুটা প্রভাবিত হলেন বলেই মনে হলো। কথাগুলি তাঁর মনে ধরল। আমরা এসব নিয়ে কিছু অনুশীলনও করলাম। তিনিও তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা কিছুটা কাজে লাগালেন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য, আরো এক বা দুটি রেজিমেন্ট পাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি জায়গা মতো তেমন কিছুই বলেননি। এরপর তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বদলি করা হলো... আমার যদ্দূর মনে পড়ে তাঁকে...কম্যান্ড নিতে ডেকে পাঠান...

* তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসেন?

** আমার মনে পড়ে তিনি শিয়ালকোট ডিভিশনের কম্যান্ড গ্রহণ করার জন্য ফিরে আসেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তবে আপনি পূর্ব পাকিস্তানের যেসব জরুরি প্রতিরক্ষার বিষয় বলেছেন সেসব বিষয়ে তাঁর সাথে আমার যে আলোচনা হয় তার সারবত্তা তিনি অস্বীকার করেননি। আমার এখানে বলার হলো : যেভাবে কথা হয়েছিল সে পরিসরে এখানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আদৌ মজবুত করা হয়নি। ঐ সময় তাৎক্ষনিকভাবে একটা কিছু করা হয়েছিল—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

* আপনি এসব ব্যাখ্যা ইতোমধ্যে দিয়েছেন। আপনি এও ব্যাখ্যা

করেছেন যে, কেন আপনার মতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষার ঐ পরিকল্পিত আয়োজন গড়ে ওঠেনি। কেননা সামন্ত স্বার্থ...

** না তা হয়নি। একটা রেজিমেন্ট পাঠানোর পরই সব শেষ। আর তারপর একাত্তর যখন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ল তখন শোর পড়ে গেল, টনক নড়ে উঠল, তড়িঘড়ি সামরিক মদদ পাঠানো শুরু হলো। আরে এক ডিভিশন, আওর ডিভিশন ভেজো, ইয়ে করো, উয়ো করো ইত্যাদি।

* কথাটা ঠিক নয়। পঁয়ষট্টিতেই তো ওদের মালুম হয়েছিল ঠিকই, ওরা আবিষ্কার করেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান রক্ষাযোগ্য নয়। এ হলো গিয়ে ১৯৬৫-র কথা। তারও পরে...

** কেউ বলেনি পূর্ব পাকিস্তান রক্ষাযোগ্য নয়, বরং ওরা সবাই বলেছে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার চাবিকাঠি রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। আর ঘটনাচক্রে '৬৫-তে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি, যদিও তার নেপথ্যে বহু কারণ ছিল। এ বিষয়ে আমার অভিমত হলো, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপের জন্য যেসব পূর্বশর্ত ছিল তার সব কিছু তখনো পূরণ হয়নি। আর সেগুলির মধ্যে প্রধান শর্ত ছিল যে, পঁয়ষট্টিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কের বাঁধন একাত্তরের মতো অতটা শিথিল হয়নি। আর বলাবাহুল্য, সেটিই ছিল আমাদের প্রতিরক্ষায় সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। ভারতকে আরো ২০-২৫ বছর অপেক্ষায় থাকতে হলে সে তা করতে তৈরি ছিল, হুট করে হঠকারিতা করা তাদের পরিকল্পনায় ছিল না। আপনারা নিশ্চয়ই আমি যা বলতে চাই তা উপলব্ধি করেছেন। প্রতিরক্ষা সাজসরঞ্জামের প্রশ্নে আমার বক্তব্য হলো, ১৯৬৫-র যুদ্ধ ছিল আদর্শ পরিস্থিতি, ১৯৭১-এ আরো অনেক বেশি দিন ধরে যুদ্ধ চললেও প্রকৃতপক্ষে এ সংঘাতের মাত্র ছয় দিন পরেই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদেরকে যা বলতে চাই তা হলো : যা হচ্ছিল তার মোড় উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল, অবস্থা পর্যবেক্ষণের মতো সময় হাতে ছিল তখনো। দ্বিতীয় জিনিসটি ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে অংশীদার হওয়ার উপলব্ধি ও প্রত্যয়ই যদি না থাকে, তাহলে তারাই বা কদ্দিন এভাবে চলবে, আর নেতৃত্বে যখন তারা নেই, তারাই বা সব বিষয় নিয়ে দেখবে, ভাববে কেন? আর ইত্যবসরে উস্কানি, মন্ত্রণা দেয়ার লোকেরও কি অভাব থাকে?

* আপনি কি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে?

** ছিল। বৈষম্য ছিল যা নিয়ে রীতিমতো কথা তোলা যায়। দাবি করা

যায়। সে কথাই বলি। আপনারা জানেন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের উৎসাহিত করা হয়নি। বাঙালিদের ব্যাপারে একটা বৈরিতা ছিলই। তাই বেশি বাঙালি ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে ছিল না। এর কি অজুহাত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

* না, আমি সাধারণভাবে সেনাবাহিনীর জন্য সম্পদ বরাদ্দের কথা বলছি।

** আমি সে কথায় আসছি। সেজন্য আমাদেরকে ঐ সময়ে দেশের উভয় অঞ্চলের সত্যিকারের অবস্থা কী ছিল তা খতিয়ে-দেখতে হবে। ঢাকা ঐ সময় একটা ছোট জনপদ ছিল, সেকথা আপনারাই জানেন। আর পূর্ব পাকিস্তানের অঞ্চলটি 'চাকর-বাকর' শ্রেণীর বাস বলেই পরিচিত ছিল। আর পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চল ছিল তুলনামূলকভাবে উন্নত, অন্য কথায় ব্রিটিশ আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা তেমন সুবিধাজনক ছিল না। সেদিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। চাকরি-বাকরির বেলায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থায়।

সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সংখ্যায় ছিল অনেক, সিভিল সার্ভিসেও বাঙালির সংখ্যা ছিল অনেক কম। এরকম অবস্থা নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু। তাই সর্বাগ্রে আমাদের সবাইকে পাকিস্তানি হতে হবে, আর বাংলায় মুসলিম লীগের ভূমিকা হতে হবে আরো বেশি। আপনি শের-এ-বাংলা, মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথাই ধরুন... ধরুন ওদের গোটা গ্রুপটির কথা। এঁরা আমাদের সকলের বরণীয়, আমাদের খিদমতের দাবিদার, এঁরা সকলেই ছিলেন নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি ঘটনাক্রমে আলীগড়ের ছাত্র। আপনাদের বাংলাদেশের একটি (প্রথম?) গোটা মন্ত্রিসভার সকলেই আলীগড়ের শিক্ষার ঐতিহ্যধারী, শুধু ঐ মন্ত্রিসভার হিন্দু সদস্য বাদে। যেমন ধরুন ছিলেন, এটিএম মোস্তফা, কেএম কায়সার, আরো অনেকে। এঁরা সবাই অত্যন্ত দক্ষতা ও সম্মানের সাথে কাজ করেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, কিছু পশ্চিমা স্বার্থবাদী মহলের ধ্বজাধারী দুষ্টচক্র শয়তানী শুরু করে দেয়। তারা চক্রান্ত করে বলতে শুরু করে ওরা পিছিয়ে পড়া লোক, ওরা বোঝা ছাড়া কিছু নয়। এটা ছিল ওদের ভুল। আসলে বাংলার কোনো অপরাধ ছিল না। কেননা, এই বাংলাকে ওরা একদিন সালাম দিয়েছে, বাংলা কোথায় সে খোঁজ পড়েছে। তবে আমি সে সব বিস্তারিত ইতিহাসে যেতে চাই না। সহজ, সরল, সোজা সত্যটি হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা সামাজিক দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে যায়।

ওখানকার দশা করুণ হয়ে ওঠে। এ জন্য গোড়া থেকেই দরকার ছিল পরিকল্পনার, সেই সঙ্গে কাজের। দরকার ছিল ওখানকার মানুষের মোট আয়-উপার্জনের উন্নতির। আমাদেরই উচিত ছিল দেরিতে হলেও কাজটা শুরু করা। আর সেজন্য কিছু যুক্তি মেনে নেবার প্রস্তুতিরও প্রয়োজন ছিল। বোঝা উচিত ছিল, এসব পশ্চাৎপদ এলাকাকে টেনে তোলা দরকার, উন্নত এলাকাগুলির সাথে সেগুলিকে সমান্তরালে আনতে হবে। বেলুচিস্তানের কথাই আপনি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরুন, আপনারা তো সেখানে যেতে চেয়েছেন। আমি বরং আপনাদের কাছে এই আরজি পেশ করছি যে, পাকিস্তান যখন স্বাধীন হয় তখন দরকার ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য বাস্তব অবস্থা তৈরি করার। পূর্ব পাকিস্তানের একটি ভূমিকা ছিল, তারা তা পালন করেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানে যেসব সিনিয়র সরকারি আমলা নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এর একটি কারণও অবশ্য ছিল এই যে, সে আমলে সিনিয়র বাঙালি অফিসারও তেমন কেউ ছিল না। আর হাতে গোনা যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে বসে উন্নয়ন নামক 'পুলি পিঠার ফোঁড়' শুনছিলেন। এভাবে দূরত্ব বেড়ে যায় দ্বিগুণ। আবার সামগ্রিক পরিকল্পনা ব্যবস্থার পর্যায়ে যে কাজ করা হয় তাকে বলা হয় কৌশলগত পরিকল্পনা। আমি বলব এরকম উদ্যোগ নেয়া হয় ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের আমলে। কিন্তু আসলে হচ্ছিল ট্যাকটিকাল প্ল্যানিং বা আপাতত কাজ হাসিলের পরিকল্পনা। তবে সেখানেও ছিল শুভঙ্করের ফাঁক। আমার ধারণায়, নীতি নির্ধারণের বেলায় পূর্ব পাকিস্তানের এজমালি অংশ যা থাকা উচিত সে তা পায়নি। এর আরো পরের দিকে এ ব্যাপারে কিছু করার চেষ্টা হয়েছে তবে তা ছিল প্রসাধনীর বা অনুরূপ নামের প্রলেপ দেবার মতো, ভাসা ভাসা ব্যবস্থা। যেমন ধরুন, সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, বালুচ রেজিমেন্ট, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ছিল– ছিল না পূর্ব পাকিস্তানি বা বাঙালিদের কোনো রেজিমেন্ট। তাই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর সেই কাজটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য। কোনো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেদিন প্রকৃত প্রয়োজন ছিল না, দরকার ছিল না পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বা অনুরূপ নামের রেজিমেন্ট পোষার। বরং দরকার ছিল পাঞ্জাবি, পাঠান, বালুচ, বাঙালি নির্বিশেষে পাকিস্তান পদাতিক বাহিনীর। দরকার ছিল সবাইকে সেখানে একাত্ম করার। কাজেই আপনারা যদি ভেবে থাকেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করে পাকিস্তানের জন্য খেদমতের ব্যবস্থা করেছেন, তাহলে সেটা নিহায়তই নির্বোধের বেহেশত বাস করার শামিল, অন্তত আমার তাই অভিমত।

* কিন্তু এই যে সেনাবাহিনী রেজিমেন্টের কথা আপনি বলছেন, সেগুলির কি একটা জাতিগোষ্ঠী পরিচয় থাকার দরকার নেই? উচিত নয়?

** নামের কী দরকার? দরকার বলতে তো ছিল একটাই। দ্বিতীয় বিষয় ছিল, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা কত সেটা। শুধু পূর্ব পাকিস্তানি লোক নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকও সেনাবাহিনীতে বাড়ানোর দরকার ছিল। এজন্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ছিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য দৈহিক উচ্চতার শর্তের কথা। কালক্ষেপণ না করেই উচিত ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য দৈহিক উচ্চতার শর্ত শিথিল করা। এ ব্যাপারটা বোধ করি অন্ধেরও মনোযোগ এড়াবার নয়। ইংরেজরা একটা কিছু বানিয়ে থাকতেই পারে, আমরা তো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই চাচ্ছিলাম। ওরাই ঠিক করেছিল কারা যোদ্ধা জাতি, কারা নয়। অথচ সেসব মনগড়া ব্যাপার। কেউ যোদ্ধা, কেউ নয় বলে কোনো কথা আছে নাকি? বরং সেক্ষেত্রে এমন একটা উন্নাসিক ধারণাই বরং কাজ করেছে।

* আপনি বাস্তবিক কথাই বলেছেন যে কারও পিঠ যদি দেয়ালেই ঠেকে যায় সে কি লড়বে না? আপনার কী মনে হয়?

** আমি তো বলি শুধু তাই নয়, প্রতিটি মানুষের মাঝেই যুদ্ধ করার সামর্থ্য রয়েছে। তবু প্রশ্ন কে লড়াকু, কে যোদ্ধা। এখানে, আমাদের বেলায় বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হয়েছে, ওখানে হয়নি... এই যা। ব্যাপারটি বলা যায় অনেকটাই এ রকম, হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে শিল্প গড়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হয়নি তাদেরই বেনিয়া স্বার্থে। তখন রুমাল পর্যন্ত ম্যানচেস্টার থেকে তৈরি হয়ে আসত এদেশে। পরে কিছু কিছু শিল্প গড়ে তোলা হয় বোম্বাই, কলকাতা ইত্যাদি জায়গায়। পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই তেমন হয়নি, পাঞ্জাবে ঠিকই হয়েছিল। এখন কথা উঠতে পারে যুক্তির খাতিরে, পাঞ্জাবে যদি এত শিল্পই বসানো হয়, তাহলে সৈনিকের যোগান আসবে কোত্থেকে? তাহলে অন্য কোথাও থেকে কি সেটা আসবে না, আনতে হবে না? হয়তো অবস্থা এমন যে, তার পরেও সেখানে অনেক এলাকা রয়ে গেছে এখানে ওখানে, কিন্তু সেসব জায়গাতে তো মানুষের অন্য কাজও আছে। দেখা গেল, এমনি এক এলাকার এক লোক বলল, আমাদের অনেক লোকের দরকার কাজকর্মের জন্য। আমার চার ভাইকে সেজন্য বাড়িতে থেকে যেতে হবে। তাহলে? আজকাল আমাদের এখানে এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে পাখতুনিস্তানের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। পাখতুনদের সব আলাদা হতে হবে। আমি এ নিয়ে বছর কয়েক আগে এক নিবন্ধে লিখেছি, এতই যখন জাতের ব্যাপার তো ঝামেলার দরকার কী। এসব

ছেড়ে একটা ফেডারেশন ব্যবস্থা বহাল হোক। এ ফেডারেশনে কম-বেশি সবাই হবে সমান। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা এখন কেন্দ্রে খুব বেশি রকমে কেন্দ্রীভূত। সেটা থাকবে না। তৃতীয়ত, মুঘল জমানায় একেকটা অঞ্চলের যে সব নাম ছিল সেইভাবে মুলতান সুবা, লাহোর সুবা, পেশাওয়ার সুবা–এমন সব সুবা কায়েম হয়ে যাক বা এরকম কিছু হোক, ঝামেলা চুকে যাক। এখানকার যেসব বিভাগ/অঞ্চল রয়েছে সেগুলি ভেঙে সুবা বা স্টেস্ট বানিয়ে দিন। আর যত ক্ষমতা আছে দিয়ে দিন নির্বাচিত কাউন্সিলের হাতে, জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা দূর হয়ে যাক। আজকে বেলুচিস্তানে ঝগড়া-ফ্যাসাদ চলছে সেখানকার বালুচ-পাঠানদের মধ্যে। বেলুচিস্তানকে দুই বা তিন সুবায় ভাগ করতে হবে। এটা কোনো কথা হলো? কিছু লোক আছে তারা শুধু সমস্যা দেখায়, পথ দেখায় না, গলদ ধরে, নিজেরা শোধরায় না। আর তাই আমি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রসঙ্গটি এমনি এক অলোকেই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

* আপনি কি আপনার এসব পর্যবেক্ষণ, অভিমত, অভিজ্ঞতার কথা নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে আপনার দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত করে বলতে পারেন? মানে বলছি, যখন আপনি নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন?

** আমি তো জাতীয় নিরাপত্তা অফিসার ছিলাম না।

* ঠিক তা নয়, আমরা বলতে চাই তেমন একটা অবস্থানে তো ছিলেন আপনি!

** আমি আপনাদের সে বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে বলব। তিনটি ত্রুটির কথা আমি আগেই বলেছি। ওরা একটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করে। এর নেতৃত্বে ছিলেন পাঁচ কেবিনেট মন্ত্রী। আর আমি সেই কাউন্সিলের সচিব মাত্র ছিলাম।

* ঐ পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে ড. জি ডব্লিউ চৌধুরী ছিলেন কি?

** বলছি। ইয়াহিয়া নিজে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আর ছিলেন অর্থমন্ত্রী, যোগাযোগমন্ত্রী, আরো ছিলেন দুজন মন্ত্রী। তবে গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী ছিলেন না। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম, এ কাউন্সিলের কাজ কী? আমি এ প্রশ্ন করেছি পেশাদার এক সৈনিক হিসেবে। আমি আমার রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলাম। আমি ছিলাম একজন ক্যাপ্টেন, ব্রিগেড মেজর। লে. কর্নেল হিসেবে আমি রেজিমেন্ট কম্যান্ডে ছিলাম। লে. কর্নেল হিসেবে আমি ছিলাম জিআই। একই পদে আমার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি ডকট্রিন বা তত্ত্ব গড়ে তোলা। কর্নেল হিসেবে আমি ছিলাম স্কুল ট্যাকটিক্সের প্রধান। সেখানে আমার কাজ ও দায়িত্ব ছিল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থেকে কর্নেল পর্যন্ত গোটা

সেনাবাহিনীর সবাইকে ট্যাকটিক্স শিক্ষা দেয়া। আমি কাজ করেছি স্টাফ কলেজের একজন লে. কর্নেল হিসেবে। আমি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে একটি ব্রিগেডের কমান্ডে ছিলাম। ব্রিগেডিয়ার পদেই আমি ছিলাম সেনাবাহিনীর কারাগারের মহাপরিচালক। মেজর জেনারেল হিসেবে আমি একটি ডিভিশনে জিওসি ছিলাম। আমাদের কাছে কিছু লোক আসা-যাওয়া করত। আমি তারপর একটি লেখা তৈরি করি। সেটি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। আমি তাতে নিরাপত্তা সম্পর্কে অনেক ভেতরের-বাইরের তথ্য সন্নিবেশ করি।

* আপনি কি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্থাপন করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে লেখাটি তৈরি করেছিলেন? না, শুধু নিজের জন্য?

** কাউন্সিলের জন্য, সুনির্দিষ্টভাবে। আমি যখন কাউন্সিলে আমার পদের দায়িত্ব নিই তখন আমার প্রশ্নই ছিল : আমার কাজ কী?

* আপনি আমাদের জানিয়েছেন যে, ইয়াহিয়া যখন পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসেন তার আগে আপনি তাঁর সাথে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেছিলেন। আইয়ুব খানের ১৯৬৯-এর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতায় তখন আপনার ও ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? আসলে আমি আইয়ুব খানের শেষ ছয় মাস নিয়ে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

** আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল পরিকল্পনার। তবে হ্যাঁ, আপনি আইয়ুব শাসনের শেষ দিনগুলি সম্পর্কে জানতে চান তো সে কথা বলি। ঐ সময় দেশের ভেতরে কিছু ঘটনা ঘটে। সীমান্ত প্রদেশের লান্ডিকোটাল থেকে এসব ঘটনার সূত্রপাত। লান্ডিকোটাল পাকিস্তান সরকারের কার্যত নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত এলাকা, যেখানে রয়েছে দুনিয়ার সব সামগ্রীর এক বিরাট চোরাচালানী পণ্যের বাজার। এসব ঘটনা যখন ঘটেছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন জেনারেল মূসা। তিনি বললেন, কাজের লোক উমর জিএইচকিউতে বসে আছে, আর সারা দেশ জ্বলছে। ওর গায়ে কি তাপ লাগছে না? করছে কী? মূসা এ নিয়ে ফিল্ড মার্শালের কাছে অভিযোগ করলেন। ফিল্ড মার্শাল আমাকে বললেন, কী করছো তুমি? আমি বললাম, স্যার, যা সব চলছে তাতে শুধু দেশের সেনাবাহিনী নয়, আগামীতে চীনা সেনাদেরও আপনি পাবেন। কিন্তু তাও বোধ হয় যথেষ্ট হবে না। কদিন পর খবর পাওয়া গেল, সোয়াত ও ঝিলামের মধ্যকার বেতার সংযোগ লাইনটি কেটে দেয়া হয়েছে। এখন সে জায়গাটি ঘিরে রেখেছে আর্মড পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোকেরা। আর একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকেও ভয়াবহ সব সিচুয়েশন রিপোর্ট আসতে লাগল। এ অবস্থায় আমি তখন

পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি মুজাফফর হুসেনের কাছ থেকে খবর নেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, মুজাফফর ভাই তুমি তো শরিফ লোক, এখন তুমি আমায় বল তো কী অবস্থা তোমার ওখানে? মুজাফফরের খবর অনুযায়ী, যত গর্জন আসলেই তত বর্ষণ নয়! মুজাফফর সম্পর্কে আর কী বলব, শুধু এটাই বলা যায় যে, লোকটা সহজে উত্তেজিত হয় না, বেশ আশাবাদীও বটে। তবে যাকে বলে বুদ্ধিদীপ্ত তেমন অবশ্য নয়। বাস্তব ও আশাবাদী হবে অথচ সেই সাথে মাথার অভাব যদি থাকে সেটা সেনাবাহিনীর জন্য বড় মুশকিলের কথাই বটে। তবে মুজাফফর সাদাসিধে সৈনিক, কোনো মন্দ অভিপ্রায় তার নেই। এরপরে লাহোর থেকে, অন্য সব জায়গা থেকেও খবর এলো বাস্তবিকপক্ষেই ঐ ছয় মাসের দিনগুলি ছিল ভয়াবহ। ইতোমধ্যে ফিল্ড মার্শাল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যে লোকটি প্রায় সারাজীবন দোর্দণ্ডপ্রতাপে ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন তাঁর ভাগ্যরবি তখন পাটে নেমেছে। এলো গোলটেবিল বৈঠকের প্রশ্ন। আরটিসির আঞ্জাম করো। এলেন খাজা খয়েরুদ্দিন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন। গুল হাসান বললেন, 'মুজিব সাবকো বোলাও।' জেনারেল গুল হাসানের ওখান থেকে টেলিফোনে শেখ মুজিবকে আসার জন্য বলতে হবে।

* শেখ মুজিব কেন? গোলটেবিল বৈঠকের কথা বলছেন তো? আমার কিছু প্রশ্ন আছে এখানে। যে আগরতলা মামলা হয়ে গেল সেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়টিকে কি সাধারণভাবে মিথ্যা বলে মেনে নেয়া হয়েছিল? যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবের বিচার চলছিল। আপনি তো জানেন, তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় এজন্য যে...

** বেগতিক পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে...

* আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যে একটা বানোয়াট মামলা তা কি সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছিল?

** এখানকার প্রায় সব লোকেরই বিশ্বাস, মামলায় সত্যতা কিছু একটা ছিল। তবে তাদের যে আপত্তি একটা ছিল তা হলো মামলাটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

* প্রকাশ্য বিচার?

** হ্যাঁ, বিচারে একটা যথার্থ রায় হতে হবে। হয় ঐ ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে, নয় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। তাঁর ওপর জাতক্রোধের কারণে তাঁকে উড়িয়ে এনে কোনো মোকদ্দমাবাজি কাম্য নয়। একজন মানুষের ওপর এভাবে এত গুরুতর অভিযোগ অপরাধ চাপিয়ে দেয়া যায় না।

* তবে আমাদের এখানে প্রশ্ন হলো, এই মামলায় সুনির্দিষ্টভাবে জড়িত

থাকার ব্যাপারে আপনাদের সরকারের একটা বিশ্বাসের কথা আপনিও জানেন, আর ঘটনা যদি তা-ই হয় তাহলে গোলটেবিল আলোচনায় মুজিবের উপস্থিতির ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেয়ার কারণ কী? তখন তো আপনাদের সে ধরনের গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতাও ছিল না যে তাঁর বিচারপর্বটি অবাধ ও পক্ষপাতশূন্য হতেই হবে। তখন তো সামরিক আইনের জমানা।

** সামরিক আইন তখন ছিল না।

* আমরা ওটাকে সামরিক ডিক্টেটরশিপ বলতে পারি।

** না, কোনো একনায়কতন্ত্র ছিল না।

* ছিল ঠিকই, ওটা কী বলে, ছিল বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

** ঠিক ধরেছেন আপনি! ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব তাঁর মানসিক স্থিতি হারিয়েছিলেন। সব ধরনের দলের লোক তখন তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। আমরা তাঁকে বলতাম হুঁকা আওর টোপি–কী যেন নামটি তাঁর... নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান। একমাত্র শীর্ষ ব্যক্তিটি ছাড়া সবাই তখন কেবলই হুকুমদার : ইয়ে কারো, উয়ো কারো, রীতিমতো হুলস্থুল তুলকালাম ব্যাপার। সবাই তখন কেবল বলছে, ইয়ে কারে গে, মুজিবকো নেহি বোলাওগে। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি। এ ধরনের চাপ এলো, চাপ মাথা পেতে নেয়াও হলো। আর রাজনীতির এই খেলায় খাজা খয়েরুদ্দিন তাঁর চালগুলি চালছিলেন। তিনি এলেন, আর গোলটেবিলের দিন ঘনিয়ে আসতে জেনারেল গুল হাসান আমাকে বললেন, আরে, কোথায় তুমি। খাজা সাব তো শেখ মুজিবের সাথে কথা বলবেন। আমার ঘর থেকে যখন কথা হবে তখন আপনি নিজেই কথা বললে ভালো হয় না! তাঁর সাথে মুজিবের কথা বলিয়ে দাও। আমি বলি, আপনি নিজেই কথা বললে ভালো হয় না! সে যা হোক, খাজা সাহেব শেষ পর্যন্ত নিজেই রিসিভার তুলে শেখ সাহেবের সাথে কথা বললেন। এই কথা বলার সময় খাজা সাহেব একটা গ্যারান্টি কোথা থেকে পেয়েছিলেন জানি না, হতে পারে আইয়ুব বা তাঁর কেউ তাঁকে সে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে তাঁর নিরাপত্তায় কোনো ব্যাঘাত হবে না। তাঁকে যদি কোনো অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেই হয় তাহলে এসবের একটা দফারফা হওয়াই দরকার।

* তবে সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার জন্য মুজিব জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছেন, আমার তো মনে হয়, স্পষ্টত এ গ্যারান্টি দেন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক।

** নির্বাচনী ফলের কারণে ঐ ম্যান্ডেট ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।

* আমি ১৯৬৯-এর সময়কার কথা বলছি, সত্তরের আগে...

** তাই! আমি তো... এখানকার কর্তাব্যক্তিরা যা ভেবেছিল তা হলো, তাঁকে ছাড়া কাজ হবে না। কাজেই যেভাবে সম্ভব তাঁকে এখানে ডেকে আনুন। কেননা, একমাত্র তাঁর পক্ষেই এখানে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে রাজি করানো সম্ভব।

* হয়তো আপনার মনে আছে যে, একটা রাজনৈতিক ঘটনা তখন চলছিল। শেখ মুজিব তাঁর ছয়দফার পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছিলেন আর সরকার ছয়দফা বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছিল। ফলে শেখ মুজিব আরো বেশি জনপ্রিয় লাভ করে।

** ঠিক।

* এটাকে কী চোখে দেখা হয়?

** মনে হতে থাকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার রক্ষার চেষ্টা করছেন, আর সরকার তাতে বাগড়া দিচ্ছে।

* আমি তো কথাটাকে ঘুরিয়ে বলতে পারি, সরকার যদি তাঁর ছয় দফাকে আমলে না নিত, তাহলে মুজিব এত জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠতে পারতেন না।

** তাতো বটেই, তার ওপর সরকার যদি মামলা গোপনে না চালিয়ে প্রকাশ্যে পরিচালনা করত, তাহলে এতকিছু ঝামেলা হতো না।

* আপনি কি সরকারের ঐ সময়ের ঐ পদক্ষেপকে ভুল বলবেন?

** কোনো সন্দেহ নেই। বিচারপতি আব্দুর রহমানও ঐ সময়ে একবার বলেছিলেন, তোমরা তো ওখানে বসে বসে জিনিসটা করালে, কিন্তু দরকার ছিল সবকিছু প্রকাশ্যে করার। তবে আপনারা কি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তখন অনেক কিছুই ঘটেছিল যার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার বেশ অবকাশ ছিল। আর স্বার্থান্ধ, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সেদিন সে সব বিষয়কে নিজেদের জন্য হুমকি বলে গণ্য করেছে।

* আপনি শাসক চক্রের কথা বলছেন?

** শাসক মহলের শতকরা ৭৫ ভাগ তো বটেই। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের আমলাদের মধ্যকার বহু সিনিয়র অফিসার এতে ছিলেন, আর এঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এম এম আহমদ। এই সেই আদি ও অকৃত্রিম এম এম আহমদ যিনি ঢাকায় বসে দর কষাকষিতে ছিলেন। এ এক পরিতাপজনক বিষয় যে, তখন কিছু লোক প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার ধারণায় মদদ যুগিয়েছে। এদেরই অন্যতম আহমদিয়া মিরযা সম্প্রদায়প্রধান মিরযা আবু তাহেরের এতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ঐ সময় তিনি কোমর বেঁধে লেগেছিলেন পাকিস্তানের দুটি অংশকে আলাদা করে ফেলতে। আর এম এম আহমদ তো এই আবু তাহেরেরই

'গোলাম' ছিলেন।

* ঐ সময় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান ছিলেন তো স্যার জাফরুল্লাহ্ খান।

** না, জাফরুল্লাহ্ খান কখনো তা ছিলেন না। বহু আগে মিরযা গোলাম আহমদ মারা যান। তাঁর ধর্মীয় উত্তরাধিকার লাভ করেন আরেক ব্যক্তি, সেই দ্বিতীয় জনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বশির উদ্দিন মাহমুদ তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁরই পুত্র ও উত্তরাধিকারী হলেন আবু তাহের। আবু তাহের ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়প্রধান। জাফরুল্লাহ্ কখনো তা ছিলেন না। তিনি কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

* তাহলে আপনি বলছেন, আহমদিয়ারা....

** বলছি। ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় তারা একটা বৈঠকে মিলিত হয় লন্ডনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিরযা তাহের, সরাফতুল্লাহ ও আরো একজন। ঐ বৈঠকে বিচার-বিবেচনা চলে, পাকিস্তানে যে নির্বাচন হচ্ছে তাতে তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন কাকে সমর্থন জানাবে। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়, পিপলস পার্টিকে সমর্থন জানানো হবে। পিপলস পার্টিকে ওরা কীভাবে সমর্থন জানায় সে খবর পিপলস পার্টি বা খোদ ভুট্টোও জানতেন না। ঐ নির্বাচনের সময় সারা পাঞ্জাব জুড়ে আহমদিয়ারা তাদের সোলা ও জানা সঙ্গে নিয়ে যেত আর সেসব কাজে লাগাত প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে প্রচারণায়। কাউকে তারা বুঝতে দিত না যে তারা পিপলস পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করে চলেছে। এভাবেই তখন ওরা কাজ করে।

* সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের কেউকেটা হিসেবেই কি এসব তথ্য আপনার হাতে আসে? আপনি মিরযাদের সম্পর্কে এখন যা বলছেন সেটা ঐ সময় কি আপনার জানা ছিল? জানা ছিল কি এম এম আহমদ সম্পর্কে, জানতেন যে ওরা এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

** জানতাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট, সি-ইন-সি কেউ একথা বিশ্বাস করেননি। এখন আপনিই ভেবে দেখুন এসব লোকের সত্যিই এসব.....

* আপনি এম এম আহমদের কথা বলছেন?

** না, আমি কাজ করছি পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য।

* আপনি এসব কেমন করে জানতে পারেন, কার কাছ থেকে?

** ওদের মধ্যে খোলাখুলিই আলাপ চলত। আমি নিজে কিছু আহমদিয়াকে চিনি ও জানি...

* ওরাই আপনাকে বলেছে?

** ওরা বলেছে, আমাদের মিরযা সাহেবের ওপর খোয়াব এসেছে, হুজুরও দেখা দিয়ে বলেছেন, ব্যাপারটা তাঁদের জানা। কিন্তু ওরা বলে না, তারপর মঞ্জিল কী? কেননা, চোর ব্যাটা চুরি করতে বেরিয়ে কি শোর করে জানাবে যে, আমি অমুক জায়গায় চুরি করতে চলেছি?

* আপনি কী বলেন?

** বলাবাহুল্য এ সম্প্রদায়টি এরকমই। আর ভূট্টো বলেছিলেন তিনি কারও আনুকূল্য নেননি। এমন কথা কেউ যদি বলে তিনি তাদের চুরমার করে দেবেন। এর ফল হিসেবে দেখা গেল, ভূট্টো আহমদিয়াদের একটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় ঘোষণা করেছেন। মদের ওপর নিষেধাজ্ঞাও ঘোষণা করেন ভূট্টো, যিনি নিজেই নাকি তাঁর সমসাময়িককালের সেরা শরাবী! জুম্মাবারের সরকারি ছুটির ঘোষণাও তিনিই দেন। আসলে তিনি তাঁর গদি সামাল দিচ্ছিলেন। তবে কোনো কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। তা সে যা-ই হোক আপনাদের কথায় আসা যাক। কী জানতে চাইছিলেন আপনারা? আমি কি আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছি?

* অবশ্যই! তবে আংশিক। এটি কি সম্ভব যে যেহেতু বিষয়টি তখন জানা ছিল, ইয়াহিয়া জানতেন, তিনি কি জানতেন এ পরিস্থিতির মোকাবিলা কেমন করে করা যায়?

** তথ্য তাঁকে পৌঁছে দেয়া হয়। এখন তিনি এ নিয়ে কিছু করেছিলেন কি না আমার তা জানা নেই। দৃষ্টত তখন এটি ঘটে...

* তবে আপনি কি এরকমটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান গোল্লায় যাক বলে যে তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল সেই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন?

** না।

* অথচ বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...

** না, না, সে কথা আপনাদের আমি বলছি। লারকানায় ভূট্টোর বাসভবনে ইয়াহিয়া-ভূট্টো সলাপরামর্শে বসার আগের কথাই বলছি আমি। তখনো পর্যন্ত আমি ইয়াহিয়াকে দেখেছি তিনি সর্বান্তঃকরণে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার পক্ষে। তিনি মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে ঐকান্তিক। কিন্তু লারকানা বৈঠকে তাঁরা যাবার পর সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।

* জেনারেল গুল হাসান তাঁর লেখা বইতে এর উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এরকম ধারণার কথাও বলেছেন যে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছিল বা ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ তিন জেনারেল মিলে কী স্থির করে সে বিষয়ে সেনা সদর দফতরকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হয়।

** এনএসসির কোনো বৈঠকই হয়নি।

* আমি তিন জেনারেল যেমন, পীরজাদা...

** তার অভিযোগ কেন তাকে সেই সিদ্ধান্তে রাখা হয়নি। এটা একটা ভাবার বিষয় বটে। জেনারেল হামিদ ছিলেন জিএইচকিউপ্রধান। তিনি সকল আলোচনা ও কথাবার্তায় ছিলেন। সবকিছুতে ছিলেন। আমাকে ওদের এত টানাটানি করার কারণ ঐ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল। ওরা ধরে নিয়েছিল যে, আমিই কাউন্সিলপ্রধান– যা আসলে সত্যি নয়।

* ঠিক?

** সিকিউরিটি সরাসরি প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করত। দুয়েকবার আমি সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করেছি, তবে তার পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের মতো কিছু বিষয়ে নয়। বরং তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান–দুই অঞ্চলেই অস্ত্র চোরাচালান হয়ে আসছিল। তাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে কি না। মাত্র দুটি বিষয় ছাড়া আমি কখনো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। তারাই প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলত। তবে জিএইচকিউপ্রধান ছিলেন জেনারেল হামিদ। তাঁর সাথে ইয়াহিয়া বৈঠকে বসতেন। যদি জিএইচকিউ-এর দায়িত্ব জেনারেল গুল হাসানের হাতে গিয়ে থাকে, হতেও পারে গুল হাসান সেখানে ছিলেন। দ্বিতীয়ত, একথাই সবচেয়ে সহজে বলা যায় যে, জিএইচকিউ তো আমার সাথে আলোচনা করেনি। কাজেই দেখ, আমি এতে নেই। তৃতীয়ত, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছি, তিনি আর পীরজাদা চাচ্ছিলেন ভূট্টো ক্ষমতায় আসুন। ওরাই ছিল পালের গোদা কিসিমের চরিত্র। পীরজাদা কলকাঠি, কৌশল ঠিক করছিলেন। গুল হাসান আর ঐ যে কর্তাব্যক্তি কী নাম যেন, এয়ার চিফ আবদুর রহিম, রহিম। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই ওদের নানা টানাহ্যাঁচড়ার পর লাহোর দুর্গে নিয়ে আটকে রাখা হয়। কাজেই এখানে কথা হলো, জিএইচকিউ সবকিছুতে সত্যিই ছিল না। আমি এর একটা নমুনার কথা আপনাদের বলব, সেটি একটি অপারেশনের কথা। ওটার নাম ছিল অপারেশন জিব্রাল্টার বা এ ধরনের কিছু। ঐ অপারেশনের আওতায় ভারতীয় কাশ্মীরে কিছু লোক প্রবেশ করানো হয়। আমি ১৯৬৫-র আগে সময়কার কথা বলছি। এই অপারেশন পুরোপুরি পরিচালনা করা হয় রাওয়ালপিন্ডি থেকে। এতে জড়িত ছিলেন জেনারেল মূসা, জড়িত ছিল জিএইচকিউ। আর এরই পরিণাম হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় '৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ঐ সময় রাওয়ালপিন্ডির জিএইচকিউ ছিল পুরোটাই আহমদিয়া জেনারেলদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জেনারেল ছিলেন আহমদিয়া, চিফ অব স্টাফ আহমদিয়া... এসব কি নিছক দৈবচক্রের

ব্যাপার? তাই ওরা যা '৬৫-তে করতে পারেনি, একাত্তরে তা করতে সক্ষম হয়।

* তাহলে, কথা হলো ১৯৭১-এ চক্রান্তের ভেতর চক্রান্ত ছিল। একদিকে ইয়াহিয়া-ভূট্টোর মধ্যে, অন্যদিকে পীরজাদা, গুল হাসান আর জেনারেল হামিদের মধ্যে। তারাও...

** না, জেনারেল হামিদ এসবে ছিলেন না। পীরজাদা ও গুল হাসানের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পীরজাদা ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চিফ অব স্টাফ। আর আমার নজরে যেসব জিনিস ধরা পড়ে তা খুব সুবিধার মনে হয়নি। যেমন অ্যাডমিরাল একেএম আহসানের কথাই ধরি। তাঁর সম্পর্কে আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানেও তিনি সেখানকার মানুষের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবেই মনে করতেন, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত। এক সময় তিনি পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। এহেন একজন ব্যক্তিকে পীরজাদার কক্ষে বসতে দেয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্টের কক্ষটি জাতীয় মর্যাদার প্রতীক বলে সেখানে তাঁকে বসতে দেয়া হয়নি। অফিসের কিছু চিঠিপত্র যথাস্থানে পৌঁছাচ্ছিল না। আমি তাই আহসানকে একটি চিঠি লিখি। আমি ঠায় বসে এখানে, আর সেখানে চলছে সিকিউরিটি। আমি আপনার জন্যে একটি কাজ তো করতে পারি। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনার কিছু যোগাযোগ করার বা পৌঁছে দেবার থাকলে তা মেহেরবাণী করে আমাকে জানান এবং কোনো কিছু থাকলে তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি জীবিত থাকলে তা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে যাবে। তিনি এজন্যে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দেন। ঐ পর্যন্তই। আহসান ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছে আমার সাথে দেখা করেন। আমি আমার কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বিধির অভিপ্রায় কী আমার জানা ছিল না, বুঝতে পারিনি। সবাই এটা করছিল, ওটা করছিল, তেল মর্দন করছিল। একজন তো সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে গেল, আর মাত্র তিন মাস না যেতেই দেখা গেল লোকটি প্রকৃতপক্ষেই মাজা ভেঙে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

* পরে টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়। এতে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

** তিনি একজন ভালো সৈনিক বটে, তবে ঐ স্তরের যোগ্য সৈনিক নন।

* আপনার কি সে কথা তখন জানা ছিল?

** তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন না যার পক্ষে স্বকীয় ও স্বাধীন সিদ্ধান্তের আলোকে এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে কৌশলগত প্রয়োজন আর রাজনীতির

চাহিদার মধ্যে মণিকাঞ্চন সমন্বয় সাধন করা সম্ভব ছিল। সৈনিক হিসেবে তিনি ভালো, সেই কাজটা দিন, তিনি চমৎকার আঘাত হেনে যাবেন দুরন্ত সৈনিকের মতোই। তবে ওখানে তার চেয়েও বেশি কিছুর দরকার ছিল। আরো বেশি করে দরকার ছিল স্বাধীনভাবে কম্যান্ড দেবার। আর আপনি যখন সেই স্বাধীন, আলাদা কম্যান্ডের আসনে আছেন তখন আপনাকে ঢের বেশি স্বাধীন সিদ্ধান্তও নিতে হবে। আপনাকে যারা রাওয়ালপিন্ডি বা ইসলামাবাদে বসে আছে তাদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। সাধারণ মেধার সৈনিক হিসেবে আমাকে লাহোর বা রিসালপুরের অধিনায়কের দায়িত্বভার দেয়া যেতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানের নয়। পূর্ব পাকিস্তানে আমি তা নেবও না। আর যদি তেমন দায়িত্ব নিতেই হয় তাহলে আমি সেখানকার পদাতিক ডিভিশনগুলিকে নিজে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেব। আর সেটা পূর্ব পাকিস্তান বলেই। নির্দেশ দুরকমের দেয়া হয়ে থাকে। এর একটি হলো অপারেশন অর্ডার। এর আওতায় বিভিন্ন কম্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর অপারেশন ইন্সট্রাকশন হলো, যাতে আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই। বড়জোর আপনি করণীয় কী তার একটা রূপরেখা দিতে পারে ওতে। পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় প্রযোজ্য ছিল অপারেশন অর্ডার। সরাসরি অপারেশন অর্ডার–যা লিখতে হবে নিজেকে। এ নির্দেশের আওতায় বলা হবে, তোমরা এই অবস্থান বা জায়গাগুলি দখল করবে, এই এই অবস্থানগুলি রক্ষা করবে। তোমরা তোমাদের সেনাবিন্যাস ঠিক রাখবে। আর অন্য জিনিস যেটি হয় সচরাচর তা হলো, শত্রুপক্ষ যেসব জায়গা দখল করেছে তোমরা সেগুলির ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে। আর সেক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর সেটা তোমাদেরই ব্যাপার, সেভাবেই কাজ করতে হবে।

* আপনি কখন খবর পেয়েছিলেন, টিক্কা খান অ্যাকশন নিতে যাচ্ছেন?

** আমি তখন ঢাকাতেই ছিলাম। আমি ২৬ মার্চ ওখান থেকে রওনা হই।

* বেশ। ঢাকায় আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়েছে ধরা হয়, সে রাতে ইয়াহিয়া চলে আসেন, ভূট্টোও তারপর তড়িঘড়ি ঢাকা ত্যাগ করেন। আর অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় ঢাকার বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানা শুরু হয়ে যায়। আপনি কি সেসবের কিছু জানতেন, জানেন? আপনি কি ইয়াহিয়ার সফরসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন?

** আমার সেখানে যাওয়ার কারণ, বহুদিন ধরেই কথা চলছিল যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকায় যাবেন, আমিও ঢাকায় গিয়েছিলাম। ঐ সময়ে যে পরিস্থিতি আমার নজরে পড়ে তাতে দেখা যায়, সেনাবাহিনী বেতার কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ

করেছে, আরো সব পদক্ষেপ নেয়া চলেছে। আমি তাতে দেখলাম এসবের শেষ পর্যন্ত কী হবে, জাতীয় নিরাপত্তা বিধান আদৌ করা যাবে কি না। আর রোয়েদাদ খানের একটা তলব পাওয়া গেল। তিনি ছিলেন তথ্য ও বেতার সচিব। তাঁর কাছ থেকে খবর মিলল ওয়্যারলেস স্টেশনের কে কোথায় লাপাত্তা হয়েছে, কারও খোঁজখবর নেই।

* তা আপনি তো জেনারেল, সফরেই গিয়েছিলেন। আপনি কি প্রেসিডেন্টের সাথেই গিয়েছিলেন না কোনো সুনির্দিষ্ট কাজে গিয়েছিলেন?

** না, আমার সুনির্দিষ্ট বা নির্ধারিত কোনো কাজ ছিল না। তবে পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তা জেনে.....

* যা ছিল জাতীয় গোপনীয়তামূলক কিছু বা জাতীয় নিরাপত্তা...

** বলতে পারেন, তবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে এমনি এমনি বাতচিৎ করে কাটাচ্ছি। কথা ওঠে, বসে বসে করছটা কি? তাই প্রথমে আমি লাহোর থেকে করাচী যাই। করাচীতে যখন এলাম তখন খবর পাওয়া গেল, ঠিক হয়েছে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়, তার দিন-তারিখও ঠিক হবে। আমাকে বলা হলো, দ্যাখো সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে। আমি ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করি। আমি তাঁর সাথে ছিলামও কিছুক্ষণ, ফজরের নামাজের সময় থেকে...

* দিনটির তারিখ বলতে পারেন?

** তারিখটা আমার খেয়াল হচ্ছে না, মনে করতে পারছি না। একজন বিহারি লোক ছিল...। এ ঘটনা জাতীয় পরিষদের দিন-তারিখ ঘোষণার পর। আমাদের জানা ছিল, তখনো কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধ থেকে গিয়েছিল। ইয়াহিয়ার কথায় দ্বিমত পোষণ করে মুজিব সাহেব বলেছিলেন, জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় হতে হবে। তাঁর আরো একটি শর্ত ছিল এই কারণে যে, প্রেসিডেন্ট তাঁকে বলেছিলেন তিনি দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। আর সে কারণেই আরো ভালো হবে তিনি যদি ইতোমধ্যে একটিবার পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আসেন। আমাকে এই দুটি কাজ দেয়া হয়েছিল। শেখ সাহেবের সাথে দেখা হলে আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনি তো কার্যত দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট তো যাবার পথেই সে কথা ঘোষণা করে দিয়ে গেছেন। তা আপনি একবার আসুন না পশ্চিম পাকিস্তানে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আপনার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার। তাই! তা বেশ ভালোই তো, তিনি বললেন। কিন্তু সম্মতি দিলেন না। এর ওপর খন্দকার মোশতাকও তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কী কারণে জানি না, তিনি

না যাবার কথাই স্থির করলেন। আরো যে কথা তিনি বললেন তা হলো, আগে তো জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন এখানে হোক, তারপর না হয় আমি পশ্চিম পাকিস্তানে যাব। আপনার কথা আমি প্রেসিডেন্টকে বলব আর তিনি যা বলেন তা-ই করব। প্রেসিডেন্ট আমাকে বললেন, এখন ভূট্টোর সাথে গিয়ে কথা বলো। কাজেই আমি করাচি গেলাম ভূট্টোর সাথে কথা বলতে। ভূট্টোর সাথে দেখা হতেই তিনি আমাকে জানালেন, আমার বিশ্বাস মুজিবের সাথে দেখা হয়েছে তোমার। আমি বললাম, জ্বি স্যার। কী বলেছেন তিনি? তিনি বলেছেন, জাতীয় সংসদের পয়লা অধিবেশন ঢাকায় হতে হবে। তারপর মিনিটখানেক কী ভেবে বললেন, ওকে, এক কাপ চা তো খান। আমি ভাবসাবে খুব খুশি হলাম। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে গেলাম, স্যার, আমি জনাব ভূট্টোর সাথে দেখা করেছি। তিনি মুজিব সাহেবকে বলেছেন, আমার মতে ব্যাপারটা খুবই ন্যায়সম্মত হবে। বাদবাকি সেশন তো হতেই থাকবে নিয়মমাফিক, শুধু উদ্বোধনী অধিবেশনটাই...। প্রেসিডেন্ট তো খুবই খুশি। তিনি কাউকে ডেকে একটা ডিক্টেশন দিলেন, শেখ সাহেবকে খবর দাও, জাতীয় পরিষদের পয়লা অধিবেশন ঢাকাতেই হবে। আর এরপর শুরু হয়ে গেল দৌড়ঝাঁপ, আর তারই এক ফাঁকে হলো লারকানা বৈঠক।

* সে বৈঠকে সবাই হাজির ছিল?

** আমার তো মনে হয় তার একটা কারণও ছিল। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব ছিল ইরশাদ। তার কথাবার্তায় আমি আঁচ করলাম, পূর্ব পাকিস্তান ছুটে গেছে, ভূট্টো তার এই থিওরি গছাতে চেষ্টা করছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন, ওটা তো ছুটেই গেছে নির্ঘাত, তো আসুন আমরাই ওটাকে বাতিল করে দিই। তবে যা-ই হোক আমি এসবের সাক্ষ্য নই। হলে বলতাম...। এসবের আগে পর্যন্ত আমার ধারণা অনুযায়ী অন্তত ইয়াহিয়ার সামনে এরকম কোনো পরিস্থিতি আছে বলে মনে হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে তিনি, এমনকি নুরুল আমিনের সাথেও তীব্র বিরোধ এড়ানোর জন্য শত উপায়ে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, নুরুল আমিন সাহেব আপনার বোধ হয় খেয়াল আছে, ভূট্টো শেষবারের মতো চীন সফরে যান তখন তাঁর সাথে আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটির একটা লোক ছিল, একই কাজ ছিল তার। এখন সেই সময়ে নুরুল আমিন, খাজা খয়েরুদ্দিন, জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব, মওলানা মওদুদী ও আরো একজন কর্নেল ছিলেন। আরো লোক ছিল, আমি তাদের নাম ভুলে গেছি। আমি তাঁদেরকে বলেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক নেতার সাথে কথা বলা দরকার। পরে আমাকে জানানো হলো যে,

নুরুল আমিন সাহেব নাকি বলেছেন, এ জন্যে মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে দৌড় পাড়তে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে তো হাওয়াই জাহাজে যাবার টিকিটের পয়সা নেই। আমি তাঁদের তিনজনের প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করি। ইয়াহিয়া সাহেব তো নুরুল আমিন সাহেবকে বলেই ফেললেন, আরে নুরুল আমিন সাহেব, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন, দৌড় পাড়ার জন্য আমাদের তিনজনকে সরকার পাঠাবে! এতে পাল্টা জবাব দিলেন নুরুল আমিন, না, খাজা সাহেব, আপনিই আমাদের বলুন দেখি দেশের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান কত খরচ করতে পারে? তবে এটা সামান্য ব্যাপার হলেও পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপার–তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

* কিন্তু ঐ সময় আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি তো ২৫ তারিখে রওনা হয়ে যান, তারপর কোথায় ছিলেন?

** ২৬ তারিখে। আমি বলেছিলাম নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্থগিত করায় খুবই খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

* আপনি তাও জানেন অথচ অপারেশন সার্চলাইট হচ্ছে এটা জানতেন না, বেশ ভালো তো!

** কিন্তু আমি জানতাম কর্নেল ফরমান আর ঐ জেনারেল কি নাম যেন... রাজা...

* খাদিম হোসেন রাজা। তখন সাহেবজাদা ইয়াকুবের অপারেশন চলছিল...

** না, ওটার নাম ছিল অপারেশন ব্লিৎসক্রিগ। প্রশ্ন হলো, কেন ঐ অপারেশন তৈরি করা হয়েছিল? এর জবাব হলো, এ রকম অভিযানের পরিকল্পনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ সম্পর্কিত নিবন্ধন আমি আপনাদের দেব। এ রকম দু-একটা নিবন্ধ লেখা রয়েছে। এর একটিতে জেনারেল ইয়াকুব তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, হ্যাঁ পরিকল্পনাটি আমিই তৈরি করি। কিন্তু সেটি ফরমান আপডেট করেছেন না হুবহু সেটিই বাস্তবায়িত করা হয়েছে সেটি আলাদা ব্যাপার। তবে ঐ পরিকল্পনার ব্যাপারে ইয়াকুবের যুক্তি ছিল সম্ভাব্য কোনো পরিস্থিতির জন্য একটা পরিকল্পনা তো চাই। তবে তিনি এ পরিকল্পনা অনুযায়ী অ্যাকশন নেয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি বরং সর্বাত্মকভাবে রাজনৈতিক দরকষাকষির পক্ষে ছিলেন, আর সে কারণেই তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়।

* জেনারেল ইয়াকুবের প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, তা ঠিক।

** তিনি তাঁর নিজ অবস্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি মুজিবের বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেন।

* এখন আমার অন্য একটি প্রশ্ন : লায়ালপুরে যে মামলার বিচার তখন চলছে সে বিষয়ে আপনি কি অবহিত ছিলেন?

** এ বিচার চলার বেশিরভাগ সময়টাতেই কেবল আমি এটুকুই জানতাম যে, ঐ মামলায় আসামি পক্ষের উকিল ছিলেন জনাব ব্রোহী ও আরেক জন। কোথায় এ বিচার চলছে আমি জানতাম না। এক লোক ছিলেন যার নাম লে. কর্নেল কাইয়ুম। তিনি পরে পাকিস্তান সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য বেঁচে নেই। এই লে. কর্নেল কাইয়ুম ছিলেন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের লিয়াজোঁ অফিসার।

* জেনারেল কাইয়ুম ঐ ট্রাইব্যুনালের সভাপতি, চেয়ারম্যান বা এমন একটা কিছু।

** নাম আমার মনে নেই তবে কর্নেল কাইয়ুম ছিলেন ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আইএসআই-এর জেনারেল জিলানীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। জিলানী ছিলেন আইএসআই-এর বড়কর্তা, আর কাইয়ুম ছিলেন তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন ও বন্ধু মানুষ। প্রেসিডেন্ট তাঁকে এ মামলার কোনো কথা ফাঁস না করার জন্য বলেন। তাই শুধু এই লোকটি ও আইনজীবী ব্রোহীই মামলার আসামির কাছে গিয়ে কথা বলতেন। আর কারও, এমনকি ব্রোহী সহযোগী উকিলেরও সে অনুমতি ছিল না। তিনি কিছু জানতেন না। আমারও এ নিয়ে কিছু করার ছিল না।

* না, আমি কেবল জানতে চাইছি, কখনো এ বিষয়ে আপনি জেনেছিলেন কি না?

** আমি জানতাম এ ধরনের মামলা হয়ে থাকে। তবে আমাকে কখনো কেউ বলেনি এ রকমই একটা মামলা এখন চলছে। আমাকে বলা হয়...

* না, খবরের কাগজেই তো খবর ছিল যে শেখ মুজিবের বিচার চলছে। আর তাই নিয়ে দেশে বিরোধিতাও চলছে। এ সবের খবর ছিল খবরের কাগজেই।

** ঠিক। তবে মামলা হয়নি আমি বলিনি, আমি মামলার গোড়ার দিকের কথাই বলছি। ব্রোহী সাহেব শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা লড়ার প্রস্তাব দেন। এখানকার আরো কিছু শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীও তাঁর পক্ষে মামলা লড়ার প্রস্তাব দেন। আসলে ওর কী হলো, কে কার মামলায় তাঁর পক্ষে লড়লো বা লড়লো না, মামলা কী প্রকৃতির হবে, কোর্ট মার্শাল না সামরিক বিচার, না অসামরিক আদালতের বিচার, সে বিচার কী ধরনের, কী প্রকৃতির হবে এসব নিয়ে অনেক গোমরই ছিল। কিন্তু মামলাই তো গেল ভেস্তে...

* আপনি কি ২৫ মার্চের অ্যাকশনের কথা জানতেন?

** আমি জানতাম কোনো একটা পরিকল্পনার আওতায় সেনাবাহিনী পঁচিশের রাতে অ্যাকশনে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে অ্যাকশনটি কী ধরনের, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কোথায় আসলে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল না। শুধু আমার কাছে মনে হয়েছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমি সেখান থেকে ফেরার পরপরই বোঝা গেল, না, স্বাভাবিক ব্যাপার ওটা ছিল না। ওটা ছিল একটা বিরাট ধরনের অপারেশন। করাচিতে আমি বিমান থেকে পা মাটিতে রাখতেই খবর পেলাম, ভূট্টো মহোদয় এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতি দিয়েছেন পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য। আপনারা ভূট্টোর সেই বিবৃতি খবরের কাগজের পাতায় নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমার কাছেও আছে। আমি সেদিন করাচিতে দেখলাম, সেখানকার লোকজন মিষ্টি বিলি করছে আনন্দে। এটা নজরে পড়েছে পেশাদার সৈনিকের চোখেও। এটির বিষয়ে আপনাদের একজন সাংবাদিক লিখেছেন। আছে নাকি আপনাদের কাছে বইটি? আপনারা তো লেখাপড়া করছেন, লেখক মানুষ। বইটি লেখা হাসান সাঈদের [জহিরের]। এসব নিয়ে আমরা তিনজনে কথা বলেছি : আমি নিজে, আলতাফ গওহর ও বেনজীর ভূট্টো। বেনজীর প্রধানমন্ত্রী থাকতে একদিন তিনি আলতাফ গওহরকে বলেন, জেনারেল উমরকে ডাকুন তো! গওহর আমার কাছে এলে আমি বললাম কবুল, আমার দিক থেকে আমি তো পরিষ্কার, আমি যাব, আপনি উনাকে জানিয়ে দিন। আমি অবশ্য পাকিস্তান কে বা কারা ভেঙেছে তাদের নাম করব না, তবে ঐ যুদ্ধ থেকে যে শিক্ষা মিলেছে তার কথাই বলব যে, তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। ভূট্টো ভেঙেছে, ইয়াহিয়া ভেঙেছে, মুজিব ভেঙ্গেছে–এসব বলতে আমি আগ্রহী নই। কেননা তাতে লোকে বলবে আমরাই তো পাকিস্তান ভেঙেছি। কাজেই ওতে কাজ নেই। ওটা থেকে সরে আসাই বাঞ্ছনীয়। এ হলো একটি দিক। আর দ্বিতীয়টি হলো এই বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ককেই আমি খুব বেশি রকম গুরুত্ব দিই। আমি সেইসব লোকেরই একজন যারা পাকিস্তানের সাথে আজন্ম সম্পর্কিত। পাকিস্তানের জন্মের সাথে আমার একটি বড় সম্পর্কের বাঁধন রয়েছে। আমি মনে করি, পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশও হতো না। আপনারা হয়তো আমাকে যুক্তি দেখিয়ে বলবেন, সাহেব, আপনি তো এমন সব মোক্ষম যুক্তি দেখাচ্ছেন, তর্ক করছেন কিন্তু মনে করে দেখুন, '৪৬-এর লাহোর প্রস্তাবে বাংলার প্রতিনিধি দল না এলে কী হতো! আপনারা এরকম হরেক যুক্তি দিতে পারবেন তবু একথা আমি বলব যে, বাংলাদেশ ভালো করছে...এ খবর আমাকে অত্যন্ত আনন্দ

দেয়। আমার গৃহে একটি বাঙালি বালক রয়েছে, বিশ্বাস করুন সে আক্ষরিক অর্থেই আমাদের পরিবারেরই একজন। আমরা এক সময় যে দোষ করেছি সে সময়েরই দোষঘাট মাত্র। আমার তো মনে হয়, আমাদের আলাদা হওয়ার দরকার থাকলে সে তো হতোই, হয়েছেও কিন্তু যে মর্মান্তিকভাবে তা হয়েছে, সেটিই ট্রাজেডি! আর কিছু প্রশ্ন আছে আপনাদের? বলুন!

* একটি প্রশ্ন হলো, সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের কাছে নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছিল...

** গোড়ায় সামরিক বাহিনী কিছু জড়িত ছিল। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে অবস্থা বদলাতে শুরু করে। মনে হতে থাকে পরিস্থিতির উন্নতির আশা নেই তবে নির্বাচনের আগেই একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কিছু রাজনৈতিক দল যদি মোটামুটি আসন না পায়—না পাওয়ার আশঙ্কাই ছিল বেশি—তাতে কিন্তু হবে না। মনে করা হয়েছিল তিন মুসলিম লীগ—ফজলুল [কাদের] মুসলিম লীগ, খান আবদুল কাইয়ুমের মুসলিম লীগ আর মিয়া মমতাজ দৌলতানার মুসলিম লীগ ক্ষমতায় আসতে না পারলেও কয়েকটি আসন পাবে আর তাতে বড় রকমের বিভেদ দেখা দিতে পারবে না। মুজিব সাহেবের সঙ্গে দৌলতানার যোগাযোগই ছিল সবচেয়ে বেশি। ফজলুল কাদের চৌধুরী ইতোমধ্যেই এ দুনিয়া ছেড়ে গেছেন। সে যা-ই হোক, এই তিন মুসলিম লীগের ওপরও জামায়াতে ইসলামী ছিল। সেই জামায়েত বলেছিল যে, মুসলিম লীগ যদি এক হয় তাহলে ঐ দল নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করবে না বরং মুসলিম লীগও ডানপন্থী দলগুলিকে সমর্থন জানাবে। তবে তারপর যা ঘটে তা হলো, মুজিব নাকি ইয়াহিয়াকে বলেছেন, কী হবে আমি বলতে পারি না, যে কোনো কিছুই হতে পারে। তবে এর সত্যাসত্য আমি কিছু জানি না। মুজিব ও দৌলতানার মধ্যে কিছু আলাপ হয়। তবে গোড়া থেকে জনসাধারণের দিক থেকে যা ঘটে তাতে বোঝা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তারা পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের কোনো অফিস খোলেনি, কাউকে নির্বাচন প্রার্থী করা হয়নি সেখান থেকে। আর এসবের মাঝে তাদের মনোভাব ফুটে ওঠে। ফলে আমরা এখন নিশ্চিত বলতে পারি, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খসে যাক—শুধু তিনি (ভূট্টো) এটাই চাননি, তিনি আরো কিছু চেয়েছিলেন আর সেজন্য তিনি সবকিছুই করেছেন। যখনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে, একটা না একটা চাতুরি খেলেছেন সব সময়। বলেছেন, এটা করুন, সেটা করুন। আমি এরকমই একটি ছলচাতুরির একজন সাক্ষী। পূর্ব পাকিস্তান তো নির্বাচনে এখানেও দু-একজন

প্রার্থী দিয়েছিল, মুজিব সাহেবের রাজনৈতিক দলের দফতরও ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কিছুই ছিল না। তাই নির্বাচনের ফল যখন এলো তখন অনেকে মনে করলেন, দুটি দলের মধ্যে একটা কোনোরকমের সমঝোতা হবে। যদি এই মর্মে সমঝোতা হতো যে, ঠিক আছে, আমরা বিরোধী দলের আসনে বসব, আপনারা সরকার গঠন করুন, সে-ই ভালো হবে। কিন্তু তা হবে কী, উল্টো এমন কথাবার্তা শুরু হলো যে, আরে, ওরা তো আমাদের ফতুর করে ছাড়বে, লুটে নিয়ে যাবে। ভূট্টো বললেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছি। এসব কথা রীতিমতো তার প্রকাশ্য বিবৃতিতেই রয়েছে। আমি এর একটা দৃষ্টান্ত দেব। ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে ঢাকায় ছোটখাটো গোলযোগ হয়েছে–এ রকম বার্তা আসে জেনারেল ইয়াকুবের কাছ থেকে। আমি তখন করাচিতে আসি। আমি এসেছিলাম সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে; এক বিয়ের অনুষ্ঠানে শরিক হবার জন্য। প্রেসিডেন্ট সাহেবও করাচিতে। আমার কাছে টেলিফোন এলো, প্রেসিডেন্ট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যা হোক আমি নির্দেশ পেয়ে গিয়ে দেখি ইয়াহিয়া ও ভূট্টো দুজনে কথা বলছেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, দ্যাখো পূর্ব পাকিস্তানে এই বার্তাটা পাঠাতে হবে। বলতে হবে, পরিস্থিতি বুঝে জোরালো অথচ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নিতে হবে। কথা কানে যেতেই ভূট্টো সাহেব খৈ ফোটাতে শুরু করলেন, আরে কড়া ব্যবস্থা নিন, এটা করুন, সেটা করুন। আমি প্রেসিডেন্টের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, দেখুন এত কথার কী দরকার, আপনার নির্দেশ কী সেটা বলুন মি. প্রেসিডেন্ট। 'আরে তুম যাও ভাই আপনা মেসেজ দে দো।' আমি ডিভিশন সদর দফতরে গিয়ে বার্তা দিলাম : হ্যাঁ, ইয়াকুব সাব, শক্ত হোন, তবে কোনো অন্যায় নয়। আপনার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে। আরেকটি সভার কথা। আমার এক ভাই পাকিস্তানের আশঙ্কা বা ভয়ভীতির কারণ কিসে কিসে জানতে চেয়েছিল। সে আসলে তখন নানা বিষয়ে ড্রাফটিংয়ে হাত পাকানোর মহড়া দিচ্ছিল। বললাম, আর কী! পাকিস্তানের রয়েছে জাহেলিয়াতের ভয়, বেরোজদারির ভয়, ডিমের ভয়, এই যেমন আপস করে থাকার মদদের ভয়, জনসাধারণের অংশীদারির চেতনা নেই–তার ভয়। আর আমি এসবের বিষয়ে মনোনিবেশ করে প্রেসিডেন্টের কাছে নোটের পর নোট পাঠাচ্ছি আর যেখানে সামরিক ভয়, আশঙ্কা আছে সেসব বিষয় পাঠাচ্ছি আমার প্রতিরক্ষা সহযোগীর কাছে, তার বিবেচনার জন্য। বিষয়টি ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক যোগাযোগের কারণে; সেটিও তো একটা হুমকি। আমেরিকানদের মনোভাবও হুমকি। যাক এসব, আমি ভূট্টোকে বললাম, তো জনাব ভূট্টো, আপনি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহমূলক

কার্যকলাপের পরিকল্পনার খরচটা যোগাতে যাচ্ছেন নাকি? হাসতে হাসতেই বললাম কথাগুলি। আর এর পরিণতি হিসেবে আমাকে হয় জেলে, নয় বাড়িতে অন্তরীণ কাটাতে হলো। আমি এরপরেও ভূট্টোর ঘর রক্ষার চেষ্টা করেছি। আমি নির্বাচনের ফলাফলের আলোকে বলতে চাইছিলাম, ক্ষমতার একটা ভাগাভাগি করে নেয়া তো যায়, একটি দল বিরোধী পক্ষে আসন নিতে পারে আইনসভায়। তাঁরা দৌলতানার মতো লোক বা রাজনৈতিক দলের পরামর্শও তো নিতে পারে। দৌলতানা তো বলেছেন, ধরো, একটা সরকার তোমরা গঠন করো যাকে জাতীয় সরকার হয়তো বলা যাবে না তবে আমরা পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সরকারের সকলের দলের প্রতিনিধিত্ব তো দিতে পারি। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়! তিনি সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের কাছে ঘেঁষবেন না। অথচ সেই তিনিই পোঁ ধরেছেন, জাতীয় নেতা হবেন। এদিকে, হুঁশ নেই তার চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পূর্ব পাকিস্তানে বসে আছে।

* আপনি জেনারেল নিয়াজীর বই পড়েছেন? তিনি তো লিখেছেনই, তার ওপর ইসলামাবাদের জেনারেলরাও তো পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভাবে না। এই অভিযোগ কি সত্যি?

** নিয়াজী ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছেন। ও ব্যাটা তো লুটপাটেই ব্যস্ত ছিল, ওর স্বকীয়তা কী করে থাকে?

* তিনি তো বলেছেন....

** বলেছেন! কেউ যদি সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই বকর বকর করতেই থাকে, বকলেই হলো! আমার অনেক বন্ধুই তার এসব বকোয়াজ রীতিমতো ঐ সময়টায় পর্যবেক্ষণ করেছে, সমীক্ষা চালিয়েছে।

* তিনি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে আলাদা করার একটা পরিকল্পনাই ছিল। ভূট্টোর সমর্থনক্রমে জেনারেলরা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। তিনি বলেন যে, আপনার পদটি...

** যা খুশি তিনি বলতে পারেন, সেটা তাঁর অধিকার। তবে বস্তুতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা হলো, গোটা সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি বয়স হয়ে যাওয়া ব্যক্তি যাকে ওরকম একটা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁর সেই মেধা নেই। তিনি সুস্থ ও মানসিক ভারসাম্যের অধিকারী ব্যক্তি নন। তবে তিনি তাঁর ক্যারিয়ারে যা করে নিয়েছেন সেটাই তাঁর বাহাদুরি, সেটা অবশ্য অন্য জিনিস। আমরা এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করছিলাম। সোজা গিয়ে কমান্ড নেয়া, তাও স্বাধীনভাবে এটা নিরেট কসাই হওয়ার কোনো কাজ নয়।

* উনি তো ছিলেন শের বা টাইগার নিয়াজী!

** টাইগার! ওটা তো আমাদের এক কার্যক্রমেরও নাম....

* কোথাও গলদ ছিল। জেনারেল ইয়াকুব পরিকল্পনাটি করেছিলেন এ রকম কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য। আর জেনারেল নিয়াজী ছিলেন সিনিয়ারিটি তালিকার অনেক নিচের দিকে। তার অবস্থা এমন কিছু আহামরি ছিল না। আপনি কি মনে করেন, নিয়াজীর সিনিয়র জেনারেলরা পূর্ব পাকিস্তানে তখন যে পরিস্থিতি চলছে সেই বিবেচনায় সেখানে যেতে চাননি?

* ঠিক বলেছেন। তাদের অনেককেই বলা হয়েছিল, তাদের কেউ যেতে চাননি। আর সেখানে এই লোক বলেন, 'হাম জায়েঙ্গে। বাঙালিকো এক মিনিট মে ঠিক করে দেঙ্গে,' এ ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি করেছিলেন নিয়াজী। করবেনই তিনি, কেননা সে মেধাই তার ছিল না। আমি এ মন্তব্যের জন্য দুঃখিত। আমি নিজেও অতি সাধারণ একজন সৈনিক। সেই আমার মূল্যায়নেও নিয়াজী একজন ভালো যোদ্ধা, আঘাত হানা, সাহসিকতা দেখানো ইত্যাদির জন্য। তবে জটিল সমস্যার সঙ্গে পাল্লা দেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আপনারা জানেন, একজন সামরিক অধিনায়কের জন্য এমন সামরিক কম্যান্ডের মুহূর্ত আসে যখন তাকে সামরিক অধিনায়কেরও ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হয়। তিনি তখন আর সমরনায়ক থাকেন না। আইসেনহাওয়ারের কথাই ভাবুন। তিনি বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি যখন কেবলমাত্র সমর অধিনায়ক ছিলেন না। তাঁকে বহু দেশ ও জাতিকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল, বহু সমস্যাও দেখতে হচ্ছিল। তাঁর শতকরা ৯০ ভাগ কাজই ছিল অসামরিক।

সেনাসংগঠন হয়তো একটা পরিকল্পনা করে দিয়েছে এবং কার্যক্ষেত্রে অবস্থা অনুযায়ীই চলে সব। ঐ রকম পরিস্থিতিতে কেউ কম্যান্ড দেবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে গেলে, এমনকি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও তাঁকে ঐ মেধার হলে চলবে না। তাঁকে হতে হবে ঋজু চরিত্রের টাইগার, ঠাণ্ডা মাথার লোক। তাকে বলা হয় টাইগার, বাঘ, কিন্তু আমরা খোলা চোখে তেমন কিছুই আমি দেখি না, তার মতো লোক ঐ জায়গায় একেবারেই বেমানান। আমি তার সামরিক সামর্থ্যের সমালোচনা করছি না। রণক্ষেত্রে আমি আমার দুশমনের ব্যাপারে ধূর্ত, শয়তান হতে পারি, কিন্তু কেউ তার নিজের লোকের বেলায় এমন হতে পারে না। অনেক জিনিস সমাধান করতে হয় অত্যন্ত সতর্কভাবে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আমি এ সম্পর্কে একটা লেখা দেব আপনাদেরকে। আমি আপনাদের বলতে চাই, সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আন্তরিক অভিপ্রায়

ছিল না। আমি এ জন্য সুনির্দিষ্ট করে কারও নাম নেব না। আমি মনে করি, কার্যত প্রায় প্রত্যেকেই এতে অবদান যুগিয়েছে, জেনে না জেনে, তা সবাই কমবেশি এ জন্য দায়ী। একাত্তরে যা ঘটেছে তা শুধু একাত্তরেরই ব্যাপার নয়। আমি একেবারে গোড়া থেকেই বলেছি, ভারতের মতলব ছিল, মতলব ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করে দিতে হবে; আর সে জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে...

* মাফ করবেন, আমার প্রশ্ন রয়েছে। আপনি বলছেন, ভারত সব সময় পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছে। আবার বলছেন, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিল বিরাট বৈষম্য। এ জন্য পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল আর তারই পরিণতি ১৯৬৯। তাহলে এ দুয়ের মধ্যে আপনি সম্পর্ক তৈরি করছেন কীভাবে? আসলে তো এ দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়!

** পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলও ছিল....

* বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানিরা অসন্তুষ্ট ছিল।

** ঠিক।

* তাই তারা তাদের সঠিক অংশের অধিকার পেতে চেয়েছিল। সে কারণে ঐ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কেন, তাহলে কেন আপনি বলছেন, ভারতের স্বার্থ থাকতে পারে? তাদের বিষয় নয় এটি, এ ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বার্থের বিষয়।

** না, তারা এমন কিছু ছিল না যা করেনি।

* কেমন করে সেটা?

** পূর্ব পাকিস্তানে তখন প্রচারণা চলছে।

* কী ধরনের?

** ভারতীয়রা সজাগ ছিল। তারা এও জানত পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্রীয় সরকার দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য কাজ করছে। ঠিক এ অবস্থায় একটি লোকের নামে পরিস্থিতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে শত উপায়ে শোষণ করা হয়েছে তা নিয়ে লোকজন ছিল সোচ্চার। চাপও ছিল চারদিক থেকে। তখন তাই অনেক কিছুই ঘটছিল। কিছু কৌতূহলোদ্দীপক কথা আমি আপনাদের বলতে চাই। আমি পূর্ব পাকিস্তানকে তেমন নিবিড়ভাবে জানি না। তবু হিন্দুরা যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়, কত শিক্ষক ছিল পূর্ব পাকিস্তানে? খুব একটা সংখ্যা তাঁদের কমেনি, কেন? ব্যাপারটা শুধুই কি কাকতালীয়?

* আপনি কি বলতে চাচ্ছেন হিন্দু শিক্ষকরা পশ্চিমবঙ্গে দেশত্যাগ

করে যায়নি?

** গিয়েছিল। কিন্তু আমার কথা হলো, এত বিপুল সংখ্যায় তারা থেকেও গেল!

* মোটেও তা নয়। আমরা তো তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ও পরিসংখ্যান তো আমার জানা। কিন্তু আপনি বলছেন... সে যাক, জিজ্ঞেস করি আপনি তো একজন একাডেমিক ব্যক্তিত্ব। আপনার মননের বিচারেই এ ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত। আপনি বলতে চান, এখানে একটা প্রচারণা আছে বা এরকম কিছু চলছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের অভিযোগের কথা যারা তুলছে বা এসবের যারা প্রবক্তা তারা ভারতীয়দের দ্বারা প্রভাবিত।

** সবাই নয়। তবে তাদের মহলের ভেতরের কিছু লোক...

* তো তাহলে ঠিক আছে...

** আমি শুধু সাধারণ একটা...

* আমাদের বলা শুধু আপনি প্রশ্ন তুলেছেন বলে। প্রফেসর রেহমান সোবহানের কথা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই। তিনি বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর জামাতা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তরুণ অর্থনীতিবিদ হিসেবে এক অর্থনৈতিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই বৈষম্যের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। আর তাই সেই আলোকে বৈষম্যের বিষয়টি পরিকল্পনা কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত হয়।

** আমি ওটা জানি।

* জ্বি হ্যাঁ, এসব দলিলপত্রেই রয়েছে। রয়েছে সাহিত্যেও, কাব্যে, রয়েছে তাতে বৈষম্যের একটি বিরাট ফিরিস্তি!

** তবে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, এই বৈষম্য দূর করার প্রয়াস অনেকখানি এগিয়েছিল, কম অংশীদারির অনুভূতিও কমে আসছিল আর তেমন অবস্থায় যদি বলা হয় ভারত সুযোগ নেয়নি শতেক উপায়ে, আমার কী বলার আমার জানা নেই।

* আমাদের বঞ্চনা কী, তা কারও না বোঝার কথা নয়, আমরা যা নই, মানে আমি বলতে চাই...

** আমি সে কথা বলিওনি যে ভারতই শুধু করেছে। আমার প্রতিপাদ্য ছিল, ভারত অপেক্ষায় ছিল অনুকূল পরিস্থিতির। পাকিস্তানে এত বিশৃঙ্খলা, এত দুর্যোগ যখন এলো তখনই কেবল ওরা ভাবল, এটাই আঘাতের মাহেন্দ্রক্ষণ।

* ঠিক আছে। আপনি যা বলতে যাচ্ছেন তা সবই ঠিক। কিন্তু আমরা

আসলে যা বলতে চেষ্টা করেছি তা হলো, আপনি যে সব যুক্তি খাড়া করছেন, রাও ফরমান আলীও কমবেশি সেসব যুক্তিই দিয়েছেন। তিনিও বলার চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দু শিক্ষকরাই নাটের গুরু, এমনকি আপনি তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কেও বলেছেন...

** আমি এত কিছু জানি না। ওটা ইয়াহিয়ার ব্যাপার, আর আমার পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে, বাংলাদেশ সম্পর্কে, ওসমানী সম্পর্কে, গোটা নির্বাচন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো এই যে, আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ এসব সমস্যা সুরাহার চেষ্টা করেনি, আর কেউ করে থাকলেও তা দায়সারা ধরনের। একবার ইয়াহিয়া সাতজন বাঙালি অফিসারকে এক সাথে পদোন্নতি দেন। সেটা একদিনেই ঘটে। তাতে প্রতিক্রিয়া হয় একান্ত বিপরীত। কেউ সারাটা সময় কাজ করে না, হুঁকা টানে, তাদের গাত্রদাহ ঘটে। আমি প্রতিবাদ জানাই। বলি, ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে! সাতজন লোককে তুলে নিয়ে প্রমোশন একেবারে ফুল সেক্রেটারি হিসেবে? এ রকম একটা ভাবসাব। আসলে এর ব্যাখ্যা শুধু এই হতে পারে যে, নিজের ভালো এমন কিছু হলেও অনেকের তা পছন্দ হয় না।

* আমরা তো দেখছি, আপনি এসব ভালোই জানেন, তাহলে কেন আপনি ভারতীয় জুজু চোখে দেখেন? আপনি এর কারণ কী কী তা বলবেন?

** অবশ্যই, আমার হিসেবে ইতোমধ্যে ২৫টা বছর পার হয়েছে। সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে। ওটার প্রভাব তখন থেকেই পড়তে শুরু করেছিল। রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই। তবে তাঁকে তুলে ধরা হচ্ছিল পরম শুভ হিসেবে। এই ঠাকুরকে সাগরপারে, বিদেশেও ওঠানো হচ্ছিল। আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাজটা হীন, নোংরা। গোড়ায় নমঃ নমঃ সূচনা, সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো– যে সাফল্য এর আগে আর কখনো আসেনি। এমন ঘটনা নিত্য আমার সামনে ঘটেছে, আমার সামনে মারমুখী হয়ে বলেছেন, সাহেব আমরা বাঙালি। আর আমি জানি আমি মুসলিম। আমার নাম দেয়া হয়েছে দূরদেশী আরবি বীরদের নামে। এসব ব্যাপার বহুদিন ঘটতে পারেনি। অবস্থা ছিল টাইট, নিশ্ছিদ্র। সাহিত্যের লেনদেন হবে–তাতে আপত্তির কী আছে! তবে কোনো চক্রান্ত, কোনো পরিকল্পনা একদিনে ফলে না, ওরাও তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি রাতারাতি। ওরা কেবল আমাদের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসেছে। আমার মূল বক্তব্যটি ওরা আমাদের দুর্বলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে, আমরা যখন ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছি তখনই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে–লোহা গরম হয়েছে ঠিকমতো, এখনই আঘাত হানার

সময়।

* আপনি কি মনে করেন, সাধারণভাবে পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা পাকিস্তানের প্রতি কখনো অনুগত নয়?

** এটা ঢালাওভাবে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে কিছু লোক তো খেলায় থাকে, সবাই নয়। দেখুন, আজকাল দালাল বানাতে পয়সা হলেই হয়, তবে যাদের তা বানানো হবে তাদের মনন বা মানসিকতা যদি অনুকূল থাকে কাজটা শতেক উপায়ে করা সহজ হয়ে পড়ে। আমি একটা নজির দেব। এক গুরুত্বহীন লোক ফতুয়া, পাঞ্জাবি পরত, সে লিখল, আমি একজন কমিউনিস্ট, পুরানো কথাই পাড়ছি আপনাদের কাছে। সে কোনো চর ছিল না তখন। যা হোক, তার কথার যাদুকরী মাদক প্রভাবে লোকজন তাকে প্রচুর চাঁদা দিল। লোকটার ছিল একটি মোটরসাইকেল, হাঁকালো মোটরকার আর তারপর–হয়ে গেল মহা কমিউনিস্ট! আর এভাবেই তো সব ঘটে। এমন অনেক বিভ্রান্ত, বিচ্যুত ব্যক্তি আছে, তাই বলে সে যে পাকিস্তান ভেঙে খান খান করতে চায় এমন নয়। তাকে উস্কে তোলা হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে। ভাষা বিরোধকেও এরকম মিহি চালে কাজে লাগানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল দ্বিভাষিক রাষ্ট্র হবে, তাতেও কাজ হলো না, সর্বাধিক সমালোচনা এলো ভারতের দিক থেকে। ভারত সুযোগ নিতে থাকল। আমরা সমালোচনায় মুখর হলাম, একে অন্যের বিরুদ্ধে, বাঙালিরা উর্দু নিচ্ছে না কেন,.... তবে এ সিদ্ধান্ত এক পর্যায়ে হলো দ্বিভাষিক রাষ্ট্র হবে। যা হোক আমরা তখন একাধিক জিনিস নিয়ে একের পর এক ভুল করছিলামও আর ভারত তার ফায়দা তুলছিল। আজকে তাদের লক্ষ্য হলো পাকিস্তানকে ভাঙা নয়, বাংলাদেশকেও নয়। তারা এটুকু নিশ্চিত করতে চায় আপনি তাদের লাইনে থাকুন, আর তারা হবে এই অঞ্চলের সিদ্ধান্ত নেবার মালিক। আমি অবশ্য নিজে ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের পক্ষে।

৩৩

এই হলো জেনারেল উমরের বক্তব্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। তিনি সাক্ষাৎকারে যা বলেছেন, বই লিখলে তা-ই বলতেন, হয়তো ঘটনার বিস্তৃতি ঘটত মাত্র। জেনারেল উমরের কাহিনী কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা আলোচনা করব অন্যান্য তথ্য ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। পাকিস্তানি জেনারেলদের প্রতিটি কাহিনী এভাবে বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।

প্রথমে দেখি জেনারেল ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক নীতি নির্মাণে উমরের

ভূমিকা ছিল কি না যা তিনি অস্বীকার করছেন। এ সম্পর্কে সবচেয়ে পুরানো ভাষ্য মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খানের। তিনি লিখেছেন (১৯৭২) উমর সম্পর্কে যে, ইয়াহিয়ার নিজস্ব যে চক্র ছিল তাতে ন্যাশনাল সিকিউরিটির প্রধান হিসেবে উমরও অন্তর্ভুক্ত হলেন। "He was an opinionated man and took pride in his supposedly superior knowledge of Pakistan affairs, and how they should be handled." চক্রের মধ্যে, উল্লেখ করেছেন ফজল মুকিম, তিনিই প্রেসিডেন্টের 'ট্রাবল শুটার' হয়ে উঠছিলেন, উমর কথা বলতে পারতেন, ছিলেন শিক্ষিত এবং এ কারণে বোধহয় প্রেসিডেন্টকে প্রভাবান্বিত করতে পারতেন।

জেনারেল নিয়াজী (১৯৭১) তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, জেনারেল উমর গোড়া থেকেই নীতি নির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়ে একটি ভূমিকা পালন করেছেন, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই তিনি রাজনীতিবিদদের বলছিলেন ঢাকায় না যেতে। শুধু তাই নয়, যারা পূর্বপাকিস্তানে আছে তারাও ঐ স্থান ত্যাগ করলে ভালো। এ দেশটিকেই পরিত্যাগ করা উচিত। নিয়াজীর ভাষায়, "The reason he gave was that East Pakistan had became a hub of international intrigue. Therefore, it should be discarded." তিনি আরো জানাচ্ছেন, সরকার তখন কেন্দ্রীভূত প্রেসিডেন্ট হাউসে। এবং সেখানে বসে দেশ ও পূর্ব পাকিস্তানের সব ব্যাপার চালাচ্ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া, হামিদ, পীরজাদা, উমর ও মিঠা।

এবার ২৫ মার্চের ঠিক আগের কথায় আসি। ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকি ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জনসংযোগ অফিসার। তিনি লিখেছেন, ঢাকার পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে-সব মন্তব্য ও ছবি ছাপা হচ্ছিল তাতে জেনারেল ইয়াহিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। তখন, সিদ্দিকির ভাষায়, ইয়াহিয়ার প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা জেনারেল উমর এসে তাঁকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অভিযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, "What sort of DPR are you, he asked, if you cant even control these (বাঙালি) bastards."

আরো পরে জেনারেল উমরকে নিয়ে নিরাপত্তা কাউন্সিল করেছিলেন ইয়াহিয়া। শের আলি তখন প্রচার মন্ত্রী। উমর একই সঙ্গে শের আলির হয়েও কাজ করছিলেন। লিখেছেন সিদ্দিকি– "It was a sort of cross between intelligence and PR. Yahyah desired the two generals to control the strong drift towards political extremism."

জেনারেল উমর কি গণহত্যা সম্পর্কে জানতেন, বা মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় কী ঘটছিল তা কি অজানা ছিল তার? উমর বলেছেন, না তিনি কিছুই জানতেন না। নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব কিছুই জানতেন না? না,

উমরের উত্তর, আমি একজন সদস্য ছিলাম মাত্র।

তাহলে এবার শুনুন রফি রাজার বয়ান। রফি রাজা ছিলেন পিপিপির নেতা। ২৫ মার্চের আগে ঢাকায় এসেছিলেন ভূট্টোর সঙ্গে। ২৬ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমায় বলেছেন– "জেনারেল উমরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঢাকায়। ২৫ মার্চ তিনিও ছিলেন সেখানে। আমরা যখন প্লেনের ভেতর বসে আছি। উমর বেশ একটা ভাব নিয়ে ঢুকল সবার পরে। ভাবটা, মস্তো এক কাজ করে এসেছে। কারো সঙ্গে কথা বলল না উমর। এমনকি ভূট্টোকে দেখেও মনে হলো না সে তাকে চেনে। ১৯৭১-এর সব ঘটনায় উমর অবশ্যই ইনভলভড্ ছিল।"

গণহত্যার ব্যাপার উমর জানতেন না? এ-প্রসঙ্গে আলাপ করি পাকিস্তানের এক সময়ের ডাকসাইটে আমলা আলতাফ গওহরের সঙ্গে। তিনি এ প্রসঙ্গ তুলতেই হেসে ফেললেন। বললেন, উমর ও রোয়েদাদ খান (তৎকালীন তথ্য সচিব) তখন প্রায়ই যেত ঢাকায়। ঢাকা থেকে ফিরে এসে আমার বাসায় আড্ডা দিতে আসত। তখন তারা জানাত ঢাকার সব কথা। সুতরাং, কোথায় কী ঘটছে সব কিছুই তারা জানত।

গণহত্যার বিষয়টি নিয়ে বারবার জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে একসময় উমর বললেন, "সব কিছু পরে জেনেছি। জানেন, আপনারা আসার আগে আপনাদের জন্য কোরান পড়ছিলাম আর সে সময়কার কথা মনে করে আপনাদের জন্য কাঁদছিলাম আর দোয়া করছিলাম।"

আলতাফ গওহর এ প্রসঙ্গে বললেন, "এখন সবাই এ ধরনের কথা বলছে। ফিলোসফিক্যাল ভাব দেখাচ্ছে। এরা সবাই ১৯৭১ এর পর ভালো ভালো চাকরি পেয়েছে। উমর তো একটি ইনস্টিটিউটের প্রধান ছিল। এখন নাকি আবার দরবেশ দরবেশ ভাব করে!"

এই ছিল পাকিস্তানি জেনারেলরা। এ ভাবেই ২৫ বছর তারা পাকিস্তান চালিয়েছিল। বাঙালিদের হাতে পর্যুদস্ত হওয়ার পরই প্রথম তাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে।

৩৪

লে. জেনারেল গুল হাসান ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শেষ কমান্ডার ইন চিফ, ১৯৭১ সালের নীতিনির্ধারকদের একজন। বলা হয়ে থাকে, তিনি ছিলেন ভূট্টোর সুহৃদ এবং পাকিস্তান ভাঙায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ভূট্টো

ক্ষমতায় এসে প্রথমেই যে কাজটি করেছিলেন তাহলো তাকে কমান্ডার ইন চিফ করা। কিছুদিন পর তাকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয় অস্ট্রিয়া এবং গ্রিসে। এরপর ভুট্টোর সঙ্গে তার মনান্তর হয় এবং এক কড়া চিঠি লিখে তিনি পদত্যাগ করেন। হয়তো, এসব কারণে তার মনে হয়েছে আত্মজীবনী লেখার। ১৯৯১ সালে তিনি শেষ করেন 'মেমোয়ার্স' কিন্তু তখন তা প্রকাশ করেন নি, কারণ বেনজীর মাত্র ক্ষমতায় এসেছেন। তার বই বেনজিরবিরোধীরা ব্যবহার করুক তা তিনি চাননি। ভুট্টোর সঙ্গে তার মনান্তর হতে পারে, বেনজিরের সঙ্গে তো নয়। ১৯৯৩ সালে তাই প্রকাশিত হয় জেনারেল গুল হাসানের আত্মজীবনী 'মেমোয়ার্স'।

এ-বইয়ে তার জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ আছে। কিন্তু আমি ব্যবহার করেছি যে অধ্যায়গুলি সেগুলিতে এসেছে বাঙালি বা বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।

কোয়েটার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে গুলের জন্ম ১৯২১ সালে। বয়স হতেই অন্যান্য মুসলমান পরিবারের মতো তাকেও সেনাবাহিনীতে পাঠানো হয়। তিনি একদিকে ভাগ্যবান। চাকরির শুরুতে (১৯৪২) নিয়োগ পান জেনারেল নিকলসনের এডিসি হিসেবে তারপর জেনারেল স্লিমের। স্লিমের এডিসি হওয়ার সুবাদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভ্রমণ করেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে, নিযুক্তি পান কায়দে আজম মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র এডিসি হিসেবে যদিও এডিসি হিসেবে তিনি আর কাজ করতে চাচ্ছিলেন না।

জিন্নাহ্‌, তার মতে, পাকিস্তান চাইলেও সব ধর্মের প্রতি ছিলেন সহিষ্ণু, মিতব্যয়ী এবং শৃংখলাপূর্ণ। মোল্লারা ভেবেছিলেন, পাকিস্তানে তারাই হবে আধিপত্যকারী কিন্তু জিন্নাহ তাদের প্রশ্রয় দেননি। ফলে, পাকিস্তানকে তারা বলত নাপাকিস্তান এবং জিন্নাহকে কাফিরদের রাজা।

জিন্নাহ্‌র এডিসি হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর মাঠপর্যায়ের পোস্টিং পান। ১৯৬১ সালে নিযুক্ত হন ডিরেক্টর আর মিলিটারি অপারেশন যেটি তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিং। এরপর মুলতানে আর্মাড ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন। ১৯৬৮ সালে হন সিজিএস। এ সময়টুকুর এক বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন যাতে উল্লেখ করেছেন সেনাবাহিনীর গঠন, পাক-ভারত যুদ্ধ ইত্যাদি যা আমাদের আলোচনার জন্য প্রয়োজন নেই। এখানে তার একটি মন্তব্য উল্লেখ্য। লিখেছেন গুল, তিনি যখন ডিএমও হন তখন সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে খানিকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। অনেকে বলাবলি করছিল, সেনাপ্রধান মুসা যেহেতু বালুচি, তাই আরেকজন বালুচিকে এরকম

গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছেন। তার মতে, "... Parochialism, sectarianism any sycophancy can devastate any country or institutions including a well-disciplined army."

সুতরাং, অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে রাজনীতিবিদ, আমলা সেনাবাহিনীকে এসব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এটি যদি তার আন্তরিক ভাবনা হয় তাহলে বাঙালি, বাংলাদেশ, বাঙালি রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে পশ্চিমপাকিস্তানের জেনারেলরা যখন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি প্রতিবাদ করেননি কেন? এবং তার পুরো বইতে, বাঙালি, রাজনীতিবিদ সম্পর্কে একটি সহানুভূতিপূর্ণ বাক্য নেই, শুধু তাই নয়, এরপর তিনি অনেক মন্তব্য করেছেন তা উল্লিখিত মন্তব্যের বিপরীত। আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেব।

গুল হাসান লিখেছেন, পাকিস্তানে যদি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ভিত্তি থাকত তাহলে সেনাবাহিনীকে এত ঝামেলা পোহাতে হতো না। যদি রাজনৈতিক সরকার থাকত তাহলে সেনা ম্যানুপুলেশন হতো না। পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ভিত্তি থাকলে পাকিস্তানের থাকত প্রথম শ্রেণীর সেনাবাহিনী। তারপর তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর কৃষ্ণমেনন ও জেনারেলদের নেহেরু বরখাস্ত করেছিলেন। এখানে, গুল স্বীকার করে নিচ্ছেন, দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার ফলে সেনাবাহিনী আর প্রথম শ্রেণীর থাকেনি। কিন্তু গুল প্রশ্ন রাখেননি নিজের কাছে যে, আইয়ুব খান ও জেনারেলরাই জোর করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং বেসামরিক কর্তৃত্ব যাতে বিস্তৃত না হয় সে চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানের ৫০ বছরের ইতিহাসই হচ্ছে বেসামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

বইয়ের উপসংহারে আবার গুল হাসান বলেছেন, রাজনীতিবিদরা সামরিক আইন আনার পরিবেশ তৈরি করেন। এটি যেন না করা হয় এবং সেনাবাহিনীও যেন কথায় কথায় সামরিক শাসন জারি না করে। আসলে তিনি কোন পক্ষ নেবেন তা ১৯৯৩ সালেও ঠিক করতে পারেননি। কারণ, আজীবন তিনি বা তারা ছিলেন সামরিক শাসনের বেনিফিশিয়ারি।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, আইয়ুব ক্ষমতা দখলের পর যে ভুলটি করেছেন তাহলো রাজনীতিবিদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। তাদের তিনি অজ্ঞ, নীতিহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে বর্ণনা করে বলেছেন, তাদের পরীক্ষা নেয়া উচিত ছিল এবং তারপর নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট না হলে আবার নির্বাচন। সে নির্বাচনেও কেউ যদি সরকার গঠন করতে না পারে তাহলে চার-পাঁচ বছরের জন্য আবার জারি করতে হবে সামরিক আইন। এই কয়েক বছরের মধ্যে

রাজনীতিবিদদের তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। এই এক্সপেরিমেন্ট চালালে বেসামরিক কর্তৃত্ব কিভাবে ভিত্তি পাবে? গুল হাসান এই প্রশ্নের উত্তর দেননি। তাছাড়া সামরিক আইনের অধীনে রাজনীতিবিদরা কীভাবে প্রমাণ করবেন যোগ্যতা? এই যোগ্যতা কি প্রমাণিত হবে সামরিক শাসকদের অনুগ্রহের? এর উত্তরও তিনি দেননি। জেনারেলদের অর্ডারের মতো তিনি শুধু মন্তব্য করে গেছেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে 'hobnobbing' করেছিলেন। ভারত তাঁকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র দিয়েছিল। কথা ছিল, পূর্বপাকিস্তানের এক অংশ দখল করে শেখ সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেবেন এবং ভারত তখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি মূল্যায়ন করেছেন এভাবে যে, শেখ মুজিব আমেরিকা থেকে স্টাইপেন্ড পেতেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ধনী হিন্দুরা তাঁকে টাকা যোগাতেন। পাকিস্তান যে সবের প্রতীক, শেখ মুজিব ছিলেন তাঁর বিপরীত এবং তাই তিনি ছিলেন পূর্বাংশের "Most amenable leader." এরপর ভারতীয়রা তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদের ব্যাপারে প্রভাবিত করে। এই প্রত্যয়ের ওপর ভিত্তি করে শেখ মুজিব, তাঁর সহকর্মীরা বা ভারতীয়রা বা সবাই মিলে সৃষ্টি করে ছয়দফা। ছয়দফা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে না নেয়ায় অসহিষ্ণু হয়ে তাঁরা করেন আগরতলা ষড়যন্ত্র।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শেষে হলো গোলটেবিল বৈঠক এবং তারপর যে সব 'ট্র্যাজিক' ঘটনাবলি ঘটে, তার জন্য দায়ী রাজনীতিবিদরা, লিখেছেন গুল হাসান। এবং ছয়দফা ও শেখ মুজিবকে সমর্থন করেছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী এবং হিন্দুরা (যেন তারা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী নন) ভারতের উষ্ণ সমর্থনে।

জেনারেল লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ফেলো সিটিজেনদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক অভিযোগ ছিল। অভিযোগ করা হতো, পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ উন্নয়নমূলক প্রকল্প করা হয়েছে। উচ্চ চাকরিতে প্রায় সবাই পশ্চিম পাকিস্তানি। পাটের টাকায় স্ফীত হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান। তিনি স্বীকার করছেন, এর মধ্যে খানিকটা সত্য আছে তবে, যে রকম বলা হচ্ছে সে রকম উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে হয়নি। স্থানীয় হিন্দু ও ভারত পূর্বপাকিস্তানের মানুষদের ভালোভাবে ব্রেইন ওয়াশ করেছে। আসলে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ ছিল এবং ১৯৪৭-এর পর পূর্বাংশ থেকে ভারতে পাট পাচার করা হচ্ছিল। সুতরাং এর জন্য পশ্চিমপাকিস্তানি দায়ী নয়।

আইয়ুব খানের প্রশংসা করে লিখেছেন তিনি, আইয়ুব ছিলেন জাতীয়

নেতা। রাজনৈতিক নেতারা জাতীয় নেতা নয়। "He thouhgt in terms of Pakistan as an entity, unlike our politicians whose vision never extended beyond provincial boundaries."

রাজনীতিবিদের সম্পর্কে এ ধরনের আরো অনেক মন্তব্য করেছেন তিনি। ভূট্টো ও মুজিব সম্পর্কে বলেছেন, মিথ্যা যদি লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যমে হয় তাহলে তারা তাই বলেছেন, সত্য কখনও নয় এবং আসলে তারা সৃষ্টিশীল মিথ্যাবাদী। গুল হাসান এটাই বলতে চেয়েছেন তার বইয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে, পাকিস্তানে সত্যের একমাত্র প্রতীক ছিল জেনারেলরা।

গুল হাসানের বইয়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'দি এন্ড অফ অ্যান এরা' ও 'দি ইনএভিটেবল'। এ দুই অধ্যায়ে ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালের ঘটনাবলির বর্ণনা আছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত তার বর্ণনা অন্যান্য জেনারেলদের মতো গতানুগতিক, জেনারেল ফজল মুকিম খানের থেকে ধার করা। এ বিবরণে একটি বিষয়ই বারবার জোর দেয়া হয়েছে যে, শেখ মুজিবের নিরন্তর প্ররোচনার ফলে অবস্থার অবনতি ঘটেছিল, সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষ হচ্ছিল এবং সেনাবাহিনীও ক্রমেই ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছিল ফলে, ২৫ মার্চ সামরিক অ্যাকশন ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

এ বিবরণে গুল হাসান নতুন কোনো তথ্য সংযোজন করেন নি, একটি ছাড়া। তিনি জানাচ্ছেন, ২৫ মার্চের সামরিক অ্যাকশনের প্রস্তাব করেছিলেন ভূট্টো। ২৫ মার্চের আগে, ভূট্টোকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ইয়াহিয়া। সংকটের সমাধানের আশায়। ভূট্টো বলেছিলেন, সমাধান একটি আছে। তাহলো, সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র সামরিক ব্যবস্থা যা শেখ মুজিব ও তাঁর অনুসারীদের মাটিতে নামিয়ে আনবে। তিনি আরো জানাচ্ছেন, ১৯৭৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর *ইসলামী জমহুরিয়ায়* গোলাম আজমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ভূট্টো একথা স্বীকার করেছেন।

সেনাবাহিনী যে বাঙালির ওপর নির্যাতন করেছে সে সম্পর্কে একটি লাইন আছে। তাঁর মতে, বাঙালিরা বিদ্রোহ করে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের সহকর্মীদের হত্যা করে। "Later, atrocities were committed by the Army on the Bengalis."

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইসলামাবাদের সেনা সদরে কী ঘটছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন গুল। এ সময় তিনি কয়েকবার ঢাকা সফর করেন। তিনি লিখেছেন, তিনি অনুধাবন করেছিলেন, শেষরক্ষা হবে না। এ কারণে সিজিএস হিসেবে বারবার তিনি সেনাধ্যক্ষ জেনারেল হামিদ ও

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তা বোঝাতে চেয়েছেন কিন্তু কেউ তাতে গুরুত্ব দেয়নি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তাহলো ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের জন্য দায়ী জেনারেল হামিদ ও জেনারেল ইয়াহিয়া। এরপর বর্ণনা দিয়েছেন পাকিস্তানে ভূট্টোর ক্ষমতা দখল, তার সেনাপ্রধান হওয়া ও ভূট্টোর সঙ্গে মনান্ত র ইত্যাদি যা আমাদের রচনার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এ বিবরণে একটি বিষয় কয়েকবার তিনি উল্লেখ করেছেন। ভূট্টো তাকে বলেছিলেন, শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে চান এবং এর জন্য ৯০ জনের একটি তালিকা তৈরি করেছেন যার মধ্যে গুল হাসানের নামও আছে। পরে এ বিষয়ে গুল হাসান ওসমানীকে লিখেছিলেন। ওসমানী জানিয়েছিলেন, কথাটি সত্য নয়।

উপসংহারে, জেনারেল অবশ্য একটি কথা স্বীকার করেছেন। পাকিস্তানের পরাজয়ের পর, জেনারেল হামিদ যখন জুনিয়র অফিসারদের ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন গুল হাসান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তাদের উপেক্ষার কথা ভাবছিলেন। "I was still pondering over our indifference to the people of our former Eastern wing." ৪২৪ পাতার বইতে আর কোথাও তার এ ধরনের মন্তব্য নেই। অন্যান্য জেনারেলরা কিন্তু স্বীকার করেছেন দুই প্রদেশের অসাম্যের কথা।

গুল হাসান ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়, সামরিক শাসন, বিপর্যয়ের জন্য সেনাবাহিনীর দায়-দায়িত্ব মেনে নিয়েছেন। এর জন্য দোষী উচ্চ পদের সামরিক কর্মকর্তারা। কিন্তু বাকি সৈনিক, অফিসাররা সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। সামরিক শাসন জারি হতো না, অন্যান্য জেনারেলদের মতো তিনিও ভূমিকায় ও উপসংহারে বলেছেন, যদি রাজনীতিবিদরা ঠিক থাকতেন। অর্থাৎ সবকিছুর জন্য তারাই দায়ী। সুতরাং–
"As far as I can foresee, the spectre of Martial Law will be ever-present in Pakistan, unless she produces political leaders who can look beyond provincial horizons, be above-board, possess honesty of purpose, cmmand the solid rapport of the masses, and the genuinely concerned with their welfare, and last but by no means least, be patriots."

তবে, তা সম্ভব কি না তো বিষয়ে তার সন্দেহ আছে।

৩৫

লে. জেনারেল কামাল মতিনউদ্দিন লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর ১৯৪৬ সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি

চাকরি করেছেন ৩৪ বছর। অবসরের আগে জয়েন্ট স্টাফের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর থাইল্যান্ডে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তারপর ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। খুব সম্ভব মহাপরিচালকের পদে থাকার সময়ই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। *পাওয়ার স্ট্রাগল ইন দা হিন্দুকুশ* তার প্রথম বই। তার দ্বিতীয় বইটি নিয়েই এখানে আলোচনা করব, নাম *ট্র্যাজেডি অব এররস : ইস্ট পাকিস্তান ক্রাইসিস* ১৯৬৮-১৯৭১। ৫৩০ পৃষ্ঠার বইটি বের করেছে লাহোরের ওয়াজিদালিস।

এটি তার আত্মজীবনী নয়। পাকিস্তানের ইতিহাস এবং কেন পাকিস্তান ভাঙল তার ইতিহাস তিনি লিখতে চেয়েছেন। তার আগে যেসব জেনারেলরা লিখেছেন তারাও পটভূমি হিসেবে এ ধরনের বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে, কামাল মতিনউদ্দিনের বইটি ব্যতিক্রম। প্রথমত, এটি সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে, যথোপযুক্ত তথ্যপঞ্জি সহ প্রচুর সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েছেন, বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। জেনারেল হাকিম আরশাদ তার বইয়ের ওপর নির্ভর করে নিজের আত্মজীবনী লিখেছেন। মতিনউদ্দিনের লেখায় একটি নিরপেক্ষ ভঙ্গি আছে যার ফলে পাঠকদের কাছে তা 'কনভিনসিং' মনে হবে। আমার কাছেও হয়েছে। এই বইয়ের বাড়তি গুণ মৌখিক বিবরণ ব্যবহার করে অনেক অজানা তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। বাঙালি পাঠকের বইটি পড়ে মনে হতে পারে, তাহলে ১৯৭১ হলো কেন? আমরা যা জেনেছিলাম, যা দেখেছি তার সবই কি মিথ্যা? এ প্রশ্ন জাগলেই তার উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। আপাত নিরপেক্ষতার আড়ালে ১৯৭১ সালের জন্য যে সব ঘটনা/কারণ/ব্যক্তি দায়ি, তাদের দায়-দায়িত্ব খাটো করে দেখাতে চেয়েছেন। অথবা তারা দায়ি নয়, তারা পরিস্থিতির স্বীকার। তার বিবরণে এইসব ব্যক্তি/ঘটনা/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য বা মূল্যায়ন বা সমালোচনা যে নেই তা নয় কিন্তু অন্তিমে বোঝা দুষ্কর কে দায়ী। এ দিক থেকে কামাল মতিনউদ্দিন সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন।

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে। এর আগে তিনি বাংলাদেশেও এসেছেন, অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। যাদের সাক্ষাৎকার তথ্যের জন্য নিয়েছেন তাদের একটা অংশ বাংলাদেশের পাকিস্তান সেনা রাজনীতির ধারক-বাহক। পাকিস্তানে যাদের সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তারা প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে ১৯৭১ সালের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭১ সালের ২০ বছর পর তারা যখন তথ্য দেবেন বা বলবেন তা যাচাইয়েরও ব্যাপার থাকে। কারণ, ঘটনাবলি বা ব্যক্তি স্বার্থ স্মৃতিকে প্রভাবিত করে। এটি পদ্ধতির ব্যাপার। একটি

উদাহরণ দিই : ১৯৭২ সালে যেসব বাঙালি সেনাকর্তার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল তারা প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন, পাকিস্তান বা কেন্দ্রের অবিচার তাদের ক্ষুব্ধ করেছিল, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তাদের উদ্দীপ্ত করেছিল, মুজিবের ডাকেই তারা লড়াই করেছেন। পরবর্তীকালে তারা যখন বিএনপি বা জামায়েতী আদর্শে বিশ্বাসী হলেন এবং সাক্ষাৎকার ও মন্তব্য দিতে গেলেন তখন যা বললেন তার সবই উল্টো। যেমন লে. জেনারেল শওকত বীরোত্তম স্বাধীনতার ড্রাম তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। তার মতে, ২৫ মার্চ রাতে লে. জে. জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে একটি ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জেনারেল আবদুল মতিন বীর প্রতীকের বইটি পড়লে মনে হবে কেন তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন? যা এখন বিশ্বাস করেন তা মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিশ্বাসের উল্টো।

বাংলাদেশে এ ধরনের কিছু নাম আগেই উল্লেখ করেছি তিনি অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। বাংলাদেশে যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাঁদের দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক ভাগে আছে, কর্নেল ফারুক, লে. জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন, রাষ্ট্রদূত মুরশিদ, শামসুদ্দোহা, মঈনুল হোসেন, অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান, আয়েনউদ্দিন [রাজাকার], হাসান আরিফ, মে. জে. ইসকিন্দার করিম, এনাম আহমদ চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন, লে. জে. আতিকুর রহমান, মে. জেনারেল মজিদউল হক [মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার সামরিক আইন প্রশাসক], লে. কর্নেল রশিদ।

অন্যদিকে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন, নুরুল কাদের খান, ব্রিগেডিয়ার আবদুল হাফিজ, মেজর নুরুজ্জামান বীরোত্তম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক শামসুল হক [যিনি সব আমলেই কোনো না কোনো পদে ছিলেন]। কোন দিকটা ভারি বেশি নিজেই বুঝে নিন। এদের সাক্ষাৎকার বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৭১ সালের মার্চের ঘটনাবলির সময় নিয়ে বিবরণে।

পাকিস্তানে যেসব সেনা কর্মকর্তা ছিলেন কেন্দ্রে ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের [উল্লেখযোগ্য প্রায় সবারই] সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এদের সংখ্যা ৪৮ জন। মতিনউদ্দিন নিজে লে. জেনারেল ছিলেন দেখে এদের সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছেন। এটি তার কৃতিত্ব। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা কেন্দ্রে এবং এখানে নীতি নির্ধারণ ও মাঠে ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার একপেঁশে হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?

যে ১৬০টি বইয়ের ওপর তিনি নির্ভর করেছেন তাতে পাকিস্তান, ভারত

ও এর বাইরের অনেক বই আছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য বইয়ের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। তাহলে, এদের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে যুক্ত হবে?

এ বই কেন তিনি লিখতে চেয়েছেন। তার কারণ চারটি :

১. ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তান টিকে থাকার কথা নয়। অনেকে বলেন, দুই দেশের সম্পর্কের উপাদান দুটি– ধর্ম ও পিআইএ।

২. পশ্চিম পাকিস্তানিরা সবসময় বাঙালিদের শোষণ করেছে।

৩. ভারতীয় ঐতিহাসিকরা বলেন, পাঞ্জাবিরা সামরিক বেসামরিক পর্যায়ে ছিল আধিপত্য বিস্তারকারি। তারাই বাঙালিদের সব কিছু থেকে বাইরে রাখার চেষ্টা করেছে।

৪. ১৯৭১ সালের 'ভারত-পাকিস্তান' যুদ্ধ 'লাইটেনিং ক্যাম্পেন' বা 'ক্লিন ওয়ার' ছিল।

মতিন কামালউদ্দিন বলেছেন এর কোনোটি ঠিক নয়। এর অর্থ আমাদের এখানে এসব বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই অসত্য। তবে, মানতে হবে, কোনো রেটরিক নয় তিনি তথ্য উপাত্ত দিয়েই তার যুক্তি তুলে ধরেছেন। সেগুলি নাকচ করতে হলে আমাদেরও তথ্য উপাত্ত দিতে হবে।

৩৬

প্রথমে কামালউদ্দিনের তথ্য উপাত্ত তুলে ধরব। প্রয়োজনে তার মন্তব্য বিশ্লেষণ করব। তবে, তার উপাত্তের মূল্যায়ন করব শেষে।

প্রথম পর্ব পটভূমি। এতে তিনটি আলাদা অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে– ভৌগোলিক চরিত্র, ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্ন ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত।

ভৌগোলিক বর্ণনা তিনি যথাযথই দিয়েছেন। ডেমোগ্রাফিতে দুই লাইনের একটি মন্তব্য আছে। সেটি হলো, বাঙালিদের শারীরিক গঠন দেখে পাঠান বা পাঞ্জাবিরা এক ধরনের ভ্রান্ত জাতিগত শ্রেষ্ঠতার ধারণায় ভুগত এবং বাঙালিদের প্রতি ব্যবহারে তা প্রতিফলিত হতো। মন্তব্যটি সত্য এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার যে সব কারণ তার মধ্যে এটি প্রধান যা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বোঝানো যাবে না। তিনি পরবর্তীকালে সেনা কর্মকর্তাদের যেসব উক্তি ব্যবহার করেছেন তাও এর প্রমাণ। বিষয়টিকে মতিনউদ্দিন গুরুত্ব দিলে তাকে ৫০০ পাতার থিসিস লিখতে হতো না। কেননা মানুষ অন্তিমে মানুষ, আবেগ যার বড় উপাদান। এবং কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিরা আবেগহীন হলে সে আন্দোলন সফল হয় না।

পাকিস্তানের ২৫ বছর পশ্চিম পাকিস্তানিদের এমনকি তাদের সহযোগী বিহারিদের এ ঔদ্ধত্য আমাদের সহ্য করতে হয়েছে যা জেনারেলদের করতে হয়নি। ফলে, এর ক্ষোভ বেদনা তারা বুঝতে পারেননি।

পরের অনুচ্ছেদে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে তার পূর্বসুরীদের পূর্ব ধারণার সঙ্গে তার ধারণা মিলে যায় যা থেকে কোনো পাকিস্তানি মুক্ত নয়। এটিও পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে কাজ করেছে যা তারা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারেননি।

তিনি লিখেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, অভিন্ন বাংলায় জনসংখ্যার ৫৭% ছিলেন মুসলমান এবং তারা ছিলেন প্রচণ্ডভাবে হিন্দু প্রভাবিত। এর কারণ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা মুসলমানদের অবিশ্বাস করত। এরপর হান্টারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন, মুসলমানরা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে দেখল সব দরজাই তাদের জন্য বন্ধ। এর আগে এসব কিছুর মালিক ছিলেন তারা, এখন ঘৃণ্য হিন্দুরা।

আমরা লক্ষ্য করছি, প্রথমেই হিন্দু প্রভাবিত বলে একটি লেবেল এটে দেয়া হলো। হান্টারের যে উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন তা বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে নয়, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের সম্পর্কে। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে উত্তর ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কে। বইটির নাম 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস'। তিনি আরো জানাচ্ছেন ১৯০ বছর হিন্দুরা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

মুসলমানদের অন্ত্যজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো লিখেছেন তিনি, যে কারণে তারা আলাদা বাসভূম চেয়েছিল। মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ চেয়েছিল। হিন্দুরা চায়নি। বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। মুসলমানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করল। হিন্দুরা তার বিরোধিতা করল। এখানে আরবি এবং ইসলামিক স্টাডিজের ভালো বিভাগ ছিল। প্রতিটি হলে পেশ ইমাম ছিল। এ ধরনের ইসলামিক ভাবধারা পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মতিনউদ্দিন যত সরলভাবে বর্ণনা করেছেন বিষয়টি তত সহজ ছিল না। একথা সত্য হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী আধিপত্য বিস্তার করেছিল সর্বক্ষেত্রে। মুসলমানরা অন্ত্যজ ছিল কিন্তু, বর্ণ হিন্দুদের চোখে অন্য বর্ণের হিন্দুরাও ছিল অন্ত্যজ। মুসলমান জমিদারও কখনও মুসলমান প্রজার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছিল তবে তা বিখ্যাত ছিল তার শিক্ষকদের জন্য যাদের সারা ভারত থেকে বাছা হয়েছিল। এবং এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপিয়রা ছিলেন। সবার নিযুক্তি ছিল মেধার ভিত্তিতে। হিন্দুরা এগিয়ে ছিলেন দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংখ্যা বেশি ছিল। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান/ধর্মের প্রভাবান্বিত ছাত্র যেমন ছিল, মুক্তি বুদ্ধি চর্চার ছাত্রের সংখ্যাও কম ছিল না। তবে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টিতে, বিশেষ করে মুসলমান মধ্যবিত্ত সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা বাঙালি স্বাধিকারের পক্ষেই কাজ করেছে, পাকিস্তানের পক্ষে নয়।

তবে, মুসলমানদের জন্য আলাদা বাসভূমির দাবিতে ত্রিশের দশকে মুসলমান নেতৃত্ব আন্দোলন করেছেন, জনমত সংগঠন করেছেন, সেটি ভুল নয়। নেতারা বোঝাতে পেরেছিলেন, সাম্প্রদায়িক মতবাদের ভিত্তিতে, আলাদা বাসভূম পেলেই দুধ ও মধুর নহর বয়ে যাবে। সেটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে হটে যেতে হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ফজলুল হক ও আওয়ামী লীগের ওপর বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি ঠিকই লিখেছেন [আহসান মঞ্জিলকে সবসময় হাসান মনঞ্জিল বলেছেন যা ঠিক নয়] আওয়ামী লীগ ছিল সেক্যুলার এবং লিবারেল পার্টি। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার একটি কারণ এই। তার কথার সূত্রধরে বলতে পারি, এতে আবার প্রমাণিত হয় বাঙালি ধর্মকে রাজনীতিতে স্থান দিতে চায়নি যেটি পাকিস্তান দিয়েছে।

এরপর তিনি মুসলিম লীগের পতন ও আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের উত্থান আলোচনা করেছেন। তারপর ছয় দফা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এসব বিবরণে তথ্যগত বিকৃতি নেই বা পাকিস্তানি ব্যাখ্যা দেয়ারও চেষ্টা করেননি। একটি বাক্য ছাড়া সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন পাকিস্তানের সংহতির প্রতি মুজিবের কোনো 'abiding commitment' ছিল না। কমিটমেন্ট না থাকলে, ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান কেন আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন কেন্দ্রের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে। এ প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

৩৭

মতিনউদ্দিনের গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'বিচ্ছিন্নতার কারণ'। এতদিন আমরা পড়ে এসেছি দু'প্রদেশের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অসামর্থই দু'অঞ্চলের মানুষকে দূর করে দিয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এ অঞ্চলের মানুষদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। মতিনউদ্দিন বলছেন, অনেকে বলেন পশ্চিমের সহ-নাগরিকদের প্রতি বাঙালিদের ক্ষোভের

অনেক কারণ ছিল। তবে, সে কারণগুলির কিছু অতিরঞ্জিত, কিছু মিথ্যা তবে, শুরুতে সমস্যাগুলি এমন ছিল না যা অতিক্রম করা যেত না। তার ভাষায়–

"Some were, of course, exaggerated to achieve the objective of selfish individuals. A few were completely false and part of a disinformation campaign. But none of the issues were so great, in the beginning, to be unsurmountable." [পৃ. ৪৭]

বাঙালিদের ক্ষোভের কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলিকে বেছে নিয়েছেন সেগুলি হলো : ভাষা, সংস্কৃতি, সরকারি কর্মচারিদের ব্যবহার, রাজনীতি এবং প্রশাসন– এসব ক্ষেত্রে তার বিবরণ ভারসাম্যপূর্ণ।

ভাষার ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন, ভাষার প্রতি বাঙালির টান প্রবল। উর্দুকে চাপিয়ে দেয়াটা ঠিক হয়। এ প্রসঙ্গে এক পাকিস্তানি বাঙালি অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ভাই কর্নেল আবদুল কাইয়ুমকে উদ্ধৃত করেছেন। কাইয়ুম মক্কায় গিয়েছিলেন। কাবা শরীফ দেখে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। কাবা দেখে প্রথমে তার আরবি [যা তিনি ভালো জানেন] উর্দু বা ইংরেজিতে কিছু মনে হয়নি। তার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা– প্রভু তোমার কাছে পৌঁছার শক্তি আমায় দাও হে...। তবে, এখানে খন্দকার মোশতাকের কৌতূহলোদ্দীপ্ত সাক্ষাৎকার আছে। সেখানে মোশতাক জানিয়েছেন ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র ভাষা প্রশ্নে যারা নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি তাদের একজন।

তবে সমস্যা হচ্ছে মতিনউদ্দিন পাকিস্তানিতো। বাঙালি মানেই হিন্দু এই পূর্বধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। তাই ভারসাম্যপূর্ণ বিবরণের মাঝেও চলে আসে এ ধরনের বাক্য– [রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে]

"These luminaries on the cultural stage of Bengal projected mainly Hindu emotions and secular feelings which unwittingly permeated in to Muslim minds in Bengal." [পৃ. ৪৮]

একইভাবে সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ১৯৪৭ এর আগে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একে অন্যের আধিপত্য মানতে রাজি ছিল না। পাকিস্তান যখন হলো তখনও পরিস্থিতি ছিল একই রকম। এই সাংস্কৃতিক পার্থক্যটা, পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে পূর্বাংশে। অন্য সবার তাদের পোশাক, খাবার, চেহারা ছিল পৃথক। বাঙালিরা সংস্কৃতিঅন্ত মানুষ। খালিদ বিন সাঈদের উদ্ধৃত মতামতের সঙ্গে একমত পোষণ করে তিনি লিখেছেন, সাঈদ লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধশিক্ষিত ধর্মীয় নেতারা মনে করতেন বাঙালি মুসলমানদের

শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। মতিন জানাচ্ছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধ-শিক্ষিত সংকীর্ণমনা মোল্লারা জানত না যেন,

"Islam does not have the same cultural values in all parts of the world." [পৃ. ৫৫]

তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখেছেন, অনেকের ধারণাই সেই মোল্লাদের মতো। মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান যখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তখন, চাঁদপুরে বালিকারা তাকে নেচে গেয়ে অভ্যর্থনা জানানোতে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে দোষারোপ করেছিলেন এ বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু ঘেঁষা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হচ্ছে না।

এত সব বলার পরও মতিনউদ্দিন যখন নিজের মতামত দিচ্ছেন তখন অজান্তেই চলে আসছে মনে গেথে যাওয়া সেই সমীকরণ–বাঙালি=হিন্দু। তিনি লিখেছেন বাঙালিদের–

"Love for dance, music and poetry brought them closer to the Bengali Hindus. It is also time that the Hindu elite had dominated the social and economic life of Bengal and there was much greater fusion between the two religious communities in that provinces. So be it!" [পৃ. ৫৩]

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং বোঝা যায় যতই তিনি ভোলার চেষ্টা করেন বাংলাদেশ হিন্দুদের দেশ নয় মুসলমানদেরও কিন্তু ভুলতে পারেন না।

১৯৯২ সালের শবেবরাতের দিন তিনি ঢাকায় ছিলেন। দেখলেন টিভিতে বাংলায় শবেবরাতের ফযিলত বর্ণিত হলো। এরপর আজানের ধ্বনি। তিনি চমৎকৃত হয়ে পরিচারককে জিজ্ঞেস করলেন প্রতিদিন নামাজের সময় টিভি থেকে কি আজান প্রচারিত হয়? পরিচারক ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দিলেন, 'আব আপকো মালুম হুয়া কী হামভি মুসলমান হ্যায়, হামকো হিন্দু সমাজ কার মার দিয়া' [আপনি এখন বুঝছেন যে আমরা মুসলমান। হিন্দু ভেবে আমাদের সবাইকে আগে হত্যা করেছেন।] মতিনউদ্দিন লিখেছেন–

"This remark coming spontaneously from a semi-literate, lower middle class Bengali youth, twenty one years after the breakup, shook me." [পৃ. ৫৮]

পাকিস্তানি কর্মকর্তারা যে বাঙালিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত না তাও তুলে ধরেছেন মতিনউদ্দিন। যেমন, সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈন্যদের তাদের নাম ধরে না ডেকে 'বাঙালি' বলে ডাকা হতো। তবে, অন্তিমে মতিনউদ্দিনের

মনে হয়েছে এগুলি ছিল তুচ্ছ ব্যাপার, এবং এর কোনোটাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না। কিন্তু সেগুলি জমে জমে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তার ভাষায়–

"All of these little irritants none of them deliberate, when taken collectively, did convey the impression of a contemptuous attitude of the West Pakistanis towards the Bengalis." [পৃ. ৫৯]

রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতা বাঙালিদের ক্ষুব্ধ করেছিল। রওনক জাহানের মতামত উদ্ধৃতি করে তিনি জানাচ্ছেন, ১৯৪৭-১৯৫৮ দুই অংশেই ক্ষমতার সমান অংশীদারত্ব ছিল। আইয়ুব খানের প্রথম কেবিনেট মন্ত্রির সংখ্যা দুই অংশে সমান ছিল। সুতরাং, ১৯৪৭ এর পর থেকে এ কারণটি বাঙালির ক্ষোভের কারণ বললে সঠিক হবে না।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে ঠিকই আছে। কিন্তু রওনক জাহানের সংখ্যা তত্ত্ব এবং মতিনউদ্দিনের যুক্তির পুরোটাই সঠিক নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কোন বাঙালিরা ক্ষমতায় ছিল? তারা পূর্ববঙ্গ থেকে গিয়েছিল। প্রধানত মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসেবে। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই মুসলিম লীগও তার নেতাদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষোভ ছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনও মানুষ পছন্দ করেনি। এ সব বিবরণ মতিনউদ্দিনই দিয়েছেন। আইয়ুবের মন্ত্রিদের সামরিক বাহিনীর দালাল হিসেবেই মনে করা হতো। মূল প্রশ্ন সংখ্যাতত্ত্ব শুধু নয় সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি ক্ষমতার অংশীদার কিনা তাও। এছাড়া ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের বারবার হস্তক্ষেপ। মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া এগুলিও বিরাট ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

তবে, তিনি স্বীকার করেছেন ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত কেন্দ্রের ১৯৮ জন মন্ত্রির মধ্যে ৭৮ জন ছিল মাত্র পূর্ববঙ্গ/পাকিস্তানের। এবং এটি ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল বলেও কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন। সংখ্যাতত্ত্ব দিলে ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত দেয়াই শ্রেয়। আংশিক দিলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশাসনের ক্ষেত্রে তিনি ১৯৬৬-৬৯ সাল পর্যন্ত ৭টি সারণি দিয়েছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে দশটিই মন্ত্রণালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মকর্তাদের সংখ্যার আকাশ পাতাল তফাৎ। তিনি বলছেন, এর জন্য কেন্দ্র বা পশ্চিম পাকিস্তানিদের দায়ি করা অযৌক্তিক। তার যুক্তি হচ্ছে, ১৯৪৭ সালের পর ভারতে উচ্চপদস্থ পদে যারা কর্মরত ছিলেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন অবাঙালি এবং তারা এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। শুরু থেকেই পূর্ববঙ্গ সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিল। এছাড়া, সিন্ধু বা বালুচিস্তানের অবস্থাতো আরো খারাপ ছিল। কর্মকর্তাদের হিসাব দিয়েছেন ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। সারণি ৫ এ দেখা যাচ্ছে ১৯৭০ সালেও প্রভাবশালী পদে পূর্ব

পাকিস্তানির সংখ্যা মাত্র ২ জন।

তার যুক্তি মেনে নিয়েও বলা যায় ১৯৪৯ ও ৫০ সালে বাঙালি যারা সিএসপি হয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে তারা কোন পদ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং পদায়নের ক্ষেত্রে সেটি ডেপুটি হোক বা জয়েন্ট হোক কোন মন্ত্রণালয়ে দেয়া হতো? বাঙালিদের ইন্টারভিউতে নিয়মিত বাদ দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা কম। তার সংখ্যাতত্ত্বই সে কথা বলছে। তিনি এর যুক্তি হিসেবে বলেছেন, বাঙালিরা সেনাবাহিনীতে ঐতিহ্যগতভাবেই যেতে চাইতেন না। ঠিক আছে। কিন্তু যারা গিয়েছিলেন তাদের সমসাময়িক পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় তারা কোন পদ পর্যন্ত প্রমোশন পেয়েছিলেন? ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা কত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে? আমাকে পাকিস্তানের এক নীতি নির্ধারক বলেছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্টনমেন্ট করার কারণ ছিল। কারণ, আশেপাশে তখন জীবিকার সৃষ্টি হতো। তবে মতিনউদ্দিন স্বীকার করেছেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত রাখায় বাঙালিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। উপসংহারেও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল ব্যয় বাঙালিরা পছন্দ করেনি। কাশ্মীর প্রশ্ন নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যা ছিল কম। প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট সব কারখানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান; লাভবান হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। অস্ত্র কেনা-বেচার ব্যাপারটাও ছিল তাদের হাতে এবং এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হতো যা পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল।

এসব স্বীকার করেও তিনি উপসংহারে বলতে চাইছেন ১৯৬৫ সালে যুদ্ধের পর, দুই প্রদেশের ভারসাম্য রক্ষায় যে সম্পদের দরকার ছিল তাতে ঘাটতি পড়ে এবং সে ঘাটতি তখনও মেটান যায়নি। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের একসময়ের অর্থমন্ত্রি সারতাজ আজিজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠায়। সারতাজ বলেছিলেন–

"If that War had not taken place both East and West Pakistan would have prospered and a major cause for the alienation of the Bengalis would have been removed." [পৃ. ৮৮]

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অসমতা ছিল স্বীকার করেছেন তিনি। অর্থনীতির গতি ছিল শ্লথ। এর ১৯টি কারণ [পৃ. ৮৫-৮৭] দেখিয়েছেন তিনি। সেগুলি হলো :

১. *ভুল অর্থনৈতিক নীতি;* কিন্তু সেটা তো কেন্দ্রের করা

২. *অবকাঠামো বিশেষ করে যোগাযোগ ও জ্বালানির অভাব;* সেটি সৃষ্টির দায়িত্ব ছিল তো কেন্দ্রের। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরপর গ্যাস পাওয়া গেলে আগেও নিশ্চয় পাওয়া যেত।

৩. *কেন্দ্রের অপ্রতুল বরাদ্দ;* এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হয়নি।

৪. *বরাদ্দ ব্যবহারের মতো ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না।* কিন্তু সে ক্ষমতা সৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র কেন্দ্র মনোযোগ দেয়নি।

৫. *শিক্ষার ও ব্যবস্থাপনার মান ছিল নিচু।* উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়নি কেন?

৬. *এখানকার ব্যবসায়ীরা পশ্চিম পাকিস্তানদের থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত জটিলতা কম বুঝত।* এ এক অদ্ভুত যুক্তি!

৭. অভিন্ন ভারতের ব্যবসায়ী যারা পাকিস্তানে এসেছিলেন তারা অধিকাংশই এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে।

৮. বিনিয়োগ অভাব কারণ স্বল্প সময়ে লাভ কম, প্রাকৃতিক দূর্যোগ; "Considerable Hindu influence which discouraged 'encroachment's by dynamic West Pakistan Muslim enterprenures." কাঁচামালের অভাব, অধিকাংশ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ইত্যাদি। এছাড়া ১৯৬৯-৭১ সালে রাজনৈতিক গৌলযোগ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির আরো ক্ষতি করেছিল।

এ সমস্ত অজুহাত বা যে সব কারণ দেখান হয়েছে তার উত্তরে একটি বাক্যই বলা যায়– এর জন্য কি বাঙালি দায়ি?

এবার উল্টোদিক থেকে দেখা যাক। বাজেট যখন প্রণীত হয় [যা কেন্দ্রীয় সরকার করছেন] তখন স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার অনুপাত ও উন্নয়নের কথা ভাবা হয়। ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেটে পূর্ববঙ্গে লোকসংখ্যা পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে বরাদ্দ হয়েছিল ১৮.৭ ভাগ। জনসংখ্যার হার অনুযায়ী টাকার পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল ২৫ কোটি টাকা বেশি কিন্তু পূর্ববঙ্গ পেয়েছিল ১০ কোটি টাকারও কম। পাঞ্জাবে তুলা উৎপাদনে ভর্তুকি দেয়া হতো অথচ এখানে পাটে তা দেয়া হতো না। সেই তখন ১৯৫২ সালের ১৮ মার্চ গণপরিষদের সদস্য শাহুদুল হক বলেছিলেন– 'এ সত্য গোপন করে লাভ নেই যে পূর্ববঙ্গবাসী ক্রমশই আরো স্পষ্ট অনুভব করছেন, পূর্বাঞ্চল হতে চলেছে পশ্চিমাঞ্চলের উপনিবেশ।' সেই বাজেট অধিবেশনে পূর্ববঙ্গে সদস্যরা বিভিন্ন খাতে কম বরাদ্দ ও বঞ্চনা নিয়ে অভিযোগ করছিলেন। যেমন, তারা বলেছিলেন, বিমানবাহিনীতে নিয়োগের জন্য ৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ১টি মাত্র পূর্ববঙ্গে। শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ সাড়ে ১২ কোটি টাকা ও পূর্ববঙ্গে সাড়ে ৫ কোটি টাকা। কেন্দ্র যে সব প্রযুক্তি শিক্ষায়তন চালাত তার সব ছিল

পশ্চিম পাকিস্তানে। সৈয়দ আবু বাসার মাহমুদ হুসেইন ঐ সময় গণপরিষদে বলেছিলেন, "ইসলামের নামে ধ্বনি সবাই দেয়। ইসলামের আদর্শ মানে খুব কম লোকই। আর কতদিন আপনারা ঐ ইসলামের নাম করে পূর্ববঙ্গকে শোষণ করবেন? পূর্ববঙ্গের জন্য সরকারি প্রকল্পাদির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের 'ধীরে চলো নীতি'র আসল উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গকে পঙ্গু করে রাখা।"

টাকা বরাদ্দ করলেও পূর্ববঙ্গের খরচের ক্ষমতা ছিল না বলে মতিনউদ্দিন যা বলেছেন তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে ১৯৫৮ সালে সংসদে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতায়। তিনি বলেন, "পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু করতে গিয়ে দফায় দফায় প্রশাসনিক বিভাগগুলির দরজায় ধরণা দিতে দিতে ঐ কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে যায় বলে টাকা ফিরে যায়। কেন্দ্রীয় আমলাদের বাধাতেই পূর্ব পাকিস্তানের সরকার সময় মতো কাজ করতে পারেন না।"

১৯৫৬ সালে আবুল মনসুর আহমেদ জানান, কেন্দ্রিয় রাজস্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পাওনা বছরে মাথাপিছু ৮ টাকা আর তারা পায় ১ টাকার কিছু বেশি। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৫-৫৬ বছরে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ৭০৫-৭০ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তান পায়। অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ এক প্রবন্ধে দেখান, "১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত হিসাবে গড়ে বছরে ৩৪ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান।" ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১২৫ কোটি টাকা, তার মধ্যে পূর্ববঙ্গে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১২৬ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু আবারও জানান পিআইডিসি তাঁর প্রকল্পের ৬১টি প্রকল্পের মধ্যে ১৭টি বরাদ্দ করেছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক ১৯৬৩ সালে লিখেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে এমন এক বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে যে ১৯৫১-এর পরের মাত্র ৯ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ১৮-এর স্থলে ২৯ শতাংশ এগিয়ে গেছেন।" মতিনউদ্দিন দেখিয়েছেন, [চালাকি করে] চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল কম। কিন্তু গমের দাম? পূর্ব পাকিস্তানের চালের দামের চেয়ে ছিল অর্ধেক।

১৯৫৯-১৯৬২ সালে পাকিস্তানে বছরে ৯টি বৈদেশিক প্রতিনিধি দল এসেছে। তাদের মধ্যে ২.৭৫ টিকে পূর্ববঙ্গে আসতে দেয়া হয়েছে। সৈয়দ আবদুস সুলতান ১৯৬২ সালে সংসদে বলেন, বিগত ১৪ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে প্রকল্প ব্যয় করা হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা আর পশ্চিমে ৯৯৮ কোটি

টাকা। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করে ১১২৫ কোটি টাকা বৈদেশিক বাণিজ্যে কিন্তু খরচ করার অধিকার পায় ৫৪০ কোটি। পশ্চিম পাকিস্তান অর্জন করে ৮১৫ কোটি টাকা, ব্যয়ের অধিকার পায় ১৪০০ কোটি টাকা। জাতিসংঘে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠান হয়েছিল ৭৩২ জন আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১০০ জন। কলম্বো প্ল্যানে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিল ১৪৩১ জন আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৫০ জন। উন্নয়ন বহির্ভূত পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল ৩০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ৫০০ কোটি টাকা। [এসব তথ্য নেয়া হয়েছে জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস* গ্রন্থ থেকে]

এরকম প্রচুর সংখ্যা তত্ত্ব দেওয়া যায় কিন্তু দেয়ার দরকার নেই। সেই ১৯৫৮ সালে গণপরিষদে আবদুল খালেক বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ জেগে উঠছে যে সব কারণে তার থেকে উপযুক্ত পাঠ নিয়ে দেয়ালের লিখন পড়তে হবে। নইলে সে ভাঙন শত আওয়ামী লীগও রুখতে পারবে না।"

১৩ বছর পর সে ঘটনাই ঘটেছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, যতটুকু উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়েছিল তা প্রতিবাদ, আন্দোলনের কারণে। স্বেচ্ছায় কেন্দ্র কিছু দেয়নি। সুতরাং, মতিনউদ্দিনের তত্ত্ব এখানে খাটে না।

১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি যারা নীতি নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। তারা একটি তত্ত্বের নাম করেছেন, যার নাম 'লায়াবলিটি তত্ত্ব'। এ তত্ত্বের মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যা পারো নিয়ে তাকে ঝেড়ে ফেল। এই ঝেড়ে ফেলার ব্যাপারটি ঝাড়া হয়েছিল ১৯৬৯ সালে।

এক সভায় কালাবাগের আমীর জানতে চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের কাছে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে ছাড়া পশ্চিমে পাকিস্তানের চলবে কিনা। তারা হিসাব করে জানিয়েছিল চলবে। সে কারণেই বলা যেতে পারে ১৯৭১ সালটি ছিল সেই ঝেড়ে ফেলার মুহূর্তমাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, এই যে অসাম্য তা দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। ইঙ্গিতটা এই আর কিছুদিন থাকলে এই অসমতা দূর হয়ে যেত। যে কথাটি তিনি বলেননি, তাহলে ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাঙালিদের প্রত্যেকটি ইস্যু নিয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য করা হয়েছে এবং বাঙালিদের শান্ত রাখতেই কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তারপরও দেখা যাবে ঐ সময়ই দুঅঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রকট। একটি দেশ গঠিত হওয়ার ২৫ বছর যদি

বলা হয় এখন থেকে 'রেমিডিয়াল মেজার্স' নেয়া হবে সেটি কি এক দুই জেনারেশনের ক্ষোভ ক্ষান্ত করতে পারবে?

তবে এই চিন্তা পঞ্চাশ দশক থেকেই ছিল। সে সময় কিছু অস্ট্রেলিয় বিশেষজ্ঞকে ভার দেয়া হয়েছিল অর্থনীতি বিকাশে কোন অঞ্চলে কোন বিষয়ে জোর দেয়া যায় সেটি নির্ধারণ করতে। তারা মত দিয়েছিলেন, পূর্ববঙ্গে শিল্পের ওপর এবং পশ্চিমবঙ্গে কৃষির ওপর। তা শুনে পাকিস্তানের মহাসচিব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্তব্য করেছিলেন, পাগল, একদিন না একদিন পূর্ববঙ্গ আলাদা হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানে কেন শিল্প গড়া হবে?

সে জন্য বলেছিলাম, সংখ্যাতত্ত্ব না দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর দিতে। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে কেন্দ্র পূর্ববঙ্গবাসীকে নিচু চোখে দেখেছে, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭১ সাল ছিল সেই ২৫ বছরের দৃষ্টিভঙ্গির জবাব মাত্র।

৩৮

তৃতীয় অধ্যায় 'রাজনৈতিক (শেষের শুরু)' বা 'পলিটিক্যাল কোয়াগমাইর' (বিগিনিং অব দি অ্যান্ড)। ১০০ পাতার এই অধ্যায়টি সুখপাঠ্য, তথ্যসমৃদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ। পূর্বধারণা প্রসূত কিছু কিছু মন্তব্য আছে। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে এ পর্যন্ত জেনারেলদের সব লেখার মধ্যে এটিই সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। তার এ লেখায় পরিষ্কার হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও সম্পূর্ণ সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের বাঙালিদের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯৬৮ সালে ২৯ জানুয়ারি হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য আইয়ুব খান যখন লন্ডন গেলেন তখন স্পীকারের কাছে দায়িত্ব দিয়ে যাননি কারণ তাকে তিনি বিশ্বাস করতে [স্পীকার আবদুল জব্বার খান] পারছিলেন না। এটি ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধান ভঙ্গ যা বাঙালিদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

তিনি এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যা তিনি শুনেছেন। ১৯৬৯ সালে। ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা উঠলে ইয়াহিয়া আইয়ুব খানকে নাকি বলেছিলেন, 'আপনি জব্বারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন না কেন?' উত্তরে আইয়ুব বলেছিলেন, "I do not trust the bastard." স্পীকার হলেও বাঙালি তো তাই তিনি হয়ে যান 'বাস্টার্ড' যদিও তিনি আইয়ুবেরই দলের।

ক্ষমতা হস্তান্তর হলো। যথার্থই বলেছেন মতিনউদ্দিন যে, 'আবারও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা নেওয়া ঠিক হয়নি।'

ইয়াহিয়ার নতুন যে মন্ত্রিসভা হয় যেখানে বাঙালিরা যোগ দিতে চায়নি। কারণ যোগ দিলে তারা সেনাবাহিনীর দালাল হিসেবে পরিচিত হবে। জেনারেল পীরজাদা তাকে বলেছিলেন, জোর করে বাঙালিদের আনতে হয়েছিল। পীরজাদা তাকে জানিয়েছিলেন–

"He had to coerce them to join the cabinet." [পৃ. ১৩১]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সেনাকর্মকর্তাদের নিয়ে যে ঘনিষ্ঠ একটি চক্র করেছিলেন সেখানে আর কারো উপস্থিতি কাম্য না হলেও ভূট্টো সেখানে মাঝে মাঝে জায়গা পেতেন–

"Mr. Bhutto occasionally found his way also into the small group." [পৃ. ১৩২]

মতিনউদ্দিন লিখেছেন, নির্বাচনের সময় থেকেই আওয়ামী লীগ বেশি শক্তি দেখিয়েছে। যেমন, জামায়াতের সভা পণ্ড করে দিয়েছে। নির্বাচন প্রাক্কালে এই একটি ঘটনা কিছুই প্রমাণ করে না, বিশেষ করে যারা জামায়াতের তখনকার ভূমিকা জানেন। তিনি লিখেছেন–

"The Awami League, which even before the election campaign had begun to show its muscle, became a fascist and militant organisation which was not prepared to brook any rival. It was determined to crush by force any opposition to its formula for total regional autonomy. Consequently no other political party was allowed to hold public meetings in East Pakistan." [পৃ. ১৪১]

এই মন্তব্য ডাহা অসত্য। ১৯৭০ সালের খবরের কাগজ ওল্টালেই নজরে পড়বে কতগুলি দল কতগুলি সভা করেছিল।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তিনি। ফরমান বলেছিলেন, "elections were free for all" [পৃ. ১৫৪]

মতিনউদ্দিন আরো উল্লেখ করতে পারতেন, ফরমান বলেছিলেন, ডানপন্থীদের পেছনে তারা অনেক টাকা ঢেলেছিলেন জেতাবার জন্য। পারেননি। কারণ, তারা ভেবেছিলেন ধর্মের নামে বাঙালিদের মোহগ্রস্ত করে রাখা যাবে। এ ছাড়া নিজেদের কূটকৌশল ও শক্তির ওপর তাদের প্রচণ্ড আস্থা ছিল।

১৯৭০ সালের বন্যার প্রসঙ্গ তিনি তুলেছেন। তার মতে, পূর্ব পাকিস্তানে ১ ডিভিশন সেনা ও দুটি হেলিকপ্টার ছিল। এটি কি পূর্ব পাকিস্তানের দোষ? পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলাই এর প্রমাণ। তার মতে, সেনাবাহিনীকে

বাঙালিরা সাহায্য করে নি, বাঙালিরা নিজেরাও কিছু করেনি কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদা তোলা হয়েছে। অথচ, মনে করে দেখুন, আমরা সবাই তখন কমবেশি ত্রাণ কাজে ছিলাম। ফরমান অভিযোগ করেছেন মুজিব ভোলা যান নি, পটুয়াখালিতে ছিলেন। ফরমান আলি কি জানেন ভোলা দূরের কথা পটুয়াখালি যাওয়ারও উপায় ছিল না। টাকার জন্য কবর থেকে লাশ তুলে আবার কবর দেয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যা পরে আরো অনেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন–

"The army had been insulted, maligned and confined to the barracks by the awami league workers during their anti-West Pakistan hatred campaign."

সেনাদের সমালোচনা করলে তাদের অপমান করা হয় যেন তারা দেবতা। ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সালে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে আপামর জনসাধারণকে অপমান করেছিল তার কি উত্তর হবে? কিন্তু কোনো পাকিস্তানি জেনারেলকে এই মূল কথা বোঝান যাবে না। বাঙালি জেনারেলদেরও। ২০০৮ সালে তারা একই ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের অপমান করেছিল কারণ তাদের নাকি অপমান করা হয়েছিল।

টাইমস অব লন্ডনও তখন সেনাবাহিনীর [ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের] সমালোচনা করেছিল এ বলে যে, তারবেলা বাঁধে অবাধে এত খরচ হয়েছে অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনো খরচ হয় না। এ মন্তব্যে ক্ষুব্ধ মতিনউদ্দিন লিখেছেন, "It should have known that such large projects in under developed countries are financed by multinationals and international aid giving agencies. They ensure that only those projects are accepted which are techincally feasible and where return are promising." [পৃ. ১৫০]

পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কি তা প্রযোজ্য ছিল না? যদি প্রযোজ্য না হয় তাহলে বাংলাদেশ হওয়ার পর তা প্রযোজ্য হয় কীভাবে? মোনেম খান পর্যন্ত তারবেলা বাঁধ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, তাদের সব তারবেলা আর আমাদের বেলায় কী? খানিকটা ব্যঙ্গ করে মতিনউদ্দিন বলেছেন, এর ২০ বছর পর বাংলাদেশে বন্যা/ঝড় হয়েছে। বেগম জিয়া তখন বিদেশী সাহায্য চেয়েছেন। মৃতদের সৎকারে তারা সাহায্য করেছে।

"But Mujib was no longer on the scene to put the blame on the West Pakistanis for this sacrilege act." [পৃ. ১৫০]

কয়েক বছর আগে পাকিস্তানে ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশও সাহায্য

পাঠিয়েছে। মূল কথা ছিল, নিজের দেশের মানুষ ত্রাণে নেমেছিল কিনা? সেনাবাহিনী থেকে ছাত্র সবাই ত্রাণে ঝাপিয়ে পড়েছিল। তিনি আরো প্রশ্ন রেখেছেন, *লন্ডন টাইমস* তো এখন লেখে না বন্যা ঠেকাবার জন্য কেন খরচ করা হচ্ছে না।

মতিনউদ্দিন জানেন না হয়তো, বন্যা ও নদী ভাঙন ঠেকাবার জন্য বাংলাদেশে কত অর্থ ব্যয় করেছে এবং করছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো কার্পণ্য করেনি। প্রকৃতির সঙ্গে পারা যাচ্ছে না সেটি অন্য ব্যাপার।

নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলির তথ্য সমৃদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন মতিনউদ্দিন। আওয়ামী লীগের খানিকটা সমালোচনা থাকলে তার বিবরণে স্পষ্ট হয়েছে যে ভূট্টো এবং সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তরে অপারগ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট সমাজও এর বিরোধী ছিল। আর কোনো জেনারেল এমন বিবরণ দেননি।

সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তার লেখায়। আই এস আই ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি ছিল না। এর প্রধান বলেছিলেন–

"We will not let that bastard rule the country."

১২ জন জেনারেল মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি ছিলেন না। তার ভাষায়–

"The military were afraid that the Awami League, when in power would adopt a conciliatory attitude towards India, relegaté Kashmir to the back-burner and direct funds from defence to economic development of East Pakistan. The Bengali representation in various government departments and autonomous agencies would he increased with no regard to merit, qualification or seniority. The authority of the president, which helped in exercising a check on the policies of the majority party, would also be eroded." [পৃ. ১৫৬]

এ বর্ণনার মধ্যেও কিন্তু হিন্দু প্রসঙ্গ এড়াতে পারেননি। ১৯৭১ সালে জগন্নাথ হলের হিন্দু ছাত্ররা মিছিল করে শ্লোগান দিয়েছে 'Quit Bengal' এবং 'জয় হিন্দ।' 'বাংলা ছাড়' সিকান্দার আবু জাফরের বিখ্যাত কবিতা। ঐ সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। 'জয় বাংলা' ছাড়া কোনো শ্লোগান শুনিনি।

ঐ সময়ই ভূট্টো ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে বলেছিলেন,

"Dont forget I got the highest votes from the cantonment." [পৃ. ১৬১]

পশ্চিম পাকিস্তানের 'top brass' রাও মুজিবের পক্ষে ছিলেন না। তাদের বিশ্বাস তিনি চেষ্টা করবেন,

"seek an accomodation with India at the expense of Pakistans

interests. They were also afraid that financial resources would be transferred to East Pakistan which would curtail the economic growth of West Pakistan." [পৃ. ১৭০]

ইয়াহিয়া নিজেও অনুভব করেছিলেন সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, শিল্পপতি, সামন্ত ভূস্বামী কেন্দ্রীভূত পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নতুন এক দল বাঙালি তাদের গুরুত্ব খাটো করে দেখবে এটি তারা চাইবে না।

এসবের কারণেই যথাসময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে জাতীয় পরিষদের সভা স্থগিত করেন। এর প্রতিবাদে ৭ মার্চ। [তিনিও ভুল করে লিখেছেন সভাটি হয়েছিল পল্টনে] মতিনউদ্দিন যথার্থই লিখেছেন ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হলো,

"Bangladesh had virtually came into being on March 7, 1971". [পৃ. ১৯১]

তারপর আলোচনার মহড়া। ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগের আগে টিক্কা খানকে বললেন, "The bastard is not behaving. You get ready." [পৃ. ১৯৯]

তারপরের ঘটনা সবার জানা। তিনি অনেক বিবরণ দিয়েছেন, সবকিছুই বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু যদি দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্পষ্ট করতেন তাহলে প্রথম দুই অধ্যায়ে এতো সংখ্যাতত্ত্ব এত তথ্য দেয়ার প্রয়োজন হতো না। নিজেকে প্রশ্ন করতে পারতেন কেন পশ্চিমা সেনাদের কাছে মুজিব বা বাঙালিরা ছিলেন 'জারজ' [বাস্টার্ড]? সবচেয়ে বড় কথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন। সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই তো চুকে যায়। এত আলোচনা কিসের? বেনজীর ভূট্টো থেকে পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনাকর্তারা সরাসরি এ মন্তব্যের জবাব দেননি। ঘুরে ফিরে বলতে চেয়েছেন দুই অঞ্চলে দুজন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। মতিনউদ্দিনও অন্যভাবে প্রসঙ্গটি তুলেছেন। স্পষ্ট করে যেটি বলার দরকার ছিল, যা তার বিবরণও সমর্থন করে, কিন্তু তিনি বলেননি। তাহলো, ১৯৭১ সালের ঘটনার জন্য দায়ি সেনাবাহিনী ও তাদের প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খান এবং আমলাতন্ত্র ও পশ্চিম পাকিস্তানি এলিট গোষ্ঠীর প্রতিনিধি জুলফিকার আলী ভূট্টো। গণহত্যা [৩০ লক্ষ] ও চার লক্ষ ধর্ষণের দায়-দায়িত্ব তাদেরই।

৩৯

অ্যাকাডেমিক বা গবেষণা গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, পছন্দ না হলেও। জেনারেল মতিনউদ্দিনের ক্ষেত্রেও সেই সমস্যা হয়েছে।

একদিকে তিনি পাকিস্তানি ও জেনারেল অন্যদিকে অবসর গ্রহণের পর বই লিখছেন অ্যাকাডেমিক হিসেবে। জেনারেল পদ থেকে অবসর নিলে খোলা চোখে তখন অনেক কিছু চোখে পড়ে যা আগে পড়ত না। অ্যাকাডেমিক বই রচনা করতে যেয়েই বিপদে পড়েছেন তিনি। সেটি বোঝা যায় গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় পড়লে, যার শিরোনাম 'মুক্তিবাহিনী'।

গ্রন্থের অধ্যায়গুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র। তবে, তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এ জন্য যে, পাকিস্তানের অন্যান্য জেনারেলদের লেখায় মুক্তিবাহিনী শব্দটি প্রায় নেই। কিন্তু, মুক্তিবাহিনীর বর্ণনা ছাড়া একাত্তরের ইতিহাস লেখা বাতুলতা। সেটি জেনারেল মতিনউদ্দিন বুঝেছিলেন। তবে, লেখাটি তার জন্য ছিল কষ্টকর, কিছু শব্দ ব্যবহারই তার প্রমাণ।

মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের বার্তা পৌঁছেছিল ব্যারাকে বাঙালি সেনাদের কাছেও। তারা ভেবেছিল এবার ক্ষমতায় গেলে তাদের ক্ষেত্রে যে সব অন্যায্য ব্যবহার করা হয়েছে তা কমবে। বাক্যটি তিনি এভাবে রচনা করেছেন–

"Many of their perceievd injustices would surely be undone." [পৃ.২২১] অর্থাৎ Injustice-গুলি সত্য নয়।

এরপর তিনি ইবিআর, ইপিআর প্রভৃতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। নুরুল কাদের খানের বর্ণনায় তারপর মুক্তিবাহিনী গঠনের বিবরণ দিয়েছেন। এখানে যতটা সম্ভব ভারত যে সব করে দিচ্ছে তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে তথাকথিত, [উল্লেখ্য বিএনপির একজন প্রতিষ্ঠাতা ও মন্ত্রী মরহুম সাইফুর রহমান মন্তব্য করেছিলেন– 'কোথাকার কোন নজরুল ইসলাম', যা মতিনউদ্দিনের মন্তব্যেরই সমার্থক]। মুক্তিযোদ্ধাদেরও তথাকথিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারপর ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সাহায্যে কীভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

"মুক্তিবাহিনী যে রকম কার্যকর হবে বলে মনে করা হয়েছিল সেরকম হয়নি" মনে করেন মতিনউদ্দিন। লিখেছেন তিনি, ভারতীয় এক লেখক মুক্তিবাহিনীর 'ফাইটিং আসপেক্ট' নিয়ে 'ইন্টারেস্টিং' ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার মতে, বিদ্রোহীরা পাঠানদের ভয়ে অস্থির ছিল। মুরগি হৃদয় বিদ্রোহীরা ভারতীয় সেনা অফিসারদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, 'পাঠান মরা গিয়া হ্যায় ইয়া নাহি। আগার মারা নাহি তো আগার নাহি যাউঙ্গা।' জেনারেল অরোরা মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, পাঞ্জাবি মুসলমানদের নিয়ে বাঙালিদের এক ধরনের প্যারোনিয়া ছিল। তারা তাদের কাছাকাছি যেত না। ছোট ছোকড়াদের পাঠাত খবরাখবর জানার জন্য।

প্রথম ঘটনাটির ফুটনোট দেয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থপঞ্জিতে গার্গ নামে কোনো লেখকের নাম নেই। অরোরার উক্তির কোনো সূত্র দেয়া হয়নি। অরোরা ঢাকা এসেছেন, অনেকবার বক্তব্য রেখেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্ব নিয়ে কিন্তু এ ধরনের কোনো মন্তব্য কখনও করেছেন বলে শুনিনি। আর প্রথম বক্তব্য সম্পর্কে বলতে চাই। ১৯৭১ সালের জুন-জুলাই (খুব সম্ভবত) মাসের সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকাটি দেখুন। সেখানে একটি ছবি আছে। লুঙ্গি গেঞ্জি পরা এক মুক্তিযোদ্ধা এক পাঞ্জাবির শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটা হাতে ধরে প্রদর্শন করছে। এটি উল্লেখ করতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু করতে বাধ্য হলাম।

জেনারেল মতিনউদ্দিন মনে করেন, মুক্তিবাহিনীর প্রধান অবদান পাকিস্তানিদের সম্পর্কে সর্বশেষ খবরাখবর জানানো। ভারতীয়দের এইসব খবরাখবর জানাত তারা। অবশ্যই গ্রামের মানুষজনও ছিল ভারতীয় সেনাদের ইচ্ছুক ইনফর্মার।

অন্যান্য আদর্শিক গেরিলা সংগঠনের মতো মুক্তিবাহিনীও পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পর পাগল হয়ে গিয়েছিল। অরিয়ানা ফ্যালাসীর সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন, "আত্মসমর্পণের দু'সপ্তাহ পরও অবাঙালিদের হত্যা করা হচ্ছিল। শত্রু মনে হলেই মুক্তিবাহিনী পিটিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। ১৯৭১ সালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অফিসার জনৈক হাশমী তাকে জানিয়েছিলেন, তারা এত আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল যে, আত্মসমর্পণের পর তাদের মনে আল্লাহর ভয় ঢোকানোর জন্য তাদের হাজার হাজার মুক্তিকে হত্যা করতে হয়েছে।"

["They had gone so out of control that even the Indian army had to kill thousands of Muktis after the surrender to put the fear of Allah in them." [পৃ. ২৩৮]

এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু বলতে হয়, ১৬ ডিসেম্বরের পর তা'ই যদি হতো তাহলে বাঙালি পাকিস্তানিরা আজ আবার বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তান করার স্বপ্ন দেখত না। বিভিন্ন জায়গায় রাজাকারদের গ্রেফতার, পেটান, দু-এক জায়গায় হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু যে মাত্রায় প্রতিশোধের দরকার ছিল তা হয়নি। এবং প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতির আজ এই পাকিস্তানি অবস্থা।

আর ফ্যালাসীর যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তার কোনো ক্ষমতা নেই। ভারতীয় বাহিনী তা করতে গেলে ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধ শুরু হতো।

মুক্তিযোদ্ধাদের শৌর্যবীর্য নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। এ নিয়ে হাজারখানেক বই লেখা হয়েছে। তবে, মনে হয় তার বইটি যেভাবে তিনি

লিখছিলেন সেখানে এই অধ্যায়টি না দিলে বরং ভালো হতো। পুরো বইয়ে যে ভারসাম্য রক্ষার একটা প্রচেষ্টা আছে সেটি নস্যাৎ হয়ে যেত না। মিথ্যায় পরিপূর্ণ ও কষ্টকৃত ভাবে রচিত এ অধ্যায়টি প্রমাণ করেছে পাকিস্তানি একজন জেনারেল শেষ পর্যন্ত একজন পাকিস্তানি জেনারেলও। পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া তার পক্ষে দুষ্কর।

গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলি নিয়ে আলোচনার খুব একটা প্রয়োজন নেই। পঞ্চম অধ্যায় 'সামরিক অভিযান'। ২৫ মার্চের গণহত্যা চালাবার অভিযান সম্পর্কিত বর্ণনা। এটি না লিখলে ভালো হতো। এক ধরনের মামুলি ইঙ্গিত ছাড়া তেমন কিছু এখানে নেই। না ভুল বললাম, আছে। অনেক অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ যার মূল কথা হলো, পাকিস্তানি সৈন্যদের চেঙ্গিস খানের সৈন্যদের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। তারা সেনা, পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সের ক্রস ফায়ারে পড়ে গেছে। তবে, এদের ওপর আরো নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন ছিল ইত্যাদি। জেনারেলকে এভাবেই বিষয়টি দেখতে হবে, কারণ তিনি পাকিস্তানি জেনারেল এবং তখন 'বীর' পাকিস্তানি বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তার ভাষায়, দীর্ঘ হলেও অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করছি। যাতে বোঝা সম্ভব হয় অধ্যায়টিতে তিনি কী বলতে চেয়েছেন–

"It would not be totally correct however to lebel all those who carried out orders as butchers or Chengiz Khan's hordes. They were soldiers who were caught in the cross fire of political violence-their fault lay in not being able to dampen the bitterners that had been aroused because of decades of political bungling. Greater control over emotions was needed. Though it is realised that those who have not been under stress and strain of prolonged insurgency can sit back and make pious sermons it still cannot be denied that it was both necessary and imperative to restrain the men under contral." [পৃ. ২৬৯]

এর অন্তর্গত অর্থ ২৫ মার্চ অতিরিক্ত কিছু হয়েছিল যা ঠিক ছিল না কিন্তু সরাসরি সেটি তার পক্ষে বলা দুরূহ।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'পাকিস্তান ভাঙ্গায় ভারতীয় ভূমিকা'। এটি পাকিস্তানি জেনারেলদের প্রিয় বিষয়। আগের অধ্যায়গুলিতেও এর বর্ণনা আছে। তবে এটি বিস্তারিত। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালে ভারত কী কী ব্যবস্থা নিয়েছিল তার ধারণাকৃত বর্ণনা আছে। সপ্তম অধ্যায় ১৯৭১ সালে অন্যান্য দেশের ভূমিকা। এখানে নতুন কিছু নেই। অষ্টম অধ্যায় 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৭১ (পূর্বাঞ্চল)।' ১০৮ পৃষ্ঠার এ অধ্যায় কোথায় কোথায় কীভাবে যুদ্ধ হয়েছে এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা কীভাবে বীরত্বপূর্ণভাবে 'ভারত'কে ঠেকিয়েছে তার বিস্তারিত

বর্ণনা আছে। নবম অধ্যায়ে 'নৌ ও বিমান' যুদ্ধ এবং দশম অধ্যায়ে 'জাতিসংঘে পাকিস্তান।' এসব অধ্যায়ে কখনও 'যৌথ বাহিনী', 'মিত্র বাহিনী' বা 'মুক্তি বাহিনী'র উল্লেখ করা হয়নি। তবে, ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে আত্মসমর্পণের সময় বাংলাদেশের কেউ উপস্থিত ছিল না। এর অর্থ যুদ্ধটি ছিল ভারত-পাকিস্তানের। কিন্তু এই মন্তব্যটি কি সত্য?

দ্বাদশ বা শেষ অধ্যায়টির শিরোনাম 'পাকিস্তান ভাঙার কারণ'। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক শাসনের অনুপস্থিতি, বাঙালিদের সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি কথা উল্লেখ করেছেন যা প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিতেও ঘুরে ফিরে এসেছে। ইয়াহিয়া শতাব্দীর ভুল করেছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তর না করে।

"Yahya made the mistake of the century by not handing over power to the majority party which had the support of almost the entire population of East Pakistan." [পৃ. ৪৭৪]

তবে, পাকিস্তান ভাঙার মূল কারণ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করা। তবে, শেখ মুজিবের অনড় মনোভাব সংঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করেছে। আর পিপিপি চেয়ারম্যানের অধিবেশনে যোগ না দেয়ার ঘোষণায় ইয়াহিয়ার পক্ষে জাহাজ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ইংরেজিতে বাক্যগুলি পড়লে বোঝা যাবে সূক্ষ্মভাবে বলা হচ্ছে পরিস্থিতির জন্য আসলে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবই দায়ী। তার ভাষায়– "The Sheikh's uncompromising attitude set the ship of state on a collision course the refusal of the Chairman of the Peoples Party to join the national assembly session on 3 march pushed it further into more troubled waters, leaving president Yahya the impossible task of siring it from being wrecked." [পৃ. ৪৭৪]

এরপর বৈদেশিক নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থনেতিক ক্ষেত্রে ধারাগুলি 'পারসিভড' বলে উল্লেখ করেছেন। বাঙালিদের সামাজিকভাবে খাটো করে দেখা হয়নি, সামরিক অভিযান ইত্যাদি এবং এসবের সুযোগ নিয়েছে ইন্ডিয়া। বিচারপতি হামুদুর রহমানের বক্তব্য দিয়ে তিনি এ প্রসঙ্গের ইতি টেনেছেন নিজের বক্তব্য হিসেবে, যে সবকিছুর জন্য ভারতই ছিল দায়ী।

"Justice Hamood-ur-Rahman, however, very rightly, pointed out that it was India which was keen to do every thing to precipitate a crisis in East Pakistn." [পৃ. ৪৮১]

ত্রয়োদশ অধ্যায় পাকিস্তান বাংলাদেশ ও ভারতের ওপর পাকিস্তান ভাঙার অভিঘাত এবং সবশেষে উপসংহার। বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখেছেন, দ্বি-জাতি

তত্ত্বের কারণে বাঙালি বাংলাদেশ পেয়েছে। পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না। অর্থাৎ, দ্বি-জাতি তত্ত্ব সঠিক ছিল। ধর্ম নিরপেক্ষতার যে পথ বাংলাদেশ নিয়েছিল তা ভুল ছিল। এখন তার ইসলামি পরিচয় ফিরে পেয়েছে। তবে স্বাধীনতা পেয়ে কী লাভ হয়েছে? বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে আছে পাকিস্তান থেকে এবং পাকিস্তানের সঙ্গেই তো বাণিজ্য করছে। ভারত, পাকিস্তান ভাঙার জন্য এত টাকা খরচ করেছিল যে ইন্দিরা গান্ধী 'গরিবি হটাও' অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ, ভারতের কোনো লাভ হয়নি। পাকিস্তান আকারে ছোট হয়েছে আর কী ক্ষতি হয়েছে? তবে পাকিস্তান ভাঙার জন্য যারা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তাদের ওপর প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। কাকতালীয় ঘটনাই বলা যেতে পারে। এদের কারোই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। মুজিবকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে, তাজউদ্দীন বিদ্ধ হয়েছেন বেয়নেটে, ভূট্টোকে ঝোলান হয়েছে ফাঁসিতে আর জিয়াউর রহমান খুন হয়েছেন। ইয়াহিয়া এসব থেকে বেঁচেছেন তবে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গৃহবন্দি থেকেছেন, খন্দকার বেঁচে আছে [এখন মৃত] তবে পাঁচ বছর জেল খেটেছেন যে দেশ তিনি গড়তে সাহায্য করেছেন।

উপসংহারে পুরানো কথাগুলিই আবার বলেছেন। আমাদের উপসংহারে বলব, পাকিস্তানি জেনারেলদের মধ্যে কামাল মতিনউদ্দিনই সামগ্রিকভাবে ১৯৪৭-৭১ পর্বের ইতিহাস রচনা করেছেন। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং মাঝে মাঝে নিজের বক্তব্য/মন্তব্যের মাঝে ফুটে উঠেছে যে, পাকিস্তানি কোনো জেনারেলের পক্ষে অবজেকটিভ ভাবে ১৯৭১ দেখা সম্ভব নয়। বাঙালিদের মন বোঝাও সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তার পূর্বসুরিদের ধ্যানধারণা ও পূর্ব ধারণা থেকে বেরিয়ে আসাও।

৪০

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সিদ্দিকির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ১৯৯৮ সালে। মহিউদ্দিন আহমদ ও আমি করাচি পৌঁছেছি ১৯৭১ সাল সম্পর্কিত বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। আমেনা সৈয়দ, সিদ্দিকির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেন।

১৯৭১ সালে সিদ্দিকি ছিলেন সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক। অবসর গ্রহণের পর পত্রিকায় কলামন্ লেখেন, *ডিফেন্স জার্নাল* নামে একটি জর্নাল সম্পাদনা করেন। আমরা যখন করাচিতে তখন তাঁর প্রথম গ্রন্থ *দি মিলিটারি ইন পাকিস্তান : ইমেজ অ্যান্ড রিয়ালিটি* প্রকাশিত হয়েছে।

সিদ্দিকির সে সময় দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কয়েকদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *ঈষ্ট পাকিস্তান : দি এন্ডগেম।*

উপর্যুক্ত বই দুটির বিষয়বস্তু মিল আছে অনেক। প্রথমটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উত্থান ও বিকাশ : সেখানে ১৯৭১ এসেছে, স্বাভাবিক ভাবে বিধৃত হয়েছে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও। দ্বিতীয় বইটি মূলত স্মৃতিচারণামূলক। সেখানেও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রসঙ্গ এসেছে কিন্তু বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বা ১৯৭১।

পাকিস্তানি জেনারেলদের যে কটি বই এখানে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে সিদ্দিকির বই দুটিই আমার ব্যতিক্রমি মনে হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বইটি। পাকিস্তানি কেউ এভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিচার করতে পারে তা আমার ভাবনার অতীত।

আমি এখানে প্রথমে তাঁর দুটি বই আলোচনা করব। তারপর ১৯৯৮ সালে নেয়া সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত করব। সাক্ষাৎকারের অনেক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি আছে প্রথম ও দ্বিতীয় বইটিতেও। তবুও আমার কাছে সেটি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তাছাড়া, নতুন তথ্যও আছে তাতে। সিদ্দিকির *দি মিলিটারি ইন পাকিস্তান : ইমেজ অ্যান্ড রিয়ালিটি*, জেনারেলদের মন এবং তাদের লেখা গ্রন্থ (বিশেষ করে ১৯৬৯-৭১ সম্পর্কিত) বুঝতে সাহায্য করবে। সম্পূর্ণ, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিচার করেছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো সদস্যের এ ধরনের লেখা এই প্রথম প্রকাশিত হলো। মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও এসেছে গ্রন্থটিতে, তাই তা আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ওপরে জেনারেলদের তৈরি যে ইতিহাস তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছি, এ বইটি সে তত্ত্ব স্পষ্ট করতেও সাহায্য করবে।

গ্রন্থকার শুরুতেই অজ্ঞাত এক ব্যক্তির একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন– "Countries which worship armies tend to use armies." বলা যেতে পারে এটিই তাঁর বইয়ের মূল বিষয়। পাকিস্তানিরা সেনাবাহিনীকে ভজনা করেছে এবং ব্যবহার করেছে। তবে, তিনি বিষয়টি অন্যভাবে দেখলে যথাযথ হতো। পাকিস্তানিরা সেনাবাহিনীকে ভজনা করেছে আর সেনাবাহিনী রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেছে, ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করেছে এবং রাষ্ট্রকে ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলেছে। সিদ্দিকি পুরো বইয়ে একটি বিষয়ই বলতে চেয়েছেন, পঞ্চাশের দশক থেকে পাকিস্তানের সামরিকবাহিনীর একটি ইমেজ গড়ে তোলা হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। ইমেজ বৃদ্ধির এই নিরন্তর ধান্ধা তাদের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, তারা কোনো ভুল করতে পারে না। জেনারেলরা সবসময় মনে করেছেন, রাজনীতিবিদরা যে বিশৃঙ্খলা (mess) সৃষ্টি করে যান

তারা তা দূর করতে পারবেন। এ বইয়ের উদ্দেশ্য এটি দেখানো যে, সেনা ভজনা কী ধরনের ধ্বংসাত্মক অভিঘাত সৃষ্টি করে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'দি বার্থ অফ দি ইমেজ (১৯৪৭-৫২)'। ১৯৪৭-৫২, এই পাঁচ বছর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইমেজের ছিল ভ্রুণাবস্থা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেনাবাহিনীর প্রধান ছিল ব্রিটিশ। আইয়ুব খানকে সেনাবাহিনী প্রধান রাখার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পাকিস্তানিত্ব কায়েম হয়। অন্যান্য ব্রিটিশ অফিসার যারা ছিলেন তারাও চলে যান। স্যান্ডহার্স্ট শিক্ষিত পাঞ্জাবি অফিসাররা ক্ষমতায় চলে আসেন। আইয়ুব খান সচেতনভাবে সেনাবাহিনীর ইমেজ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এবং এই ইমেজ সৃষ্টি দুই প্রদেশে দুই রকমভাবে হয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধের একটা ঐতিহ্য ছিল। সেনাবাহিনীর অধিকাংশ ছিল সে অঞ্চলের। ফলে, সেনাবাহিনীর ইমেজ সৃষ্টিতে সেখানে বাধা ছিল না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে লিখেছেন, সিদ্দিকি, যুদ্ধের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। আইয়ুব খান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম জিওসি। বাঙালিদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য তিনি গ্রামে-গঞ্জে ফ্ল্যাগ মার্চ করাতেন। বাঙালিরা, দীর্ঘদেহী, সুবেশী পশ্চিমা এই সৈন্যদের দেখে মুগ্ধ হতো, একধরনের শ্রদ্ধা জন্মাত।

১৯৪৭-৫২ সময়কালে, ওপরের দিকে সবাই ছিলেন পশ্চিমা, একজন ছাড়া। তিনি ছিলেন আসাম ক্যাডারের বাঙালি মেজর জেনারেল মজিদ। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্রের বিচারের সময় বিনা কারণে জেনারেল মজিদকে সংশ্লিষ্ট দেখিয়ে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ সময় লে. কর্নেল ওসমানী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন।

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি যা উল্লেখ করেননি তাহলো, জেনারেল মজিদ-কে চাকরিচ্যুত করার মাধ্যমেই সেই ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় আইয়ুব খানের সঙ্গে ওসমানীর বাক-বিতণ্ডা (চরম অর্থে নয়) হয় যা আইয়ুব খান ভুলতে পারেননি। এবং ওসমানীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আর কোনো প্রমোশন দেয়া হয়নি। ওসমানী হয়তো এ বিষয়টি আগেই অনুধাবন করেছিলেন। কারণ, এরপর যতদিন তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন ততদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ার কাজে মন দিয়েছিলেন। এ পটভূমিকায় ১৯৫০ সালে, এ.আর. সিদ্দিকি ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগ দেন সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগে। কারণ, সেনাবাহিনী তখন সচেতনভাবে ইমেজ সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়েছে।

৪১

১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সালটি ছিল সেই ইমেজের বিকাশ। সিদ্দিকির দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম তাই 'দি গ্রোথ অফ দি ইমেজ'। ১৯৫৩ সালে, জামায়াতে ইসলাম লাহোরে দাঙ্গার সৃষ্টি করে। কাদিয়ানীদের ওপর ছিল তাদের আক্রমণ। লাহোরে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং জেনারেল আজম খান হন লাহোরের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। উচ্চাভিলাষী ছিলেন আজম খান এবং জনসংযোগেও ছিলেন দক্ষ। সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে তিনি ক্ষমতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি দেখালেন, এ ধরনের দাঙ্গা ত্বরিৎ গতিতে একমাত্র সেনাবাহিনীই দমন করতে পারে। দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য মওদুদীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো (কার্যকর হয়নি)। ধর্মীয় কোনো নেতার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার সাহস সেনাবাহিনীর ইমেজ বৃদ্ধিতে সাহায্য করল এভাবে যে, তারা শান্তিরক্ষায় অকুতোভয়। সিদ্দিকির ভাষায়– "Officers were treated and projected as popular heroes and leaders." জেনারেলের নামে লাহোরে প্রতিষ্ঠা করা হলো– 'আজম ক্লথ মার্কেট।'

এ সময়টিতে কিছু কিছু বাঙালি সেনাবাহিনীতে নিয়োগ পেতে লাগল। কিন্তু জানিয়েছেন আরেক জেনারেল তোজাম্মল হোসেন মালিক যে, কাকুলে মিলিটারি একাডেমিতে বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখি ১৯৫২ সালে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ছোট ভাই আবদুল কাইয়ুমকে ঠেকানো যায়নি। শ্রেষ্ঠ ক্যাডেট হিসেবে তিনি 'সোর্ড অফ অনার' লাভ করেন। পাকিস্তানি মহিলাকে বিয়ে করে তিনি পাকিস্তানেই থেকে যান কিন্তু কর্নেলের ওপর তাঁকে প্রমোশন দেয়া হয়নি। এর ব্যতিক্রম জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন। কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি ছিলেন ঢাকার খাজা পরিবারের সঙ্গে যুক্ত এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত (এবং পরেও) তারা ছিলেন ক্ষমতার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত এবং বাংলা যাদের মাতৃভাষা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে, বাঙালিদের প্রতি জেনারেলদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা তুলে ধরেছেন সিদ্দিকি আইয়ুব খানের উদাহরণ দিয়ে। তাঁর ভাষায়– "Even as a local major-general in East Pakistan back in 1948, Ayub had conceived a profound contempt or commiseration for the Bengalis, from the chief minister (Khawaja Nazim-un-Din) down to the common man in the street." পিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় সোহরাওয়ার্দীর প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়েছিলেন সামরিক অফিসাররা। আইয়ুব কখনও একথা ভোলেননি। ১৯৪৮

সালে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সামনে যখন বিক্ষোভ চলছিল তখন আইয়ুব বগুড়ার মহাম্মদ আলীকে কঠোর ভাষায় বাড়ি চলে যেতে বলেছিলেন– "I tapped Muhammad Ali on the shoulder and said. 'Are you looking for a bullet?"

বাঙালিদের আইয়ুব কতটা ঘৃণা করতেন তার উল্লেখ আছে আইয়ুবের আত্মজীবনীতে। সেখানে থেকে বড় হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত করছি কারণ এর ফলে আমাদের বুঝতে সহজ হবে বাঙালিদের কিভাবে দেখেছেন জেনারেলরা এবং তাদের নীতিনির্ধারণ এ দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে প্রভাবিত করেছিল। আইয়ুব লিখেছিলেন– "It would be no exaggeration to say that up to the creation of Pakistan, they (the Bengalis) had not known any real freedom. They have been in turn ruled either by the caste Hindus, Moghuls, Pathans or the British. In addition, they have been and still are under considerable Hindu cultural and linguistic influence. As such they have all the inhabitions of down-trodden races..."

ইতিহাস জ্ঞান না থাকলে যা হয় আর কি। আইয়ুব খান বলতে ভুলে গেছেন, যে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও একইভাবে বর্ণ হিন্দু, মুঘল ও ব্রিটিশদের অধীনে ছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের সবাই ব্যঙ্গ করত ব্রিটিশদের ধামাধরা হিসেবে।

এ সময় পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী আমেরিকার নজরে আসে, জানিয়েছেন সিদ্দিকি। তবে তিনি যা বলেনি তাহলো, সামরিকবাহিনী আমেরিকার কব্জায় চলে যায় এবং আমেরিকা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে সামরিকবাহিনী ও পাকিস্তানকে। এ বিষয়ে খানিকটা আলোচনা করতে চাই।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেছিলেন তখন ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে চান যেখানে জনগণ পাবে একটি সৎ, গণতান্ত্রিক এবং কার্যক্ষম সরকার। নিউইয়র্ক টাইমস মন্তব্য করেছিল, আইয়ুবের আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তারিক আলি অভিযোগ করেছেন, এই সামরিক অভ্যুত্থানে আইয়ুবকে সহায়তা করেছিল সিআইএ। এমনকি আইয়ুবের ভাইও এ বক্তব্য স্বীকার করেছেন। তারিক আলির বইতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী তারিক আলিকে ঘটনাটা বলেছিলেন। সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে নতুন প্রেসিডেন্ট বৈদেশিক নীতির কথা নাকি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এ বলে যে, ব্যক্তিগতভাবে একটি দূতবাসের ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ তা হলো মার্কিন দূতাবাস। আইয়ুব

খানের সঙ্গে মার্কিনীদের মধুর সম্পর্কের কথা কলিম সিদ্দিকিই উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন মার্কিনীরা তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেয়ে এতই খুশি হয়েছিল যে, এক বছরের মধ্যে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল তিনগুণ। ১৯৫৮ সালে যে সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ১ লক্ষ ডলার ১৯৫৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়াল ১৮ কোটি ৪ লক্ষ ডলার। এখানে উল্লেখ্য যে, মার্কিন অস্ত্র সাহায্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের (অক্টোবর, ১৯৫৩) যে আলোচনা হয়েছিল তাতে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন আইয়ুব এবং এর আগে এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে তেমন কোনো আলোচনাই হয়নি।

সামরিক খাতে প্রচুর মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও জাতীয় মোট উৎপাদনের তুলনায় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিচের সারণি তার উদাহরণ।

ওয়েন এ উইলকক্স একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে এক দশক ধরে পাকিস্তানের সমরখাতে খরচ করতে হয়েছে খুব কম। নিচের সারণি সে কথা বলে না। একই প্রবন্ধে আবার উইলকক্স স্বীকার করেছেন যে বৈদেশিক [অর্থাৎ মার্কিন] হস্তক্ষেপ এশিয়ার আঞ্চলিক বিরোধগুলিকে প্রশমিত করতে পারেনি, বরং সেগুলির ব্যাপ্তি ও কুফল বাড়িয়ে তুলেছিল।

নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, ১৯৫৪-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রখাতে সাহায্য পেয়েছে ১.৫ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭২ সালে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য-সংক্রান্ত যেসব তথ্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সাহায্যের পরিমাণ টাইমসে উল্লিখিত অঙ্কের অর্ধেক। দুটি উৎসের এ গরমিল থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, গোপনে যেসব অস্ত্র দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ সরকারি নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়নি। এমস জর্ডনের দেওয়া হিসাব এ সন্দেহ আরো জোরদার করে [ড্রেপার কমিটির সদস্য থাকাকালীন এমস সরকারি হিসাব দেখেছেন] তাঁর মতে, ১৯৬০ পর্যন্ত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমরখাতে ৩৯০-৪৪০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়েছে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একটি হিসাব নিলে এ বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে।

পাকিস্তান সরকার বছর	রাজস্ব ও প্রতিরক্ষা ব্যয় রাজস্ব (লক্ষ টাকা)	প্রতিরক্ষা ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৯৪৭-৪৮	১৯৮৯	১৫৩.৮
১৯৪৮-৪৯	৬৬৭.৬	৪৬১,৫

১৯৪৯-৫০	৮৮৫.৪	৬২৫.৪
১৯৫০-৫১	১,২৭৩.২	৬৪৯.৯
১৯৫১-৫২	১,৪৪৮.৪	৭৭৯.১
১৯৫২-৫৩	১,৩৩৪.৩	৭৮৩.৪
১৯৫৩-৫৪	১,১১০.৫	৬৫৩.২
১৯৫৪-৫৫	১,১৭২.৭	৬৩৫.১
১৯৫৫-৫৬	১,৪৩৫.৮	৯১৪.৭
১৯৫৬-৫৭	১,৩৪১.৪	৯০০.৯
১৯৫৭-৫৮	১,৫২৫.০	৮৫৪.২
১৯৫৮-৫৯	১,৯৫৮.৭	৯৯৬.৬
১৯৫৯-৬০	১,৯৭৭.৫	১,০৪৩.৫
১৯৬০-৬১	২,১২২.৫	১,১১২.৪
১৯৬১-৬২	২,৩১৬.৯	১,১০৬.৬
১৯৬২-৬৩	২,৪৪৬.০	৯৫৪.৩
১৯৬৩-৬৪	২,৮২৯.৬	১,১৫৬.৫
১৯৬৪-৬৫	৩,৩০১.০	১,২৬২.৩
১৯৬৫-৬৬	৩,৭৯৭.৯	২,৮৫৫.০
১৮৬৬-৬৭	৪,৪৭৫.২	২,২৯৩.৫
১৯৬৭-৬৮	৪,৭০৪.২	২,১৮৬.৫
১৯৬৮-৬৯	৫,৭৭৪.১	২,৪২৬.৮
১৯৬৯-৭০	৬,৬০২.৬	২,৭৪৯.২
১৯৭০-৭১	৬,৪৬১.৩	৩,২০০.০
১৯৭১-৭২	৫,৮৯৮.৬	৪,২৬০.০

১৯৬২-এর দিকে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ৭টি B-57 এর এক স্কোয়াড্রন এবং ১২টি F-104 স্টার ফাইটার এবং চার স্কোয়াড্রন বিমান ছিল। এক বছরের মধ্যে পাকিস্তানের যুদ্ধবিমানের সংখ্যা দাঁড়াল ২৫০ টিতে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দুই স্কোয়াড্রন B-57B-লাইট বোম্বার, এক স্কোয়াড্রন F-104 স্টার ফাইটার এবং চার স্কোয়াড্রন F-86 F স্যাবর।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসনাল সাবকমিটির সামনে প্রদত্ত মার্কিন সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব কর্নেল উলফ পি গ্রসের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে কমিটির সামনে এক শুনানিতে তিনি বলেন, ১৯৫৪-১৯৬৫-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ৬৯ কোটি ৩ লক্ষ ডলারের সমরাস্ত্র

এবং ৭০ কোটি ডলারের অন্যান্য সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করেছে। গ্রস-প্রদত্ত হিসাব-অনুযায়ী এ পরিমাণ প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ডলার যা 'নিউইয়র্ক টাইমস'-উল্লিখিত অংকের কাছাকাছি।

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত পাকিস্তানের ইকোনমিক এপ্রাইসাল কমিটির মত অনুসারে [১৯৫২ সালে] রাজস্বের ৫৪ থেকে ৮৬ ভাগ সমরখাতে ব্যয় না করে বরং উন্নয়ন ও সমরখাতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা উচিত। কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি। মার্কিন অনুদান বৃদ্ধির ফলে সমরখাতের উদ্বৃত্ত ব্যয় করা হয়েছিল সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবারের আরাম-আয়েস বা ভোগ-বিলাসের জন্য।

মার্কিন নীতিনির্ধারকরা ঠিকই জানতেন যে, তাদের সাহায্যের ফলে পাকিস্তানে বিলাসপ্রিয় এক সামরিক এলিটদের বিকাশ হচ্ছে। যাদের জীবনযাপনের মান সাধারণ লোক থেকে অনেক উঁচুতে। শুধু এ কারণেই সেনাবাহিনীর নিচের দিকে বা সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমলারা এক্ষেত্রে সুচতুরভাবে ভারত-ভীতির ব্যাপারটা আতঙ্কের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। প্রচারমাধ্যমগুলি ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে এ আতঙ্ক ছড়াতে তারাও সাহায্য করেছিল। ১৯৭১ সালের পরও পাকিস্তানে গণঅসন্তোষ মাথাচাড়া দেবার পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু সেই একই আমলারা জনমনে উপরোক্ত আতঙ্কজনিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সমর্থ হয়েছিলেন নিজেদের বাঁচাতে।

পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্রের আমলাদের যোগাযোগের ওপর তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। তবে, এ সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ-চলাকালীন ঘটনাবলি এর প্রমাণ। ঐ সময় পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিয়ত পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। এবং এটা সম্ভব হয়েছিল দুই দেশের আমলা বিশেষ করে সামরিক আমলাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে।

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সামরিক আঁতাত চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই এ সম্পর্কের শুরু। লিখেছেন ফজল মুকিম খান, "শিগ্গীই পাকিস্তানের অফিসাররা মার্কিন মতামতকে গুরুত্ব দিতে শিখল। এ ধরনের বোঝাপড়া হয়ে যাবার পর পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অফিসারদের সম্পর্ক মধুর হতে সময় লাগল না। [ফলে] প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের কঠোর দায়িত্ব পালনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের অফিসাররা পাকিস্তানি অফিসারদের সমর্থন জানিয়েছে।" 'সুস্থ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক' গড়ে তোলার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল শিক্ষা সফরের।

আয়োজন করা হয়েছিল 'অরিয়েন্টেশন ট্রেনিংয়ের।' এর অর্থ হ্যারল্ড এ. হোভের মতে, মার্কিন সামরিক কেন্দ্রগুলি দেখানো এবং বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থানরত মার্কিন অফিসারদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন। এ প্রশিক্ষণের তত্ত্ব ছিল যে, এর মাধ্যমে ঐ দেশের (পাকিস্তানের) উঠতি নেতারা মার্কিন সামরিক সংস্থা ও জনগণ সম্পর্কে জানতে পারবে। এবং মার্কিন নীতিরও তারা সমর্থক হয়ে উঠবে। তারিক আলির মতে এসব শিক্ষাসফর ছিল ঘুষ এবং এভাবে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিকবাহিনীর ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। আমরা লক্ষ্য করি এর ফলে সামরিক আমলারা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল যে পেন্টাগনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় তারা সহযোগী বেসামরিক আমলাদের উপেক্ষা করত। এ কারণেই বোধ হয় ১৯৭১ সালে সামরিক আমলারা নিশ্চিত ছিল যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেই। যদিও সে আশা সফল হয়নি কিন্তু শেষ সময়ে মরিয়া হয়ে পৃথিবীর একটি মহা-শক্তিশালী নৌযান পরমাণুচালিত বিমানবাহিনী এন্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রেরণ প্রমাণ করে যে, দুই দেশের সামরিক আমলাদের বন্ধন কত ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল। [মার্কিন ও পাকিস্তানি সেনা প্রশাসনের বিবরণটুকু নেয়া হয়েছে আমার ও জয়ন্ত কুমার রায়ের লেখা *প্রশাসনের অন্দরমহল: বাংলাদেশ* থেকে]

সিদ্দিকি জানিয়েছেন, এই মৈত্রী 'centre of gravity' পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে নিয়ে আসে। এবং জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চল নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে। এ সময় তুলনামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে বিশেষ করে নৌ ও বিমানবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সম্পূর্ণ সেনা এস্টাবলিশমেন্টের তুলনায় তা ছিল ভগ্নাংশ মাত্র। আমেরিকার সাহায্যের প্রায় পুরোটা লাভ করে পশ্চিম ও সামরিকবাহিনী। এতে তাহলে বাঙালির কী লাভ? কিছুই না। লিখেছেন সিদ্দিকি– "The Bengalis paid the piper, while the West Pakistanis called the tune. The inflow of the American aid and all the propganda in respect of its benefit touched the Bengalis where it hurt them most that is, inadequate representation in the armed forces as the largest repository of power and authority."

এ ছাড়াও ১৯৫৮ পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রতিবছর বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেনাবাহিনীর ইমেজ, ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। অন্যদিকে, জাতীয় ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। সৃষ্টি হয় বিশৃংখল অবস্থার। সেনাবাহিনী তখন প্রস্তুত জোর কদমে ক্ষমতা দখলের জন্য।

৪২

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪-এর সময়কালটুকুকে ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি উল্লেখ করেছেন সেনাবাহিনীর ইমেজের পরিপূর্ণতা লাভের সময় হিসেবে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন তিনি 'দি রাইজ অব দি ইমেজ'।

আইয়ুবের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে ১৯৫৮ সালে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত যে ইমেজের সৃষ্টি করেছিল সেনাবাহিনী তার ফল পাওয়া যায় এ সময়ে। সামরিক শাসনকে অধিকাংশ মানুষ স্বাগত জানায়। সিদ্দিকি যে- বিষয়টি উল্লেখ করেননি, তাহলো, পাশ্চাত্য বিশেষ করে মার্কিন অ্যাকাডেমিশিয়ানরা একটি নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি করেন এ সময়। তাহলো পাকিস্তানের মতো অনুন্নত দেশে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে সামরিক শাসনের প্রয়োজন। এই তত্ত্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামরিক শাসনকে মদদ যোগায়।

ক্ষমতা দখলের পর আইয়ুব জনসংযোগকে ঢেলে সাজান। তাঁর তখন মনে হয়েছিল, শক্তি দ্বারা সবকিছু জয় সম্ভব নয়, ক্ষমতাও সংহত করা যাবে না। এজন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে এবং এক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে– "Only through persuasion and education." সুতরাং সামরিকবাহিনী ও বেসরকারি জনসংযোগে যুক্ত হলো এ দুটি উপাদান। সিদ্দিকী লিখেছেন– "With his deeply ingrained soldiers contempt for the 'bloody civilian', the scruffy intellectual and wretched penpusher, Ayub instantly realized and accepted their nuisance value."

এ পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি করা হয় রাইটার্স গিল্ডের। দুই অংশের লেখকরা কিছু পাবার আশায় গিল্ডে ভিড় জমাতে থাকেন। এই প্রথমবারের মতো দুই অংশের লেখকদের একটি ফোরাম গঠিত হয়। কর্তব্যরত জেনারেলদের বিভিন্ন উচ্চপদে বসান হয়। ইয়াহিয়া খানকে রাজধানী গড়ার ভার দেওয়া হয় এবং এভাবে প্রথম তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়ান। আইয়ুব খানকে প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে জাতীয় 'বীর'-এ পরিণত করা হয়। সংবাদপত্র ও সরকারি মাধ্যমও এই বীর-বন্দনায় রত হয়।

আইয়ুব খান এ সময় "ইনটেলেকচুয়াল রেজিমেন্টেশনের' জন্য গঠন করেন 'ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন' যা আমাদের কাছে পরিচিত বিএনআর নামে। আইয়ুবের প্রচারণা প্রধান ব্রিগেডিয়ার এফ.আর. খানকে এর দায়িত্ব দেয়া হয়। সিদ্দিকি এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "The Bureau was a most skilfully designed instrument of brain washing through a combination of PR and intelligence. Police and security agencies were intergrated into the Bureau to serve as a watchdog on the country's intelligentsia."

সেনাবাহিনী শুধু প্রচারণার মাধ্যমে কিভাবে পাকিস্তানের রক্ষক হিসেবে সেনাবাহিনীর ইমেজ গড়ে তুলেছিল তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন সিদ্দিকি। জেনারেল আজম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁকে অপসারণ করা হলে "Bengalis wept and cried and staged rallies against centres decision. The military had virtually become an object of worship in East Pakistan."

বাঙালি যুবকরা এই ইমেজের মোহে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। অন্যদিকে, মার্কিনীরা সর্বতোভাবে এই ইমেজ রক্ষায় সহায়তা দিতে থাকে যার ফল আগেই উল্লেখ করেছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় 'আর্মড ফোর্সেস ডে' পালন। এ দিনের মাধ্যমে জনসাধারণকে দেখান হতে থাকে সেনাবাহিনী কত শক্তিশালী। অন্যান্য জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান তো চলতেই থাকে।

৪৩

১৯৬৫ সালটি ছিল, সিদ্দিকির মতে, এই ইমেজের পরীক্ষার সময়কাল- 'দি টেস্ট অফ দি ইমেজ'। এ সময় পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর আগে দু'একটি সীমান্ত সংঘর্ষে পাকিস্তান ভালো অবস্থায় থাকলে সেনাবাহিনীর জনসংযোগ তুঙ্গে ওঠে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে নানা খবরাখবর পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলির সরবরাহের দায়িত্ব নেয় জনসংযোগ বিভাগ। রেডিয়োতে সেনাবাহিনীর বীরত্বগাথা নিয়ে গান প্রচারিত হতে থাকে। পশ্চিমে এই সময় একটি গান তো ছিল সবার মুখেমুখে- "মেরা মাহি চাইল চাবে লি/কানাইলনি জার্নাইল নি' (আমার প্রেমিক হয় কর্নেল নয় একজন জেনারেল)। বা 'মেরি চান মাহি কাপ্তান' (আমার প্রেমিক, মুখ তার চাঁদের মতো, সে একজন ক্যাপ্টেন)। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। সিদ্দিকি যেই উন্মাদনার কথা বলেছেন তা এখনও মনে পড়ে। ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ থেকে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ পর্যন্ত এই ইমেজের ছিল জয়জয়কার (দি ট্রায়াম্প অফ দি ইমেজ)।

এ সময় লাহোরের দক্ষিণে কাসুর সেক্টরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট লড়েছিল। গুল হাসান ছিলেন মিলিটারি অপারেশনের পরিচালক, ওসমানী উপ-পরিচালক। কিন্তু ওসমানীকে এ সময় কোনো কাজ দেয়া হয়নি।

ওসমানী এতে দমেননি। তিনি ব্যস্ত ছিলেন কীভাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্বগাথা প্রচার করা যায় তা নিয়ে। সে সময় তিনি অভিযোগ করেছিলেন, পাঞ্জাবি প্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বগাথা ব্ল্যাক আউট করছে। সিদ্দিকির কাছে তিনি অভিযোগ করে বলেছিলেন, আলতাফ গওহর পাঞ্জাবিদের তুলে ধরছে আর বাঙালিদের কথা চেপে যাচ্ছে। ওসমানী একজনের জন্য 'নিশান-ই-হায়দার' দাবি করেছিলেন কিন্তু ব্যাটালিয়ন কমান্ডার তা অগ্রাহ্য করেন। তবে, এই রেজিমেন্টকে দুটি সিতারা-ই-জুরাত ও ছয়টি তমঘা-ই-জুরাত দেয়া হয়। এককভাবে কোনো ব্যাটেলিয়ন এতগুলি মেডেল পায়নি। ওসমানী এককভাবে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্বগাথা প্রচারের কাজ করে গেছেন। সিদ্দিকির মতে, এই প্রচার পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল। কারণ, সামরিকবাহিনীর সবকিছু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া এবং 'They hated sharing it with the Bengalis."

এই সময় আইএসপি আর-এর ডিরেক্টর কর্নেল জেড এ সুলেরি প্রচারে নতুন এক মাত্রা যুক্ত করেন। তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এত বীরত্বপূর্ণভাবে লড়েছিল কেন? কারণ, সে মুসলমান। সে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেছে। সেনাবাহিনী হলো তাঁর মতে, "The ultimate sanction behind the creation of Pakistan." পশ্চিম পাকিস্তানে এই নথি পত্র-পত্রিকা জোরেশোরে প্রচার করতে লাগল। আমরা এর প্রকাশ দেখেছি। যখনই কোনো আন্দোলন হয়েছে শাসক বা সামরিকচক্রের বিরুদ্ধে তখনই বলা হয়েছে, আন্দোলনকারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে, তাদের মদদ যোগাচ্ছে হিন্দুরা (অর্থাৎ ভারত)। ইসলাম বিপন্ন। সুতরাং ইসলাম রক্ষায় এদের বিরুদ্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সিদ্দিকির ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'দি ম্যানিপুলেশন অফ দি ইমেজ।' এর সময়কাল তিনি নির্দিষ্ট করেছেন সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ থেকে ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ পর্যন্ত। তাঁর মতে, "The 1965 war had exalted the military image to mythical heights."

কিন্তু প্রশ্ন জাগে কেন এই হোঁচট খেল? কারণ, আমরা দেখি, তাশখন্দ চুক্তির পরদিন থেকে এর বিরুদ্ধে ধিক্কার শুরু হলো। এ বিষয়টির প্রতি সিদ্দিকি তেমন আলোকপাত করেননি। এ থেকে আবার এই বিষয়টাও পরিষ্কার হয় যে

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই জনসংযোগ ছিল রঙিন ফানুস মাত্র। পাকিস্তান যদি যুদ্ধে জিতেই থাকে তাহলে তাশখন্দ চুক্তি করতে পাকিস্তান বাধ্য হবে কেন? এর অন্য একটি দিক আছে, একদিকে যখন সামরিকবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল অন্যদিকে রাজনীতিবিদরা এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধও হচ্ছিলেন যার বিবরণ সিদ্দিকি দেননি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গোড়া থেকেই সামরিক শাসন মেনে নেয়নি। তাশখন্দ চুক্তি রাজনীতিবিদদের সুযোগ এনে নেয়। আইয়ুব খান তাশখন্দের প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে 'এক দশক' পালনের উদ্যোগ নেন ব্যাপকভাবে। এই প্রচারণা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আরো আলাদা করে দেয়। কারণ– "The overplay in the Decades publicity of the prosperity theme created, in general an agonizing awareness of the gap between appearance and reality." বাঙালিরা দেখল, যা উন্নতি হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তানের, পূর্ব পাকিস্তানের নয়।

অন্যদিকে ওসমানী সচেষ্ট ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মর্যাদা বৃদ্ধিতে। তিনি এই রেজিমেন্টের এক পুনর্মিলনীর আয়োজন করেন এবং সেখানে সিদ্দিকিকেও আমন্ত্রণ জানান হয় জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে। এই রেজিমেন্টের নাম, প্রতীক, সব ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং আলাদা। যদিও তা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর অংশ কিন্তু "It prided itself in being the only post-independance army regiment which did not carry a foriegn flag. Practically monolithic in class composition (unlike the mixed Pakistani regiments) it developed a sense of apartness from the rest,of the army." সিদ্দিকির মতে, এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ সেনাবাহিনীর মধ্যে সূক্ষ্ম বিভেদের সৃষ্টি করেছিল। এর রেজিমেন্টাল সেন্টারকে বলা হতো টাইগার সেন্টার, যে রাস্তা গেছে সেন্টারের দিকে তার নাম ছিল টাইগার রোড, সেন্টারের কমান্ডেন্টকে বলা হতো পাপা টাইগার আর রিক্রুটসদের টাইগার কাবস। জেনারেল নিয়াজি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, টাইগার রোডের নামকরণ হয়েছিল তাঁর নামে (টাইগার নিয়াজি)। তিনি যে সত্য বলেন নি, সিদ্দিকির তথ্যই তার প্রমাণ।

আইয়ুবের ডিকেড পালনের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শুরু হয় গণআন্দোলন। ইয়াহিয়া খান ধৈর্যসহকারে তাঁর ইমেজ সৃষ্টি শুরু করেন। জনসংযোগ বিভাগ আবার এর মধ্যেই ইমেজ 'ম্যানুপুলেট' করতে সমর্থ হয়। এবং এ কারণেই, রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনে ইয়াহিয়া সামরিক শাসন ঘোষণা করলে মানুষ তা সাময়িকভাবে মেনে নেয়।

সিদ্দিকি উল্লেখ করেছেন, আইয়ুবের একদশক শুরু হয়েছিল সামরিক

শাসনের মাধ্যমে, শেষও হলো সামরিক শাসন জারি করে। এ সময় জনসংযোগ ব্যবহৃত হয়েছে "As the main prop and instrument of governance" এর কাজে। এ ইমেজ শাসকদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির সৃষ্টি করেছিল এবং তারা তা বিশ্বাসও করত। আলতাফ গওহরের তোষামোদী জনসংযোগ সহায়তা করেছিল সামরিকবাহিনীকে "To build its action oriented image in a political vacuum."

৪৪

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন সিদ্দিকি 'দি টুইলাইট অফ দি ইমেজ' ইমেজের গোধূলিবেলা– যার সময়কাল ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১।

ইয়াহিয়া নিজেকে যেভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাহলো, তিনি সামরিকবাহিনী প্রধান বটে কিন্তু কট্টর সামরিক প্রধান নন। তিনি জনগণের কাছাকাছি। সিভিলিয়ানও বটে। এটি প্রমাণ করার জন্য তিনি কারণে-অকারণে সাংবাদিকদের সঙ্গে রসিকতা করতেন, সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ঢাকায় এসময় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'দি পিপল'-এর সম্পাদক আবিদুর রহমান তাঁকে 'আংকেল ইয়াহিয়া' বললেও তিনি তা মেনে নেন। সিভিলিয়ান হওয়ার তাঁর বাসনা জনসংযোগের ক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করে। সিদ্দিকির ভাষায়, "Messed up the popular image of the armed forces."

১৯৭০ এর প্রলয়ংকারী ঝড় জনসংযোগ তথা সামরিকবাহিনীর জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে তড়িঘড়ি করে ফিরে যান। বাঙালিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

২১ নভেম্বরে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ গুল হাসান ডেকে পাঠান জনসংযোগের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকিকে। তিনি সিদ্দিকিকে জানান, পরিস্থিতি সংকটময়, ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ খোলাখুলি সেনাবাহিনীর সমালোচনা করছে। এবং সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগের প্রেস রিলিজ পর্যন্ত ছাপছে না। সিদ্দিকিকে ঢাকায় যেতে হবে।

সিদ্দিকি ঢাকায় এসে দেখলেন কথা সত্য বটে। তবে, পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তুলছে বিদেশী সাংবাদিকরা। এ প্রসঙ্গে সিদ্দিকি যা বলছেন তা মেনে নেয়া যায় না। কারণ, আমরা তো তখন ঢাকায়-ই ছিলাম। তিনি লিখেছেন, অনেক বাঙালি সাংবাদিক বিদেশী সাংবাদিকদের হয়ে কাজ

করছিল। বিদেশীরা বাঙালিদের অতিরঞ্জন বিশ্বাস করছিল। "The foreign press teams spent most of their time in their Dacca hotels, visting the affected areas only rarely," পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে মানুষের দুর্দশা মোচনে কাজ করে যাচ্ছিল তা যেন বিদেশী সাংবাদিকদের নজরেই পড়ছিল না– আক্ষেপ করেছেন সিদ্দিকি। সামরিক শাসনের পক্ষে সাংবাদিকরা ছিল না এবং তা লুকাবার চেষ্টাও তারা করেনি।

যে সিদ্দিকি পূর্ববর্তী ছয়টি অধ্যায়ে সামরিকবাহিনীর একটি অ্যাকাডেমিক বিবরণ তুলে ধরেছিলেন, তার দু'তিনটি অনুচ্ছেদ তাঁর লুকানো পূর্ব ধারণা তুলে ধরে। অর্থাৎ, পাকিস্তানি জেনারেল যতই চেষ্টা করেন তাঁর নিরপেক্ষ ইমেজ তুলে ধরতে তাতে তিনি ব্যর্থ হন। বাঙালিদের প্রতি পূর্ব ধারণা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। মাত্রার হেরফের থাকতে পারে শুধু এই পূর্ব ধারণার ক্ষেত্রে।

ইয়াহিয়া ঢাকায় এসে প্রেস কনফারেন্স করেন। আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাংবাদিকরা তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছিল, পারেনি। সিদ্দিকির মতে, ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীর ইমেজ আবার খানিকটা ফিরিয়ে আনেন এবং সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। নির্বাচন হলো এবং সিদ্দিকির ভাষায় তারা প্রমাণ করল সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'ব্রুট ফোর্সে'র মাধ্যমে তারা সবসময় পাকিস্তানের ক্ষমতায় থাকবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র, বিশেষ করে সেনাবাহিনী এতে আতংকিত হয়ে ওঠে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল সেনাবাহিনীর প্রতি হুমকিস্বরূপ। সিদ্দিকি লিখেছেন, সেনাবাহিনী নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে কিন্তু তাদের 'উইজডম' নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন– "How come that none amongst the generals could foresee the invitable outcome of the election clearly enough to forestall it in good time? The military image in West Pakistan thus received a temporary set-back."

নির্বাচনের পর যেন সেনাবাহিনী তার কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। বাঙালিরা ক্ষমতায় এলে সেনাবাহিনীর কী হবে? এ প্রশ্ন ছিল সেনাবাহিনীর সব জেনারেলের মনে। ইয়াহিয়া যদিও বারবার বলছিলেন তিনি ব্যারাকে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, কিন্তু সে জীবনে তিনি আর ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

সিদ্দিকির এই বিবরণে আমরা একটি ইঙ্গিত পেয়ে যাই পরবর্তী ঘটনাবলির। সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছুক ছিল না, ভুট্টোকে তারা ব্যবহার করেছিল। সৃষ্টি করেছিল অজুহাতের এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে মরিয়া হয়ে সৃষ্টি করেছিল ২৫ মার্চের। অর্থাৎ, নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পরপরই সেনাবাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে সিদ্দিকি বর্ণনা দিয়েছেন সেনাবাহিনীর ইমেজের– "The military found itself in the twilight region of political power after the elections. In the gathering dusk the military image looked like the sphinx-half beast and half woman a freak on the em erging national scene."

৪৫

১৯৭১ ছিল ইমেজের সূর্যাস্ত (দি সানসেট অব দি ইমেজ)। এ অধ্যায়টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে সময় সিদ্দিকী সামরিক বাহিনীর জনসংযোগের প্রধান ছিলেন। এবং তাঁর ব্রিফ ছিল, বিশ্ববাসীকে বোঝানো যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

সিদ্দিকি জানাচ্ছেন, নির্বাচনের পর সেনাবাহিনীর মধ্যে এই ভাব-ই জাগছিল যে তারা অপাংক্তেয়। জাতীয় সব কর্মকাণ্ড থেকে তারা বাদ পড়ে যাবে। ১৩ বছরের সামরিক শাসনে তারা পেয়েছিল অপার ক্ষমতার স্বাদ। সামরিকবাহিনীর স্থান যেখানে হওয়া উচিত, নির্বাচন তাদের সে স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তাছাড়া অন্য একটি বিষয়ও ছিল। বাঙালিরা এখন ক্ষমতায় আসবে, আরো বাঙালি সেনাবাহিনীতে আসবে, ভারতের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হবে এবং "The consequent domination of the West Pakistan military power and of its image."

এ বক্তব্য থেকেই আমরা জেনারেলদের মানসিক জগতের ধারণা পাই। আসলে, কখনোই তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, নির্বাচনে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। গোয়েন্দা রিপোর্টও তাই বলছিল। সুতরাং, সেনাবাহিনীই শাসন চালাবে। নির্বাচনের ফলাফল তাদের ছক উল্টে দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানে এ সময় একটি ঘটনা ঘটে, জানিয়েছেন সিদ্দিকি। সেনাবাহিনীর ইমেজ তখন বাঙালিদের কাছে আলাদা কিছু নয়। তারা আর পশ্চিম পাকিস্তানিরা এক যারা দমিয়ে রাখতে চায় বাঙালিকে। এ পরিস্থিতিতে ৯ মার্চ সেনাবাহিনীর চাপে প্রাদেশিক সরকার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় এ পর্যন্ত ১৭২ জন নিহত হয়েছে, এর মধ্যে ২৩ জন নিহত হয়েছে সেনাবাহিনীর দ্বারা। সেনাবাহিনী বোঝাতে চেয়েছিল, বাঙালিদের ওপর শুধু তারা নয়, পুলিশও গুলি চালাচ্ছে এবং সিংহভাগ মানুষ মারা গেছে বাঙালির

গুলিতে। এতদিন বাঙালি আধা-সামরিকবাহিনী বা পুলিশ, পশ্চিম পাকিস্তানি ওপরঅলার হুকুম শুনছিল। কিন্তু এবার তারা শংকিত হয়ে পড়ে এবং ক্রুদ্ধও। সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত সবখানে এখন বাঙালি-অবাঙালি বিভেদের সৃষ্টি হয়। এর দশ দিন পর জয়দেবপুরে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আবরারের হুকুম মানতে বাঙালি সৈন্যরা অস্বীকার করে।

জেনারেলরা যে কী রকম জেনোফোবিয়ায় ভুগছিলেন তার একটি উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে। সিদ্দিকি লিখেছিলেন, *দি পিপল*-এ প্রতিদিন সামরিক শাসনবিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। জ্বালাময়ী এরকম একটি প্রবন্ধের নাম ছিল– "Whos who in the Aviary' লেখক একজন শওকত ওসমান। তিনি জানাচ্ছেন, আসলে এটি ছিল কর্নেল ওসমানীর লেখা। সামরিকবাহিনীর জনসংযোগের প্রধানের ধারণা ছিল এরকম!

পত্র-পত্রিকায় তখন নিয়মিত সামরিকবাহিনীর বিরুদ্ধে লেখা হচ্ছিল, বিশেষ করে *দি পিপল*-এ। (বাংলা তারা পড়তে জানত না দেখেই *পিপল*-এর কথা ঘুরেফিরে এসেছে)। সিদ্দিকি জানাচ্ছেন, সেনাবাহিনী ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল এবং "The mere word Bengali stank in their nostrils." বাঙালিরা তাদের কাছে ছিল বিদেশী আর বাঙালিদের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিদেশী। যে-কারণে ২৫ মার্চ প্রথমেই *দি পিপল*-এর অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

২৩ মার্চ, ঢাকা শহরে কোনো পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ না দেখে ইয়াহিয়া খান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তখনই প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তারপর এলো ২৫ মার্চ। ২৬ মার্চ বিদেশী সাংবাদিকদের ফেরৎ পাঠানো হলো। সিদ্দিকি লিখেছেন, ও-কারণেই তারা পাকিস্তানবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই জানাচ্ছেন, ভাগ্যিস ২৬ মার্চ তাদের ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। না হলে ২৬ মার্চ সকালে ঢাকার রাস্তায় বেরুতে পারলে আরো খারাপ হতো কারণ, "It was a picture of death and desolation."

এ সময় জনসংযোগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তথ্যসচিব রোয়েদাদ খান। তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি, জানাচ্ছেন সিদ্দিকি, তাঁর কাছে "Every problem was ultimately a PR problem." তিনি বাঙালিদের মধ্যে 'আল্লাহর ভয়' ঢোকাতে চাচ্ছিলেন। প্রয়োজনে, বাঙালিকে জাতি শুদ্ধ করার ব্যবস্থাও। শেখ মুজিবকে বন্দি করে পাকিস্তান নিয়ে গেলে, রোয়েদাদ বলেছিলেন, "Let the world know that the bastard is in our hands." সিদ্দিকি তাতে বাধা দিয়েছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এ সময় সাংবাদিকদের নিয়ে আসা হয় পূর্ব

পাকিস্তানে। তারা তাদের ডেসপ্যাচে পাকিস্তানি সৈনিকদের বীরত্ব তুলে ধরতে থাকেন। কিন্তু সমস্যা হলো, সিদ্দিকি লিখছেন, সবই যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল কেন? এই কন্ট্রাডিকশন নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা মাথা ঘামায়নি। তারা খুশি ছিল যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে বেশ ভালো কাজ করছে। এভাবে সিদ্দিকি লিখেছেন, সেনাবাহিনীর এতদিনকার গড়ে ওঠা ইমেজে ফাটল ধরল। "It was 'foregin' in the East and 'national' in the West, a devoted and a self sacrificing fighting force for one wing and an engine of oppression for the other." পেশাগতভাবে, একজন সৈনিকের মনে সন্দেহ জাগছিল, তারা কীভাবে 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি'র বিরুদ্ধে লড়বে যার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ নেই। তাই একমাত্র প্রপাগাণ্ডায়-ই তারা স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছিল।

ইয়াহিয়া তখন আদেশ দিয়েছিলেন পূর্ণোদ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালানোর। শ্বেতপত্র প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হলো। নির্মিত হলো ডকুমেন্টারি 'দি গ্রেট ব্রিটেয়াল', এ ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা করলেন বাঙালি অধ্যাপক জি. ডব্লিউ. চৌধুরী। ইয়াহিয়া ও জেনারেলরা ছবিটা দেখলেন। ছবি শেষ হলে, ইয়াহিয়া প্রশ্ন করলেন, "I hope all the devastation shown in the film is not result of army action." ছবিটি আর রিলিজ করা হয়নি।

সিদ্দিকি ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও পাকিস্তান সরকারের প্রচারণার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতির যতই অবনতি হচ্ছে, ততই প্রচারণা চলছে– সব স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, জেনারেলরা সবাই জানতেন বাংলাদেশে কী ঘটেছে। ঘটনা আর তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। প্রপাগাণ্ডার আড়ালে তারা স্বস্তি খুঁজছিলেন। ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানবাহিনীর পরাজয়ের পর এতদিনের গড়ে ওঠা ইমেজ ভেঙে খানখান হয়ে যায়। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, সিদ্দিকি তাঁর কুশীলব যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের প্রায় সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কী ঘটেছিল? তারা কি তা জানতেন? সবাই একবাক্যে বলছেন, না তারা জানতেন না। এমনকি রোয়েদাদ খানও একই কথা বলেছেন।

অন্য জেনারেলদের থেকে ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকির বইটি অনেক বেশি অবজেকটিভ। তিনি তুলে ধরেছেন, কীভাবে ফাঁকা বুলির উপর ভিত্তি করে সেনাবাহিনীর ইমেজ গড়ে উঠেছিল যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল ছিল না।

এবং কীভাবে সে প্রচারণা আবার দু'প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করছিল। বাস্তবতার সঙ্গে জেনারেলদের কোনো ধারণা না থাকায় মিথ্যার ওপর গড়ে ওঠা এ ইমেজ ১৯৭১ সালে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। এ ইমেজ তারা ব্যবহার করতে চেয়েছিল শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য। এখনও পাকিস্তানে তারা আবার সে ইমেজ গড়ে তুলতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। বাংলাদেশের পরাজয়ের শোধ তুলতে তারা জড়িয়ে পড়েছিল আফগানিস্তানে। সেখানেও তারা মার খেয়েছে। যে কারণে, নওয়াজ শরিফের পক্ষে সম্ভব হয়েছে সামরিকবাহিনীর প্রধানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা যা পাকিস্তানের ইতিহাস বিচার করলে অভূতপূর্ব ঘটনা। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তানিদের সাহায্য করছে গণতন্ত্রের পথে যেতে।

অবজেকটিভ হওয়া সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের যুদ্ধ অন্তিমে তাঁর কাছেও ছিল পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ। বাঙালিরা যে ন্যায্য বিচারের জন্য যুদ্ধ করেছে তা তাঁর বইতে একেবারেই অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, তাঁর এক লেখায় (পরিশিষ্ট : ৫) উল্লেখ করেছেন, ১৯৭১ সালে সংকটের জন্য উভয় অংশই দায়ী। এবং মুজিব-ভুট্টো দুজনেই এর জন্য দায়ী। তাঁর ভাষায়, "While West Pakistan's share of blame is admittedly much larger than East Pakistan, the latter can not be altogether absolved. As for the Army, it was inexorably sucked into the political quagmire. Mainly of the making of Mujib and Bhutto."

রাজনীতিবিদরা কখনো পাকিস্তানি জেনারেলদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না।

৪৬

২০০৪ সালে করাচির অক্সফোর্ড প্রকাশ করেছে সিদ্দিকির ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ *ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম : অ্যান অলুকারস জার্নাল ১৯৬৯-১৯৭১।*

১৯৭১ সাল সম্পর্কিত পাকিস্তানি জেনারেলদের লেখা প্রায় সব বই-ই আমি পড়েছি। পড়তে পড়তে এক ধরনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান লাভ করেছি এই যে, ঠিক কোথায় তারা বাঙালি-হিন্দু বা বাঙালি-ভারত বা 'বীর পাকিস্তানি সৈন্যদের' কীর্তির কথা লিখবে ধরতে পারি। কিন্তু, এই প্রথম একটি বই পড়লাম যা পূর্বের বইগুলি থেকে একেবারে আলাদা।

বইটি কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক জান্তার মুখপাত্র হিসেবে আবদুল রহমান সিদ্দিকি কর্মসূত্রে ছিলেন ইয়াহিয়া চক্রের ঘনিষ্ঠ। ফলে, তাদের সম্পর্কে ফার্স্টহ্যান্ড এমন তথ্য আছে যা অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, ১৯৬৯-১৯৭১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে পাকিস্তানের পরাজয় পর্যন্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা পূর্বাঞ্চলে নিয়োজিত এবং উচ্চপদস্থ ও নিম্ন পর্যায়ের অফিসাররা কী ভাবছিলেন এবং বাঙালিদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল সেটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। ভুট্টো কীভাবে সামরিক চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে কীভাবে ব্যবহার করেছিল তার সূত্রগুলি দেয়া আছে। ফলে, দেখা যাবে, ১৯৭১ সালের ওপর পাকিস্তানিরা ছাড়া অন্যরা যে সব উপসংহারে পৌঁছেছেন, সিদ্দিকিও সেসব উপসংহারে পৌঁছেছেন। এ বইয়ে বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ নেই। পুরোটা নিজের ডায়েরির ওপর ভিত্তি করে লেখা। সবশেষে বলা যেতে পারে, বাঙালি বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে কোনো পূর্ব ধারণা ছাড়াই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। সুতরাং এই বই সম্পর্কে সমালোচনা করার কিছু নেই। আলোচনা করার আছে।

আবদুল রহমান সিদ্দিকি প্রথম জীবনে সাংবাদিক ছিলেন। তারপর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন আগে যা উল্লেখ করেছি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় ছিলেন মেজর এবং জেনারেল ওসমানীর অধীনে তখন কাজ করেছেন। এরপর তাকে সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগে (আইএসপিআর) নিয়ে আসা হয় লে. কর্নেল হিসেবে। ১৯৬৯-৭১ সাল পর্যন্ত আইএসপিআরের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন এবং সেখানেই কর্নেল। পরে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে প্রমোশন পান। অবসর গ্রহণের পর করাচির রিজিওনাল ইনস্টিটিউটের পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের নির্বাহীর পরিচালক হিসেবে কাজ করে আসছেন।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক একটি জার্নালও তিনি সম্পদনা করেন।

বইটির শুরু ১৯৬৯ থেকে। প্রথম অধ্যায় 'এন্টার ইয়াহিয়া' অর্থাৎ ইয়াহিয়ার প্রবেশ। মন্তব্য করেছেন, আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়ার সূত্র ধরে যে, ভাগ্যের পরিহাস মিলিটারি কমান্ডার যারা পরে একনায়ক হয়েছে তাদের জেগে ওঠার সময়টা পূর্ববঙ্গ/পাকিস্তান। ইয়াহিয়া, আইয়ুব দুজনই জিওসি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের।

আইয়ুব খান কী পরিস্থিতিতে ক্ষমতা ছাড়লেন এবং ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এলেন তার বিবরণ দেয়া আছে যা কমবেশি আমরা জানি। সিদ্দিকির বিবরণ যে বিষয়টি স্পষ্ট করল তা'হলো, ইয়াহিয়া আইয়ুবকে বাধ্য করেছিলেন ক্ষমতা ত্যাগে। জেনারেলদের এবং গবেষকদের বিভিন্ন বইয়ে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা আছে যে, ইয়াহিয়া ক্ষমতালোভী ছিলেন না এবং প্রথমদিকে আন্ত রিকভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন। আমি অনেক সময় অবাক হয়েছি ভেবে যে, পাকিস্তানি কোনো জেনারেলের পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব? সিদ্দিকি আমাদের হাইপথেসিসকে সমর্থন করেছেন। ১৯৬৯(?) সালের মে মাসে ইয়াহিয়া অ্যাবোটাবাদে লে. কর্নেল এবং তার ওপরের কর্মকর্তাদের এক সমাবেশে বলেছিলেন, আগামী চৌদ্দ বছর এই অভাগা দেশটিকে শাসন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নেকড়েদের মুখে আমরা দেশটিকে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি নেতৃত্বে না থাকলেও পরবর্তী সিনিয়রকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাব। তাঁর ভাষায়–

"Gentlemen, we must be prepared to rule this unfortunate country for the next 14 years or so. For I simply can't throw the country to the wolves. And if and when I am relieved of my command, I would handover to the next senior, like one guard commander replacing the other." [পৃ. ২৫]

সুতরাং সেনাবাহিনীর লক্ষ্য সম্পর্কে বিতর্কে না যাওয়াই ভালো। আর বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে অনেকে এ অলীক ধারণা পোষণ করেন যে, ইয়াহিয়ার সদিচ্ছা ছিল শেখ মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তরে। ঐ ভাষণে মুজিব বা ভাসানীর নাম উল্লেখ না করে তাদের নিয়ে যে মশকরা (তাদের ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে) করেছেন তা উল্লেখ করছি। আরো উল্লেখ্য মুজিবকে ইয়াহিয়া 'বাস্টার্ড'ও বলতেন। পরবর্তীতে সে প্রসঙ্গ আসবে। ঐ সভায় ইয়াহিয়া বলেছিলেন– [ভাসানীকে ব্যঙ্গ করে]

"স্যার, সফেদ দাঁড়িঅলা একজন বলল, 'মুজিবকে ক্ষমতা দেবেন না, সে একজন বিশ্বাসঘাতক।'

'কিন্তু মৌলবি সাহেব, বললাম আমি, রাজনীতিবিদ হিসেবে মুজিবের সঙ্গে আপনার কথা বলা উচিত, আমি তো সৈনিক।'

'স্যার, আমি একজন আন্দোলনকারি (এজিটেটর) আমার কাজ উত্তেজনা সৃষ্টি করা। আপনি প্রশাসক, আপনার কাজ শাসন করা..."

ঐ সময় মানিক মিয়া দেখা করেছিলেন সিদ্দিকির সঙ্গে। অসুস্থ ছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন, ৬ দফা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এর পরের দিনই মানিক মিয়া মারা যান। সিদ্দিকি লিখেছেন, বাঙালিদের চাওয়া ঐ সময় এত কম ছিল কিন্তু সামরিক বাহিনীর কাছে ঐ কম চাওয়াটাই একটা ফাঁদ মনে হয়েছিল। তাঁর ভাষায়–

"It was amazing how little the Bengalis demanded at that stage. For the army in its West Pakistani perception, however, the 'little' might well have been a trap; a small step, to be followed by a giant leap, leading to an eventual separation." [পৃ. ২৭]

ধর্মকে যারা ব্যবহার করে তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। দু'পক্ষই দু'পক্ষকে সহায়তা করেছে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে। তার বিবরণও দিয়েছেন [পরেও] সিদ্দিকি।

ইয়াহিয়া প্রাক্তন জেনারেল শের আলীকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শের আলী মন্ত্রি হয়েই পাকিস্তানের সেই পুরনো 'ইসলামি আদর্শের' কথা তুলে ধরতে লাগলেন যা জামায়াতের পক্ষে যায়। প্রথমদিকে কর্তাদের অনেকে এতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন কারণ বহিরঙ্গে সেনাবাহিনীর পক্ষপাতহীন থাকার কথা। কিন্তু শের আলী পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছিলেন। হুসাইন হাক্কানি লিখেছেন, ইয়াহিয়া খানও তখন সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতা ভুলে শের আলীকে উৎসাহিত করেছিলেন। শের আলীর কৌশল ছিল, সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছাড়বে না বরং রাষ্ট্র ও জাতীয় বিষয়ে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংরক্ষণ করা হবে ও অব্যাহত থাকবে। সুতরাং পার্লামেন্টকে বিভক্ত রাখতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলি ঝগড়াঝাটি করবে আর সেনাবাহিনী রেফারির ভূমিকা পালন করবে। দুর্বল দলগুলি যাতে নির্বাচনে ভালো করতে পারে সে জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছিল। [পৃ: ৫৪]

এ সময় জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল উমর আধিপত্য বিস্তার শুরু করেন। এ নিয়ে পরবর্তী কালে জুন্তার সদস্যদের মধ্যে রেষারেষি দেখা দিলেও ১৯৭১ সালে গণহত্যার সময় পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন উমর। যা হোক, ক্রমেই ইয়াহিয়া অনুধাবন করেন তার উচ্চাশা বাস্তবে রূপ পেতে পারে শের আলীর বক্তব্যের মাধ্যমে। জুন্তাও বুঝতে

পারে শের আলীর বক্তব্য তাদের কাজে লাগবে। সিদ্দিকির ভাষায়–

"Sher Ali's lectures and ideological involvement might have been the unfolding of Yahyahs own secret ambition to stall the transfer of power. Sher Ali ideological stance fitted into the arm's secretly cherished slowly, emerging plan to retain a hold on the political situation in perpetuity." [পৃ. ২৯]

ইয়াহিয়ার প্রধান স্টাফ অফিসার ছিলেন জেনারেল পীরজাদা। সিদ্দিকি তার মাধ্যমে চেয়েছিলেন শের আলীকে নিরস্ত করতে। অনুরোধ করেছিলেন পীরজাদাকে প্রেসিডেন্টকে বিষয়টি জানাতে। পিরজাদা বলেছিলেন, কীভাবে তিনি শের আলীকে নিরস্ত করবেন যেখানে তিনজন পাঞ্জাবি তার গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান? এরা ছিলেন মেজর জেনারেল আকবর খান (মহাপরিচালক, আইএসআই), রিজভি (পরিচালক ইনটেলিজেন্স ব্যুরো ও উমর (এনএসসি)। এ মন্তব্যে আরেকটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়। জেনারেলদের চক্রের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তার করেছিল পাঞ্জাবিরা।

উপসংহারে সিদ্দিকি লিখেছেন, সামরিক শাসনে বিরাজনীতিকরণ ইসলামাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি এবং বাঙালিদের কোনোরকম ছাড় না দিয়ে শাসন করার লক্ষ্য দৃঢ় করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে বাঙালির অধিকার আছে তার নৈতিক ও আইনগত দিকটি তারা উপেক্ষা করেছিল। তার ভাষায়–

"Depoliticization under military rule only added to Islamabad's arrogance, and strengthened its determination to rule without the slightest concession to the opposition from Bengali. It also blinded them to the moral and legal imperative of transfering to the Bengalis a due share of state power commensurate with their numerical strength." [পৃ. ৩১]

২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার পাঁচ শর্ত বা এলএফও [লিগাল ফ্রেম অর্ডার] ঘোষণা করলেন [দ্বিতীয় অধ্যায়] রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হলো। পাকিস্তানে দুই অংশে জামায়েত দুটি পত্রিকা বের করল। করাচি [প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল মুলতান থেকে] থেকে দৈনিক *মুসাওয়াত* ও ঢাকা থেকে *দৈনিক সংগ্রাম*। দুটি পত্রিকাকেই নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন দিল আইএসআই।

আইয়ুব খানের নীতি পূর্ব পাকিস্তানিরা পছন্দ করেনি। তারা ছিল ক্ষমতার বাইরে আর সব ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। এর ফলে সিদ্দিকির মতে বাঙালির 'শভিনিজম' দৃঢ় করল। সমষ্টিগত জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকার চিহ্নিত না হওয়ায় বিকশিত হলো আঞ্চলিক 'প্রিজুডিস' ও 'ভার্নাকুলারিজম'।

সিদ্দিকি উপর্যুক্ত তিনটি শব্দ ব্যবহার আবার তুলে ধরে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচারিত ও প্রচলিত পূর্ব ধারণা। আসলে, যদি তিনি বলতেন, এতে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এর ফলে বিকশিত হচ্ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ তাহলে বিষয়টি আরো বাস্তবসম্মত হতো।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন, কায়েমি স্বার্থ বিকাশ ও সংহত হওয়ায় সেখানে 'ইসলামি আদর্শ' নামে এক মেকি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। শব্দটির প্রচুর অপব্যবহার হয়েছে। যা-ই তাদের স্বার্থের বিপরীতে গেছে তাই ইসলামি স্বার্থের বিপরীতে বলে তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে 'obscurantist' শক্তিসমূহ বিরোধীদের গলা চেপে ধরার জন্য এটি ব্যবহার করেছে।

জেনারেল ইয়াহিয়ার নিজের লক্ষ্য ও ইচ্ছার ইতোমধ্যে বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি কোনো তাড়া বোধ করছিলেন না। কারণ, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), নুরুল আমীনের পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটি পার্টি, জামায়েত ইসলামী তাকে সমর্থন যোগাচ্ছিল রাজনৈতিকভাবে আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলি খবর দিচ্ছিল নির্বাচনে ঝুলন্ত সংসদ হবে যার অর্থ ইয়াহিয়া নিজের খেলা খেলতে পারবেন।

৪৭

১৯৭০ সালের টর্নেডো প্রাক নির্বাচনী এবং নির্বাচনে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। সিদ্দিকির বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম–'প্রাক নির্বাচনী জ্বর এবং সাইক্লোন।'

অক্টোবর, ১৯৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড উষ্ণ হয়ে উঠল। একদিকে ভূট্টো অন্য দিকে বাকিরা। শেখ মুজিবও এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে, বক্তৃতা দিয়েছিলেন করাচি ও লাহোরে। লাহোরে তাঁর সভায় গণ্ডগোল হয়েছিল। ফিরে এসেছিলেন তিনি ঢাকায়। কাইয়ুম মুসলিম লীগকে তখন জুন্তা সমর্থন দিচ্ছিল।

এদিকে ভাসানীকে দলে আনতে চাচ্ছিল জুন্তা, জানিয়েছেন সিদ্দিকি। অর্থের অভাবে ভাসানী নির্বাচনে যেতে চাচ্ছিলেন না। নির্বাচনে তাঁর দরকার ছিল, তাঁর মতে আড়াই কোটি টাকা। রিজভি ইয়াহিয়ার অনুমতি নিয়েছিলেন প্রয়োজনে সেই টাকা দেবেন। কিন্তু, তা দেওয়া হয়নি। ভাসানী সেই যে ক্ষুব্ধ হলেন সেই ক্ষোভ আর তাঁর হ্রাস করা যায়নি।

টর্নেডো আঘাত হানল পূর্বপাকিস্তানে। ইয়াহিয়া চীন থেকে ফেরার পথে ঢাকায় নামলেন। ফকারে করে ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে এলেন কিন্তু তার কাছে টর্নেডোর ছোবল ভয়াবহ মনে হয়নি। গভর্নর আহসানের ওপর ত্রাণের দায়িত্ব দিয়ে ফিরে গেলেন তিনি ইসলামাবাদ।

ইয়াহিয়ার চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাল সারা বিশ্ব। ব্রিটেন ও আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো। সেনাবাহিনীকে ডাকা হলো। জেনারেল ইয়াকুব যথাযথ সাহায্য করলেন না। এই নতুন তথ্য জেনারেল ইয়াকুবের অন্য একটি দিক তুলে ধরে। এতদিন একটি ধারণা ছিল তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রতি সহানুভূতিশীল। এবং অন্য পাকিস্তানি জেনারেলরা লিখেছেন, সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, হ্যাঁ একমাত্র তারাই ত্রাণ কাজে এগিয়ে আসছিল। ইয়াকুব আহসানকে জানিয়েছিলেন বহিঃআক্রমণ রক্ষায় সৈন্যরা নিয়োজিত। ভারতীয় আক্রমণ ঠেকাবার জন্য যারা নিয়োজিত তাদের কীভাবে পাঠানো যায় সামান্য ত্রাণ কাজে? সৈন্য পাঠান হয়নি যে তা নয়, যা পাঠান হয়েছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম। তার ওপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসগর খান ছাড়া কোনো রাজনীতিবিদ/প্রশাসক আসেননি। বাঙালির ক্ষোভ চরমে উঠল। মুজিব হয়ে উঠলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নির্বাচন এলো। জেনারেল উমর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে অন্য দলগুলোকে টাকা বিলোতে লাগলেন যাতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুজিবকে হারাতে পারে। সব প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে বাঙালি মুজিবকে এমন ভোট দিল যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, সারা পাকিস্তানেই আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলো। ভূট্টো শুধু গরিষ্ঠতা পেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে।

এই ফলাফল সেনাবাহিনকে খুশি করল না। জেনারেল গুল হাসান সিদ্দিকিকে ডেকে বললেন, 'ভূট্টোকে আমাদের ব্যাক করা উচিত।' সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক ব্রিগেডিয়ার ইকবাল খানকে ডেকে বললেন, সিদ্দিকির সঙ্গে মিলে একটি উপায় বের করতে। তাদের যুক্তি ছিল। মুজিব সেনাবাহিনীর বন্ধু নয়। ক্ষমতায় এসে তিনি সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস করতে চাইবেন যা বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিপন্থী। ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের, পাঞ্জাবে তিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন আর সেনাবাহিনীর ৭৫ ভাগ পাঞ্জাবে। সুতরাং সেনাবাহিনীকে তিনি স্পর্শ করবেন না। সিদ্দিকির মতে, তখনই দান চালা হয়ে গেল– "The die had thus been cast in Bhuttos favour." [পৃ. ৫১]

তবে, সিদ্দিকি জানাচ্ছেন, আশা করা হচ্ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান

হিসেবে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান সফরে আসবেন। তাজউদ্দীন শুধু এলেন। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের ধারণা হলো তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের কেয়ার করেন না। সিদ্দিকির মতে, জাতীয় নেতা হিসেবে যে বিবেচনা তাঁর দেখাবার কথা তা তিনি দেখাননি। সিদ্দিকির ভাষায়–

"Mujib's Bangla-centric strategy created much bad blood against him and his party in West Pakistan. It was taken for granted that either he did not care for West Pakistan, or was a poor tatician politically. He did not show the acumen and maturity that was legitimately expected of him as a national leader." [পৃ. ৫৪]

ইয়াহিয়া এর মধ্যে ঢাকা এলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে করাচি ফিরে সাংবাদিকদের জানালেন, মুজিবই হচ্ছেন পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। তার এই বাক্যটিকে অনেকে তার ভালোমানুষি ও ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু সিদ্দিকি জানাচ্ছেন অন্য তথ্য। তার মতে, এটি হঠাৎ মুখ ফসকে কোনো কথা নয়, ভেবে চিন্তেই ইয়াহিয়া তা বলেছিলেন। প্রথমত এই মন্তব্যের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে মুজিবের বিরুদ্ধে সজাগ করেছিলেন এবং ভূট্টোকে প্ররোচিত করেছিলেন। তারপর লারকানায় ভূট্টোর আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন ইয়াহিয়া। সেনাবাহিনী বা জুন্তা তখন আরো দৃঢ় হলো যে কোনো বাঙালিকে প্রধানমন্ত্রী করা যাবে না। এবং ভূট্টোও তখন ক্ষমতার অংশিদার হতে চাইলেন। ভূট্টো ঘোষণা করলেন জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা যাবেন না। জেনারেল উমর ছোট ছোট দলের নেতা যারা জিতেছিলেন তাদের কাছে যাওয়া আসা শুরু করলেন এই অনুরোধ [বা হুমকিও] নিয়ে যেন তারা ঢাকা না যান।

ঢাকায় সেনাবাহিনী পাঠানো হতে লাগল। ২২ ফেব্রুয়ারি গভর্নরদের কনফারেন্স হলো পিন্ডিতে। সেখানেই প্রথম সিদ্ধান্ত হলো নীতিগতভাবে যে পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। রাও ফরমান আলীও এ কথা স্বীকার করেছেন সিদ্দিকির কাছে। সুতরাং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু হঠাৎ হয়নি তা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

চতুর্থ অধ্যায়ে সিদ্দিকি দেখিয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্বার্থ কীভাবে একত্রিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান দলনে নামছে।

লাহোরের মোচি গেটে ফেব্রুয়ারির শেষ দিন ভূট্টো জাতীয় সংসদে যোগ না দেয়ার হুমকি দিলেন। পরদিন ইয়াহিয়া সংসদ স্থগিত করার ঘোষণা দিলেন, এতে প্রমাণিত হয়, লিখেছেন সিদ্দিকি যে, ভূট্টো এবং ইয়াহিয়ার মধ্যে একটি হটলাইন ছিল। ইয়াহিয়া অবশ্য তার বক্তৃতায় সংসদ স্থগিত করার কারণ

হিসেবে সেই পুরানো গৎ ফিরিয়ে আনলেন– ভারত যে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে তাতে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া আবার ঘোষণা করলেন ২৫ মার্চ অধিবেশন করতে হবে। সিদ্দিকির ভাষ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বের প্রতি ইয়াহিয়া কঠোর ও প্ররোচনামূলক ভাষা প্রয়োগ করলেন। এক হাতে দিলেন আরেক হাতে নিলেন।

আমরা যদি ইয়াহিয়ার ভাব বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, ইয়াহিয়া তার লক্ষ্য পূরণে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আস্তে আস্তে দুপক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন এবং বলছেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ রকম ধ্বংসাত্মক কাজ কখনও চলতে দিতে পারে না এবং তাদের কাজে তারা কখনও ব্যর্থ হয়নি। ইয়াহিয়ার ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি–

"Our East Pakistani leadership reacted in a manner which resulted in destructive elements coming out in the street and destroying life and property. I will not allow a handful of people to destroy the homeland of millions of innocent Pakistanis. It is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan- a duty in which they have never failed..." [পৃ. ৬৫]

ইতোমধ্যে ইয়াকুবকে বদলি করে বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে খ্যাত টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে আনা হলো। ইয়াকুব ইতোমধ্যে 'ব্লিৎজ' পরিকল্পনা তৈরি করে গেছেন। মুজিব ও তার দল সঠিক ব্যবহার না করলে কী করতে হবে তাই হলো 'ব্লিৎজ'। ইয়াকুবের ভাষায়–

"We may have to give him a whiff of the grapeshot, should they refuse to behave and go berserk." [পৃ. ৬৬]

৭ মার্চ পল্টনে বক্তৃতা দিলেন মুজিব, লিখেছেন সিদ্দিকি। আসলে ওটা হবে রেসকোর্স ময়দানে। স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি করলেন না বটে কিন্তু বক্তৃতা শেষ করলেন 'জয় বাংলা' ও 'জয় পাকিস্তান' বলে। রেসকোর্সে ঐ দিন আমি ছিলাম বটে কিন্তু 'জয় পাকিস্তান' শব্দটি শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

সিদ্দিকি ১৬ মার্চ ঢাকায় এলেন। এরপর ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক, সেনা কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন যা অন্য কারো বইয়ে পাওয়া যাবে না।

দেখা যাচ্ছে রোয়েদাদ খান প্রতিদিন ভুট্টোকে আলোচনা সম্পর্কে জানাচ্ছেন এবং কবে ঢাকা আসতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছেন। জাতীয় সেনাবাহিনীকে অপমান করার জন্য চক্র বাঙালিদের কঠোর শিক্ষা দেয়ার দাবি তুলছেন। ১৯ তারিখে রোয়েদাদ ভুট্টোকে পরামর্শ দিচ্ছেন ঢাকা আসার।

ডেইলি পিপলের প্রকাশিত সংবাদ আর কার্টুনও পশ্চিমা সেনাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল [২৫ মার্চ এর বহিঃপ্রকাশ দেখি। প্রথম সুযোগেই তারা পুড়িয়ে দিয়েছিল *ডেইলি পিপলের* অফিস]। ক্যান্টনমেন্টে সিদ্দিকিকে একদিন এক অফিসার বলেছেন, বাঙালিরা সব বিশ্বাসঘাতক এদের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, এমনকী যারা ইউনিফর্মে আছে তাদেরও। সিদ্দিকি জানতে চাইলেন সৈনিক, ইবিআর, ইপিআর মিলিয়ে বাঙালির সংখ্যা কুড়ি হাজারের মতো, কী করা যাবে এদের নিয়ে।

'কোনো সমস্যা নয়। এই জারজগুলো কাপুরুষ। এখনিই তাদের নিরস্ত্র করে ব্যারাকে রাখা উচিত। তাদের আমাদের দরকার নেই। সরে যাক তারা আমাদের পথ থেকে।'

ভূট্টো ২১ তারিখ এলেন ঢাকায়। বিহারি-বাঙালি দ্বন্দ্ব শুরু হলো, জানিয়েছেন সিদ্দিকি, তাদের অনেকে আশ্রয় নিয়েছে ঢাকা বিমান বন্দরের বাইরে কিন্তু সেনাবাহিনী থেকেও তারা তড়পাচ্ছিল বেশি যা বোঝা ছিল দুষ্কর। সিদ্দিকির ভাষায় [বিহারিরা] "An overt display of the Biharis as a group, towards the Bengalis, was not easy to understand. Their morale was almost unnaturally high. They behaved even more hawkishly than the military. They openly asked for military intervention to control the Bengali 'traitors". [পৃ. ৭৬-৭৭] জেনারেলদের দেয়া এ সম্পর্কিত আগের বিবরণগুলি দেখুন। সিদ্দিকির বিবরণ সম্পূর্ণ এর বিপরীত

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২৫ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ২৫ মার্চ যদিও তিনি ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন, গোলাগুলির শব্দও শুনেছেন কিন্তু জানতেন না কী ঘটেছে। সিদ্দিকির সঙ্গে চক্রের যোগাযোগ ছিল পেশাগত কারণে কিন্তু চক্রের অভ্যন্তরে তিনি ছিলেন না। তাছাড়া প্রথম থেকেই তার বিভিন্ন প্রস্তাবের বিপরীতে কাজ করছিল চক্র। তার সুযোগ ছিল তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তিনি ছিলেন 'বাইরের লোক'।

২৫ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত যে বিস্তারিত বিবরণ তা আমাদের জানা। তাই সেই বিবরণে যাব না। তবে দেখা যাচ্ছে গণহত্যা প্ররোচনায় রোয়েদাদ খানের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে সেনাবাহিনীরা কীভাবে আক্রমণের পটভূমি তৈরি করেছিল তার কিছু বর্ণনা দেব।

পীরজাদার সঙ্গে সিদ্দিকির কথা হচ্ছিল ঘটনার আগে। ২৩ মার্চ সারা দেশে পাকিস্তানের পতাকা ছিল না। এটি সেনাবাহিনী তাদের অপমান হিসেবে নিয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে প্রেসিডেন্ট যাচ্ছিলেন সে পথেও বাঙালিরা 'rude'

ডেমোনেস্ট্রেশন করেছে। মুজিব যা করেছে তা বলার নয়। পীরজাদার ভাষায়–

"The fact is that today his very name stinks in the nostrils of every soldier. He had no business to insult and humiliate the armed forces as he did. The man is a fool. He missed his best opportunity when he refused to visit West Pakistan after the President had already named him as the would-be prime minister." [পৃ. ৮৫]

ঢাকা টিভি চালাবার জন্য পাকিস্তান থেকে তিনজনের 'টিভি টিম' এলো। ক্যান্টনমেন্টে তারা বলল, মুজিব দুইবার নিজেকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণ করেছে; আরেকটি সুযোগ তাকে দেয়া যায় না। তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।

হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। তার মতে, হামিদুলের প্রতিক্রিয়া ছিল বিহারিদের মতো। আস্তে আস্তে সেনাবাহিনীর মধ্যে দখলদারি বাহিনীর চরিত্র ফুটে উঠতে লাগল। অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে তারা এখন জাতীয় সেনাদল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। সিদ্দিকির ভাষায়–

"The mentality of an occupation army was gradually, and unmistakably, coming into play. Insults were being avenged and the army was exerting efforts to re-establish itself as a national army." [পৃ. ১১০]

সিদ্দিকি পোড়া ঘরবাড়ি দেখেছেন, রাস্তায় দু'একটা লাশও দেখেছেন, ভয়ার্ত মানুষের ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়া দেখেছেন। কিন্তু, আমরা ঢাকায় যে ধ্বংসলীলা দেখেছি, গণহত্যা দেখেছি ও তার বিবরণ পড়েছি, সিদ্দিকির লেখায় কিন্তু তা অনুপস্থিত। যেমন, জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল ঘুরে এসে তিনি লিখেছেন, 'হল দুটি পরিত্যক্ত, কিন্তু ধ্বংসলীলা তেমন হয়নি।' জগন্নাথ হলের গণকবর ও ড. নুরুল্লাহ ভিডিও উল্টো কথা বলে।

৪৮

১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে সিদ্দিকি ফিরলেন ইসলামাবাদ। এদিকে বিদেশি সাংবাদিকরা আসছেন। তাদের কীভাবে এড়ানো যায় সেটি নিয়ে আলোচনা চলছে। ঘন ঘন সিদ্দিকির ডাক পড়ছে বড় কর্তাদের কামরায়। রোয়েদাদ তখন রেসে বেশ এগিয়ে। বিভিন্ন রকমের পরামর্শ তিনি দিচ্ছেন। বাঙালি অফিসারদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সেনাচক্র বেশ খুশি। সিদ্দিকির ভাষায়, পূর্ব এখন পরিণত হয়েছে পশ্চিমের কলোনিতে এবং পশ্চিমের ভাব অনুতাপহীন

উপনিবেশকারির।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। টিক্কা খান মনে করছেন, দুর্ভিক্ষ হলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

পশ্চিমে হাতে গোনা বাঁ ঘেঁষা কিছু বুদ্ধিজীবী ছিলেন যারা বাঙালিদের পক্ষে ছিলেন তাদের চিহ্নিত করা হতে লাগল ভারতীয় দালাল হিসেবে। *আজাদ* নামে লাহোর থেকে বামদের একটি পত্রিকা বেরুত। এ পত্রিকায়ই একমাত্র সামরিক চক্রের সমালোচনা করা হয়েছিল। সুতরাং সেটি বন্ধ হয়ে গেল। আবদুল্লাহ সালিক, হামিদ আখতার ও আইএ রহমানকে গ্রেফতার করা হলো।

আইএসআই প্রধান আকবর ঘোষণা করলেন, মুজিব এবং আওয়ামী লীগ ২৫ তারিখ একটি ক্যুর পরিকল্পনা করেছিল। ইবিআর ও ইপিআরের সাহায্যে তারা চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকা বিমানবন্দর দখল করার পরিকল্পনা করেছিল যাতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্যরা অবতরণ করতে না পারে। আর ভারত তো আছেই। সিদ্দিকি লিখেছেন, 'দি প্রেজেন্ট ক্রাইসিস ইন পাকিস্তান' নামে সরকারি একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল। আইএস আইয়ের মহাপরিচালকের ও সরকারি এই ভাষ্য হুবহু ছিল প্রায় একই রকম। দুটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সিদ্দিকি যাতে বোঝা যাবে সামরিক চক্র কীভাবে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিল–

১। "The Awami League's bid for secession was now under way... the armed forces have made a series of pre-emptive strikes, seized the initiative and saved the country..." [পৃ. ১২১]

২। "The root cause of the Indo-Pakistan trouble is that India has never really accepted the fact of Pakistan. Leaders like Sardar Vallabhbhai Patel have been on record esiring the 're-unification' of Bharat." [পৃ. ১২১]

টিক্কা খান বিদেশি সাংবাদিকদের জানালেন, ২৫ মার্চ রাতে ১০০ থেকে ১৫০ জন মানুষ মাত্র মারা গেছে– এরা সবাই ছিল দুষ্কৃতিকারী যারা সেনাবাহিনীকে বাধা দিয়েছিল। সিদ্দিকি আবারও ঢাকা গিয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন, কীভাবে দু'পক্ষের সমঝোতা সম্ভব যেখানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে?

বিদেশি সাংবাদিকরা চলে গেলে সিদ্দিকি ১১ মে দেখা করলেন নিয়াজি ফরমান এবং টিক্কার সঙ্গে। তাদের বেশ সতেজ ও আস্থাবান মনে হচ্ছিল যা সিদ্দিকির মতে ছিল বাস্তবতার বিপরীত। নিয়াজি ব্যস্ত বাঙালিদের আসল

ইসলামে ফিরিয়ে আনার কাজে, হিন্দু প্রভাবের কারণে ইসলামি বিশ্বাসে বিচ্যুতি ঘটেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু খারাপ ঘটেছে তার কারণই ছিল হিন্দু প্রভাব ও প্রচারণা। শতাব্দী ধরে বাঙালি মুসলিম ছিল গরিব ও পদানত। হিন্দু বানিয়ারা সব সময় তাদের শোষণ করেছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তাদের সাহসী হতে হবে এবং শুদ্ধ ইসলামে ফিরে এলেই সেটি হবে। নিয়াজি সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন। বাঙালি স্ক্রিপ্টেরও বদল হতে হবে। সাধারণ একজন পশ্চিম পাকিস্তানি থেকে সাধারণ একজন পূর্ব পাকিস্তানি অনেক বেশি ধর্মভিরু কিন্তু মুশকিল হচ্ছে হিন্দু প্রভাব ও বিশ্বাস যা তাকে বিভ্রান্ত করছে।

ফরমান জানালেন, পীরজাদা যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তার সঙ্গে পীরজাদার আলোচনা হয়েছিল। 'মুজিব যদি বস হয় তাহলে কী ধরনের পাকিস্তান হবে', জানতে চেয়েছিলেন পীরজাদা।

'একটি দুর্বল ও শিথিল পাকিস্তান', ফরমানের উত্তর।

'কিন্তু আমরা চাই শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান।'

'We won't let Mujib have his way.'

ফরমান উত্তরে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান এখন একটি প্রাসাদ নয়, এটি একটি কুঁড়ে মাত্র। আর এখন প্রয়োজন সেই কুঁড়ে রক্ষা করার। পীরজাদা হেসে এই উপমা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফরমানকে দেখে মনে হচ্ছিল নিয়াজির সঙ্গে তার বনাবনি হচ্ছে না। বাঙালিদের সঙ্গে হিন্দুদের মতোই ব্যবহার করা হচ্ছে। নিয়াজি সবসময় তাদের বিশ্বাসঘাতক বলছেন।

টিক্কা খান ঐ সব নিয়ে ভাবছিলেন না। অফিসাররা তার সামনে পরিস্থিতির গোলাপি চিত্র তুলে ধরছিল তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। সিদ্দিকির মতে, "Tikka's assesment of the situation reflected military hard-headedness and the reluctance to accept failure." [পৃ. ১৩৭]

সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জুনিয়রদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। সিদ্দিকি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। জেনারেল হামিদ, নিয়াজি সহ তারা চাঁদপুরে ব্রিগেড সদরে গেছেন। হামিদ দেখলেন দূর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে। ব্যাপারটা কী জানতে চাইলেন হামিদ।

'তারা একটা গ্রাম পোড়াচ্ছে স্যার,' বললেন একজন অফিসার।

'কেন?'

'দুষ্কৃতিদের বের করার (ফ্লাশ আউট) জন্য।'

হামিদের গালে লালের ছোপ দেখা দিল। ব্রিগেড কমান্ডার আতিককে বললেন, যে গ্রামটি পোড়ান হচ্ছে সেটি তো পাকিস্তানেরই। দুষ্কৃতিকারিদের

ধরে শাস্তি দেয়া হোক কিন্তু অনুগত ও দেশপ্রেমি মানুষদের হয়রানি কেন? মন্তব্যটি নিয়াজির মনপুত হয়নি। সিদ্দিকি লিখেছেন, যেখানে গেছি সেখানেই এক চিত্র। শুধু বিহারিদের খানিকটা প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল যাদের অধিকাংশ ছিল শান্তি কমিটির সদস্য। নিয়াজি খালি পাবলিক রিলেশন বা পিআরের কথা তুলতেন। যা কিছু শুনতেন সবই ছিল তার কাছে ভারতীয় প্রপাগাণ্ডা। সিদ্দিকি মন্তব্য করেছেন–

"His unawareness of the ground reality of the Bengali 'Liberation War' was simply amazing." [পৃ. ১৫৪]

এ সময়ই পাকিস্তান সরকার 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে। পক্ষপাতদুষ্ট এই শ্বেতপত্র তৈরি করেন, সিদ্দিকির মতে, এক বাঙালি অধ্যাপক জি. ডব্লিউ. চৌধুরী। এক সময় যিনি ইয়াহিয়া মন্ত্রিসভায় ছিলেন।

১ সেপ্টেম্বর সিদ্দিকি শেষবারের মতো ঢাকায় গিয়েছিলেন। নিয়াজিকে তিনি একইরকম দেখেছিলেন যিনি জওয়ানদের উৎসাহ দিতেন সবরকমের অসৈনিকসুলভ, অমানবিক এবং carnal কর্মকাণ্ডে। 'গতকালের তোমার স্কোর কী শেরা?' প্রশ্ন রাখতেন সৈনিকের কাছে। সিদ্দিকি লেখেন নি, কিন্তু শুনেছিলাম, পিআইয়ের এক কর্মকর্তা নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্ত্রী স্বামীর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য নিয়াজির কাছে গিয়েছিলেন এবং নিয়াজি তাকে ধর্ষণ করেছিলেন। সিদ্দিকি জানিয়েছেন, ধর্ষণকে নিয়াজি সমর্থন করেছেন। তার কথা ছিল, "সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে থাকছে, লড়াই করছে, মারা যাচ্ছে আর সেক্সের জন্য কি তারা ঝিলাম যাবে?"

'You can not expect a man to live, fight and die in East Pakistan and go to Jhelum for sex, would you?' [পৃ. ১৬৭]

যশোরে জিওসি ৯ ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল আনসারী অন্যদিকে সিদ্দিকিকে জানিয়েছিলেন, যেভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয়রা চাপ সৃষ্টি করছে তাতে বেশিদিন টেকা যাবে বলে তিনি মনে করেন না। জওয়ান ও জুনিয়র কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডও তিনি পছন্দ করছিলেন না। সিদ্দিকিকে বলেছিলেন, প্রত্যেকটি ধর্ষণ ও হত্যার জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ অত্যাচারিকে পছন্দ করেন না।

"We will all have to account for every single rape and killing when back in West Pakistan. Just mark my words. Allah never spares the tyrant." [পৃ. ১৬৭]

পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন বিশ্বাস করতে ভালোবাসত, সবকিছু পূর্বাংশে ঠিকঠাকমতো চলছে। বিবিসি বা আকাশবাণীর সংবাদ ছিল তাদের

কাছে 'প্রপাগাণ্ডা'। পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য কোনো নেতা তখন পুর্ব পাকিস্তানে যায়নি। ভূট্টো ভারতকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছিলেন 'গঙ্গা-যমুনার রক্ত লাল হয়ে যাবে।'

গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় ঢাকার পতন নিয়ে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম ফ্রন্টের যুদ্ধ প্রসঙ্গও এসেছে। এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা আর কোনো পাকিস্তানি জেনারেল লেখেননি। তথ্যসমৃদ্ধ এই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে জেনারেলদের অদক্ষতা, অক্ষমতা ও ভীরুতা। সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। হুইস্কি আর রঙ্গিন স্বপ্ন নিয়ে তারা ব্যস্ত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফেরার পথে অন্যদের সঙ্গে করমর্দন করেছেন। এডিসি তাকে হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে। গ্লাস হাতে দূত বললেন–

"So it has happened after all... we all wished to God that it would not happen but now that it has. I can only wish you all the very best of luck." [পৃ. ২০০]

গুল হাসান দূতকে যুদ্ধাবস্থা বোঝালেন। তিনি শুনলেন তারপর গুল হাসানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে হুইস্কির গ্লাস খালি না করে চলে গেলেন।

অবস্থাটা বোঝা যাবে আরেকটা ঘটনায়। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের জন্য নতুন খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরি করেছেন। ১৭ তারিখ রোয়েদাদ তা বিলি করেছেন। সন্ধ্যায় তা প্রচারিত হবে। সিদ্দিকি ও তার সহকর্মী রিজা তাতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছেন। রোয়েদাদের সঙ্গে তারা দেখা করলেন। রোয়েদাদ তখন মিটিং করছেন। তাদের দেখেই জিজ্ঞেস করলেন প্রচারের বিষয়ে।

'সেটি যাবে না' জানালেন রিজা।

'সেটা কীভাবে সম্ভব? প্রেসিডেন্টের আদেশ'।

তখন সিদ্দিকি আর রেজা জানালেন, পূর্ব পাকিস্তান এখন স্বাধীন। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা এখন নিরাপত্তা হেফাজতে। সেখানে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের খসড়া সংবিধানে কী আসে যায়?

সিদ্দিকি সব শেষে আফসোস করেছেন, যারা এসব কাণ্ড করেছে যাদের কথা বিস্তারিতভাবে তিনি লিখেছেন এখনও তারা বহাল তবিয়তে আছেন। কিছুই হয়নি। আল্লাহ তাদের বিচার করবেন?

"Let it be between them and their creator to decide what and where they might have erred or failed to rise to the dictates of their own conscience to do their duty to their country and the nation." [পৃ. ২১৯]

সিদ্দিকির মতে, ১৯৭০ সালের নির্বাচন সুযোগ করে দিয়েছিল সবাইকে।

কিন্তু নির্বাচনের পর শক্তির প্রয়োগ।

"was nothing less than a sinful act of bad faith committed by the military with the support of the civil bureaucracy and much of the political leadership. The break-up of Pakistan, more than an act of fate, had been the consequence of a premeditated insouciant, if you will, political mischief and machination." [পৃ. ২১৮]

সিদ্দিকি দুঃখ করে লিখেছেন, সম্পূর্ণ ট্র্যাজেডির সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হলো পশ্চিম পাকিস্তানের সিভিল সমাজের নীরবতা। এর মধ্যে অন্তর্গত রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েও আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, সদুত্তর দিতে পারেননি কেউ। সিদ্দিকি আরো লিখেছেন, যখন প্রাণের ভয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাংসদরা আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে তখন তাদের খালি আসনে যে সব নির্বাচন হলো সেখানে ভুট্টোর পিপিপি, আসগর খানের তেহরিক ই ইস্তেকলাল [অংশ নেয়নি], জামায়েত ইসলামী সবাই অংশ নিল। এর চেয়ে মর্মান্তিক কী হতে পারে। তিনি মনে করেন সেনাবাহিনী যা করেছে তা ক্ষমা করা যায় না। সিভিল সমাজও যা করেছে তাও লজ্জাকর। তাঁর ভাষায়ই শেষ করি–

"Thus, while the military junta cannot be forgiven for its unwarranted use of brute force against East Pakistani civilians, the West Pakistan based civilian leadership the high Judiciary in truth the civil society as a whole- can not get away with their own share of blame and shame. Their sins of omission in the final tally, would almost evenly balance the military's sins of commission. [পৃ. ২১৫]

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকির বই পড়ে মনে হলো না এটি একজন পশ্চিম পাকিস্তানি লেখক বা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তার লেখা। মাঝে মাঝে কিছু পূর্ব ধারণার রেশ আছে কিন্তু সমগ্র বর্ণনার তুলনায় তেমন কিছু নয়। এমন কী বাঙালি কোনো জামায়াতি বা বিএনপি সমর্থকের লেখা বইও এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি পক্ষপাতদুষ্ট। বইটি পড়ে মনে হবে বইটি ১৯৭১ সালের কোনো বাঙালির লেখা যে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে আর চারদিক থেকে শত্রুরা ঘিরে ধরে তাকে হত্যা করতে চাইছে।

৪৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ আর সিদ্দিকীর সাক্ষাতকার

* জনাব সিদ্দিকী, আপনি একাত্তরের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

** কিছুদিন আগেও আমি মাসিক *ডিফেন্স জার্নাল* পত্রিকার প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক ছিলাম। এ পত্রিকার কাজ আমি ১৯৭৫-এ শুরু করি। ২২ বছর ধরে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আরেকজনের হাতে এর দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়েছি। পত্রিকায় এখনো আমার নাম ছাপা হয়, যদিও পত্রিকার কাজের সাথে আমার যোগাযোগ নেই। আমি সম্প্রতি কিছুকাল ধরে একটা ইনস্টিটিউটে কাজ করছি। এই ইনস্টিটিউটের নাম 'রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স' (আরআইপিএসএ)। এ প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি, কল্যাণ–যুদ্ধ নয়। আমি গুরুত্বহীন ও গতানুগতিক কোনো বিষয়ে নিয়োজিত থাকতে চাই না। আমি শান্তিপূর্ণ সব কাজে ও উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকতে চাই। আমি পাকিস্তান ও ভারত–এ দু দেশের ব্যাপারে ইতিবাচক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। আমি মনে করি, সকল অমীমাংসিত সমস্যার ইতিবাচক নিষ্পত্তির জন্য তাদেরকে আলোচনায় বসতে হবে, দেখতে হবে কী কী কারণে তাদেরকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। এটা যত শিগগির হয় ততই ভালো। কেননা, সমস্যার বোঝা দীর্ঘকাল বহন করার সাধ্য দুই দেশের কোনো দেশেরই নেই। আর সামরিক ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার মত হলো, যে প্রতিরক্ষা সাধ্যের মধ্যে নেই, সেই প্রতিরক্ষাই সম্ভবত উত্তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষুণ্ন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে না। এসব বিষয় নিয়েই আমি কাজ করছি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে, কারণ আমি সেখানে ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলাম।

* আপনার কর্মদায়িত্ব কী কী ছিল?

** আমি সেনা সদর দফতরে নিয়োজিত ছিলাম আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দফতরের পরিচালক হিসেবে। আর সে হিসেবে আমি জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই বিভাগটিকে যথাসাধ্য সুপরামর্শ দিয়েছি। আমি নীতিনির্ধারক মহলের খুব কাছে থাকলেও নীতিনির্ধারণী সেলের কোনো অংশ ছিলাম না। বরং আমি ছিলাম দর্শক মাত্র। একাত্তরের ২৫ মার্চ আমি ছিলাম ঢাকায়। ১৬ মার্চ আমাকে ঢাকায় সামরিক দায়িত্ব পালনের জন্য রিপোর্ট করতে হয়। ওটা ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ১৫ মার্চ ঢাকা সফরের

পরের দিন। ১ এপ্রিল অবধি থাকার পর আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসি। আর সে কারণে খুব কাছে থেকে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে, প্রত্যক্ষ করেছি নীতিনির্ধারক হিসেবে নয়–পর্যবেক্ষক হিসেবে। ২৫ মার্চের রাতে কী ঘটেছে তা প্রকৃত অর্থে দেখেছি, শুনেছিও। ওখানকার মহল্লাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় চারদিক থেকে। আমি শহরেও গিয়েছি। খবর নেয়ার চেষ্টা করেছি। এখানে আমি ও আমার লোকেরা পূর্ব পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী রিপোর্ট কভার করেছিলাম। পূর্ব পাকিস্তান সফরে মাঝে মাঝে যেতে হতো। নিয়াজিও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন। তবে তা আমার জন্য প্রীতিকর ছিল না। কিন্তু তিনি ঐ কাজটি করেছিলেন। সম্ভবত আমি অন্য কারও তুলনায় সবচেয়ে বেশি ঘন ঘন ঢাকা সফরে গিয়েছি। আমি পরিস্থিতি যতটা সম্ভব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছি। সেই সময়কার অভিজ্ঞতায় নিয়াজীর কার্যকলাপে আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। এ কথা তাকে আমি বলেছি। এ নিয়ে বারবারই তার সাথে আমার কথা হয়েছে। ১ অক্টোবর তার সাথে আমার শেষ দেখা হয়। তখন যে কোনো সাধারণ লোকেরও না বুঝতে পারার কথা নয় যে, সব কিছুই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সেনাবাহিনী ছিল, আর সে সেনাবাহিনী এসপার-ওসপার লড়াই করতে পারত। আর সে লড়াই হতো আখেরী জং। কেননা আমাদের বাহিনীর সব সৈন্য ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে–তারা আদৌ কেন্দ্রীভূত ছিল না। জেনারেল নিয়াজী ছিলেন এক নিরেট নির্বোধ। তাকে আমি একথা বলে তার প্রতি বদান্যতা দেখাচ্ছি। কেননা, তাকে আরো কটু ভাষায় সম্বোধন করলেও তা অযৌক্তিক হতো না। নির্বোধ নিয়াজীর ধারণা ছিল, পরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় রয়েছে। আর সেই সুবাদে তার ধারণা ছিল, ৫/৬ মাইলের মতো পরিমিত এলাকায় তিনি এক নিরাপত্তা বেষ্টনী, প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে পারবেন। তাঁর সাথে সেই আমার শেষ দেখা।

* তারপরে...না ঠিক আছে, চমৎকার! আমি শুধু আপনাকে কথার খেই ধরিয়ে দিচ্ছি।

** তারপর আমি রাওয়ালপিন্ডি সেনাবাহিনী সদর দফতরে ফিরে আসি। আমার ধারণা, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তারপর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। এরপর ২১/২২ নভেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে।

* নভেম্বর?

** একাত্তরের নভেম্বর। তারা আক্রমণ করে–আমি এ কথাগুলি এভাবে ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি। প্রকৃত ঘটনাও ছিল তাই। ওরা সে সময় সাতটি

ফ্রন্টে পূর্ব পাকিস্তানে সকল দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। সে ছিল ঈদের পরের দিন। আমরা ভেবেছিলাম যে, ইসরাইয়েল যেমন ঈদ-উল-ফিতরের কাছাকাছি সময়ে শেষ রমজানে মিসরের ওপর সামরিক হামলা চালায়, তারা সেই ইসরাইয়েলী কৌশলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে। সে সময় অবশ্য প্রথমে হামলার উদ্যোগ নেয় মিসর। আমাদের বেলায় ভারতীয়রাই আক্রমণ করে, আমরা নই। আমাদের সেনারা যেদিন ঈদ করছে, ঠিক তার পরদিনই শুরু হয় ভারতের আক্রমণ। আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির ওপর দৈনিক ব্রিফিং দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি পূর্ব পাকিস্তানের মুখপাত্র। সময় যখন এভাবে এগিয়ে চলেছে তখন আমরা আশা করেছিলাম, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সেনা সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে রণাঙ্গন আরো প্রসারিত করে এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাড়া দেবেন। তেহরানে ইরানী রাজবংশের ২৫তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ১১ অক্টোবর রওনা হবার আগে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হলে সামগ্রিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু সেই আক্রমণ হলেও সামগ্রিক কোনো যুদ্ধ হলো না। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল পত্রপত্রিকা তথা গণযোগাযোগ মাধ্যম ও বহু বিদেশী সংবাদদাতাকে দিনে এক বা দু'বার করে ঐ আক্রমণ বিষয়ে ব্রিফ করার। তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে তেমন একটা খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। আমাকে যুদ্ধ সম্পর্কে সামরিক 'সিচ্যুয়েশন রিপোর্ট' যা কিছু করা হচ্ছিল সেগুলির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল বেশি করে। আসলে এসব 'সিচ্যুয়েশন রিপোর্ট' ছিল অসার–কোনো কাজেরই নয়। এসব রিপোর্টে ছিল বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রং চড়ানো। এতে অনেক কিছু কাল্পনিক, অলীক। এর মতলব ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ গড়ে তোলা...।

* কিন্তু এই কাজটি করেছিল কে?

** কে আবার, নিয়াজী। তিনিই তো ছিলেন কমান্ডার, অধিনায়ক।

* তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি যেসব ব্রিফিং দিয়েছিলেন তা আসলে ছিল...?

** সিচ্যুয়েশন রিপোর্টের ভিত্তিতে।

* অধিকাংশই তাহলে সেনাবাহিনীর বিচ্যুয়েশন রিপোর্ট?

** হ্যাঁ, কেননা এগুলিই ছিল একমাত্র তথ্যসূত্র।

* আর আপনার ধারণায় যেগুলি ছিল অতিরঞ্জিত?

** শুধু অতিরঞ্জিতই নয়...।

* '৭১ সালে যুদ্ধের সময় আপনি সশস্ত্র বাহিনীর ব্রিফিং নিয়ে যে সকল রিপোর্ট করতেন, তা কেবল অতিরঞ্জিত ছিল না, ছিল মিথ্যাও?

** সেগুলি ছিল অসার, অকেজো। আসলে রণাঙ্গনের বাস্তবতা এতে প্রতিফলিত হয়নি বরং নানা কারণে কমান্ডার তার 'মানসনেত্রে কি হেরিতেছেন' সেটির গাঁজানি ছিল। আর তা ছাড়া তিনি গোমর ফাঁক করতেও চাননি এসব রিপোর্টে। একদিন ঐ বিষয়ে চিফ অব স্টাফ আমাকে বললেন, সেটি ৩ নভেম্বরের পর আর ততদিনে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, রিপোর্টে পরিস্থিতি সাজানো হয়েছে শুধুমাত্র ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে। অথচ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এভাবে ক্ষয়ক্ষতি, হতাহতের উল্লেখে আসলে সেনা মনোবল ভাঙছিল মাত্র। বিষয়টি নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। তাই যুদ্ধ যখন চলছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে একটা অচলাবস্থা দেখা দেয়, যা আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না। আমরা পাল্টা চাপ সৃষ্টিমূলক একটা অপারেশন পরিচালনা করছিলাম। কিন্তু যেভাবে আমাদের জবাব দেবার কথা সে রকম কিছু ঘটেনি। অথচ ঐ জবাবের নেপথ্যের মূল প্রেরণাটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এজন্য দরকার ছিল আরো বড় বড় আয়োজন ও প্রয়াসের। কিন্তু বাস্তবায়িত করা যে কারণেই হোক তা হয়নি। আর সে কারণটা আপনি জানতে চাইতেই পারেন। যা হোক, আমরা তা করিনি। আমরা শুধু চেষ্টা করছিলাম লাহোর, রিসালপুরের মতো জায়গায় সুবিধাজনক অবস্থানগুলিকে মজবুত ও নিরাপদ রাখতে। কিন্তু আক্রমণাত্মক বড় রকমের কোনো সেনা অভিযান করা হয়নি, নামানো হয়নি রিজার্ভ বাহিনীকেও। ফলে যা হবার তাই হয়। যুদ্ধের ৩য় ও ৪র্থ দিনে এখানে আমাদের দিকে যুদ্ধ এগিয়ে না এলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে খবর আসতে থাকে যে, ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে আসছে, চলে আসছে ঢাকার কাছে। কখন কী খবর পড়া হচ্ছিল তা আপনাদের ভালোভাবেই জানা। ওরা তখন এগিয়ে আসছে প্রধান সড়ক ও অন্যান্য বড় রাজপথ ধরে নয়, অপ্রধান গৌণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি ধরে। ওরা প্রধান প্রধান রাজপথ ও শহরগুলি এড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের প্রতিরক্ষার প্রধান ঘাঁটিগুলি এভাবেই পদানত করে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম একমাত্র যশোর। যশোর দুর্গের পতন হয় ৭ ডিসেম্বর। এ ক্ষেত্রেই শুধু আক্রমণের লক্ষ্য সরাসরি দখল করে ভারতীয় বাহিনী এবং তা সবার চোখের সামনে। তারা সিলেটকে এড়িয়ে আসে, কুমিল্লাকে পাশ কাটিয়ে আসে। আর আমরা তখন ছিলাম, আমাদের ভাষায়, আমাদের প্রতিরক্ষার কেল্লাগুলিতে। ভারতীয় বাহিনী কখন আমাদের ওপর চড়াও হবে আর আমরা তাদের ওপর কখন ঝাঁপিয়ে পড়ব তারই ইন্তেজার করছিলাম সেখানে। এ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! কি বলব আমি আপনাদেরকে! এ রকম বলিহারি চমৎকার

প্রস্তুতি আর হয় না! আমাদের তরফে সমন্বিত কমান্ড বা বুদ্ধিদীপ্ত কমান্ডের অভাব বেশি, এটা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! এখানে অসাধারণ মেধার অধিনায়কের ইচ্ছাশক্তি, মনোবল–না, এমন কিছুর বালাই ছিল না।

* আরে কী যে বলেন, উনি তো অত্যন্ত বড় বড় খেতাবখচিত জেনারেল! তাহলে...। মানে আমি বলতে চাইছি...তা হলো ব্যাপারটা, কী বলে আপনার ধারণা?

** ভালোই বলেছেন বটে। আমি বলি কি, ওখানে একটা জিনিসই ছিল যাকে মহাসম্মানে ভূষিত করা উচিত। তবে ওটা এক ব্যাপার, আর একজন ভালো কমান্ডার হওয়া একেবারেই ভিন্ন বিষয়। জেনারেল (নিয়াজী) ছিলেন মেজর বা লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিংবা বড়জোর ব্রিগেডিয়ার স্তরের একজন ভালো অফিসার। কেন্দ্রীয় বা মূল অধিনায়কের কোনো যোগ্যতা, আর যা-ই হোক, তার ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও এর আগে '৬৫-র যুদ্ধে–উভয় যুদ্ধে সেভাবেই তার দরদাম যাচাই হয়েছে। হয়েছে আবার একাত্তরের যুদ্ধেও...। তাই আপনার জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব দিতে গেলে আমাকে বলতেই হচ্ছে, এ ধরনের কলঙ্কজনক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তিনি উত্তম অধিনায়কের ভূমিকাভিনয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা, তার অত উঁচু স্তরের মেধা ও উৎকর্ষ ছিল না।

* দৈনন্দিন অসামরিক পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট দেয়াও কি তাঁর দায়িত্ব ছিল?

** না, যুদ্ধের নয়। আসলে পূর্ব পাকিস্তানের অসামরিক প্রশাসন চালানোর দায়িত্বও ছিল সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের ওপর।

* আর আপনার কাজ ছিল খবরের কাগজের লোকজন, বিদেশী যোগাযোগের মাধ্যম ইত্যাদিকে দৈনিক এই বলে 'ব্রিফ করা' যে, বিলকুল ঠিক হ্যায়, সব কিছু স্বাভাবিক। তাহলে সেই স্বাভাবিকতা কতটুকু স্বাভাবিক ছিল তখন জনাব?

** কোনো কিছুই তখন স্বাভাবিক ছিল না। উল্টো পরিস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক ছিল তখন।

* কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট করতে হচ্ছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

** না, পরিস্থিতি স্বাভাবিক এমন রিপোর্ট আমরা করছিলাম না। বরং পৃথিবীর অন্য যে কোনো জায়গায় যুদ্ধের রিপোর্ট যেমন করা হয়, সেভাবেই যুদ্ধ সম্পর্কিত রিপোর্ট করছিলাম।

* কথাটা ঠিক হলো না। যুদ্ধ শুরু হয়েছে আরো পরে। আমি তো ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি।

** ঠিক ধরেছেন, আসলে আমি টিক্কা খান সম্পর্কে এ যাবত আদৌ কিছু উল্লেখ করেনি। টিক্কা খানই 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করেছিলেন। সি-ইন-সি'র তরফে ইয়াহিয়া খান তখনকার অপারেশন কমান্ডার জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের সাথে সলাপরামর্শ করে এ অপারেশনের সব কিছু ঠিক করেছিলেন। হ্যাঁ, আসলে এ বিষয়গুলিও আলোচনার দরকার। আমি এখন সে আলোচনাতেই আসছি।

২৫ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের মধ্যে যুদ্ধ (অপারেশন সার্চলাইট) যখন শুরু হয় তখন কী ঘটে সে ব্যাখ্যার বর্ণনা এখন আমি আপনাদের দেব। তার আগে এ সবের একটা পটভূমি দেয়ার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর যখন জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে তখন কী ঘটে আমি তার বিবরণ দেব। ....১১ ডিসেম্বর আমি প্রেস ব্রিফিং করছিলাম। আমার ওপরওয়ালা সিজিএস লে. জেনারেল গুল হাসান খান আমাকে এ কথা জানিয়ে দেন : 'পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সব খেল তো খতম! কাজেই তোমার এখন একটা কিছু করে ফেলাই ভালো।' তবে এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি সত্যিই এক বড় রকমের শক বা আঘাতের মতো। আমি নিজে কথাটি শুনে স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ধরুন, আমার কোনো অতি ঘনিষ্ঠজন শুয়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়। আপনি জানেন, মৃত্যু নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা, তবু...তবু যখন ঘটনাটি আসলে ঘটে, আর কেউ এসে জানায়, সব শেষ। খুব বড় শক্ সেটি...নয় কি? পূর্ব পাকিস্তানের সাথে আমি অনেকখানি জড়িয়ে ছিলাম। আর সে সম্পর্ক স্পর্শকাতর নয় ঠিকই, তবে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল অন্যত্র। এখনো আমার বন্ধু স্বজন রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। বাস্তবিকই আমার পরিবার...পরিবারের একটা অংশ রয়েছে সেখানে। আমি সেখানে দীর্ঘকাল না থাকলেও আমার আত্মীয়দের সেখানে বড় ব্যবসা ছিল। আপনি মনে হয় জনাব এহ্সান আলীর নাম শুনেছেন, তিনি আমার শ্বশুর। তাই আজও পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঢের বেশি। তাই আমার মনে হতো, পূর্ব পাকিস্তানে এই যে এত কিছু ঘটে গেল, এসব এড়ানো যেত, এমনকি পাকিস্তানের দুই অংশের বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হলেও। আর সে ব্যবচ্ছেদ অস্ত্রে ও হিংসায় না করে আলোচনার টেবিলে করাই বাঞ্ছিত ছিল।

* বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে আপনি কি সংক্ষেপে কিছু বলতে পারেন আমাদেরকে?

** আপনারা যা জানেন তার বেশি কিছু আমার জানা নেই। এর

সিংহভাগ আমাদের কিংবদন্তি। আমি অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর হত্যা ও তার কথাবার্তা শুনেছি বটে। তবে আমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারি না। সে সময়টায় আমি ওখানে ছিলাম না, কোনো তথ্যও বিস্তারিত আমার জানা নেই।

* আপনি তখন ঢাকায় ছিলেন না?

** আমি ছিলাম না।

* তা-ই?

** আমি তো বলেছি, কোনো সংস্রবের অবকাশ ঘটেনি আমার।

* কে এর পরিকল্পনাকারী? কী করে এসব ঘটে বলে আপনি মনে করেন?

** কে এসব পরিকল্পনা করে থাকতে পারে তা আমার জানা নেই। তবে এর দায়িত্ব কমান্ডারের। নাটের গুরু আমার কাছে একজনকে মনে হয়-তবে এও বলি, প্রমাণ করতে পারব না আমি।

* না, মানে আপনি অনুমানের কথাই...

** আমার ধারণা ফরমান আলিই সেই ব্যক্তি। কেননা ফরমান সেই ব্যক্তি যার ওপর কর্তৃপক্ষের আস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি। ফরমানই পারত নিঝুম নীরবতাকে প্রচণ্ড শক্তিশালী, সরব বিষয় করে তুলতে। ফরমান হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আপনার বক্তব্য শুনবেন, যার চেহারায় ধরে রাখা আছে একটা বৈদগ্ধ্যের ছাপ। চোখে আছে চশমা, আছে সর্পিল সম্মোহনী এলাজ।

* তা আপনিও ঐ সময় চশমা পরতেন বুঝি?

** আমিও।

* তাহলে বেশ একটা জুটিই বটে।

** তার সাথে আমার কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন মেজর জেনারেল সিভিল অ্যাফেয়ার্স (এমজিসিএ)-অসামরিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল। তিনি ছিলেন আস্ত একটি গাধা। তিনি ছিলেন সব কিছুর নেপথ্য চক্রী।

* তিনি ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স (ইপিসিএপি), রাজাকার, আল-বদর, আর-শামস ইত্যাদি বাহিনীও তৈরি করেছিলেন?

** সে কথা আমি বলব না। আপনারা এ বিষয়ে আপনাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। আপনারা বলতে পারেন, হ্যাঁ বা না। কেননা, ফরমান ছিলেন এমজিসিএ। তিনি গভর্নরের পরামর্শদাতাও ছিলেন। আপনারা অবশ্য বলেছেন আগেই। তবু আমি আবার বলছি, বেসামরিক ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটত তার কোনো কিছুই ফরমানের অজ্ঞাতসারে হতে পারত না। আর তাই বলে যে তাকে সে সবের জন্য আদেশ-নির্দেশও দিতে হতো এমন নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিধর ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি কি না এখন বলেন, কিছুই জানেন না! না, আমি বলি, সব কিছু জানা ছিল তার।

* ফরমান তার লেখা বইতে দাবি করেছেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিরাট বন্ধু মানুষ ছিলেন। আপনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন? কোনো মন্তব্য আছে আপনার? তিনি কি আসলেই শেখ মুজিবুর রহমানের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন?

* না, তিনি হয়তো বা অফিসিয়ালি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবেন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। তার হয়তো দিনে তিনবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কেননা, একমাত্র তার পক্ষেই দাবি করা সম্ভব হয়েছে যে, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে খুব পরিষ্কার চেহারায় বেরিয়ে আসা। তিনিই প্রশাসনকে জানিয়েছেন...। এই ফরমান আলী এমন কাজ করেছেন যা তার করা উচিত ছিল না। ফরমান ছিল পুরোপুরি এক ভিন্ন শ্রেণীর লোক, একেবারে আলাদা। তার মতো লোকের পক্ষে বন্ধুকে পুরোপুরি পথে বসানো বা তার সর্বনাশ ডেকে আনা সম্ভব। বাস্তবিকপক্ষেও তিনি একজনকে বন্ধু হিসেবে নেন তার বারোটা বাজানোর জন্য, যে কাজটি আপনারা কেউ বন্ধু হলে তার বেলায় করতে পারতেন না। তাই আমি তার ব্যাপারেও উদার হতে চেষ্টা করেছি। আমি তাকে কখনো বিশ্বাস করিনি। ফরমান লোকটি এমন যে, সব সময় যেন মুখোশ পরে আছেন। আপনি ওর চোখ-মুখ দেখলেও ধরতে পারবেন না ঐ মুহূর্তে তিনি কী ভাবছেন, কী ফিকির করছেন, কিংবা ওর মনে কী আছে! লোকটা বুদ্ধিমান, চতুর ও প্রচণ্ড রকমের নিষ্ঠুর। এ রকমই মানুষ হলেন ফরমান যার মাঝে দয়ামায়ার কোনো অনুভূতি নেই, কিছু নেই। এ হলো গিয়ে আদ্যোপান্ত ফরমান। তার চেহারা তিনি আমায় একবার দেখিয়েছিলেন নির্বাচনের ঠিক পরপরই, জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারির দিকে। তার অল্প কিছুদিন আগে একাত্তরের ২৭ ফেব্রুয়ারি গভর্নর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফরমান এই সম্মেলনের জন্য একটি দলিল বা পেপার তৈরি করেন। ওটা ছিল সাধারণ লেড পেন্সিল দিয়ে লেখা, আমাকে দেখিয়েও ছিলেন সেটি। তাতে ইপিআর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতি বিভাগীয় সাড়া বা প্রতিক্রিয়া কী হবে তা প্রদর্শিত ছিল। অবশ্য এ সবের পরেও আমি বলতে চাই যে, ফরমান যদি বলেন, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন তাহলে তাকে সঠিকও বলতে হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, তিনি একথা আমাদের জানাননি যে তিনি তার ঐ মহৎ

বন্ধুর জন্য কাজও করেছেন তাকে অধিকার দেবার জন্য। কাউকে না কাউকে অবশ্যই আপনার বন্ধু হতে হবে।

* আমরা এখানে আসার মাত্র কয়েকদিনে আমরা এর একটা কারণের কথা শুনেছি। শুনেছি কেন 'অপারেশন সার্চলাইটের' পক্ষে এখানে প্রবল অভ্যন্তরীণ অভিমত ছিল। এই হেতুর পেছনের অন্যতম বাস্তবতা ছিল এই যে, আইয়ুব শাহীর যখন পতন হয় তখন সেই পতনের অন্যতম কারণ ছিল ছাত্র বিক্ষোভ। আবার সামরিক আইন পুনঃআরোপ করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে ক্ষান্ত দেয়।

** আপনি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন আরোপের কথাটা কী বলছেন তা আমার বোধগম্য নয়। কেননা, সামরিক আইন তো গোটা পাকিস্তানেই আরোপ করা হয়েছিল।

* না। মানে হ্যাঁ। বলতে চাই ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানেও ছাত্র বিক্ষোভ হচ্ছিল। সামরিক আইন জারির পর তারা ঐ বিক্ষোভ বন্ধ করে ও পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। আর তাই এ ধারণা গড়ে ওঠে যে, এ রকম একটা সামরিক শাসনের প্রবর্তন করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও শান্ত হবে।

** কথাটা মোটেও সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র বিক্ষোভের সূচনা হয় ১৯৬৮'র অক্টোবরের দিকে যখন আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশকের ইতি ঘটছিল। এ বিক্ষোভে পূর্ব পাকিস্তানে নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী। তখন ওখানে সেনাবাহিনীর জিওসি ছিলেন জেনারেল মুজাফফার উদ্দিন। ছাত্র বিক্ষোভের মোকাবিলায় ঐ সময় সেনা মোতায়েন করা হয়। আসগর খানও ঐ সময় ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। এ ছিল ওখানকার ছাত্র আন্দোলন। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন জুলফিকার আলী ভূট্টো।

* আমার ধারণা পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভকারীরা সামরিক আইন জারির পরপরই বিক্ষোভে ক্ষান্ত দেয়। ১৯৬৯-এ সামরিক আইন আরোপের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে নানা যুক্তি খাড়া হতে থাকে এই বলে যে, আদি 'অপারেশন সার্চলাইট'- এর মতো একটা বিদ্যুৎ গতির সামরিক অভিযান পরিচালনা করা যায় তাহলে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে।

** আপনি কি সামরিক আইন জারির কথা বলছেন?

* আমরা মনে করি, এ ধরনের কিছুর কথা ভাবা হয়। উচ্চতর সামরিক মহলে একটা ধারণা গড়ে ওঠে যে, ১৯৬৮-৬৯-এ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ হয়। এর শুরু '৬৮তে। এ আন্দোলনের কারণে আইয়ুব গতিচ্যুত হন। আর পূর্ব পাকিস্তানের সব কিছু শান্ত হয়ে আসে। এ কারণে

সেনাবাহিনীতে উঁচু মহলে এমন এক ধারণা গড়ে ওঠে যে সেনাবাহিনী যদি দ্রুত তৎপরতা চালাতে পারে তাহলে কাজ হবে।

** বলার দরকার, সর্বকালেই সেনাবাহিনী যখন কোনো অ্যাকশনে যাবার কথা বিবেচনা করে তখন তারা এও ভাবে ও বিশ্বাস করে যে, তারা সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে। আর তাই এ ধরনের পরিকল্পনা বরাবরই করা হয়ে থাকে। এতে নতুন কিছু নেই। অবশ্য, অপারেশন সার্চলাইটের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত ছিল ১০ এপ্রিল। ওদের বিশ্বাস ছিল, এই ১০ এপ্রিল তথা অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার ১৫ দিন পর সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে, সব কিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। কিন্তু যে ক্রোধ, ক্ষোভ ও তিক্ততা ওখানে পুঞ্জীভূত হয়েছিল সে বিষয়টি তারা আঁচ করতে পারেনি। আর এও ভুলে যায়, এ ধরনের অপারেশনে ব্যাপক সমর্থন দরকার; তা না থাকলে সেটি সফল হতে পারে না।

* 'অপারেশন সার্চ লাইটের' হিসাব-নিকাশ গলদের বিষয়টি কেন তারা আগে থেকে অনুমান করতে পারল না?

** এ জন্যই তো ওদেরকে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। আর ইয়াহিয়া খান রোমেলের চেয়েও বড় কোনো জেনারেল ছিলেন বলে আমি মনে করি না। তিনি হিটলারের চেয়ে কোনো বড় নেতাও ছিলেন না। তবু হিটলার যুদ্ধে পরাজিত হন। অথচ আগে তিনি যুদ্ধে ক্রমাগত জয়ী হচ্ছিলেন। তিনি কার্যত গোটা পশ্চিম ইউরোপ জয় করেন। রোমেল তাঁর অপারেশন বারবারোসা'র নেতৃত্ব দেন যুদ্ধের দুটি রণাঙ্গন খোলার জন্য, একটি রাশিয়া অভিযানের জন্য। আপনারা জানেন, সে অভিযানের কী পরিণতি ঘটে। এ সবই ঘটনা। যুদ্ধ চলে সাধারণত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে। এ কথা ভুলবার নয়।

লিবার্টো প্রসঙ্গত বলেছেন, যুদ্ধ শুধু জেনারেলদের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে–যুদ্ধ আদৌ এমন হালকা বিষয় নয়। আর আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে একটু যোগ করেই বলি, যুদ্ধ খুবই গুরুতর বিষয় যা আধুনিক জেনারেলদের হাতে ছেড়ে দেয়ার বিষয় নয়। রাজনীতি ও সমরশক্তি উভয়কেই নানা স্তরে সম্পর্কিত থাকতে হবে, তাদের ভূমিকাও থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে রাজনীতিক ও আমলাদের সমর্থন পেতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি ওঠেনি, কোনো প্রতিরোধ সংগঠিত আকারে আসেনি, বিরোধিতা করা হয়নি, বিক্ষোভ হয়নি অথচ পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছিল সে বিষয়েও কেউ তেমন আগ্রহ বা

কৌতূহল দেখায়নি। তাই আমি নিশ্চিত, সামরিক বাহিনী কালপ্রিট বা অপরাধী নয় তবু সেই সামরিক বাহিনীই ছিল আসামী। সে কথাই আমাকে শুনতে হয়েছে। সামরিক বাহিনী তার অপরাধীসুলভ কার্যকলাপে দেশের বেসামরিক মহলগুলির সমর্থন পেয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিরেট, নিটোল বিষয় এটি। পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান যা-ই হোক, এই ছিল বিধিলিপি। যখন বাঙালি আধিপত্যশীল ছিল ঠিক সেই সময় যুগপৎভাবে পাঠান, সিন্ধী, বালুচরা সামাজিকভাবে একই রকমে আধিপত্যশীল হয়ে উঠতে পারেনি। আর বাঙালিরা ছিল...।

* জেনারেল নিয়াজি তাঁর বইয়ে একটি পরিকল্পনার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেটির তথ্যে তিনি জানাচ্ছেন, এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কোনো জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানে যাক-না যাক নিয়াজীকে যেতেই হবে (বলির পাঁঠা হিসেবে!)। আর তাঁকে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করতেই হবে, কেননা তাঁকে কোনো মদদ দেয়া হবে না।

** আপনাদের তরফে কেবল তেমনটি প্রত্যাশা করাই সম্ভব। আমি আসলে বলতে চাই যে, আল্লাহর ওয়াস্তে বিশ্বাস করুন তিনি এখানকার হাই কমান্ডে থাকলেও নেতিবাচক দৃশ্যপটে তিনিও তেমন রদবদল করতে পারতেন না। এ রকম দায়িত্ব তাকে দেয়াই উচিত ছিল। আশা করি আপনারা ভুল বুঝবেন না, কেননা, এ এক তাৎক্ষণিক কাকতালীয় ব্যাপার। এ নিয়ে আমি লিখেছিও। এ হলো নিয়াজীর বই সম্পর্কে আমার বলার। এ নিয়ে আমি বিস্তৃত কলেবরে পুস্তক সমালোচনার আকারে লিখেছি এবং তা নিবন্ধ আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। জেনারেল জ্যাকবের বই সম্পর্কেও লিখেছি। জ্যাকব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ওপর একটি বই লিখেছেন, তার একটি কপিও আমি পেয়েছি।

* এ সপ্তাহে?

** জ্বি। আমি সঠিক মন্তব্য করেছি, বক্তব্যের সারসংক্ষেপ দিয়েছি এবং একটি দলিল উপস্থাপন করেছি–এর পাঞ্জাবি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দলিলটির রচয়িতা আসমত ইরানীর বাবা। আমার মনে হয়, এটি অত্যন্ত প্রামাণ্য দলিল–এর একটি কপি আপনিও পেতে পারেন। যা কিছু একাত্তরে ঘটে গেছে তার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এ দলিলে। এটি আসলে একটি চিঠি যা লেখা হয়েছিল একাত্তরের এপ্রিলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে।

* ঐ চিঠির লেখক তাঁর চিঠিতে কী বলেছিলেন?

** তিনি বলেছিলেন, সব কিছুর নিষ্পত্তি হবে বিশ্বজনীন পর্যায়ে, আর

আপনারা (পাকিস্তানিরা) হেরে যাবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পূর্ব পাকিস্তানে আপনারা আজ যা করেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধ করুন। এই আসমত ইরানীর পিতাই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি কাগজে-কলমে তাঁর এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এ চিঠির একটি কপি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, যা এখনো আমার কাছে রয়েছে। যার অংশবিশেষ....। বইয়ের একটা কপি আপনারা রাখুন।

* আপনাদের এখানকার কেউ কেউ আমাদের জানিয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসন কেন্দ্র তথা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শাসকবর্গ '৬০-এর দশকের শেষের দিকে থেকেই বলে আসছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দায়–তার ভার বোঝা হয়ে উঠেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে ফেলাই ভালো।

** কথাটা নতুন নয়। একেবারে প্রথম থেকেই এ ধারণা চলে আসছে। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ সন্দেহাতীতভাবে পরাজিত হয়। এ ঘটনাও হয়তো তেমন কিছু। যদি তাই না হবে তাহলে মি. জিন্নাহ কেন পশ্চিম পাকিস্তানে এসেছিলেন? কেন তিনি ঢাকায় গেলেন না? অথচ পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচকরা ছিল শতকরা ৫৬ জন। এসব কথা বলতে গেলে কাহিনী অনেক লম্বা হয়ে যাবে। সেটি আপনারা ভালো করেই জানেন। আমার এ বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আছে। আমি বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা-গবেষণা করছি। বলা যায়, এতে আমি খুব একটা আনন্দিত নই। আর একটা বড় কথা যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি তাঁকে দিয়েছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী, কিরণশংকর রায় ও এনামুল হাসান খান প্রমুখ। জিন্নাহ এ প্রস্তাবের জবাবে বলেছিলেন, বেশ তো, আমার কোনো আপত্তি নেই। আর কলকাতা ছাড়া বাংলা? সে কথা আমি ভাবতেই পারি না। আপনারা তাহলে এগিয়ে যান। তবে হ্যাঁ, সেটি একটি মাত্র শর্ত সাপেক্ষে। তা হলো, আপনারা কখনো স্বাধীন ভারত ইউনিয়নের অংশ হবেন না। কাজেই ঐ অবধি তিনি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

* আরেকটি বিষয়ের কথা আমাদের কানে এসেছে। সে সময় নাকি হিন্দু শিক্ষকরা পূর্ব পাকিস্তানিদের শিক্ষা দেবার ছলে তাদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে?

** বলছি আপনাদেরকে।

* এ হলো সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা। এখনই কেবল এসব কথা শুনছি।

** ফরমান আলির বই থেকে বিষয়টি আমি জেনেছি। আর এভাবেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের কাজের যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। আমি বিষয়টি আদৌ বুঝি না, কেননা দেশ ভাগের আগে তো হিন্দু শিক্ষক, অধ্যাপকের সংখ্যা বেশি ছিল। মুসলিম শিক্ষক ছিল কম। আর তাদের বিরুদ্ধে যা-ই বলা হোক, আমাদের আন্দোলনে তারাও আগ্রহ নিয়ে অংশীদার হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আমার একদিন এক কৌতূহলোদ্দীপক তর্ক-বিতর্ক হয়। আমি বলেছিলাম, অসুবিধাটি কোথায়? আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে বল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এ রকম একটা ডাক বিভাগীয় ঠিকানায় যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে বাংলাদেশকে তো পাকিস্তানের আওতাতেই রেখেছ? কাজেই আলাদা দেখলেও আসলে তা একসাথে মিলে একক দেশ। সে জবাবে বলেছিল, বাংলাদেশ বলে কি বোঝাতে চাও তুমি? আমি বললাম, বাংলাদেশ। ও বলল, তুমি কি দেশ আর প্রদেশের তফাত বোঝ না? আমি নীরব থেকে ওকে সময় দিলাম ভাববার। সে আবার বলল, দেশ হলো একটা রাষ্ট্র অঞ্চল আর প্রদেশ হলো রাষ্ট্রীয় অঞ্চল বা দেশের অংশ। যেমন, উত্তর প্রদেশ ভারতের একটি প্রদেশ। আমি বললাম, দোহাই জেনারেল, আল্লাহর ওয়াস্তে ও রাস্তায় ব্যাপারটাকে নিও না। এতে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। বস্তুত ওভাবেই ওরা সব কিছুকে বিচার করে, ওটা ওদের রীতি, আদর্শ, নিয়ম-আচার। আদর্শিকভাবে ধরে নিলাম, 'দেশ' বা 'প্রদেশ' যা-ই হোক, দোষটা কী? দেশ যদি বাংলাদেশ-পাকিস্তান হয়! কী হয় তাতে? আমার এখনো নিশ্চিত বিশ্বাস, বাংলাদেশ আর যা-ই হোক কখনো 'দেশ'-এর তল্লাশে ছিল না। বাংলাদেশ কেবল স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। তারা তাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়-আশয়ে নিজ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল। আমার বরাবরের ধারণা ছিল এ রকমই। আমি আমার জীবনের দীর্ঘ সাতটি বছর কাটিয়েছি পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষায়। আমি একটা বইও প্রকাশ করেছি। সেই বইয়ের অংশবিশেষ আমার লেখা কতকগুলি নিবন্ধ ধারাবাহিক *দ্য নেশন* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেগুলি নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। দেখে থাকলে আপনাদের মন্তব্য কী আমার জানা নেই। এ হলো সেগুলির কপি, আপনাদের জন্য।

* আমরা জেনারেল উমরের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি জানিয়েছেন ২৫ মার্চ রাতে তিনি ঢাকায় ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনাবলি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন না।

** আমিও এ বিষয়ে কোনো কিছু জানতাম না। তবে স্পষ্টত বুঝতে পারছিলাম এ লোকটি এর মধ্যে ছিলেন।

* ২৫ মার্চ যা ঘটেছিল তাতে জেনারেল উমর ছিল একথা কেন আপনার মনে হয়?

** কারণ তিনি এতে ছিলেন বলে। ২৫ মার্চ সকালে তার সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন আমার পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরার সময় হয়েছে। আর সে কারণেই আমি জেনারেল পীরজাদার কাছে বিদায় নিতে যাই। তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন। আমি তাকে রীতিমাফিক স্যালুট দিয়েছিলাম। আমার মুখের আকৃতি তেমন সুদর্শন কিছু নয়। আমার মুখটা বরং সিরিয়াস গম্ভীর প্রকৃতির। আর ২৫ মার্চে তো অনিবার্যভাবেই আমার মুখমণ্ডল খুব গম্ভীর হওয়ারই কথা। তাই তিনি আমাকে বললেন, ওহে, কী জন্য তুমি এত গম্ভীর? আমি বললাম, স্যার, এখানকার পরিস্থিতি তো জানেনই। তিনি বললেন, আরে না না, চিয়ার আপ, মুখ গোমড়া করে থেকো না। সেদিনই ২৫ মার্চ, ১৯৭১।

* কথাগুলি কার? জেনারেল উমরের?

** জেনারেল উমরের। আর তারপর তিনি একটি শায়ের (কাব্য স্তবক) আবৃত্তি করলেন। বললেন সবকিছু ভুলে থাকতে।

* তা কাব্য স্তবকটি কী ছিল? শায়ের সুনাইয়ে জারা?

** হ্যাঁ, শোনাব। সম্ভবত আমার এর পুনরাবৃত্তিতে ভুল হয়ে যেতে পারে।

* ইয়ে গুজারনে কোয়ি বাত নেহি।

** "মায়ই যবভি ঢাকা যাতাহু
ওয়ো কাতিল ছে কাহতা যাতাহু
তাওহি মে দ্যাস্তো বালু হ্যায়
ওয়ো ওয়াক্ত কি যো...।"

কোনো আঘাত করার সময় পুরো গায়ের বল কাজে লাগানো না হলে তা এক অবমাননাকর অমর্যাদাই বটে–ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকে বিশ্বাস করবে। সে আঘাতটাই আসে পঁচিশের নিশুতি মধ্যরাতে–১১টা বা ১২টায়। আর সে কারণেই জেনারেল উমর যদি বলে থাকেন, বলতেই পারেন, কেননা তিনি পাকিস্তান জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান। আর কারণটি সম্পর্কে জেনারেল জ্যাকব তাঁর বইয়ে বলেছেন, জেনারেল উমর ছিলেন ইয়াহিয়ার কসাই। তবে ওটা আমার মন্তব্য নয়।

* তাহলে আপনি কী বলেন?

** তিনি এসব ব্যাপারে খুব ভালো করেই ছিলেন কিংবা অনেকটাই এর ভেতরে ছিলেন। এ রকম করে বলছি এ কারণে যে আমি ছিলাম জনসংযোগের লোক। সবকিছুই আমার নজরে আসত, তবে সবার শেষে। আর এ কারণেই

আমি বলছি, আমি ধারেকাছেই ছিলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোনো অংশীদার ছিলাম না।

* এ সম্পর্কিত বইপত্র পড়লে সেনাবাহিনীর জেনারেলদের সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয় আমি সেটিকে কীভাবে বলি... কেমন যেন, এলোমেলো, বিভ্রান্তিকর, স্ববিরোধী মনে হয়।

** আরে না, এ জন্য অনেক দলিল, কাগজপত্রও তো রয়ে গেছে। মানে আমি বলতে চাই, তাদের সকলের মতামত একই হতে পারে কী করে?

* ঠিক তা নয়, এক সময় তারা জেনারেল উমরের মতোই বলছে, আমি এই করছিলাম। আমি সেই করছিলাম। ইয়াকুব, নিয়াজিও বলছিলেন। কিছু জনসাধারণ বলেছে ভিন্ন কথা।

** আমার তা জানা নেই। আমি জানি না জেনারেল উমর এসব বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন। দলিলপত্রই বা কেমন তাও আমি জানি না। আমি জেনারেল ইয়াকুবের বরাত দিতে পারি। তিনি অনেক কিছুই স্বীকার করেছিলেন। জেনারেল ইয়াকুবের সাথে তাঁর সামরিক আইন প্রশাসন দফতরে আমার দেখা হয়। সর্বশেষ তাঁর সাথে আমার দেখা হয় ঢাকায়। তিনি জানিয়েছিলেন, ১৯৭০-এর নভেম্বরের নির্বাচনের দিন কয়েক আগে অস্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী কিছু সৈনিক একটি জরুরি পরিকল্পনা তৈরিতে উদ্যোগী হয়। আর এ বিষয়ে আমার এই যে নিবন্ধটি দেখছেন আগামী সপ্তাহে ইসলামাবাদের কোনো একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাই বলতে পারি জেনারেল ইয়াকুব ছিলেন তাঁর স্বকীয় ধারার এক জঙ্গী বাজপাখি। তাঁর ধারণা ছিল এভাবেই তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তবে তাঁরা আসলে দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেননি। সে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর এ ধরনের অভিযান আগাগোড়াই নিরর্থক। ১৯৭০-এর নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তীকালে আমি সেখানে ছিলাম। আমি ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এসব উপকূলীয় এলাকা যেমন–ভোলা, হাতিয়া ও এ ধরনের আরো প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছি। ঐ সময় বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি অনুমান করেছিলাম, আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, আর অন্য দলগুলির ভরাডুবি হবে। তবু ওদের কোনো চৈতন্যোদয় ঘটেনি।

* বাংলাদেশ সম্পর্কিত বইগুলিতে '৭০ সালের নির্বাচনের ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কেমন ব্যাপার? কী মনে করেন আপনি এ বিষয়ে? কতগুলি আসন কোন দল পাবে তা ওরা নিরূপণ করতে পারল না?

** দেখুন, গোয়েন্দা বিভাগ বরাবরই ব্যর্থ হয়—সব সময়। আর গোয়েন্দা প্রবরেরাই কর্তৃপক্ষকে ডোবায়। দেখুন না, ভারতে কী ঘটেছে, ওখানকার বোমা বিস্ফোরণ, বিশিষ্ট ব্যক্তি হত্যা—যার কোনো কূলকিনারা, নিশানা-আভাসও পাওয়া যায়নি। সব সময়ই এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই ললাট লিখন।

* আবারও আমি সামরিক বিষয়েই প্রশ্ন করছি। জেনারেল নিয়াজী সম্পর্কে। আপনি তো তাকে ভালো অফিসার বলে মন্তব্য করেছেন। এখন আমি যোগ করতে চাই—বহুগুণে শক্তিশালী ভারতকে ঠেকাতে তো তিনি তার যথাসাধ্য করেছেন। আসলেও তিনিও যা করেছেন তা তার সাধ্যের বাইরেও। অথচ বহু লোকে এখন বলছেন জেনারেল নিয়াজী কোনো যোগ্য জেনারেল ছিলেন না। আমার প্রশ্ন হলো, তার যোগ্যতার বিষয়টি পাকিস্তানি সেনা সদর দফতরের কি জানা ছিল না? যদি থাকে, তাহলে বিষয়টি কেমন বিসদৃশ দেখায় না কি?

** আপনি কিন্তু অনেকগুলি বিষয়কে বেমালুম টপকে যাচ্ছেন। ভারতের মতো দেশও অনেক জায়গায় সামরিকভাবে পরাজিত হয়েছে, কাশ্মীরে তাকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে, অহমিয়াদের হাতে বহু সেনা খুইয়েছে, এগুলি কি সত্যি নয়?

* এগুলি তো আছেই। কিন্তু আমরা বলতে চাই, জেনারেল হিসেবে নিয়াজী ধাঁধার জবাব কী?

** না, আমি কেমন করে বলি, তিনি ভালো জেনারেল নন। আমি বলি তিনি নিষ্ঠাবান, খুব ভালো একজন সামরিক অফিসার।

* আপনি তো জানেন যে তিনি জানিয়েছেন, দুই-তিন জন জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানে সেনাপতিত্বের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। কাজেই বাছাইয়ের সিঁড়িতে নিচে থাকা সত্ত্বেও নির্বাচকরা তাকে পূর্ব পাকিস্তানে সিপাহসালার হিসেবে তুলে নেন।

** আর সেটাই হলো আখেরের বাছাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী ঘটেছিল জানেন? রেবেন এক সময় লক্ষ্য করেন যে, তিনি যে সময় সিদি ইব্রাহিমে ছিলেন তখন তাঁর ঐ অবস্থান থেকে তিনি জার্মান জেনারেল রোমেলকে সেখান থেকে হটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু রিচার্ডসনের কাছ থেকে আদেশ এলো তাঁর কাছে : দুই ডিভিশন সেনা পাঠাও গ্রিসে।। তিনিও সে হুকুম তামিল করলেন। কিন্তু তাতে কী হলো, গ্রিসে কোনো ভালো ফল তো পাওয়াই গেল না, সিদি ইব্রাহিমের দিকে অগ্রগতিও স্তব্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হলে এ নিয়ে বহু সমালোচনার বার্তা আসতে থাকলে রেবেন বললেন, না ওটা ছিল আমারই ভুল।

আমি সেভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে নোট পাঠানোর সাহস রাখি। আর সেটিই কথা। জেনারেলের এখানে কোনো প্রশংসা পাবার নেই। জেনারেল নিয়াজী আমার সাথে অত্যন্ত চমৎকার আচরণ করেছেন। আর আমিও একমাত্র ব্যক্তি, যে তার সম্পর্কে অত্যন্ত সদয় মন্তব্য করেছি।

* জ্যাকব সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

** জ্যাকব তো আরেক ইয়াকুব। আমি বলব, আরেক নিয়াজী। কারণ জ্যাকব অনেক কাজই করেছেন। ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র সাথে ১৯৯২-এর নভেম্বরে তিনি পাকিস্তানে এলে অল্পকালের জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। আমি তখন লাহোরে ছিলাম। লোকটি রীতিমতো সুরাসক্ত, জানতেনও না বোধ করি যে তিনি একজন জেনারেল। খুবই মোটা থলথলে শরীর। আর তাঁর মুখ থেকে যেসব বচন বেরোয় তা সত্যিকার পেশাদার সৈনিক শুনলেও লজ্জা পাবে। এহেন জ্যাকব এখন যুদ্ধে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হবার দাবিদার। তাঁর সে দাবির নিক্তির প্রান্তে ঝুলে আছেন মানেক শ, আর আরোরা বেচারা তো লাপাত্তা। তিনিই সে দিগ্গজ যিনি যুদ্ধের সব কিছুর প্রণেতা। তারপর মানেক শ....। এহেন জ্যাকবের উক্তি, না-না, ঢাকা তো আপনাদের রাজনৈতিক কেন্দ্র, কত কিছু। আমি জবাবে বলেছিলাম, জ্বি, যা ঘটেছে তাতো নিশ্চয়ই, তবে কখনো বলবেন না...। আমি তাই বলি জ্যাকব ও নিয়াজী একই শ্রেণীভুক্ত। তফাত শুধু এই– জ্যাকব নিয়াজীর চেয়ে...

* আপনি বলেছেন, যুদ্ধের বিষয় এমন গুরুতর যা জেনারেলদের হাতে যেমন ছেড়ে দেয়া যায় না, তেমনি রাজনীতিকদের হাতেও নয়। এখন বলুন ভূট্টোর ভূমিকা কী ছিল? তিনি ছিলেন...

** তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিপর্যয় আর কি! তিনি কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন একই দেশের দুই দেশরক্ষা দফতর, জোড়া প্রধানমন্ত্রী পদের। তিনি আটকেই থাকুন বা লারকানা, ইসলামাবাদে থাকুন, তিনি সব সময় ক্ষমতার জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন, আর সেটাই তাঁর... সব। আমি মনে করি প্রশ্নটি আসলে ক্ষমতা হস্তান্তরের ছিল না, বরং বেশ কয়েকটি স্তর পেরিয়ে তা হবার কথা ছিল। ১নং স্তর : নির্বাচন। ২নং স্তর : জাতীয় পরিষদে উদ্বোধনী অধিবেশনের দিন তারিখ নির্ধারণ। ৩নং স্তর : জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের উপস্থিত ও ভাষণদান। ৪নং স্তর : খোদ শাসনতন্ত্রের বিষয়াবলী ১২০ দিনের সময়সীমার মধ্যে নির্ধারণ। ৫নং স্তর : প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্রের অনুমোদন। ৬নং স্তর : ক্ষমতার হস্তান্তর। কিন্তু সবকিছু গোলে হরিবোল করে দেয়া হয়। ক্ষমতা

হস্তান্তরের প্রশ্নটি আমার বিবেচনায় মোটেই সঠিক ছিল না। আমি আমার ওপরওয়ালা মেজর জেনারেল গুল হাসান খানকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, আল্লাহর ওয়াস্তে প্রেসিডেন্টকে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে দিন। জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন নির্ধারিত তারিখে হতে দিন। সেই অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাবেন ও ভাষণ দেবেন। আর সেই সাথে তিনি তাঁর যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে কোনো একটা কার্যকর রফা ও ব্যবস্থায় উপনীত হবেন। আর তাতে দুই-তিন বা পাঁচ মাস লাগতে পারে। এ সময়টি ১২০ দিন সময়সীমার বাইরে থাকবে এবং ফেডারেল শাসনতন্ত্রের জন্য ১২০ দিনের যে মেয়াদ তা নির্দিষ্ট তারিখে শুরু হবে–পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে শাসনতন্ত্র প্রশ্নে আলোচনা শুরুর ঠিক পর থেকে। আর সেটিই হতে পারে নিখুঁত কাজের উপযোগী ব্যবস্থা। কিন্তু তারপর কী ঘটে সে তো আপনাদের জানা। লারকানার সলাপরামর্শের পর ভুট্টোর ভোল পাল্টে গেল। সবকিছুর তালগোল আরো একবার পাকিয়ে গেল। ইয়াহিয়া খান কখনো একথা বলেননি, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি একাত্তরের ১৪ জানুয়ারি বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার আগে কোনো এক ব্যক্তির দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, আমি দেশের যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি। ঐ ব্যক্তি তাঁকে আরো প্রশ্ন করেন : কে তাহলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন? ইয়াহিয়া বলেন, 'কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা।' তিনি কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। তিনি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কথাই বলেছিলেন। আর কিছুই নয়। কিন্তু এরপর ইয়াহিয়া যান লারকানায়, আর তারপরই গোটা রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যায়।

* বিষয়টা কি সেনাবাহিনীতে জানা ছিল যে তিনি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবেন?

** অবশ্যই। তারা অলস বসে ছিল না, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তাদের সহানুভূতি ছিল। আর ভুট্টো তাদের মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি নানা রকমের কাহিনী ফাঁদতে শুরু করেন। তিনি এমন আজগুবি কথা শুরু করে দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সব ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়ে যাবেন। অথচ সকলের জানা উচিত যে, রাওয়ালপিন্ডি থেকে করাচি, করাচি থেকে চট্টগ্রাম ট্যাঙ্কগুলি নিতে বেশ একটা সময় লাগার কথা। যা হোক, আপনি কি সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রাম গেছেন? চট্টগ্রামের নতুন পাড়ার সেনাবাহিনীর রেজিমেন্টাল সেক্টরে একটা রুশ উভচর ৭৬-টি ট্যাঙ্ক এখনো থাকার কথা।

সেটা এখনো আপনি দেখতে পাবেন। এই ট্যাঙ্কটিকে কাসুর থেকে চট্টগ্রাম নিতে তিন মাস সময় লেগেছিল।

* তাহলে তিনি ওদের ভীতির এই বিষয়টি নিয়ে 'মাদারির খেল' শুরু করেছিলেন।

** ভীতি নয় বরং বলুন উচ্চাভিলাষ, যার নির্গলিতার্থ আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, নির্বুদ্ধিতা। উচ্চাভিলাষ? হ্যাঁ, ওটা ছিল বটে তবে কোনো ভীতি ছিল না।

* আসলে পশ্চিম পাকিস্তানে তখন এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয় চলছিল। সে সময় ভূট্টো সেনাবাহিনীতে তার একাধিক সমর্থকগোষ্ঠীর উদ্দেশে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন, বার্তা ছিল জেনারেলদের জন্যও, বার্তা ছিল সর্বস্তরের সেনামহলগুলির জন্য।

** না, না, তা মোটেও নয়। সেনাবাহিনী মূল্যের নিরিখে যা-ই হোক না কেন, এ সংগঠনটি বাস্তবিকপক্ষেই মনোলিথিক, একাট্টা, কেন্দ্রাভিমুখী। ভূট্টো সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এ হলো আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর কথা। আমি আপনাদের দেশে গিয়েছি। জেনারেল এরশাদের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলাপ হয়েছে। সে সময় তিনি ছিলেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট। আপনাদের সেনাবাহিনীর পদাতিক বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর মতোই উত্তম। আপনাদের বেলায় শুধু তফাতটি হলো যে, তারা অস্ত্রসজ্জিত নয়। সেনাবাহিনী হলো এককেন্দ্রিক সংগঠন। আমাদের দেশের সেনাবাহিনীতে এখনো মধ্যপ্রাচ্য দেশীয় ধাঁচ আসেনি। অথচ আপনারা লে. কর্নেলদের জন্য একটি ভাষার, অন্যদের জন্য অন্য ভাষার প্রস্তাব করেছেন। এটি হয়তো বা কিছুকাল পরে হবে। সে বিষয়ে আমি বলতে পারি না। এরপর জেন্টলম্যানদের (জেন্টলম্যান ক্যাডেট) জন্য আরেকটি ভাষা রেখেছেন।

* নওয়াজ শরীফের সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

** মনে হয় ঠিক হবে না। কেননা আমি আমার নিবন্ধে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি। আমি আশা করি, নওয়াজ শরীফ যা বলেছেন তা কখনো তিনি অস্বীকার করবেন না। কারণ, ওটা এখন বাস্তব সত্য। এ নিয়ে আর বেশি কিছু মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কেবল আপনি যদি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধগুলির কপি আমাকে পাঠান তা-ই যথেষ্ট হবে।

* অবশ্যই, যা কিছু হোক আপনি তার কপি পাবেন।

** আর হ্যাঁ, আব্দুল হাফিজ, যিনি এক সময় ভূট্টোকে সমর্থন করতেন, তাঁর কিছু অদ্ভুত ধ্যানধারণা আছে আমার ও আমাদের ব্যাপারে। তবে আমি

বিষয়টি গায়ে মাখি না। কেননা কেউ যদি সদ্য পরিচিত কারও সম্পর্কে একভাবে চিন্তা করে বা করার বিষয়ে স্থির করে থাকে, তাতে আমার বলার কিছু নেই। তেহরানে তিনি আমার সাথে দেখা করেন। তিনি বলেন, কেন আমাকে আপনার অফিসে ডেকেছেন? আমি কোনো জন্তু বা এরকম কোনো কিছুর সাথে কথা বলি না। সে যাই হোক আমি তাঁকে ডেকেছিলাম। তিনি একজন লাগামবর্জিত মানুষ, কেননা...।

* ও, হাফিজের কথা বলছেন! এ ব্যাপারে তো তাঁর রীতিমতো সুখ্যাতিই আছে।

** না, না, তিনি ও জন্য খ্যাত নন। তিনি সে রকম মানুষ নন। তিনি অসহিষ্ণু অহমিকাক্লিষ্ট– একবার কিছু সিদ্ধান্ত নিলে সেখান থেকে তিনি নড়েন না।

* এ ঘটনা ঘটে কবে?

** ১৯৮৯-এ আমার তেহরানে সফরের সময়।

* তা আপনি কেন ভাববেন হাফিজ এখনো বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক? তিনি ইতোমধ্যে ওখান থেকে চলে গেছেন।

** ঐ সময়টায় আমি বাংলাদেশের গোটা বিষয়টি বিচার-বিবেচনা ও সমীক্ষা করছিলাম। তখন ১৯৮৬। আমি এরশাদের সঙ্গে বাংলাদেশে যাই। তাঁর সাথে বৈঠকে মিলিত হই। একথা আপনাদের খুব ভালো করে জানা। ঐ সময় বাংলাদেশে, ডিসিএমএলএ বা উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন জেনারেল আতিকুর রহমান। তিনি এক বিশদ বিস্তৃত বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি খুবই সদয় ব্যক্তি। তিনি আমার স্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। কারণ আমার আত্মীয়-স্বজন কিছু বাংলাদেশেও রয়েছে। এ সফরে আমাকে যে ভিআইপি ফ্ল্যাটে থাকতে দেয়া হয়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সেই একই ফ্ল্যাটে আমি ছিলাম। আমি আপনাদের দেশ ও দেশের লোকজন দেখেছি। খুবই চমৎকার। এরশাদের সাথে আমার তিন দফা বৈঠক হয়। আর অপরিহার্যভাবেই আপনাদের আবাসিক সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমার একটা ধারণা নেবার সুযোগ হয়। কিন্তু বলার বেশি কিছু নেই, কেননা, আপনাদের সেনাবাহিনী অস্ত্রসজ্জিত নয়। এটি আপনাদের বিবেচ্য বিষয়। মহোদয়, সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্বের প্রতীকও বটে, এরশাদ এসবের জবাবে বলেন, ঠিকই বলেছেন। ধরুন যদি বদমাশ ভারতীয়রা... আমি মনে করি নিশ্চিত আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন। দেখেশুনে মনে হলো লোকটির আদ্যোপান্ত সব দেখা হয়ে গেছে। তবে তার সম্পর্কে একটা ধীর আর সহিষ্ণু ধারণাই হলো।

তাকে খুব ভালো করে জানা এর আগে হয়নি। তিনি এখানে ছিলেন। এখানে যে ২০-২৮ হাজার বাঙালি সৈনিক ছিল তিনি তাদেরই একজন।

* যাই বলুন এঁরা তো সবাই পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক একাডেমী থেকেই বেরিয়েছে।

** আর সেটাই জঘন্যতম ব্যাপার।

* কী আর বলা!

** মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার একদিকে, বাঘা সিদ্দিকী একদিকে, আর এরশাদ, বিএমএ একদিকে। সব মিলেমিশে ওরা একাকার। এক হয়ে যায়। সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে গেরিলা বাহিনী। বাঘা সিদ্দিকী বাঘা সিদ্দিকীই থেকে যান। আর যে মুহূর্তে শিক্ষিত সেনাবাহিনী এসে যায়, কাদেরিয়া বাহিনী তাতে রণক্ষেত্র হারায়। কেননা, বাঘা সিদ্দিকীর গেরিলারা কোন্ টাইপের তা আপনারা জানেন। আর ওরা সব সময়ই এক রকমের। অথচ যা উচিত তা হলো গেরিলাদেরকে অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়। একবার শান্তি ও নিয়মিত বাহিনী এলে সেখানে আর গেরিলা বাহিনী থাকতে পারে না। টাইগার সিদ্দিকী সম্পর্কে অনেক লোমহর্ষক বিবরণ রয়েছে। আমাদের একজন সংবাদদতা জানিয়েছেন যে, এই বাঘা সিদ্দিকী অবাঙালি লোকজনকে ঘেরাও পাড়কাও করার পর তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে তাদের রক্ত নিজেদের হাতে আঙুল রাঙিয়ে নিতেন। সেটা তাঁরা করেছেন বিশ্ব যোগাযোগ মাধ্যমের উজ্জ্বল পাদ-প্রদীপের সামনে। কিন্তু যাই হোক, তিনি তাঁর কাজ তো করেছেন। বাঘা সিদ্দিকী সমস্যার নিষ্পত্তি করেছেন। সে রকমই মানুষ তিনি। এসব কাজের শর্তই এমন। আমি হলে আমাকেও এমন কাজে অংশীদার হতে হতো।

* কিন্তু কাজটা তো ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময়!

** সর্বাত্মকভাবে। কিন্তু সবকিছুর পরেও এ কথা তো নির্মম সত্য, কার্যকলাপ চলেছে। ভেতরে এ সব হিংসা নির্মমতা, বহিঃপ্রলেপের প্রসাধনীই তো কেবল সাধারণের নজরে পড়ে।

* আসলেও দীর্ঘ নয় মাসের দুঃসহ বিভীষিকার রাজত্বের পর ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর এলে কারুর পক্ষে জান্তব আক্রোশ, তথা প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখা ছিল খুবই কঠিন কাজ।

** আমি স্বীকার করি সে কথা, হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে এ ব্যাপারে একমত। আরো একটি জিনিস। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বলে সেটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য। আমরা বিদেশী সংবাদদাতাদের ২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করেছিলাম। এই একবারই মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টিক্কা খান তার সারা

জীবনে। অতীতে কিছু দেখানোর ছিল না, তাই কখনো তিনি সিদ্ধান্ত নেননি। ঢাকায় তখন কার্ফ্যু ছিল। আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে লম্বা ড্রাইভে পোস্তা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে বহু লাশ আমার চোখে পড়েছে। অবশ্য ঢাকা ক্লাবের বাইরে মাত্র ২/১টি লাশ দেখেছি। আর কিছুই না। কিন্তু তবু বিদেশী সংবাদদাতাদের অনতিবিলম্বে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্তটিতে গৌরবের কিছু ছিল না। তাদের আগে কোনো বিদেশী সংবাদদাতাকে পরিদর্শনে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়নি। আমিই পরে প্রথমবারের মতো ছয়জন বিদেশী সংবাদদাতার একটি দলকে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যাই। এঁরা হলেন, *টাইম ম্যাগাজিন, ফিনান্সিয়াল টাইমস, সিনহুয়া, রয়টার, নিউইয়র্ক টাইমস* ও আরো কয়েকজন সংবাদদাতা। তাঁরা উপদ্রুত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন। তাঁদেরকে ঘুরে দেখার সময় লোকজনের সাথে কথা বলার সকল স্বাধীনতা দেয়া হয়। কিছু লোক আমাদের দেখে সরে পড়ে। আমরা ওদের বাইরে আনতে পারিনি। এসব ঘটনা ঘটে যায় দুর্ভাগ্যক্রমে। খুব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলেই আমার ধারণা। আমি এ বিষয়ে নিবন্ধ লিখে তখন পাঠিয়েছিলাম। আমি মনে করি আমাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক ক্ষমতা চাওয়া দরকার রয়েছে এ বিষয়ে। আমরা যে সব দোষ করেছি আপনাদের তুলনায় তা অনেক বেশি। তবে আপনারাও ভুল করেননি, অন্যায় করেননি এমন নয়। পাকিস্তান যা ছিল আজ আর তা নেই।

* জানতে চাই, কীভাবে এই সহযোগিতামূলক ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা ঘটবে?

** আমি বলতে চাই, আমাদের দুই পক্ষকে পরস্পর ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা, আপনারাও সব সময় ঠিক কাজ করেননি।

* হলো তাই। কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে তো কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হবে? মানে দুই তরফকে তাদের সীমানা অবধি এগিয়ে আসতে হবে।

** না, আমার ধারণায় সর্বোত্তম জিনিসটি হলো পরস্পরকে বলা যে, ভাই যা-ই ঘটেছে সে জন্য আমরা দুঃখিত। আর সেটিই সব।

* ক্ষমা প্রার্থনা করায় কি এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায়... আমি তো মনে করি না।

** আমিও মনে করি না।

* বিষয়টি সম্পর্কে আপনি ইতোমধ্যে বলেছেন। থাক–অনেক বাস্তব তথ্যও বেরিয়েছে আপনার কথা থেকে।

** আমি যা বলেছি, তাতে পাকিস্তানের ভেতরটা আপনারা দেখেছেন।

* তাতে কী? বলি ...।

** না, না। এ কথাটা বলতে দিন আমাকে। এ ধরনের কথাবার্তা বলতে যথেষ্ট বুকের পাটার প্রয়োজন হয়।

* আমি সেটা বিশ্বাস করি।

** বিশেষ করে একজন পাঞ্জাবির এ ধরনের কথাবার্তা বলা...।

* আমি মনে করি এটি যথেষ্ট তাৎপর্যবহ।

** আসলে এ বিষয়ে চাপা দেয়ার বিষয়টি বেশ কঠিন। আপনার কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি জানি পরস্পর ক্ষমতা চাওয়ার যুক্তিযুক্ত নিখুঁত কারণ রয়েছে। কেননা, ভুল করেছে দুই পক্ষই। সবকিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়েছি আমরা এধারে, আপনাদের ওদিকে নয়। তবে এসব আর নয়। শেখ মুজিবুর রহমান জয়ী হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে, তাঁর কেন আসার দায় থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানে? আমাদের সে তর্কের অবকাশ নেই।

৫০

জেনারেল খালিদ মাহমুদ আরিফের জন্ম ১৯৩০ সালে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৪৯ সালে। জেনারেল জিয়াউল হক যখন ক্ষমতা দখল করেন তখন ১৯৭৭ সালে আরিফকে সেনা প্রধান নিযুক্ত করেন। ১৯৮৪ সালে উন্নীত হন তিনি জেনারেল পদে এবং তাকে ভাইস চিফ অব আর্মি স্টাফ করা হয়। তবে সেনা প্রধানের দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত ছিল। ১৯৮৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর লেখালেখি শুরু করেন। কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার তিনটি উর্দু কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে তিনি দুটি বই লিখেছেন। একটি *ওয়ার্কিং উইথ জিয়া,* দ্বিতীয়টি *খাকি শ্যাডোজ।* প্রথমটির সময়কাল ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের আমল। দ্বিতীয়টির সময়কাল ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৭। প্রথম বইটির অনেকাংশ ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিতীয় বইতে।

দুটি বইয়ের ভঙ্গিই অ্যাকাডেমিক। দুটি বইতেই ১৯৭১ সম্পর্কে দুটি অধ্যায় আছে। তবে, তাতে নিজের মন্তব্য কম। অন্যান্য লেখকদের তথ্যাবলির ওপর ভিত্তি করেই বিবরণ দুটি লেখা।

প্রথম বইতে বাংলাদেশ সংক্রান্ত অধ্যায়টির নাম 'ঈস্ট পাকিস্তান অ্যামপিউটেড'। কেন পাকিস্তান ঢাকা হারাল, বিবরণের শেষে এক অনুচ্ছেদে তার কারণগুলি বর্ণনা করেছেন। এতে নতুন কোনো তথ্য বা মন্তব্য নেই। দ্বিতীয় বইতে এই অনুচ্ছেদই বিস্তারিতভাবে একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বইটি আত্মজীবনীমূলকও বটে। অ্যাকাডেমিক বিবরণের মাঝে তার স্মৃতিকথাও বিধৃত হয়েছে। এ বইয়ে বাংলাদেশ সংক্রান্ত অধ্যায়ের নাম 'ডিবাক্‌ল অ্যাট ঢাকা'।

প্রথমেই দেখা যাক পদ্ধতিগত বিষয়টি। তিনি বেশি ব্যবহার করেছেন এ বাসিতের *দি ব্রেকিং অব পাকিস্তান* ও কামাল মতিনউদ্দিনের উল্লিখিত বইটি। বাসিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিহারিদের ওপর বাঙালিদের 'অত্যাচারের' বিবরণ নিয়েও একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। বাঙালিদের 'নিষ্ঠুরতার' প্রমাণ দিতে গিয়ে অধিকাংশ জেনারেল বাসিতের বইটি ব্যবহার করেছেন। মতিনউদ্দিনও। আর মতিনউদ্দিনের বই সম্পর্কে তো আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং জেনারেল আরিফের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তা এখানেই বোঝা যায়, ভঙ্গিটা যতই অ্যাকাডেমিক থাকুক না কেন।

প্রথমেই তিনি লিখেছেন, শূন্য থেকে ১৯৭১ হয়নি। পাকিস্তানের অভ্যন্ত রীণ ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছে শত্রুভাবাপন্ন ভারত। তার মতে, পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয়ের জন্য সে সব ব্যক্তিকে দায়ী করতে হবে যারা ব্যর্থ হয়েছে ও দেশের সঙ্গে ঐ টালমাটাল সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এর সঙ্গে জরুরি বাস্তব ও 'ধারণাকৃত' কারণগুলি যা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করছে। ১৯৪৭ সালের পর বাঙালি মনে ক্ষোভের অনেক কারণ আছে, যেমন– এলাকার পশ্চাতপদতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং হিন্দু জনসংখ্যার সাংস্কৃতিক আধিপত্য। এছাড়া ছিল কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভুল যা এই ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে কেন্দ্র অবহেলা করছে। তাছাড়া পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতের সন্দেহজনক ভূমিকা এলাকায় ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল।

লক্ষ্য করুন, এমনভাবে বিষয়টা সাজানো হয়েছে যে, দোষ কার তা নির্ণয় করা কঠিন। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা জন্মগত। কেন্দ্র ভুল করেছে, করতেই পারে, তাতে ক্ষোভের জন্ম নিয়েছে যা যৌক্তিক নয়। আর এসব হচ্ছে 'ধারণাকৃত'। এর সঙ্গে যুক্ত হিন্দু ও ভারতের আধিপত্য।

হিন্দুদের বিষয়টি আবারও এসেছে। তিনি লিখেছেন, সংখ্যালঘিষ্ট হিন্দু অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও সমাজ জীবনে এভাবে বিস্তার করেছিল "far

in excess of its population ratio" [পৃ. ৯৬] আরিফ ভুলে গেছেন ১৯৪৭ সালে প্রভাবশালী হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে। যারা রয়ে গেল তাদের কিছু স্বইচ্ছায় বা যাওয়ার উপায় ছিল না বলে। তাদের জমিজমা ব্যবসার স্থান পূরণ করেছে বাঙালি ও অবাঙালিরা।

আরিফ লিখছেন, 'Bengali bond' খুবই শক্তিশালী ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিল না। ইকবাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রাধিকার পেয়েছেন। সত্যি কথা অবশ্য একটি লিখেছেন, বাঙালিরা, অবাঙালিদের সঙ্গে কথা বলার জন্য উর্দু শিখেছিল, অবাঙালিরা বাংলা শেখেনি। এতে ক্ষোভ ছিল বাঙালির।

কিছু সামান্য সমস্যার কথা উঠেছিল শুরুতে, লিখেছেন আরিফ। যেমন, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করা। জিন্নাহ করাচিতে রাজধানী হবে ঘোষণা করে তার সমাধান করেন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন পূর্ব পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি আমলাদের 'stiff-necked' ব্যবহার পছন্দ করেনি। এরা পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চপদগুলিতে ছিল।

"The popular feeling was that such job opportunities rightfully belonged to the sons of the soil." [পৃ. ৯৬] এরপর এসেছে ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ইত্যাদি। এগুলি আরিফের কাছে 'minor grievances'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আরিফ আরো মনে করেন, ইতিহাসও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

"History played an important part in the issue that confronted East Pakistan." [পৃ. ৯৭]

যে ইতিহাসের শুরু ব্রিটিশ আমল থেকে। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসে এসব উত্তরাধিকার সূত্রে পান। অর্থাৎ তার কীইবা করার ছিল।

নির্বাচনের পর দুই ক্যারিশমেটিক ও জনপ্রিয় নেতার অহঙ্কার উদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি, 'ইরেশন্যাল' ব্যবহার এবং আপসহীন ভঙ্গি দু প্রদেশকে মুখোমুখি দাঁড় করাল। তার ভাষায়–

"The regional split was accentuated by the egocentric attitude of the two charismatic and populist leader– Mujib and Bhutto– Whose irrational behaviuor and uncompromising attitudes put the country on an irreversible collision course." [পৃ. ১০৭]

তাহলে অন্তিমে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে, দুই রাজনৈতিক নেতার কারণেই পাকিস্তান ভেঙে গেছে। পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, সেনাবাহিনীর ভূমিকা এখানে গৌণ।

এরপর বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়ে অন্তিমে আরিফ জানাচ্ছেন, শেখ মুজিব

সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ও পাঞ্জাবি 'শালা'দের বিরুদ্ধে বিষ উগরে বাঙালিদের আবেগকে মথিত করে তুললেন। সমস্ত দোষ পশ্চিম পাকিস্তানের। প্রশাসনিকভাবে ভারত সূক্ষ্মভাবে এই আবেগকে তাতিয়ে তুলেছিল [কীভাবে তার উল্লেখ নেই]। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুরাও একই কাজ করল। সংকটের চূড়ান্ত মুহূর্তে ভারত প্রবলভাবে মুক্তিবাহিনীকে প্রভাবিত করল।

শুধু তাই নয়, ২-২৬ মার্চ বাঙালিরা নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা এক লাখ বিহারি ও অবাঙালিকে হত্যা করে। এখানে বাংলাদেশের জিয়াউর রহমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা শুনেছেন, জিয়াউর রহমান তার কমান্ডিং অফিসারকে হত্যা করেছেন অফিসারের ব্যাটম্যানকে দিয়ে। এসব ঘটনা আরিফের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়া পাকিস্তান গেলে তার সম্মানে প্রদত্ত নৈশভোজে তিনি যাননি কারণ তার "Presonal instinct prevented me from lunching with a murderer who had stooped so low as to have his own commanding officer gunned down." [পৃ. ১২০] তাহলে আরিফদের সঙ্গে বসাই তো যাবে না যারা ৩০ লাখ হত্যা করেছেন।

আরিফ বিস্মৃত হয়েছেন ২৫ মার্চ কী ঘটেছিল? পরবর্তী নয় মাস কী হত্যাযজ্ঞ চলেছিল। ১ লাখ বিহারি ও বাঙালি হত্যা আমার কাছে অনেক পশ্চিম পাকিস্তানিও বলেনি।

এরপর সেনাবাহিনীর ভূমিকা, যুদ্ধকালীন কৌশল ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। কোথাও সেনাবাহিনীকে দায়ী করা হয়নি। মার্চ-ডিসেম্বর এই নয় মাসে সেনাবাহিনীর গণহত্যা, লুট, ধর্ষণ আলোচিত হয়নি। তবে বারবার ভারতের প্রসঙ্গ এসেছে। কীভাবে ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।

আরিফের এই অধ্যায়ের উপসংহারটি পড়লে বাঙালি, বাংলাদেশ, রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হবে। তিনি লিখছেন–

"The fall of Dacca resulted from a faulty political situation and weakness in generalship. While impetuous Bhutto and unfaithful Mujib share considerable blame for the national tragedy in 1971, General Yahyah Khan bears the stigma for presiding over the destruction of the country. Pakistan gallant soldiers, sailors and airmen did not get a fair chance to defend their country and demonstrate their skill while faring the orchestrated challenge of internal subversion and external aggression." [পৃ. ১৩৭]

পাকিস্তান তাহলে ভেঙে ছিল 'অবিশ্বস্ত' মুজিবের কারণে। আর কেউ তার জন্য দোষী নয়। আর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের দেশ রক্ষায় পর্যাপ্ত সুযোগ

পায়নি–এ মন্তব্যের অর্থ কী? উল্লেখ্য ১৯৭১ সালে আরিফ ইসলামাবাদে সদর দপ্তরে ইয়াহিয়ার সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

৫১

পাকিস্তানি আদি সৈনিকদের একজন ব্রিগেডিয়ার জেড. এ. খান বা জহির আলম খান। তার পিতা ছিলেন সেনাবাহিনীতে। পিতা চাননি, তিনি আসুন সেনাবাহিনীতে। কিন্তু জোরজবরদস্তি করে গেছেন সেনাবাহিনীতে। পরবর্তীকালে তার ছোট ভাইরাও বিমান ও নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। ১৯৭২ সালে ভূট্টো ক্ষমতায় আসার পর তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। তার এই সৈনিক জীবনের ইতিবৃত্ত তিনি রচনা করেছেন ইংরেজিতে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বইটির নাম- *The Way It Was*. ৩৯৭ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশিত হয়েছে করাচি থেকে। প্রকাশ কাল ১৯৯৮।

বৃহৎ এই গ্রন্থটির প্রথম ন'টি অধ্যায় পাকিস্তান [পশ্চিম] পর্ব। দশম, এগার অধ্যায় 'পূর্ব পাকিস্তান' বা বাংলাদেশ নিয়ে। আবার দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ অধ্যায় পাকিস্তান নিয়ে। অর্থাৎ এ গ্রন্থে মাত্র দুটি অধ্যায় রচিত বাংলাদেশ নিয়ে।

জহির আলমের বর্ণনা থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিকশিত হওয়ার সময়টা বোঝা যায়। তিনি যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তখন কমান্ডে ছিলেন ইংরেজরা। পরে যারা দায়িত্ব পান তারাও ছিলেন ঔপনিবেশিক বাহিনীর। তার অবসর গ্রহণ কালীন অবস্থা পর্যন্ত সেই কমান্ড স্ট্রাকচারই ছিল। তিনি বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ইউনিটের গড়ে ওঠার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, প্রতিটি পর্যায়েই তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে। কখনও শাস্তি পেয়েছেন, কখনও বেঁচে গেছেন। এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল এ.ও. মিঠা মন্তব্য করেছেন ভূমিকায় যে, অনেক অফিসারকে বিচার করা হয় দেশ বা সেনাবাহিনীর প্রতি তার আনুগত্য দেখে। তার ভাষায়- "The demand of some senior for personal loyalty over loyalty to the army and the country."

জহির আলমের প্রমোশন নিয়েও শংকা ছিল। তবে দেরিতে হলেও কর্নেল অব্দি পৌঁছলেন। ফের কমান্ডারের সঙ্গে বিরোধ বাধলে তিনি ঠিক করলেন বদলি চাইবেন। এরি মধ্যে শুনেছিলেন, চট্টগ্রামে সিভিলিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের। কমান্ডিং অফিসারকে বদলি করা হবে। জেনারেল মিঠার কাছে অনুরোধ জানালেন তাকে ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের

কমান্ডার হিসেবে বদলি করার জন্য। তার আবেদন মঞ্জুর করা হলো। তিনি এলেন বাংলাদেশে। সাল ১৯৭০।

মুক্তিযুদ্ধের অনেকটা সময় ছিলেন তিনি বাংলাদেশে। পুংখানুপুংখভাবে সেই সময়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে, অনেক নতুন তথ্য পাই আমরা বিশেষ করে মেজর মান্নান সম্পর্কে যিনি পরে বিএনপির মন্ত্রী ছিলেন। তারপর গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন 'বিকল্প ধারা'।

৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন গঠিত ছিল দুটি কমান্ডো কম্পানিকে নিয়ে। এর ছিল একটি সদর দফতর প্ল্যাটুন। একটি সিগনাল প্ল্যাটুন এবং একটি ফ্রগম্যান প্ল্যাটুন। ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে রুটিন মাফিক কাটাতে হতো । মেজর আব্দুল মান্নান ছিলেন একটি কোম্পানির কমান্ডার।

জহির যখন কুমিল্লা পৌঁছলেন [এখানেই ছিল সদর] তখন শুনলেন বিদায়ী কমান্ডার লে. কর্নেল শামসুল হক চৌধুরী রাঙ্গামাটি এবং চট্টগ্রামে গেছেন। বিদায় নিতে। জহির ও চৌধুরী ছিলেন একই কোর্সের। চৌধুরী জহিরকে বলেছেন চট্টগ্রাম চলে যেতে। চট্টগ্রামে দুই বন্ধু মিলিত হবেন। চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পরিদর্শন শেষে দুজন কুমিল্লায় এসে পৌঁছলেন।

কমান্ড গ্রহণ করার প্রথম দিনই তিনি সমস্যায় পড়লেন। খবর পেলেন, রাঙ্গামাটিতে তার ফ্রগম্যান কোম্পানির হাতে একজন খুন হয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এরকম। ফ্রগম্যান ডিটাচমেন্টের প্রশিক্ষণ চলছিল সরকারি রেস্টহাউসে। রাস্তা থেকে দুজন স্থানীয় প্রশিক্ষণ দেখছিলেন। স্পাই হিসেবে তাদের ধরা হয়। ক্যাপ্টেন খোক্কার ছিলেন চার্জে। পুলিশের কাছে তাদেরকে হস্তান্তর না করে ফ্রগম্যানরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের রেস্টহাউসের ভেতরে নিয়ে উল্টো করে ঝোলানো হয় এবং তাদের নাকের কাছে মরিচ পোড়ানো শুরু হয়। যাতে পোড়া মরিচের ধোঁয়া তারা টেনে নিতে বাধ্য হয়। এ প্রক্রিয়ায় নির্যাতনের সময় একজন মারা যান। তখন জাল দিয়ে মৃতদেহটি মুড়ে কাপ্তাই লেকে নিক্ষেপ করা হয়। পুরো ঘটনাটি রেস্ট হাউসের চৌকিদার প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি রাঙ্গামাটির ডিসিকে জানান। তিনি রিপোর্ট পাঠান সরকারের কাছে। লে. কর্নেল চৌধুরী ইতোমধ্যে বিষয়টি জানতে পেরে রাঙ্গামাটি আসেন। সবকিছু জানার পরও তিনি তা চেপে যান।

বাকি যে জন বেঁচেছিলেন তাকে নিয়ে এসে কুমিল্লায় ফিল্ড ইনটিলিজেন্স ইউনিটে হস্তান্তর করা হয়। প্রথম দিন পরিদর্শনের সময় জহিরের নজরে পড়ে একজন সিভিলিয়ানকে কোয়ার্টারগার্ডে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি এর কারণ জানতে চাইলে সুবাদার তাকে ঘটনাটি জানায়।

ইতোমধ্যে গোয়েন্দারা জহিরের কাছে জানতে চান আটক ব্যক্তির সঙ্গে আরেকজন ছিল সে কোথায়। জহির তখন ১৪ ডিভিশন সদর দফতরে ফোন করে জানান, তিনি ঢাকায় কিছু বিষয় আলোচনা করতে চান যা টেলিফোনে আলোচনা করা সম্ভব নয়। জহির তখন ঢাকায় গিয়ে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে পুরো ঘটনাটি জানান।

কমান্ড গ্রহণের পর জহির দেখা করেন স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সঙ্গে । এস এস জি তার কমান্ডে না থাকায় শফি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ, তারা কুমিল্লায় অবস্থান করছে [অর্থাৎ জহিরের নেতৃত্বাধীন বাহিনী] তিনি জহিরকে নির্দেশ দেন কুমিল্লার সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করার। জহির তাতে রাজি হলেন না এবং জানালেন এসএসজি অফিসারদের সামরিক আইনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

পরে জহির জানলেন লে. কর্নেল চৌধুরী এই দায়িত্ব পালন করতেন। এবং শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে এনে কোয়ার্টার গার্ডে আটকে রেখে সামরিক কর্মকর্তাদের দিয়ে ইন্টারগেট করতেন, ভয় দেখাতেন। এসব কারণে, জহিরের মতে, সৈন্যদের মধ্যে "developed arrogance false sense of superiority in the men." [পৃ. ২৪৬]

জহির এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন । কুমিল্লা সামরিক হাসপাতালে এক সৈন্য গেছে। পরীক্ষার পর তাকে ঔষধ দেয়া হলো। সে ঐ ঔষধ না নিয়ে অন্য ঔষধ চাইল। এবং তা না দেয়াতে ডাক্তারের দেয়া ঔষধ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

হাসপাতালে ঢোকার গেট ছিল দুটি । একটি গেট দিয়ে সরাসরি হাসপাতালে ঢোকা যেত কিন্তু তা তালাবন্ধ করে রাখা হতো। যে গেট দিয়ে ঢুকতে হতো সেটি ছিল দূরে। দুই সৈন্য জিপ নিয়ে কাছের গেটটি ভেঙ্গে হাসপাতালে ঢোকে। জহির ঘটনা দুটি দেখে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

জহির অনুধাবন করেন মার্শাল ল' এর কারণে এবং এসএসজি'র সদস্য হওয়ায় তার বাহিনীর মধ্যে ঔদ্ধত্য এসেছে। তাদের চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে কুমিল্লায় নিয়ে আসা হয়। জহির জানান- তারা যা করছে তা তাদের উন্নত সৈনিকে পরিণত করছে না। তার ভাষায়-" It was for the army and the country to point them out as the best soldiers, as the elite of the army, as commandos, it was not for them to claim being superiors." [পৃ. ২৪৬]

এরপরও এই উৎপাত বন্ধ হয়নি। দু একটি ঘটনা ঘটতেই থাকে যার বিবরণ আছে জহিরের বইয়ে। জহির পূর্ববঙ্গের গ্রামের একটা বর্ণনা দিয়েছেন।

এই বর্ণনায় বোঝা যায় পশ্চিমাদের অনুভূতি ছিল কেমন?

তার বর্ণনা থেকে ইঙ্গিত পাই কেন পাকিস্তানের আজ এই করুণ অবস্থা। এর কারণ, অব্যাহত সামরিক শাসন। তারা পেশাদারী সৈনিক হতে চায় নি, তারা চেয়েছে অস্ত্রধারী হয়ে দেশ শাসন করতে।

নদী-নালায় ভরা পূর্ব পাকিস্তান। বাড়িগুলো মাটি ফেলে উঁচু করা জমির ওপর। সবচেয়ে উঁচু হচ্ছে রেলওয়ের জন্য তৈরি বাঁধ। বাড়িগুলো বাঁশ, কাঠ, খড়ের তৈরি। সরকারি সব স্থাপনায়, কবে তার নির্মাণ শুরু বা শেষ হয়েছে তার তারিখ দেয়া আছে। সব তারিখই ১৯৫৮ সালের পর।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচণ্ড গরমেও চাষিকে দেখা যাবে মাঠে কাজ করছে। এখানে সে রকমটি নয়। পাঁচ কোটির মধ্যে খুব কম মানুষই দৃশ্যমান। আবহাওয়ার কারণে খুব সম্ভব এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ দেরিতে ওঠে ১০/১১ টার আগে কাউকে দেখা যায় না। গ্রামে দোকানপাট নেই, সপ্তাহান্তে হাট বসে। সূর্যাস্তের পর গ্রামের কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে কোরআন পড়ার ধ্বনি কানে বাজে।

এ বর্ণনা পুরোটা সঠিক বলা যাবে না । ১৯৫৮ সালের পর সরকারি স্থাপনা নির্মাণের গতি বেড়েছে এটি অস্বীকার করা যাবে না । এতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়া আছে সেনা শাসনই উন্নতির চাবিকাঠি। এখানকার মানুষ খুব ভোরে ক্ষেতে যায়, রোদ উঠলে বিশ্রাম নেয়, আবার ক্ষেতে যায়। এ রুটিনের সঙ্গে জহির তেমন পরিচিত ছিলেন না বলে মনে হয়। সে সময় মানুষ খুব রাতেও ঘুমোতে যেত না। রাস্তায় হাঁটলে কোরানের ধ্বনি শোনা যায়। জহির ১৯৭১ সালে এখানে ছিলেন। তখন এই কোরান পড়া মানুষগুলোকে কেন খুন করা হলো তার কোনো উত্তর তিনি রেখে যাননি। তবে ঐ অনুচ্ছেদের দুটি বাক্য গুরুত্বপূর্ণ। লিখেছেন তিনি, কোনো গ্রামের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে বা গ্রামে গেলে একটা অনুভূতি হয় যে তুমি বিদেশে আছ, তুমি কাউকে বোঝ না, তোমাকে কেউ বোঝে না। তার ভাষায়– “While walking through a village or in a ‘haat’ the feeling was that you were in a foreign country, you could understand nobody and nobody understand you.” [পৃ. ২৪৯]

পশ্চিমারা যে এ অঞ্চলে আর পছন্দীয় নয় অকপটে তা স্বীকার করেছেন জহির । লিখেছেন তিনি, কুমিল্লায় কেনাকাটা করতে যেয়ে তারা বুঝলেন যে, কেউ তাদের পছন্দ করছে না। কোনো দোকানে গেলে কাউন্টারে দাঁড়ানো ব্যক্তি বা সেলসম্যান সরে যেত। ডাকাডাকি করলে আসত এবং এলেও বাংলায় কথা বলত যা আমরা বুঝতাম না। ধারণা করতাম, দোকানদার উর্দু কিছু কিছু

বুঝত। অধিকাংশ সময় কেনাকাটায় ক্ষান্ত দিয়ে তাদের ফিরতে হতো । রেলওয়ে স্টেশনের মতো জায়গায় কর্মচারীরা একমাত্র বাংলায় বলত এবং তা প্রায়ই ঝগড়ায় রূপ নিত । জহিরের কাছে কখনও মনে হয়নি তাদের বাংলা জানাটাও জরুরি ছিল। কিন্তু তারা ধরেই নিয়েছে যে, হয় বাঙালিরা উর্দু জানবে এবং বলবে। তবে তিনি সঠিক মন্তব্যই করেছেন এ বলে যে, "Language was the great divide".

পূর্ববঙ্গের বর্ণনা দিচ্ছেন জহির, বাস্তব পরিস্থিতিও তুলে ধরছেন কিন্তু সেই পূর্ব ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না। সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে কাজ করার সময় কিছু অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন । তাতে এর ইঙ্গিত পাই।

বন্যার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গম এসেছে বিলি বন্দোবস্তের জন্য। পরিবারের আকার দেখে গম বিলি হবে। জহির গেছেন গম বিতরণ পরিদর্শন করতে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছে। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন গম নেয়ার পর লোকজন গ্রামের অন্য প্রান্তে যাবার জন্য হাঁটছে। কৌতূহলী হয়ে তিনিও হাঁটা শুরু করলেন। এবং কী দেখলেন? দেখলেন, এক হিন্দু বানিয়া দোকান সাজিয়ে বসে গম কিনছে। গম নিয়ে গম বিক্রি করে দেয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু "বানিয়া" হিন্দুই হবে, মুসলমান নয়। কারণ, হিন্দুরাই শোষণ করছে।

জহির লক্ষ্য করেছেন কুমিল্লার ডিসি এসপিও তাকে এড়িয়ে চলেন। তাদের সবসময় ডেকে পাঠাতে হতো। তাকে অবাক করেছে যা তা হলো সামান্য কিছু কর্মচারী জেলায় ছড়ানো ছিটানো এক লক্ষ লোকের দেখাশোনা করত।

রাজনীতিবিদদের প্রতি তাদের মনোভাব দেখা যাক। জহির এ পর্যন্ত বর্ণনা যত নিরপেক্ষভাবে দেয়ারই চেষ্টা করুন না কেন এই পর্যায়ে এসে তার খাঁটি সামরিক মন পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি লিখেছেন, মার্শাল ল'র কাজ করার সময় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু "none of them impressed me"। কমিউনিস্ট পার্টির একজনের সঙ্গে কমিউনিজম সম্পর্কে আলোচনার পর মনে হলো, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং "could not explain what he represented."

নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলো। ছুটির পর বাঙালি সৈন্য যারা ব্যাটালিয়নে ফিরে আসছিল তাদের কাছ থেকে জানা গেল, আওয়ামী লীগ পেশির ওপর নির্ভর করবে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। (পৃ. ২৫৩) এ মন্তব্যটি সব সামরিক অফিসারই করেছেন।

ঢাকায় তার সঙ্গে গোয়েন্দা দফতরের লে. কর্নেল রিয়াজ শেখের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি জানালেন মুজিব ৩৭% আসন জিতবেন, ভাসানীও প্রায় কাছাকাছি থাকবেন আর বাকি ২৫ ভাগ অন্যান্য ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। গোয়েন্দা দফতরের এ ধরনের ধারণা একমাত্র পাকিস্তানি বাহিনীতে ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আমলেও আমরা তা দেখতে পাই। অর্থাৎ, গোয়েন্দা দফতরগুলো প্রায় ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা নয় নিজেদের অবস্থানের পক্ষে রিপোর্ট দেয় ও শাসকদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা এর প্রমাণ।

মিজোদের যে পাকিস্তানিরা সাহায্য করত তা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন জহির। মিজোদের থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করেছিল পাকিস্তান সরকার। রাঙ্গামাটির ডিসি নিত্য অভিযোগ করতেন মিজোদের বিরুদ্ধে এ বলে যে, এরা শৃঙ্খলা মানে না, নিয়ত বন্যপ্রাণী ও বন ধ্বংস করছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বললে জহির বিষয়টি তদন্ত করে জানলেন, যতটা বলা হয়েছে ততটা ক্ষতি তারা করেনি। মিজোদের অভিযোগ ডিসি তাদের খাবার আটকে রেখেছেন। তিনি চান, তারা যেন ভারতে ফিরে যায়।

সাইক্লোনের পরের অবস্থা তিনি উল্লেখ করেছেন । এ বর্ণনাও অন্যান্য জেনারেলদের মতো । তার মতে, ত্রাণ কাজে যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তারা ত্রাণ বিষয়ে ছিল উদাস। 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড প্রেসের' কারসাজিও তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে তারা আসতেন। খবর পেয়ে হেলিপ্যাডে ক্ষুধার্ত, জীর্ণশীর্ণ পুরুষ, মহিলা, শিশুদের জড়ো করা হতো । রিপোর্টাররা তাদের পছন্দ মতো 'মডেল' বেছে নিয়ে ছবি তুলত পয়সা দিয়ে। একইভাবে লাশ ভাসছে এমন কিছু জায়গা নির্বাচন করে রাখা হতো ছবি তোলার জন্য। ত্রাণের সামগ্রী এখানে বেচা কেনা চলত ।

এ সবই যে সর্বৈব মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামরিক শাসন চলছে সেনাবাহিনী ক্ষমতায়, ত্রাণ কাজ চালানোর দায়িত্বও তারা নিয়েছে। তারা যখন বাঙালি অফিসারদের দেখছে কাজ করছে না তখন ব্যবস্থা নেয়নি কেন ? ছবি তোলার মডেল নির্বাচনে বাধা দেয়নি কেন? বা মরদেহ দেখাবার যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা বন্ধ করেনি কেন? প্রকাশ্যে ত্রাণ সামগ্রী বেচাকেনা হলো আর তারা চোখ বুজে থাকলো এ কেমন কথা?

জহিরের মতে, সেনাবাহিনীর সবাই শুধু প্রশাসনেই খেটেছে দিনরাত, কিন্তু প্রচার পায়নি। এর জন্য সরকারি অব্যবস্থাপনা দায়ী।

আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে বোঝা যায় সেনাবাহিনীতে তখনই দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। তার একসময়ের অ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন আলম বদলি হয়েছে ইপিআরে। আলমের সঙ্গে দেখা হতে তিনি আলমকে জানালেন, আলম ভাগ্যবান যে ইপিআরে তার চাকরি হয়েছে। আলম জানাল এ জন্য তাকে ৫০০০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। পরবর্তীকালে সস্ত্রীক আলমকে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনীর এই ঘুষ লেনদেন সম্পর্কে জহির কিন্তু কোনো মন্তব্যই করেননি।

ডিসেম্বরে নির্বাচন হলো। ভাসানী নির্বাচনে গেলেন না। মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী জহিরকে জানালেন যে , ইয়াহিয়া খান তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে রাখায় তারা কোনো কিছুই করতে পারছেন না। জহিরের ভাষায়–

"The Awami League with its strong arm suppressed [শব্দ তিনটি লক্ষ্য করুন] all other parties and won 167 seats out of 169." [পৃ. ২৫৮]

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৪ ডিভিশনের দফতর প্রধান ব্রিগেডিয়ার শফি ও জহিরকে ডেকে পাঠালেন ব্রিফিংয়ের জন্য। তাদের জানানো হলো, ৩ তারিখ সংসদ অধিবেশন হবে না। এ ঘোষণা আসবে ১ তারিখ । ফলে, প্রবল প্রতিক্রিয়া হবে। ১০০ জনের একটি তালিকা দেখানো হলো যাদের গ্রেফতার করা হবে। ব্রিফিংয়ের পর তাদেরকে কুমিল্লা যেয়ে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হলো।

৫২

২৩ মার্চ দুপুরে ঢাকা থেকে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে একটি সি-১৩০ বিমান অবতরণ করল কুমিল্লা বিমান বন্দরে। দেশজুড়ে হরতাল। সৈন্যদের জন্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছে বিমানটি। জহির এই প্লেনে ঢাকা যাবেন। তাকে সদর দফতরে তলব করা হয়েছে।

বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে দেখলেন, একটি ন্যাংটো বালক দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে। জহিরের গাড়ি দেখে চিৎকার করে বলে উঠল–জয় বাংলা। জহিরের ছোট কন্যাটিও সময় সময় চিৎকার করে বলে ওঠে 'জয় বাংলা'। আর তার বড় বোন তখন তাকে থামাতে ছোটে।

২৩ তারিখ পাকিস্তান দিবস। ঢাকায় অবতরণের আগে শূন্য থেকে দেখলেন সব বাড়ির ছাদে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। মেজর বিল্লাল তাকে

নিতে এসেছিলেন বিমান বন্দরে। জানালেন, মহম্মদপুরে এক বিহারির বাসার ছাদে মাত্র উড়ছে পাকিস্তানের পতাকা । জহিরকে বিল্লাল নিয়ে গেলেন কর্নেল এস ডি আহমদের কাছে । তিনি জানালেন ২৪ অথবা ২৫ তারিখে গ্রেফতার করতে হবে শেখ মুজিবকে। তাঁকে গ্রেফতারের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে জহিরকে। রেকি করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজারের কাছ থেকে দুটি গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ি দুটিও থাকবে জহিরের কাছে।

সেদিন বিকেলে রেকি করার জন্য মেজর বিল্লাল ও ক্যাপ্টেন হুমায়ুনকে নিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নং এ পৌছালেন । বাড়ির সামনে ভিড়। তার মধ্যে দেখলেন একদল হিন্দু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। একদল মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা হিন্দু না মুসলমান তা জহির কীভাবে বুঝলেন তা জানাননি। এ বাক্যটি লেখার অর্থ, পাঠকের মনে এ ধারণার সৃষ্টি করা, পাকিস্তান ভাঙ্গার পিছে হিন্দুদের প্ররোচনা বেশি। এবং এতে প্রণোদনা যুগিয়েছিল 'হিন্দু' ভারত।

২৪ মার্চ জহিরকে বলা হয়েছিল সকাল এগারোটায় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফরমান সেখানে তাকে ফর্মালি শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেবেন। জহির জেনারেলের অফিসে গেলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, ২৫ তারিখ রাতে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য। নির্দেশ শুনে স্যালুট করে যখন তিনি বেরুচ্ছেন তখন ফরমান তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি জানতে চাও না কিভাবে তাকে গ্রেফতার করতে হবে?' জহির জানালেন, অর্ডার শোনার পর রীতিটা হচ্ছে প্রশ্ন না করা। অর্ডার পালন করা। কিন্তু তার যদি আরো কিছু নির্দেশ থাকে তবে তিনি তা বলতে পারেন। ফরমান বললেন, 'একজন অফিসার নিয়ে সিভিলিয়ান একটি গাড়িতে যেয়ে তাকে এই গ্রেফতার পর্ব সারতে হবে।' জহির জানালেন– শেখ সাহেবের বাসার সামনে যে রকম ভিড় থাকে তাতে ঐ প্রক্রিয়ায় তাকে গ্রেফতার করা যাবে না। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করতে হলে এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে যেতে হবে। ফরমান বললেন, তিনি তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তা পালনের জন্য। জহির বললেন, সে নির্দেশ তিনি গ্রহণ করছেন না, জেনারেল অন্য কাউকে সে নির্দেশ দিতে পারেন। তারপর ফরমান কিছু বলার আগেই স্যালুট করে তিনি চলে গেলেন।

জহির পরে অনুধাবন করলেন, তার এই ব্যবহারের জন্য তিনি ঝামেলায় পড়তে পারেন। সারাদিন তাই এমন সব জায়গায় রইলেন যেন তাকে কেউ যোগাযোগ করতে না পারে। পরদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোয়ার্টার মাস্টার

জেনারেল, মেজর জেনারেল এম ও মিঠার আসার কথা। মিঠা আবার জহিরের শুভানুধ্যায়ী। বিকেল পাঁচটায় মিঠা পৌঁছলেন বিমান বন্দরে। জহির সেখানে তার সঙ্গে দেখা করে সব জানালেন। জেনারেল জানালেন ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে তার সঙ্গে সকাল ৯ টায় দেখা করার জন্য।

সকাল ৯ টায় জহির গেলেন ইস্টার্ন কমান্ডের জি এস কর্নেল আকবরের অফিসে। সেখানে ঢুকে দেখেন , ফরমান আলী বসে আছেন। জহিরকে দেখে ফরমান জিজ্ঞেস করলেন, তিনি এখানে কেন এসেছেন? জহির বললেন, মেজর জেনারেল মিঠার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কর্নেল আকবরকে ফরমান নির্দেশ দিলেন ১৫ মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টার যোগাড় করে জহিরকে যেন কুমিল্লায় ফেরৎ পাঠানো হয়। জহির আকবরকে জিজ্ঞেস করলেন, জেনারেল মিঠা এখানে আসবেন কিনা। আকবর জানালেন, মিঠা এখন লে. জে. টিক্কাখানের সাথে কথা বলছেন। জহির তখন এমনভাবে বসলেন, যাতে টিক্কা খানের অফিসের দরজা খোলার সাথে সাথে তিনি দেখতে পারেন। অস্বস্তিকর ১৫ মিনিটের পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিঠা। ছুটে গিয়ে মিঠার সামনে পৌঁছে ঘটনা জানালেন তাকে। মিঠা নিজের গাড়িতে ওঠার সময় জহিরকে গাড়িতে তুলে নিলেন। মিঠা যাচ্ছেন জেনারেল আবদুল হামিদ খানের সঙ্গে দেখা করতে। হামিদ তখন ঢাকায়।

জেনারেল হামিদ যে বাংলোতে উঠেছিলেন গাড়ি সেখানে পৌঁছাল। জহির ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক ঘণ্টা পর তার ডাক পড়ল, ভেতরে। মিঠা জহিরকে বললেন, পুরো ঘটনাটা হামিদকে জানাতে। সব শুনে হামিদ ফরমান আলীকে ফোন করে জানালেন, জহিরকে তিনি পাঠাচ্ছেন এবং তার যা প্রয়োজন ফরমান যেন তার ব্যবস্থা করেন । তারপর জেনারেল হামিদ জহিরকে বললেন, শেখ মুজিবকে জ্যান্ত ধরতে হবে। জহির যখন বেরুচ্ছেন তখন হামিদ তাকে আবার বললেন, "remember he is to be taken alive and I will hold you personally responsible if he is killed." [পৃ. ২৬৪]

জহির এরপর গেলেন ফরমান আলীর অফিসে। ফরমান তাকে জিজ্ঞেস করলেন কী কী তার প্রয়োজন। জহির বললেন, 'ট্রুপস নেয়ার জন্য তিনটি গাড়ি এবং বাড়ির লে আউট।' ফরমানের কাছে লে আউট ছিল, তা জহিরকে দিলেন। আশ্বাস দিলেন গাড়িও পৌঁছে যাবে। তারপর জহির বললেন, মুজিবের বাসার পিছে জাপানি কনসাল জেনারেলের বাসা। তিনি যদি সেখানে আশ্রয়

নেন তখন কী হবে? ফরমান বললেন, বুঝে সুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।

শেখ মুজিবের বাড়ি ও সেখানে যাবার রাস্তার একটি মডেল তৈরি করা হলো। অস্ত্র বিলি হলো। রাতের খাবারের পর মডেল সামনে রেখে জহির ব্রিফ করলেন। তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হলো কোম্পানিকে। ২৫ জনের এক গ্রুপে নেতৃত্বে থাকবেন ক্যাপ্টেন সাইদ। তার কাজ শেখ সাহেবের বাসার অভিমুখে যত রাস্তা তা বন্ধ করা বিশেষ করে জাপানি কনসালের বাসায় যাতে কেউ ঢুকতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা। ২৫ জনের দ্বিতীয় গ্রুপের নেতৃত্বে থাকবেন ক্যাপ্টেন হুমায়ুন। তারা শেখ মুজিবের বাসা ঘেরাও করে বাসায় ঢুকবেন। ১২ জনের তৃতীয় গ্রুপের নেতৃত্বে থাকবেন মেজর বিল্লাল। তিনি মুজিবের বাসার প্রতি তলা তল্লাশী করবেন।

ঠিক হলো রাত ১২ টায় অভিযান শুরু হবে। ১০ টার সময় ক্যাপ্টেন হুমায়ুন এসে রিপোর্ট করলেন। রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হচ্ছে। জহির তাকে বললেন দুটি রকেট ও রকেট লাঞ্চার নিয়ে নিতে। ১১ টার সময় তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে এম এন এ হোস্টেলের পাশ দিয়ে মোহাম্মদপুরের দিকে জহিরের নেতৃত্বে কনভয়ের যাত্রা শুরু হলো। কয়েকমিনিট পর দেখা গেল, প্রতিরোধকারীরা রাস্তা বন্ধের জন্য যে ক'টি গাড়ি এনে রেখেছিল রাস্তার মাঝে সেগুলো জ্বলছে, প্রতিরোধকারীরা পালিয়েছে। অনেক কষ্টে রোড ব্লক উঠিয়ে ২০০ গজ এগোনোর পর আরেকটি রোড ব্লক চোখে পড়ল। পাইপ দিয়ে রাস্তা আটকানো হয়েছে। ট্রাক চালাবার মতো জায়গা করে রোড ব্লক সরানো হলো।

শেখ মুজিবের বাড়ির সামনে এসে পরিকল্পনা মতো ব্যূহ তৈরি করে সৈন্যরা ঢুকল। গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়া হলো। বাড়ির কম্পাউন্ডে থাকা কিছু লোক গেট খুলে পালাতে লাগল। নিহত হলো একজন। বাড়ির বাইরে তাঁবু খাটিয়ে যে সব পুলিশরা পাহারা দিচ্ছিল তারা তাঁবুসহ লেকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চারদিকে ঘন অন্ধকার।

সার্চপার্টি ঘরে ঢুকল। বাড়ির একজন গার্ডকে এক সৈন্য বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। খানিকটা যেতেই সেই গার্ড একটি দা বের করে সৈন্যটিকে আক্রমণ করল। সে জানত না পেছনে কভার দিচ্ছে আরেকজন। গার্ডকে গুলি করা হলো কিন্তু হত্যা করা হয়নি।

নিচতলায় কাউকে পাওয়া গেল না। দোতলায় রুমগুলি খোলা, কেউ নেই। একটি রুমের ভেতর থেকে আটকানো । জহির উপরে উঠলে একজন জানাল বন্ধ ঘরের ভেতর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। মেজর বিল্লালকে জহির

নির্দেশ দিলেন দরজা ভাঙ্গতে এবং নিজে নিচে নেমে গেলেন ক্যাপ্টেন সাইদ এসেছে কিনা বা মানুষজন ভিড় করছে কিনা দেখতে।

নিচে নেমে দেখলেন সাইদ এসেছে। একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবমেশিনগানের গুলির আওয়াজ পেলেন। জহিরের মনে হলো কেউ বোধহয় শেখ মুজিবকে মেরে ফেলেছে। তিনি ছুটলেন ওপরে। দেখলেন যে দরজাটি বন্ধ তার সামনে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব। জহির মুজিবকে বললেন, তার সাথে যেতে হবে। শেখ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার পরিজন থেকে তিনি বিদায় নিতে পারেন কিনা। জহির বললেন, অবশ্যই। শেখ মুজিব ভেতরে গিয়ে বিদায় নিলেন। জহির রেডিও মারফত জানালেন, শেখ মুজিবকে তারা পেয়েছেন।

গাড়িতে ওঠার আগে শেখ মুজিব বললেন, তিনি পাইপ ফেলে এসেছেন। জহির তার সঙ্গে ওপরে গেলেন। জহিরের মতে, শেখ সাহেব ইতোমধ্যে বুঝে ফেলেছেন তাকে হত্যা করা হবে না। জহিরকে তিনি বললেন, এত ঝামেলার দরকার ছিল না। তাকে বললেই তিনি চলে আসতেন। জহির জানালেন, তারা দেখাতে চেয়েছেন যে শেখ মুজিবকে তারা গ্রেফতার করতে পারেন। শেখ মুজিবকে বহরের সাথে একটি গাড়িতে রাখা হলো। গাড়ি চলল ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

পরে জহির জেনেছেন তিনি যখন নিচে ছিলেন তখন দরজা ভাঙ্গার আওয়াজ করা হয় এবং একজন একটি গুলি করে। শব্দটা এসেছিল বারান্দা থেকে। কেউ কিছু বলার আগে তখন এক সৈন্য বারান্দায় একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে ও আরেকজন মেশিনগান চালায়। শেখ মুজিব ভেতর থেকে বলে ওঠেন, তাঁর কোনো ক্ষতি করা না হলে তিনি বেরিয়ে আসবেন। তাঁকে আশ্বাস দেয়া হলো। তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন হাবিলদার খান ওয়াজির তাঁকে সজোরে একটি চড় মারে।

জহিরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য। কিন্তু কোথায় নিয়ে কার কাছে হস্তান্তর করতে হবে সে সবের কিছু জানানো হয়নি। জহির নিজের বুঝ অনুসারে তাকে সংসদ ভবনে নিয়ে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন তাকে সেখানে আটকে রেখে পরবর্তী নির্দেশ জানতে যাবেন। সংসদ ভবনের সামনে জিপ থামিয়ে একটি সিঁড়ি খুলে ল্যান্ডিং এ শেখ সাহেবকে বসালেন। এ সময় ফার্মগেট থেকে প্রচুর মানুষের গোলযোগের আওয়াজ পেলেন। তারা ভাবলেন লোকজন বোধহয় সংসদ ভবনের দিকে আসছেন। তারা প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই শব্দ মিলিয়ে গেল। পরে

জেনেছিলেন, ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য আওয়ামী লীগ কিছু লোক জড়ো করেছিল, ফার্মগেটে তারাই ছিল। পরে দলবেঁধে তারা পালিয়ে যায়।

সংসদ ভবন থেকে জহির গেলেন সামরিক আইন প্রশাসকের দফতরে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন টিক্কা খান। ব্রিগেডিয়ার জিলানী ছিলেন সেখানে, তিনি তখন ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করছেন। জিলানীকে জহির জানালেন শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে তিনি সংসদ ভবনে রেখে এসেছেন। টিক্কা খান শান্তভাবে বসেছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন গ্রেফতারের। ফর্মালি তিনি তা জানতে চাচ্ছিলেন। জহির তামাশা করার জন্য তাকে বললেন, তিনি একজনকে গ্রেফতার করেছেন। মনে হচ্ছে তিনি মুজিব কিন্তু নিশ্চিত নন। এ কথা শুনে টিক্কা খান লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জিলানী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি জহিরের কথা শুনে টিক্কা খানকে আশ্বস্ত করে বললেন, তিনি খবর নিচ্ছেন। কর্নেল এস ডি আহমেদকে তিনি পাঠালেন সংসদ ভবনে, খবর নিয়ে আসার জন্য। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি আসল নাকি নকল মুজিব।

জহির বাইরে এসে সিগারেট ধরালেন। সদর দরজার সীমানায় একজন সৈনিক লাইট মেশিনগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। সে কিছু দেখতে পেয়ে নাকি অজান্তে ট্রিগারে চাপ দিল। গুলির শব্দ। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে যত অস্ত্র ছিল সবগুলি থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান থেকে ট্রেসার ছোঁড়া হতে লাগল। কয়েকমিনিট পর আচমকা আবার সব থেমে গেল।

কর্নেল এস ডি আহমেদ মিনিট বিশেক পর ফিরে জানালেন, আসল মুজিবকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কী করা হবে তখনও সে বিষয়ে স্পষ্ট কেউ কিছু বলতে পারছিল না। পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় তাকে ক্যান্টনমেন্ট যে কক্ষে রাখা হয়েছিল সেখানেই রাখা হবে। ১৪ ডিভিশনের অফিসার্স মেসে একটি বেডরুমে শেখ মুজিবকে রাখা হলো। প্রহরী রাখা হলো একজন। পরেরদিন জেনারেল মিঠা জহিরকে জিজ্ঞেস করলেন, শেখ মুজিবকে কোথায় রাখা হয়েছে। জহির জানালেন। ক্ষুব্ধ হলেন মিঠা । বললেন, অবস্থা সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা নেই মনে হচ্ছে। কারণ, যে কোনো সময় তাকে মুক্ত করার চেষ্টা হতে পারে। পরে, মিঠা একটি স্কুল বিল্ডিংয়ের তিনতলায় শেখ মুজিবকে স্থানান্তর করেন।

৫৩

২৬ মার্চ সকাল আটটায় জেনারেল মিঠা টেলিফোনে জহিরকে নির্দেশ দিলেন হেলিপ্যাডে রিপোর্ট করতে। এর আগের দিন, মিঠা জানালেন জহিরকে, ৫৩ ব্রিগেড ও ২৪ এফ এফ কে চট্টগ্রামে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন। ৫৩ ব্রিগেডের সাথেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। জেনারেল মিঠা দুটি এম আই ৮ হেলিকপ্টার নিয়ে রওয়ানা হচ্ছেন। মাঝে কুমিল্লায় থেমে জহিরের ব্যাটালিয়ন থেকে দুই প্ল্যাটুন সৈন্য তুলে নেবেন।

কুমিল্লায় ৫৩ ব্রিগেডের সদর দফতরের পাশে হেলিকপ্টার নামল। ব্রিগেড দফতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। একজন বাঙালি অফিসার যিনি আই এস এসের দায়িত্বে ছিলেন মিঠাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সদর দফতরে নিয়ে গেলেন। ব্রিগেড মেজর সুলতান সেখানে ছিলেন। মিঠা তাকে বকাঝকা করলেন। একজোড়া হেলিকপ্টার নামছে কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই এ কেমন কথা। জহির তার অ্যাডজুট্যান্টকে ইতোমধ্যে ফোন করে বলে দিয়েছিলেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ৬০ জন সৈন্যকে তৈরি রাখতে। সঙ্গে যাবেন বাঙালি এক মেজর নাম মান্নান। এই মান্নান হচ্ছেন বিএনপির প্রাক্তন সাংসদ বর্তমানে বিকল্প ধারার সাধারণ সম্পাদক।

হেলিকপ্টার নামল নতুন পাড়া ক্যান্টনমেন্টে। ২০ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল ফাতমী মিঠার কাছে রিপোর্ট করলেন। জানালেন তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বন্দরে যেতে। সেখানে নোঙ্গর করেছে এম ভি সোয়াত। তাতে ১০৫ মিমি-র গুলিগালা আছে। ডক শ্রমিকরা যেহেতু ধর্মঘট করেছে তাই সৈন্যদের অস্ত্র খালাস করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সবেমাত্র পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন থেকে এক কোম্পানি সৈন্য এসেছে। তাদের সিলেট যাবার কথা । কিন্তু রাত তিনটা থেকে তাদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে।

২০ বালুচ যখন ইস্ট বেঙ্গল সেন্টার লাইন পার হচ্ছিল তখন টিলা থেকে তাদের ওপর গুলি ছোড়া হয়। সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডান্ট কর্নেল শিগরি এসে যোগ দিলেন। পরনে রাত পোশাক। মিঠা সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দেখে ফাতমীকে বললেন, তিনি নৌ দফতরে যাচ্ছেন। হেলিকপ্টার নামল নেভাল বেসে। দেখা হলো পূর্ব পাকিস্তানে নেভির প্রধান কমোডর আর এ মুমতাজের সঙ্গে। তিনি জানালেন, নৌ দফতর তার নিয়ন্ত্রণে তবে বন্দর এলাকায় কী ঘটছে তার জানা নেই। চট্টগ্রাম বিমান বন্দর পাহারা দিচ্ছে তার সৈন্যরা।

জেনারেল মিঠা জহিরের এক প্ল্যাটুনকে পাঠালেন বিমান বন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিতে। মেজর মান্নানকে রাখা হলো নৌ দফতরে।

এরপর একটি হেলিকপ্টারে নতুনপাড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে অনেককে 'ইভাকুয়েট' করা হলো যার মধ্যে মিসেস মজুমদারও ছিলেন । তাদের ঢাকা পাঠানো হলো। আরেকটি সন্ধ্যের আগেই মিঠা ও জহির ফিরলেন ঢাকায়।

এরপর জহির ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের কাহিনী শুনিয়েছেন। তাকে কেন ঢাকা নিয়ে এসে গ্রেফতার করা হয়েছিল এখনো অনেকের তা জানা নেই। জহির সেটি বর্ণনা করেছেন।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার পাকিস্তানের দ্বিতীয় ব্যাচের। তাকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট থেকে বদলি করে পাঠানো হয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার কমান্ড করার জন্য। ২৫ মার্চের আগে একজন অবাঙালি লে. কর্নেল গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সাথে তার অফিসে দেখা করতে। ব্রিগেডিয়ার অফিসে ছিলেন না । লে. কর্নেল দেখলেন তার টেবিলে একটি সিগন্যাল মেসেজ পরে আছে। তিনি সেটি পড়লেন। জয়দেবপুর থেকে (৪র্থ পি এম এ কোর্সের) দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লে. কর্নেল মাসুদুল হাসান পাঠিয়েছেন মেসেজটি। তিনি জানতে চেয়েছেন যদি কোনো অঘটন ঘটে তখন তার কর্তব্য কী হবে? লে. কর্নেল সেটি পকেটে পুরে বেরিয়ে এলেন ও ঢাকায় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা চট্টগ্রাম পরিদর্শনে গেলেন। মজুমদারকে জানালেন তার সঙ্গে ঢাকা গিয়ে জয়দেবপুর পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে রাজা নিয়ে এসেছিলেন। তারপর মজুমদার লাপাত্তা হয়ে যান। হেলিকপ্টারে মিসেস মজুমদারকে ঢাকা নিয়ে আসা হলো। তিনি বিমান বন্দর থেকে সোজা মজুমদার যেখানে ছিলেন সেখানে গেলেন। তাকে অনুসরণ করছিল গোয়েন্দারা। তাদের দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। লে. কর্নেল মাসুদুলকে আটক করা হয়।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এবং তার স্ত্রীকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হলো। ১৬ আর্মার্ড ডিভিশনের হেফাজতে তাদের পাঠানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল খারিয়ান ও সরাই আলমগীরের মাঝামাঝি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে বান্নিতে একটি বাড়িতে তাদের রাখা হবে। ১৬ আর্মার্ড ডিভিশনের প্রধান কর্নেল আগা জাভেদ ইকবালকে বলা হয়েছিল মজুমদার দম্পতিকে যেন ভালোভাবে তল্লাশী করা হয়। ইকবাল বিমান অবতরণের পর তাদের তল্লাশী করেন। মিসেস মজুমদারের হ্যান্ডব্যাগে তিনি একটি পিস্তল পান। ব্যাগে এই পিস্তলটি

সবসময় ছিল। এর সাহায্যে তারা প্লেনটিও হাইজ্যাক করতে পারতেন কিন্তু কেন করেননি তা তারাই জানেন। জহিরের ভাষায়, "Why she or her husband did not hijack the air craft bringing them to West Pakistan is anybody's guess." [পৃ. ২৭৫]

জহির লিখেছেন, ২০ বালুচ ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্টাল সেন্টার দখল করার পর তিনি গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায়। একটি কক্ষকে বলা যেতে পারে অপারেশন রুম। সেই কক্ষের দেয়ালে পুরো পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। কোথায় কোথায় ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন, ইপিআর, পুলিশ প্রভৃতি মোতায়েন তা চিহ্নিত করা। দেখে মনে হচ্ছিল মজুমদারের কথা ছিল সম্পূর্ণ ইপিআর বা বাঙালি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার। তাঁর ভাষায়, "an obvious command headquarters of all the Bengali troops in East Pakistan and Brigadier was to control them." [পৃ. ২৭৫]

রাতে তার বন্ধুর সঙ্গে খাওয়ার পর তারা রেডিও শুনছেন। এমন সময় খুব সম্ভব কলকাতা বেতার থেকে শুনলেন, শেখ মুজিব নিরাপদে ভারতে পৌঁছেছেন এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং নিজেকে কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

পরদিন তিনি আবার মিঠার সঙ্গে চাঁটগা গেলেন। ঐ দিনের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তারপর দিন (২৮ মার্চ) সি-১৩০ এলো চট্টগ্রামে। জহির নিহত ও আহত সৈন্যদের প্লেনে উঠিয়ে দিলেন কারণ চাঁটগায় তখনও যুদ্ধ চলছে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত । নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। নিহতের এই সংখ্যা ক্যান্টনমেন্ট ও এয়ারপোর্টে সবাইকে হতচকিত করে দিল। জহির পরে খবর পেলেন নিহতদের ঢাকায়-ই কবর দেয়া হয়েছে। কারণ ঢাকায় মৃতদেহ পাঠানোয় মনোবলের ওপর আঘাত এসেছে। জহিরের বন্ধু লে. কর্নেল সোলায়মান যিনি মাত্র দু'তিন দিন হলো এসেছে নিহত হওয়ায় জহিরকে ২ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব দেয়া হলো । [ঘটনাটি ২৮ মার্চের]

জেনারেল মিঠা ঢাকা থেকে জহিরকে নির্দেশ পাঠালেন বেতারের ট্রান্সমিটার ধ্বংসের। কিন্তু ট্রান্সমিটার কোথায় তা কারো জানা নেই। হঠাৎ চট্টগ্রামের একটি টেলিফোন ডাইরেক্টরি পেলেন। সেখান থেকে জানতে পারলেন ট্রান্সমিটারটি কালুরঘাটে। নেভিকে বলা হলো 'রেইডিং পার্টি' পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে মেজর মান্নান সিনিয়র

হওয়ায় তাকে দায়িত্ব দেয়া হলো ট্রান্সমিটার ধ্বংসের। জহির তাকে বললেন, কমিশন নেয়ার তিনি শপথ নিয়েছিলেন, এখন তার সেই শপথ পরিপূরণের সময় এসেছে। রাত ন'টার দিকে মেজর মান্নানের নেতৃত্বে 'রেইডিং পার্টি' রওয়ানা হলো। [২৮ মার্চ]

হানাদাররা তীরে পৌঁছে মেজর মান্নানের নেতৃত্বে অগ্রসর হলো। পথে একটি বিদ্রোহী পেট্রোলের সঙ্গে দেখা। মেজর মান্নান তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। যার সঙ্গে কথা বলছিলেন তার হাতে একটি স্টেনগান। আলোচনার সময় মান্নান স্টেনগানটি কেড়ে নিতে উদ্যত হন। বিদ্রোহী গুলি করে, মান্নানের হাতের তালু ভেদ করে গুলি বেরিয়ে যায়। অসাবধানতাবশত হানাদারের একটি রকেট লঞ্চার থেকে রকেট বেরিয়ে পড়ে হানাদারদের আরেকটি গ্রুপের মাঝে। অনেকে আহত হয়। হানাদার অফিসাররা আলোচনা করে ঠিক করেন একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ আগে গড়ে তুলতে হবে। আর মেজর মান্নান ক্যান্টনমেন্টে ফিরে সাহায্য আনবেন।

কাপ্তাই-চট্টগ্রাম রোড ধরে মেজর মান্নান দৌড়ে-হেঁটে ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছলেন। মান্নানের কাছ থেকে ট্রান্সমিটারের যথাযথ খবর পেয়ে বিমান আক্রমণের সিদ্ধান্ত হলো। [২৮ মার্চ] এর পরের ঘটনা আমাদের জানা। জহির লিখেছেন, জিয়া যখন বেরুচ্ছেন তখন তাকেও গুলি করা হয়। তারপর চট্টগ্রাম এলাকায় আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার ভাষায়, "Major Zia Ur Rehman , with his Rayban glasses and two flags flying on his jeep, drove up to the gate, a rifle shot and rocket was fired at him, he was standing in his jeep and was seen to drop down, then the vehicle disappeared from view. He was not identified in the Chittagong area after this." [পৃ. ২৮০]

মেজর মান্নানকে কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালে [চট্টগ্রামে] ভর্তি করা হয়। প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার চাইছিল তাকে যেন গ্রেফতার করা হয়। জহির অনেকগুলো খবর পেলেন যে, মান্নানকে 'হ্যারাস' করা হচ্ছে। জহির তখন জেনারেল মিঠাকে বলে মান্নানকে পশ্চিম পাকিস্তানের চেরাটে বদলি করেন।

এরপর জহির চট্টগ্রাম 'মুক্ত' করার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যা প্রাসঙ্গিক নয়।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টেরও কিছু বিবরণ আছে। কুমিল্লা গ্যারিসন থেকে মেজর বাহার হচ্ছেন প্রথম বাঙালি অফিসার যিনি পাকিস্তানি বাহিনী ত্যাগ করেন ২৩ মার্চ। মেজর বিল্লাল ছিলেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে। তিনি বাঙালিদের কোয়ার্টার গার্ডে বন্দি করে নতুনভাবে সব পশ্চিমাদের অস্ত্র দেন। বাঙালি অফিসার লে. হায়দার অস্ত্র চাইলে তা নাকচ করে দেন। হায়দারও সুযোগ বুঝে

ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেন।

চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'রিয়ার পার্টি'কে নিরস্ত্র করে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সৈন্য, অফিসার ও পশ্চিমাদের বাঙালি পরিচার-করাও ছিল। প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের বাঙালিদেরও একইভাবে হত্যা করা হয়। এদের অনেকে পত্তনের সময় থেকে ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর ৩৯ বালুচ কুমিল্লা এলে ৪ ইস্ট বেঙ্গল ও ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের বাড়িঘর লুট করে। চট্টগ্রাম শহরেও এ ধরনের লুটতরাজ চলে। চট্টগ্রাম 'মুক্ত' করে জহির যান রাঙ্গামাটি । তার স্ত্রী ও পরিবার ইতোমধ্যে কুমিল্লা থেকে ঢাকা পৌঁছে এবং তারপর চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মিজোদের সাথে তাদের সমঝোতা হয়। লালডেঙ্গা ও তার বাহিনী সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানীদের সাহায্য করে। এর বিস্তৃত বিবরণ রেখেছেন। রাঙ্গামাটিতে তিনি রাজা ত্রিদিব রায়ের সাথে দেখা করেন এবং সহযোগিতা চান। ত্রিদিব রায়ের বাসায় প্রায় প্রতিদিন পানাহারের জন্য তিনি যেতেন। রাজার সহায়তায় ২০০ চাকমাকে তারা রিক্রুট করেন। জহিরের মতে পরবর্তীকালে শান্তিবাহিনীর নিউক্লিয়াস ছিল এই রিক্রুটরা।

বরিশালে একবার বিমানে করে ঢাকা যাওয়ার সময় ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে তার দেখা হয়। আলোচনার সময় তিনি প্রস্তাব করেন, তিনি বেশ কিছু বাঙালিকে দিতে পারেন যারা পাকিস্তানিদের নির্দেশে চলবে। জহির জানালেন, তিনি এমন কিছু লোক চান যাদের ট্রেনিং দিয়ে সীমান্তের ওপারে নাশকতার কাজে পাঠানো যাবে। ফজলুল কাদের চৌধুরী রাজি হন। জহির সদর দফতরের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর কুমিল্লায় তাদের ট্রেনিং হয়। জহিরকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়ার পর এদের প্রথম নাশকতামূলক কাজে পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য "The operation was not followed up and fizzled out." [পৃ. ৩১৪]

জহিরের ভাষায় তিনি সাফল্যজনকভাবেই তার কাজ করেছিলেন। কিন্তু ওপরওয়ালার সাথে বনাবনি না হওয়ায় তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠানো হয় আগস্টে। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার সময় রাওয়ালপিন্ডিতে তিনি দেখা করেন লে. জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে। গুল তখন পূর্ব পাকিস্তানে এক সফর সেরে ফিরেছেন। তিনি জহিরকে বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভুলে যেতে। জহির বিস্মিত। তার ভাষায়, "While talking to me he shocked me by telling me that we should forget about East Pakistan ." [পৃ. ৩২৩]

আমাদের বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করে জহির পর্ব শেষ করব। পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে পোস্টিং পাওয়ার পর তার ডাক পড়ল লায়ালপুর (ফয়সলাবাদ) যেতে। ব্রিগেডিয়ার রহিমুদ্দিনের নেতৃত্বে সেখানে একটি সামরিক আদালত শেখ মুজিবের বিচার শুরু করেছে। জহিরকে ডাকা হলো সাক্ষী দিতে। কীভাবে মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার বিবরণ তিনি দেবেন সাক্ষী হিসেবে। দিলেনও। তাকে জেরা করলেন আসামী পক্ষের আইনজীবী এ. কে. ব্রোহী । ব্রোহীর জেরায় তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, প্রসিকিউটরের ব্রিফ অনুযায়ী তিনি সাক্ষী দিয়েছেন।

পেশাগত জীবনের শুরু থেকেই ব্রিগেডিয়ার জহির আলম খান বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়েছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে ওপরওয়ালার বনাবনি হয়নি। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরেছেন। ভূট্টো ক্ষমতায় এলে তার এক ভাই ভূট্টো বিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। তার ওপরও গোয়েন্দা নজরদারি শুরু হয়। জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। আবার ব্রিগেডিয়ার পদেও উন্নীত হন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ব্রিগেডিয়ার হিসেবেই তাকে অবসর দেয়া হয়।

জেড. এ. খানের বইয়ে পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের মন-মানসিকতার গড়ন, তার বিকাশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেনাবাহিনীর অফিসাররা দেবদূত নয়, সম্ভব হলে তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যান, প্রতিশোধপরায়ণও। দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটিও প্রচলিত। মেজর জেনারেল মিঠাও সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে–

"The Pakistan Army, in the book, has not been made out to be an army of perfect soldiers and officers of full of self-sacrificing heroes but a fighting army that reflect the society and culture as it has developed since the creation of Pakistan."

৫৪

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জহির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে নির্মোহ ভঙ্গি আছে। যা দেখেছেন যা শুনেছেন তাই-ই লিখেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাঙালিদের সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। বাঙালিরা যে হিন্দুদের প্রভাবে বা প্ররোচনায় বিদ্রোহ করেছে মনের গহীন গভীরে তিনি তাই বিশ্বাস করতেন। গ্রামে গেলে তিনি হিন্দু দেখেন, ত্রাণে গেলে তিনি হিন্দু বানিয়া দেখেন। আবার এও লেখেন গ্রামের বাড়িগুলি থেকে বিকেলে কোরআন পাঠের শব্দও ভেসে আসে। তবে স্পষ্ট তিনি বুঝেছিলেন বাঙালি,

হিন্দু-মুসলমান যা-ই হোক না কেন পশ্চিমাদের পছন্দ করে না। আর সৈন্যরা যে বাঙালিদের 'বর্বরতা'য় ক্ষুব্ধ হয়ে খুনখারাবি করেছিল তারও ইঙ্গিত দেন। পূর্বসূরীদের সঙ্গে তার পার্থক্য কম।

শেখ মুজিব সম্পর্কে কোথাও তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু যে সৈনিকটি বঙ্গবন্ধুকে চপেটাঘাত করেছিল [তার ভাষ্য অনুযায়ী] তার ছবি আলাদাভাবে ছাপেন। আর কোনো সৈনিকের ছবি তিনি আলাদাভাবে দেননি। যেন এই 'চপেটাঘাত' বঙ্গবন্ধুর পাওনা ছিল এবং যে এই জঘন্য কাজটি করেছিল সে যথার্থ কাজ করেছিল, সাহসীও বটে। কিন্তু, তার এই বর্ণনা যে তার ট্রুপসের ভাবমূর্তি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে [পাঠকদের মনে] তা তার মনে হয়নি।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের গ্রেফতার ও তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তিনি লিখেছেন। অন্য কোনো জেনারেল এ সম্পর্কে তেমন লেখেননি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের কথা আমরা এখন বিস্মৃত, কিন্তু তিনিই ছিলেন তখন সিনিয়র বাঙালি অফিসার যিনি পাকিস্তানিরা আঘাত হানার আগেই আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানিরা তাঁকে গ্রেফতার করে যথেষ্ট নির্যাতন করেছে। তিনি মুখ খোলেননি। স্বাধীনতার পর পুরস্কৃত হওয়া দূরে থাকুক, কেউ তাঁর কথা মনেও রাখেনি। অথচ, মাজেদুল হক বা এরশাদকে ডেকে এনে চাকরি দেয়া হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সেই সব দিনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতিতে*।

লে. কর্নেল মাসুদুল হোসেন খানের স্মৃতিকথাও সংকলিত হয়েছে ঐ গ্রন্থে। জহির ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সন্দেহ করার কারণ হিসেবে লে. কর্নেল মাসুদুল হোসেন খানের যে সিগন্যালের কথা উল্লেখ করেছেন তার কোনো উল্লেখ দুজন করেননি। তাহলে কি এটি শোনা কথা? তবে মজুমদার যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন তা পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের চোখ নিশ্চয় এড়িয়ে যায়নি। তারা তাঁকে সন্দেহ করেছে, জিয়াউর রহমানকে নয়, কারণ, সন্দেহ করলে ২৫ তারিখ রাতে 'সোয়াত' থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য জিয়াকে পাঠানো হতো না।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের ভাষ্য অনুযায়ী– "সিদ্দিকী সাহেব ফিরে এসে আমাকে জানালেন, শেখ সাহেব বলেছেন, 'ব্রিগেডিয়ার সাহেব খামোখা টেনশন করতেছেন। ওনাকে ধৈর্য ধরতে বলুন। আমরা রাজনীতিবিদরা আলাপ করতাছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ শেষ না হবে ততক্ষণ ধৈর্য ধরতে বলুন। সময়

আসলে আমি ওনাকে জানাব।' ওসমানি সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন 'সময় আসলে উনি কেমন জানাবেন?' শেখ সাহেব বলেছেন, ঢাকায় রেডিও স্টেশনে বাংলার অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হলে জানবেন আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। আর আমি ওনার জন্য একটা মেসেজ রেকর্ড করে রাখব এবং সেটা জহুর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে ওনাকে দেব। ২১ মার্চে ধারকৃত ঐ মেসেজ শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পর চিটাগাং এ ২৬ মার্চ প্রচার করা হয়।" [পৃ.৩৫]

২৪ তারিখে জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও জেনারেল মিঠা খান মজুমদারকে ঢাকায় নিয়ে যান। ঢাকায় তাঁর সহপাঠী ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের বাসায় রাখা হয়। সেখান থেকে তিনি সরে পড়েন ও আবারও জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওসমানী সাহেব তখনও তাঁকে কোনো নির্দেশ দিতে পারেননি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার উঠেছিলেন তাঁর বড় ভাইয়ের বাসায়। পরদিন তিনি খবর পেলেন তাঁর পরিবারকে ক্যান্টনমেন্টে ব্রিগেডিয়ার আনসারীর বাসায় রাখা হয়েছে। তিনি সেখান থেকে বিনা বাধায় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুড়বাড়ি চলে গেলেন। ২৭ তারিখ অপেক্ষা করছিলেন ক্যাপ্টেন আমিন আসবেন ও তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রাম যাবেন। সেই সময় হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে করাচী তারপর খারিয়ার রেস্ট হাউসে নিয়ে যায়।

কর্নেল মাসুদুলকে ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় গ্রেফতার করে একইভাবে নিয়ে যাওয়া হয়।

বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীন বাংলা বেতার যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের একজন। জিয়াউর রহমানের ঘোষণার তারিখ তিনি উল্লেখ করেছেন ২৭ মার্চ। ২৮ মার্চ জিয়া তাদের নির্দেশ দেন 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নাম থেকে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দিতে। সেদিন তিনি নতুন আরেকটি ঘোষণা দেন, ৩০ তারিখও আরেকটি ভাষণ দেন জিয়া। পাকিস্তানি বিমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করে ৩০ তারিখ। ঐ দিনই জিয়া বেতার কেন্দ্র ছেড়ে চলে যান। ৩১ তারিখ তারা কালুরঘাট ছেড়ে চলে যান।

তারিখগুলি উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, জহির প্রদত্ত তারিখে একটু গোলমাল আছে। কখনও একদিন পিছিয়েছেন, কখনও এগিয়েছেন। এটি স্বাভাবিক। যে কারণে, জিয়াউর রহমান ঘোষণা দিয়েছেন ২৬ তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ জিয়া নিজেই জানিয়েছেন ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ২৭ তারিখ, বেলাল মোহাম্মদও তাই উল্লেখ করেছেন।

৫৫

জেনারেল নিয়াজির বই *দি বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান* আলোচনার আগে, ব্যক্তি নিয়াজির সম্পর্কে খানিকটা ধারণা থাকলে তার বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হবে। একবার গিয়েছিলাম পাকিস্তান এবং সেখানে জেনারেল নিয়াজি সম্পর্কে একজনের মুখেও কোনো প্রশংসাবাক্য শুনিনি। প্রথমে মনে হয়েছিল, যেহেতু তিনি পরাজিত জেনারেল সেহেতু এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ পাকিস্তানিরা সবসময় নিজেদের শ্রেষ্ঠ সৈন্য ভেবে এসেছে, অথচ বাংলাদেশে তারা জীবনের প্রথম প্রচণ্ড মার খেয়েছে। এটি একেবারে লিবারেল পাকিস্তানির পক্ষেও হজম করা মুশকিল। নিয়াজি সম্পর্কে সবার মত : তিনি বীর কোনো যোদ্ধা নন, তিনি লম্পট, নিরেট অশ্লীল ইয়ার্কি মারতে দক্ষ ইত্যাদি। জামায়াতের ভাইস-প্রেসিডেন্ট তো বলেই ফেললেন, "সে বেঁচে এলো কেন?"

নিয়াজির সঙ্গে সাক্ষাত করে আমারও তাই মনে হয়েছে। লোকটি ক্লাউনের মতো অবান্তর রসিকতা করে, দৃঢ়মূল কিছু পূর্ব ধারণা আছে এবং নিরেট। আসলে পাকিস্তান, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের যে নীলনক্সা কার্যকর করতে চেয়েছিল তার জন্য দরকার ছিল বোধহীন, নিরেট লোক। সে কারণেই, সামরিক জান্তা, ১২ জনকে ডিঙিয়ে, নিয়াজিকে প্রমোশন দিয়ে ঢাকা পাঠিয়েছিল। নিয়াজির বোধশক্তির একটি উদাহরণ দেই। তিনি আমাদের বলছিলেন হাইকমান্ড তাকে বাধা না দিলে তিনি কলকাতা, গুজরানওয়ালা দখল করে কাশ্মীর নিয়ে নিতে পারতেন। এখন আপনারা মানচিত্রে দেখে নিন, কোথায় ঢাকা, কোথায় কলকাতা, কোথায় গুজরানওয়ালা আর কোথায় কাশ্মীর!

নিয়াজির প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাকে কী চোখে দেখেছে? এই প্রথম তারা লেখকের বক্তব্যের দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ প্রকাশক জানে যে, নিয়াজিকে পাকিস্তানে কী দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু বইটি তারা প্রকাশ করেছে ব্যবসায়িক কারণে এবং তা ভালো বিক্রিও হচ্ছে। আমাদের লাভটি হয়েছে এই যে, বইটি নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক হচ্ছে। এমনকি যারা গত ত্রিশ বছর চুপ ছিলেন তারাও মুখ খুলছেন। ফলে অনেক অজানা তথ্য জানা যাচ্ছে।

নিয়াজি ভূমিকার গোড়াতেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কারা ১৯৭১ সালের জন্য দায়ী। তিনি লিখেছেন যুদ্ধবন্দি হিসাবে, ১৯৭৪ সালে ভারত থেকে তিনি পাকিস্তান ফেরেন। ক্ষমতা তখন তাদের হাতে যাদের আগ্রাসী ভূমিকার জন্য

পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। "আমি যা ভয় পেয়েছিলাম, দেখি তা-ই ঘটছে," লিখেছেন নিয়াজি, "পূর্বাঞ্চলের গ্যারিসনকে নন্দঘোষ করা হয়েছে। এটি করা হচ্ছিল এ কারণে যাতে পাকিস্তান ভাঙার জন্য যিনি দায়ী সেই ভূট্টোকে রক্ষা করা যায়।"

নিয়াজি তখনই লিখতেন। কিন্তু পরিবেশ অনুকূল ছিল না। এমনকি জে. জিয়াউল হকের আমলেও। ভূট্টো থেকে জিয়া আমল পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের কেউই চাচ্ছিলেন না ১৯৭১ সাল সম্পর্কিত 'সত্য' কেউ জানুক। বরং তারা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরানোর জন্য অন্য জেনারেলদের দিয়ে লেখাচ্ছিলেন। নিয়াজি জানাচ্ছেন, "ক্রাইসিস ইন লিডারশিপের' লেখক জেনারেল ফজল মুকিম খান বইটি লিখেছেন ভূট্টো ও জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে। হতেও পারে। কারণ ফজল মুকিমকে তখন সামরিক সচিবের পদটি দেয়া হয়েছিল। নিয়াজির মতে, বইটিতে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে। *উইটনেস টু সারেন্ডার*-এর লেখক ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক সম্পর্কেও তার মতামত একই রকম। নিয়াজি দুঃখ করে লিখেছেন, সালিক তার কমান্ডারের বিরুদ্ধে লিখেছেন, যে কমান্ডার না থাকলে বাঙালিরা তার গায়ের চামড়া তুলে নিত। উল্লেখ্য, সালিক ভূট্টো ও জিয়া আমলে, যুদ্ধবন্দি হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত সব প্রমোশন পেয়েছিলেন। নিয়াজির মতে, সদর দফতর মেজর জেনারেল শওকত রিজাকে কমিশন করেছিল ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে। রিজা লিখেছিলেন *দি পাকিস্তান আর্মি* ১৯৫৬-৭১। অদক্ষতা, কাপুরুষতা ইত্যাদির কারণে নিয়াজি তাকে ১৯৭১ সালে একটি ডিভিশনের কমান্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নিয়াজির প্রশ্ন, রিজার পক্ষে কি তাহলে সঠিক ইতিহাস লেখা সম্ভব? সদর দফতর লে. জে. কামাল মতিনকে দিয়েও একটি বই লিখেয়েছিল। মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী লিখেছেন, *হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড*। নিয়াজির মতে, ফরমান আলির বইও মিথ্যার বেসাতি। ফরমান, তার ভাষায়, পাঁচ জন গভর্নরের অধীনে চাকরি করতে পেরেছিলেন। তার 'Intrigue and manipulation'-এর মাধ্যমে। এ বক্তব্যে যে যুক্তি একবারে নেই তা নয়। কারণ ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে ফেরার পর ফরমান উচ্চপদে আসীন ছিলেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের সব জেনারেলই নানা কর্মকাণ্ড করেও পেনশন পাচ্ছেন। পেনশন থেকে একমাত্র বঞ্চিত করা হয়েছে জেনারেল নিয়াজিকে।

সুতরাং নিয়াজিকে অবশেষে কলম তুলে নিতে হয়েছে। তার মতে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ভূট্টো অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম.এম. আহমেদ ও প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান কামার উল ইসলামকে বলেছিলেন,

হিসাব করে দেখতে যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া পাকিস্তান টিকবে কি না? নিয়াজি যা বলতে চেয়েছেন, তা হলো, ১৯৭১ একটি অজুহাত মাত্র, পাকিস্তানের শাসকবর্গ অনেক আগেই পূর্ব পাকিস্তানকে ত্যাগ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আমলাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি, তারা এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। কামার উল ইসলামকেও এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি তা অস্বীকার করেননি। বরং বলেছেন, ১৯৬৯ সালের পর থেকেই এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছিল। নিয়াজি আরও বলছেন, ভূট্টো বিরোধীদলের নেতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ক্ষমতায় যাওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল, যদি পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা পায়। সে জন্যই তিনি তখন বলেছিলেন, 'ইধার হাম উধার তুম'। এ যুক্তিও আমি যাদের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁরা অস্বীকার করেননি। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর করার কিছু নেই" এবং পূর্বাঞ্চলীয় গ্যারিসন যখন শেষ পর্যন্ত লড়তে প্রস্তুত তখন তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। কারণ, তা না হলে পশ্চিম পাকিস্তান আর টিকে থাকে না। এখানে একটু কিন্তু আছে। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া নিয়াজির আর কোনো উপায় ছিল না। নিয়াজির মূল বক্তব্য যেটি, সেটি কিন্তু আজ পাকিস্তানে কেউ অস্বীকার করেননি। বলা যেতে পারে, ভূমিকায় নিয়াজি যা বলেছেন তার সত্যতা আছে। কারণ নিয়াজির সমসাময়িক যারা পাকিস্তানে বেঁচে আছেন তারা কেউ-ই এ কথাগুলি অস্বীকার করেননি। তবে নিয়াজিই প্রথম যিনি প্রকাশ্যে এ কথাগুলি স্পষ্ট করে বললেন। এ জন্য কৃতিত্ব অবশ্যই তার প্রাপ্য।

নিয়াজির বইয়ের প্রথম দুটি অধ্যায় তার বেড়ে ওঠা, সেনাবাহিনীতে যোগদান, ভারত বিভক্তি, পূর্ব পাকিস্তানে পোস্টিং এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ নিয়ে লেখা। "আমার নাম আমির আবদুল্লাহ নিয়াজি কিন্তু পরিচিত হয়ে উঠেছি টাইগার নিয়াজি নামে।" এভাবে নিয়াজি শুরু করেছেন তার বাল্যজীবনের কথা। বংশ গরিমা ও নিজ বীরত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়গুলি তিনি বারবার উল্লেখ করতে ভোলেন না। আমাকে তিনি বলেছিলেন, "আরে আমি গেরিলাদের (১৯৭১ সালে) ভয় পাব কেন? আমি ইন্দোনেশিয়ায় গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়েছি না? এ কারণেই তো ১৯৭১ সালে গেরিলারা আমার সঙ্গে সুবিধা করতে পারেনি।"

নিয়াজি জানাচ্ছেন, জাপানিদের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় যুদ্ধের সময় ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন তার এই (টাইগার) নামকরণ করেছিলেন। এই 'খেতাব' ছাড়াও তিনি পেয়েছেন মিলিটারি ক্রস, সিতারা-ই-খিদমত, সিতারা-ই-

পাকিস্তান, বীরত্বের জন্য দুটি হিলাল-ই-জুরাত ও ২৪টি মেডেল। ১৯৫৭ সালে ঢাকায় ছিলেন এবং তার সাংগঠনিক প্রতিভা ও বীরত্বের কারণে ক্যান্টনমেন্টে একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছিল 'টাইগার রোড'। আইয়ুব আমলের প্রভাবশালী আমলা আলতাফ গওহর আমাদের বলেছিলেন এবং খবরের কাগজেও লিখেছেন, 'টাইগার' উপাধি পাওয়ার কারণটি অন্য। নিয়াজির সঙ্গে ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক ভারতীয় জেনারেল জানিয়েছেন, আর্মি মেসে নজর কাড়ার জন্য বেয়ারাদের নিয়াজি চিৎকার করে ডাকতেন 'শেরা'। সেজন্য তার নামকরণ করা হয় 'টাইগার' (পাঞ্জাবি 'শেরা'র কাছাকাছি অর্থ)। কোনো যুদ্ধের কারণে তিনি তা অর্জন করেননি। আলতাফ গওহর বলেছিলেন, নিয়াজি বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে তাকে তারিক-বিন-জায়েদ উপাধি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কে কখন তাকে এই উপাধি দিয়েছিল তা জানাননি। তিনি আরও বলছেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় আমি জেনারেল নিয়াজির নাম-ই শুনিনি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এ যুদ্ধ আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল। হয়তো নিয়াজি তার কাজ ভালোভাবেই করেছিলেন যে কারণে হিলাল-ই-জুরাত পেয়েছেন কিন্তু আইয়ুব খানের কোনো ব্রিফিংয়ে তার নাম উচ্চারিত হয়নি।

পাকিস্তানে নিয়াজিই বোধহয় সর্বাধিক মেডেল ও উপাধি পাওয়া জেনারেল। নিয়াজি নিজেও তা বলেছিলেন। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি ভালো লড়াইও করেছিলেন। না-হলে ক্রমাগত মেডেল পাওয়া যেত না। তবে একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত। মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মালিক তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তাঁর সেক্টরে যারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং যাদের তিনি মেডেলের জন্য সুপারিশ করেছিলেন তাঁদের কাউকে মেডেল দেয়া হয়নি। সেনাবাহিনীতে এভাবে সুবিধাবাদী চক্র নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। লক্ষ করবেন বীর উত্তম, বীর প্রতীক ইত্যাদির সিংহভাগ পেয়েছে প্রাক্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈনিকরা, যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ পাননি। সেনাবাহিনীর সদস্য ছাড়া একজনকেও নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি যাকে বীরশ্রেষ্ঠ দেয়া যায়। এভাবে বাংলাদেশের শুরুতে প্রাক্তন পাকিস্তানি সেনারা নিজেদের স্বার্থচক্র সৃষ্টি করেছিল।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন নিয়াজি, যেখানে নিজের প্রত্যুৎপন্নতা ও বীরত্বের উল্লেখ আছে। তিনি জানিয়েছেন, শিয়ালকোটের যুদ্ধে জেনারেল আবরার জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু নাম কিনলেন

জেনারেল টিক্কা খান– কিছু না করেই। যুদ্ধ সম্পর্কে টিক্কা খান ভুল ধারণা দিয়েছিলেন এবং শাস্তির হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। মন্তব্য করেছেন নিয়াজি : "At times history is unkind. It creates giants out of pygmies and titans are not given their in due share." নিজের কথা ভেবেই তিনি এ মন্তব্য করেছেন। মনে রাখা দরকার, টিক্কা খানের সঙ্গে সম্পর্ক তার মধুর ছিল না। কমান্ডার হিসেবে টিক্কা খান একেবারে ব্যর্থ– এ কথা নিয়াজি ছাড়া পাকিস্তানের কেউ কখনও বলেননি।

নিয়াজির বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়টি আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক, যার নাম দিয়েছেন তিনি– "Events leading to secession." পাকিস্তানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে যে ধারণা দেয়া হতো বা যাকে বলা যেতে পারে 'স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট' তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ অধ্যায়ে। পাকিস্তানিদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমারও তা মনে হয়েছে। এবং আরও মনে হয়েছে বামপন্থি ও নতুন প্রজন্ম এখন এই 'স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট' সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে। এ অধ্যায়ে অন্যান্য জেনারেলের মতো তিনিও পূর্ব ধারণা ব্যক্ত করেছেন। জেনারেল উমর ও জেনারেল ফরমান আলিও তাদের সাক্ষাতকারে একই ধারণা ব্যক্ত করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় জানাচ্ছেন নিয়াজি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধনী ও শিক্ষিত হিন্দুরা চলে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যায়নি। এখানে মুসলমানরা যদিও ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু ছিলেন অধস্তন। স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন হিন্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী ও লুটেরা হিসেবে। তরুণ মনকে তাঁরা প্রভাবিত করেছিলেন এবং এভাবে রোপিত হয়েছিল অসন্তোষের বীজ।

এ কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা সচেতনভাবেই প্যারিটি চেয়েছিল। কারণ তা না-হলে ক্ষমতা থাকত বাঙালিদের হাতে। সেই বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ করত কুড়ি ভাগ হিন্দু। অর্থাৎ হিন্দুরাই পরোক্ষভাবে শাসন করত পাকিস্তান। এই হিন্দু-প্রভাব রদের জন্যই উদ্ভব হয়েছিল প্যারিটি ব্যবস্থার। এ ধারণা যে কতটা বদ্ধমূল তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। নিয়াজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি আমি এবং মহিউদ্দিন আহমদ। নিয়াজির সঙ্গে আছেন তার দুই মেয়ে। প্রথমেই একজন জানতে চাইলেন আমরা হিন্দু কি না! সাক্ষাতকার শেষে দু'জনই অনুনয় জানিয়ে বললেন, আমরা যেন ভারতকে ত্যাগ করে অন্য যে কোনো দেশকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা এ প্রশ্নটিই রেখেছিলাম– আমরা যদি হিন্দু-প্রভাবান্বিতই হই তাহলে আমরা পাকিস্তান প্রস্তাব কেন করেছিলাম এবং পাকিস্তানের অংশই-বা কেন হয়েছিলাম? এ প্রশ্নের জবাব নিয়াজি, ফরমান,

উমর–কেউ-ই দিতে পারেননি। দেয়া সম্ভবও নয়, কারণ ব্যাপারটি অবাস্তব। কিন্তু পাকিস্তানি মন বোঝার জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়াজি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জানাতে বাধ্যও হয়েছেন যে, দু'প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হলেও এদের মধ্যে কোনো মিল ছিল না। ভাষা, পোশাক-আশাক, খাদ্য-রুচি– কোনো কিছুতেই না। সাক্ষাতকার প্রদানকালে নিয়াজি বলেছেন, "প্র্যাকটিসিং মুসলমান', হিসেবে বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানি থেকেও বেশি মুসলমান। 'সাচ্চা মুসলমান'। অন্যান্য জেনারেলও তাই বলছেন। এভাবেই জেনারেলদের মনের পরস্পর বিরোধিতা প্রকাশিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে নিয়াজি আরও উল্লেখ করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তান ছিল জমিদারদের ক্ষেত্র, যারা ছিল ক্ষমতাশালী ও সামন্তবাদী এবং কৃষকরা ছিল তাদের অধস্তন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রভাবশালী ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও আইনজীবীদের প্রবল প্রভাব ছিল সাধারণ মানুষের ওপর। পাকিস্তানে যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, এমনকি যাঁরা সামন্ত পরিবারেরও– তাঁরাও এ কথা স্বীকার করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যে অসন্তোষের বীজ রোপিত হয়েছিল তা নিয়াজি অস্বীকার করেননি। কিন্তু কেন, সে বীজ রোপিত হয়েছিল সে কারণ বিশ্লেষণ তিনি করেননি। তবে তার বিভিন্ন উক্তিতে মনে হয়, তিনি বা তারা কারণগুলি জানতেন। যেমন, লিখেছেন তিনি, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত। ফলে, এ অঞ্চলে অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। তার ভাষায়– "The Bengalis were convinced more than ever before that they were being neglected. To a certain extent their anxieties were unfounded."

তার মতে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মিথ্যা ছিল না। হিন্দুরা ১৯৪৭ থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে সাহায্য করেছে। ১৯৬৯ সালে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে উৎসাহ দিয়েছেন আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য যাতে তিনি ক্ষমতা দখল করতে পারেন। তার এ মন্তব্যের যথার্থতা যে নেই তা বলাই বাহুল্য।

১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসান, ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব থেকে কোনো সাহায্য চেয়ে পাননি। ফলে, এ অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। ইয়াকুব বরং একটি নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যার নাম 'ব্লিৎজ।' নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। নিয়াজি আমাদের বলেছেন, ফজলুল

কাদের চৌধুরী, ফরিদ আহমদ প্রমুখ তাকে বলেছিলেন যে, সামরিক সরকার যদি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ না করত তা হলে অন্যান্য দল ৫০/৬০টি আসন পেত। এ ধারণা পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকেরই। কারণ তারা ভেবে পায় না, কীভাবে একটি দল পরিষদের (প্রায়) সব আসনে জয়লাভ করে? ভূট্টো এ ফলাফল মানতে অস্বীকার করেন। ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গভর্নরদের এক বৈঠকে ইয়াকুবকে জানান হয় : যদি মুজিব ৬ দফা থেকে না সরেন তা হলে 'ব্লিৎজ' পরিকল্পনা যেন কার্যকর করা হয়। ইয়াকুব অনেক আগেই 'বিদ্রোহ' দমন করতে পারতেন কারণ, "All Yaqub faced was a rag-tag mob." এরপর ইয়াকুব গভর্নর হলেন এবং চারদিন পর পদত্যাগ করলেন। পাকিস্তানের বিপদের সময় তিনি পদত্যাগ করলেন বিবেকের দোহাই দিয়ে। কারণ, পাকিস্তানি ভাইদের ওপর তিনি গুলি চালাতে পারবেন না। কিন্তু এই অজুহাত ঠিক হতো যদি আরও আগে বিবেকের তাড়নায় তিনি পদত্যাগ করতেন। এককথায় নিয়াজি ইয়াকুবকে চিত্রিত করেছেন চরম সুবিধাবাদী হিসেবে, যিনি নওয়াজ শরিফের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি সরকার থেকেই সুবিধা নিয়েছেন।

সাহেবজাদা ইয়াকুবই বোধহয় ১৯৭১ সালের কুশীলবদের একজন যিনি গত ২৮ বছরে ১৯৭১ সাল সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। নিয়াজির বই প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আলতাফ গওহরকে একটি চিঠি ও কিছু দলিলপত্র পাঠিয়েছিলেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে। গওহর সেটি প্রবন্ধাকারে ছেপেছেন। আমি এবং মহিউদ্দিন আহমদ ইসলামাবাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে ১৯৭১ সাল নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। কিন্তু বললেন, এসব কিছুই "অব দ্য রেকর্ড"। অপারেশন 'ব্লিৎজ' নিয়ে কথা উঠতেই তিনি কিছু কাগজপত্র দিলেন যা তিনি আলতাফ গওহরকেও পাঠিয়েছিলেন। গওহরকে তিনি লিখেছিলেন– "As you know, baseless and malicious charges are best treated with contempt."

১৯৭১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্টের পিএসও লে. জে. পীরজাদাকে ইয়াকুব যে চিঠিটি দিয়েছিলেন তার কপিও দিলেন আমাদের।

জেনারেল ইয়াকুব বলছেন, ১৯৭০ সালের নভেম্বরে তিনি অপারেশন 'ব্লিৎজ'-এর পরিকল্পনা করেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী এ পরিকল্পনা করা হয়েছিল– "... to meet the eventuality of an insurgencey and the total collapse of law and order during the period of general elections is E. Pakistan in December, '70. In this hypothetical situation, the mission was to restore order rapidly by the stringent enforcement of martial law, selective arrest of anti-Pakistan elements,

vigorous implementation of order to secure key points vital areas using minimum force. The object was to gain control to be able to meet external intervention."

তিনি জানাচ্ছেন, তাঁর সময়ে অপারেশন 'ব্লিৎজ' কার্যকর হয়নি কারণ তার আগেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন তিনি ৫ মার্চ।

উল্লেখ্য, জেনারেল ইয়াকুব সামরিক সমাধানের ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে পীরজাদাকে তিনি লিখেছিলেন যে, পাকিস্তান ভেঙে যাবে এবং এর দায়দায়িত্ব বহন করবে কে?

আলতাফ গওহর জানিয়েছেন, 'অপারেশন ব্লিৎজ' কার্যকর করার বিরোধী ছিলেন আরেকজন সামরিক অফিসার– গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাসুদ জাফর যাকে সবাই জানত মিট্টি মাসুদ নামে। ইয়াহিয়া ও অন্য অফিসারদের এক বৈঠকে 'অপারেশন ব্লিৎজ' কার্যকর করার বিষয় যখন আলোচনা হচ্ছিল মিট্টি মাসুদ তখন তার বিরোধিতা করে বলেন, এর ফলাফল খুব খারাপ হবে। যতদিন মিট্টি বিমানবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন ততদিন 'অপারেশন ব্লিৎজ'-এ একটি বিমানও সাহায্য করেননি। জেনারেল ইয়াকুব আলতাফ গওহরকে বলেছেন যে, মিট্টির মতো এত সাহসী ও দৃঢ়চেতা লোক তিনি খুব কম দেখেছেন। আমাকেও পাকিস্তানে দু-একজন মিট্টির কথা বলেছেন। হুকুম তামিল না করার কারণে মিট্টির কোর্ট মার্শাল হয়। তিনি নাকি এখন থাকেন জার্মানিতে। সুতরাং নিয়াজি এ পর্যায়ে যা বলছেন তা সঠিক নয় এবং এসব বক্তব্য তাঁর ধারণাপ্রসূত। অন্যদিকে জেনারেল ইয়াকুবের চিঠিপত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান এবং হত্যাযজ্ঞের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পূর্বপরিকল্পিত, হঠাৎ করে তা উদ্ভূত হয়নি। নিয়াজি তারপর লিখেছেন, শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট আরও জোরালো হয়ে উঠলে ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ঘোষণা করেছিলেন, হয় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দাও, নয় তো মুজিবকে গ্রেফতার করো। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াহিয়া গভর্নরদের নিয়ে বৈঠক করেন যেখানে জেনারেল ইয়াকুবও ছিলেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় শেখ মুজিব যদি তাঁর অবস্থান থেকে না সরেন তাহলে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫৬

চলে এলো ১৯৭১ সালের মার্চ মাস। এ মাস সম্পর্কিত বিবরণে তিনি কিছু পূর্ব ধারণা ব্যক্ত করেছেন। সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং টিক্কা খানের প্রতি

বিরাগবশত কিছু সত্য বলেছেন।

নিয়াজি লিখেছেন, ৭ মার্চ মুজিব অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার পর আওয়ামী লীগ এমন সব নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিয়েছিল যা বর্ণনাতীত। বগুড়াতে ১৫০০০ অবাঙালিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছিল। চট্টগ্রামে হাজার হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা ও নারীধর্ষণ করা হয়েছিল। সিরাজগঞ্জে মহিলা ও শিশুদের ঘরে আটকে আগুন দেয়া হয়েছিল। বিহারি এবং পশ্চিম প্যাকিস্তানিরা ছিল এসব আক্রমণের লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের যেসব পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ছিল তাদের হত্যা করে তাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করা হয়েছে এবং উলঙ্গাবস্থায় বাঙালি অফিসারদের খাবার সার্ভ করতে বাধ্য করা হয়েছে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার যে কাহিনী প্রচার করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হেয় করে তোলা।

তৎকালীন কোনো বিদেশী প্রচারমাধ্যমেও কিন্তু বাঙালিদের দ্বারা সংঘটিত এতবড় হত্যাযজ্ঞের কাহিনী প্রচারিত হয়নি। নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তা'হলে এই হত্যাযজ্ঞের বিবরণ আপনি জানলেন কীভাবে? আপনার সোর্স কী?" তিনি বোধহয় আগেই আঁচ করেছিলেন এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। তাই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটি প্রবন্ধের ফটোকপি তুলে দিলেন। প্রবন্ধটি রাশব্রুক উইলিয়ামসের লেখা 'দ্য ইস্ট পাকিস্তান ট্র্যাজেডি'। তখন এর পাতা উল্টে দেখিনি। এখন দেখছি এই প্রবন্ধের উৎস পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র। বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া উইলিয়ামসের খানিকটা পরিচয় দিতে হয়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এর পক্ষে লিখতে। তিনি প্রায় সময় পাকিস্তানের সামরিক সরকারের হয়ে ভাড়া খেটেছেন। ২৫ মার্চের পর, সামরিক জান্তা আবার তাঁকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের প্রচারের স্বার্থে।

নিয়াজি এরপর লিখেছেন, টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে এলে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা পাননি। তিনি মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব দেখা করেননি, কারণ তখন তিনি ইয়াকুবের সঙ্গে নাকি নিয়মিত "wined and dined and played cards." মার্চের সেই টালমাটাল দিনগুলিতে বঙ্গবন্ধুর এত সময় ছিল একথা কোনো পাগলও বিশ্বাস করবে না।

২৫ মার্চ ঘটাবার জন্য টিক্কা খান আগে থেকেই সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে টিক্কার সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি সত্য লুকোতে পারেননি। তবে, সত্য-মিথ্যা একাকার করে ফেলেছেন। লিখেছেন তিনি এবং বলেছেনও আমাদের যে, টিক্কা যে ভুলটি করেছিলেন তা হলো তিনি মুখোমুখি ছিলেন

আরেকটি সেনাবাহিনীর নয় বরং অসন্তুষ্ট সশস্ত্র সিভিলিয়ানদের [সশস্ত্র শব্দটি মিথ্যা]। এজন্য দরকার ছিল বুদ্ধি ও ধৈর্যের। তিনি বলেছেন, কর্নেল ওসমানীকে শেখ সাহেব দায়িত্ব দিয়েছিলেন সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার। আর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মজিদকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল প্রাক্তন সৈন্যদের সংগঠিত করার। ভারত থেকে অস্ত্র আসছিল এবং পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তানি ভিন্ন মতাবলম্বীদের সশস্ত্র করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী সাহায্য করেছিল। ইতোমধ্যে হাজার হাজার ভারতীয় সেনা সিভিলিয়ান পোশাকে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছিল। শেষে মন্তব্যগুলি যে সর্বৈব মিথ্যা তা বলাই বাহুল্য। যদি বাঙালিরা সশস্ত্র থাকত এবং হাজার হাজার ভারতীয় সেনা থাকত তা হলে কি পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হতো গণহত্যা চালানো? এই সাধারণ লজিকটি লেখার সময় জেনারেল নিয়াজি খেয়াল করেননি।

এরপরেই তিনি কিন্তু বলেছেন বাঙালি সৈন্যরা তখনও বিদ্রোহ করেনি। টিক্কা খানকে বলা হয়েছিল, বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে ও রাজনৈতিক নেতাদের বন্দি করতে। কিন্তু টিক্কা কী করলেন– "General Tikka let loose every thing at his disposal as if raiding an enemy and not dealing with his own misguided and misled people. The military action was a display of stark cruelty, more merciless than the massacre at Bukhara and Baghdad by Changez Khan and Halaku Khan and at Jalianwala Bagh by British General Dyer." এই একটি সত্য কথনের মাধ্যমেই নিয়াজি তাঁর পূর্বেকার অনেক মিথ্যা মন্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন। সত্য কথনের মুশকিল এটাই। নিয়াজি বললেন আমাকে, টিক্কার এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন রাও ফরমান আলী ও বিগ্রেডিয়ার জাহানজের আবরার। জেনারেল ফরমান তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "Green land of East Pakistan will be painted red."

নিয়াজি জানিয়েছেন টিক্কা খান ২৫ মার্চের পর বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে আরেকটি ভুল করেছিলেন। এসব সাংবাদিকরা এ কারণে পরে সব বিবরণ বিকৃত করে প্রচার করে। ফলে পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি হয়। উল্লেখ্য, কয়েক মাস পরে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে যে অবস্থা স্বাভাবিক তা প্রমাণ করার জন্য নিজেদের পছন্দসই সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করে ঢাকায় নিয়ে আসে। ফিরে গিয়ে সাংবাদিকরা কেউ পাকিস্তানের পক্ষে লেখেননি। বরং অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস লিখলেন, তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট, 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ'।

অর্থাৎ, খারাপ ব্যবহারের কারণে নয়, যা ঘটেছিল সাংবাদিকরা তাই লিখেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। টিক্কা খান হলেন গভর্নর ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক অর্থাৎ বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান। তিনি রিপোর্ট করবেন প্রেসিডেন্টের কাছে এবং নিয়াজি সামরিক প্রশাসনের প্রধান। তিনি রিপোর্ট করবেন সেনাপতি জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের কাছে। নিয়াজি লিখেছেন, ভূট্টো আমলে টিক্কা খান বলতে চেয়েছেন তিনি তার অধীনে কাজ করেছেন। এটি বিন্দুমাত্র সত্য নয়।

৫৭

চতুর্থ থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত নিয়াজি পূর্বাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তার নিয়োগ, বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনা নিয়োগ, মুক্তিবাহিনী, অপারেশন প্ল্যান, যুদ্ধ-বৃত্তান্ত, পাকিস্তানের পরাজয় ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। নিয়াজি তার সামরিক পরিকল্পনার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এর একটি কারণ, তিনি যে সমর বিশারদ এবং তার অফেনসিভ ও ডিফেনসিভ প্ল্যান যে ঠিক ছিল তা তুলে ধরা। শুধু তা-ই নয়, সদর দফতরে বাধা না দিলে এবং তার পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজ করতে দিলে তিনি সফল হতেন। বিভিন্ন সামরিক পরিকল্পনার বিষয়ে সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন এবং আশা করি তাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরবেন। আমরা এখানে শুধু আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিই উদ্ধৃত করব।

চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই নিয়াজি জানাচ্ছেন, টিক্কা খানকে যখন ট্রুপসের কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হলো তখনই টিক্কা খান শক্ত হলেন। কারণ যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় কোনো জেনারেলকে সরিয়ে দেয়া তার জন্য কলঙ্কজনক। টিক্কা খান জেনারেল হামিদকে অনুরোধ করেছিলেন, নিয়াজি যেন তার অধীনে থেকে কাজ করেন। কিন্তু সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলো। হামিদ টিক্কাকে জানালেন, "Tikka you were given a chance and you have bungled it up, how can I violate the principle of not to reinforce a failure."

এ পর্যায়ে নিয়াজি আবার সঠিক তথ্য তুলে ধরছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় মানুষ ও বাঙালি কর্মচারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বাঙালিরা ঘৃণিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের কোনো রকম সাহায্য না করতে বদ্ধপরিকর ছিল। "নিজের

দেশেই আমরা অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম।" লিখেছেন নিয়াজি। ঢাকা ছাড়া দেশের বাকি অংশ ছিল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে যাদের মনের জোর ছিল আকাশ-ছোঁয়া এবং ছিল উদ্যম। এরপর নিয়াজি এক অদ্ভুত অভিযোগ করেছেন যা আসলেই তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। তিনি লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য ভারত সরকার অনেক নর্তকী, দেবদাসী ও পতিতা প্রেরণ করেছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের 'সিডিউস' করতে পারেনি, কিন্তু বিপুলসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানিকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। ২৫/২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে বেশ কিছু অবাঙালি মেয়ে উদ্ধার করা হয়েছিল যাদের রাখা হয়েছিল বেশ্যাবৃত্তির জন্য। মুক্তিবাহিনীর একজন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার শাহ বেগ সিং (ভারতীয় কমান্ডার) নিয়াজিকে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অনেক ভারতীয় মহিলা কাজ করেছে। সুতরাং নিয়াজির দৃঢ়বিশ্বাস পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, পুলিশ, সিভিলিয়ান যে বাঙালি মেয়েদের ধর্ষণ করেছে তা ভিত্তিহীন ও সঠিক নয়। যেখানে ইচ্ছুক এত ভারতীয় মহিলা আছে অনিচ্ছুক বাঙালি মেয়েদের ধর্ষণের প্রশ্নই আসে না। তা ছাড়া চারদিকে যখন, এ রকম বিপদ তখন কেউ এ ধরনের কাজ করে না বরং ধর্মভীরু হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সৈন্যদের প্লাটুন (৩৬ জন) বা কোম্পানিতে (১২০ জন) থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং তাদের পক্ষে একত্রে এসব কাজ করা সম্ভব নয়। কেউ একা বেরুবার সাহস করলেই মারা পড়ত। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য কি না সে প্রশ্নই অবান্তর। কারণ যেসব জেনারেল ১৯৭১ সালের সঙ্গে জড়িত তারাও বাঙালি রমণী ধর্ষণের পক্ষে এমন সাফাই গাননি। জেনারেল নিয়াজি বরং অনেক কিছু করেছিলেন (তার মেয়েঘটিত ব্যাপার) তার কিছু বিবরণ অন্যরা দিয়েছেন। জেনারেল ফরমানও বলেছেন। [অব দ্য রেকর্ড], আমি সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকলাম।

নিয়াজি এসব অধ্যায়ের বারবার যা বলতে চেয়েছেন তা হলো এই যে, তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের নিচে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল প্রতিকূল এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তবুও মে মাসের মধ্যেই বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়ে যখন তিনি অবস্থা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন তখন একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানো যেত।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এ পরিপ্রেক্ষিতে, "কীভাবে?"

"কেন," ভারিক্কি চালে উত্তর দিলেন তিনি, "আমার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারা যোগাযোগ করছিল।"

"কারা?"

"ফজলুল কাদের চৌধুরী, আব্দুস সবুর খান, মৌলবী ফরিদ আহমেদ, সিরাজুল হক প্রমুখ। তারা বলছিলেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করে সরকার একটি রাজনৈতিক মীমাংসা করতে পারে।"

কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল এসব non-entity-র সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই। আলাপ করতে হবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিয়াজি অবশ্য এ সামান্য ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারেননি।

নিয়াজি লিখেছেন, ঐ সময় রাজনৈতিক মীমাংসা হলে আসাম জয় করে তিনি পৌঁছে যেতেন কলকাতায়। কারণ তখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে নাগা বিদ্রোহী লাল ডেংগা, ফিজো ও চারু মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এবং তাঁরাও এতে সহায়তা করতেন। নিয়াজির এই যুদ্ধ পরিকল্পনা জেনারেল হামিদ সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে বলেছিলেন, এসব জটিল ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামানোই ভালো।

ফলে নিয়াজিকে একাই যা করার করতে হয়েছে। কেন্দ্র থেকে তার জন্য কোনো স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। বাংলাদেশের আবহাওয়া হানাদারবাহিনীর সহ্য হচ্ছিল না। অভাব ছিল তাদের কাপড়-জামার। রাজাকার-আলবদরবাহিনীগুলি "Harrassed" হচ্ছিল। এমজিও (মাস্টার জেনারেল অব অডিন্যান্স) একজন বাঙালি লে.জে. ওয়াসিউদ্দিনের কাছে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে দরবার করতে গেলে নিয়াজির চিফ অব স্টাফকে গালিগালাজ করে তিনি বের করে দিয়েছিলেন এবং সাহায্য করতে রাজি হননি। ফলে তাকে নানারকম ধোঁকাবাজি করে প্রমাণ করতে হচ্ছিল যে, তার অধীনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চারটি ডিভিশন আছে যাতে তারা একটু সমঝে চলে।

এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে নিয়াজি আমাকে জানিয়েছেন যে, রাজাকারবাহিনী তারই সৃষ্টি। এবং তার সেনাবাহিনী হ্রাস পেতে থাকায় তিনি ঐ ডিভিশন পূরণ করতেন রাজাকার দিয়ে। শেষোক্ত মন্তব্য খুব সম্ভব সত্য নয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যরা অ্যামেচার রাজাকারদের নিয়ে একই পঙ্‌ক্তিতে যুদ্ধ করবে, এটিই অবাস্তব। তবে নিয়াজি যেটি খেয়াল করেননি সেটি হলো এই যে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকসেনারা নিয়মিত হত হচ্ছিল।

এরই মধ্যে ব্রিগেডিয়ার বাকের ইসলামাবাদ থেকে ফিরে নিয়াজিকে জানালেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের আশা কেন্দ্র ছেড়ে দিচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে scape goat করা হবে। তার অবস্থা যে কত খারাপ ছিল

তা প্রমাণের জন্য তিনি এরপর ফজল মুকিম খানের বই থেকে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন : ভূমিকাতেই কিন্তু তিনি আবার ফজল মুকিম খান-কে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। নিয়াজির অধীনে কোনো নৌ বা বিমানবাহিনী ছিল না। ৩ ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে লড়াই শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়াজির হিসাব-অনুযায়ী প্রায় চার হাজার সৈন্য নিহত ও দুহাজার আহত হয়েছিল যাদের পাঠাতে হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান।

নিয়াজির সব যুক্তি মেনে নিলেও দেখা যাবে একটি বিষয়ের উত্তর মিলছে না। তা হলো নব্বই হাজারের বেশি যুদ্ধবন্দি হলো কীভাবে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোনো যুদ্ধে এত বন্দি হয়েছে বলে জানা নেই।

ঢাকার পতন সম্পর্কে সবশেষে তিনি যা মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। এতে বোঝা যায়, তার পরাজয়টা তিনি মানতে পারছেন না এবং এটিকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরাজয় বলছেন যাকে ভারত বলছে সামরিক বিজয়। কিন্তু আসলে যে এটি ছিল পাকিস্তানের সামগ্রিক পরাজয়। এ সত্যটা তিনি বুঝেও মানতে চাননি। তিনি লিখেছেন– "To capture Dhaka the Indians would have had to fight hard and suffer losses to destroy my force but to their good luck when our President realized that the Indians were not capable of defeating us he for ulterior motives, insisted on our surrender. Because he and Bhutto could only get power by our defeat and Indian victory and not by our victory or a ceasefire. All I can say is that our political and diplomatic defeat was claimed by the Indians as a military victory which it was not."

আত্মসমর্পণের সময় যৌথ কমান্ডের মে. জেনারেল জ্যাকবকে নিয়াজি বলেছিলেন, যৌথ কমান্ডের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না। জ্যাকব বলেছিলেন, "টেক ইট অর লিভ ইট।" নিয়াজির ভাষায় তাদের ব্ল্যাকমেল করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, আত্মসমর্পণের ধারাসমূহ না মানলে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল মুক্তিবাহিনীর জন্য উন্মুক্ত করা দেয়া হবে।

এখানে একটু ব্যাখ্যা দরকার। পাকিস্তানে যাঁদের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে তারাও বলেছেন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে। মুক্তিবাহিনীর কথা তাঁরা উল্লেখই করেন না। বোঝা যায়, এটি তাদের আত্মশ্লাঘায় লাগে। এসব ছোটখাট বাঙালি যাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় নি, তারা কিনা ভারতীয় সাহায্যে 'আর্যদের' হারিয়ে দিল। নিয়াজি কিন্তু তার বইয়ে আগাগোড়া মুক্তিবাহিনীকে স্বীকার করেছেন, তাদের শৌর্যবীর্যের কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন যা আর কোনো জেনারেল করেননি। কিন্তু

যৌথ কমান্ড যার অংশ মুক্তিবাহিনী, তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এটা তিনি মানতে পারেননি। তাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ভারতের কাছে হার মানা যায়, মুক্তিবাহিনীর কাছে নয়। নিয়াজির কাছে ছিল এটিই ট্রাজেডি। তবে আত্মসমর্পণের সময় তার সত্যিকার অনুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন। এখানে কোনো চাতুরি করেননি। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রমনার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তার সঙ্গে ছিলেন মে. জে. ফরমান আলি ও অ্যাডমিরাল শরিফ। নিয়াজির ভাষায়– "As I signed the document with trembling hands, sorrow rose from my heart to my eyes brimming them with unshed tears of despair and frustration. Before the surrender ceremony, a french reporter came to me and said, How are you feeling tiger? I replied, "Depressed."

এই দৃশ্যটি শুধু ১৬ ডিসেম্বর, একবার পাকিস্তানি টেলিভিশনে দেখানো হয়েছিল। পাকিস্তানিরা জানিয়েছে, এতে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে এ দৃশ্য আর কখনও দেখানো হয়নি। কারণ এই আত্মসমর্পণের সঙ্গেই পাকিস্তানের সমস্ত দর্প, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ নস্যাত হয়ে গিয়েছিল।

নিয়াজিকে আমিও একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের জন্য তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। লিখেছেন তিনি,

"I swallowed my pride and made the supreme sacrifice of reputation, honour and honour of my gallant troops in national interest."

পাকিস্তান কেন পরাজিত হলো? নিয়াজি তা বর্ণনা করেছেন তার বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যার শিরোনাম– "Engineered debacle." অর্থাৎ পাকিস্তানের ভাঙনের পিছে পাকিস্তানি শাসকচক্রের দীর্ঘমেয়াদী একধরনের ষড়যন্ত্র ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার বইয়ের নাম *দি বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান* কেন? তিনি বলেছিলেন, কারণ পাকিস্তান বিট্রে করেছিল। সুকৌশলে শাসকচক্র সেই পথ অনুসরণ করেছিল। আমরা যেসব পাকিস্তানির সঙ্গে আলাপ করেছি, এখন তারাও তা স্বীকার করেছেন। নিয়াজি তা স্বীকার করেছেন এবং এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তার বইয়ের প্রথম দিকে পূর্ব ধারণাবশত যেসব মন্তব্য করেছেন তা নস্যাত করে দিয়েছেন। সত্যের মুখোমুখি হয়ে সত্য তুলে ধরতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া আত্মপক্ষ সমর্থনে তার অন্য কোনো উপায় ছিল না। তার ভাষায়– "However, it was a consistent policy of all rulers to deprive East Pakistanis of their legitimate right of participation in governance and decision making process of the country. The result of 1970 election could have kept

Pakistan together if the democratic process of rule by the majority party had been adhered to."

ঢাকার পতনের পর যুদ্ধবন্দি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্য সচিব মুজাফফর আহমদ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন– এমএম আহমদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো। এবং নিজের অজান্তে নিয়াজিও স্বীকার করেছেন তিনিও সেই দলের, কারণ "জাতীয় স্বার্থে" তিনি আত্মসর্পণ করেছিলেন। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব ও পশ্চিম মিলে যে পাকিস্তান ছিল তার স্বার্থে নয়। পাকিস্তানের পরাজয়ের জন্য নিয়াজি, জেনারেল ইয়াহিয়া তো বটেই, এয়ার মার্শাল রহিম, লে.জে. গুল হাসান, টিক্কা খান, ফরমান আলিকে দায়ী করেছেন। আর.পি. সাহা ও তাঁর পুত্রের হত্যার ব্যাপারে টিক্কার হাত ছিল বলে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। ভূট্টোকেও দায়ী করে লিখেছেন, ভূট্টো ছিলেন তার মতে ষড়যন্ত্রে সেরা যিনি ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। নিয়াজির ক্রোধ বেশি রাও ফরমান আলীর ওপর। তার মতে, ফরমান শুধু সুবিধাবাদী ষড়যন্ত্রীই ছিলেন না, অর্থও আত্মসাত করেছিলেন। ফরমান তাকে বলেছিলেন পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে, কারণ "Mukti Bahini would kill him for his alleged massacre of the Bengalis and intellectuals on the night of 15/16th December. It was a pathetic sight to see him pale and almost on the verge of break-down." কিন্তু নিয়াজি তখন তাকে বলেছিলেন, তার জানের বদলেও তিনি ফরমানকে মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেবেন না এবং সে কথা তিনি রেখেছিলেন।

নিয়াজির বইয়ের পরিশিষ্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তৃতীয় পরিশিষ্টটি। ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ সালে তিনি একটি চিঠি দিয়েছিলেন যার বিষয় ছিল– যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলা। এ-চিঠিতে স্পষ্ট যে, পাকিস্তানি বাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। অথচ পুরো বইয়ে তিনি তা অস্বীকার করেছেন।

নিয়াজির বইটি পাকিস্তানে কেউ পছন্দ করেনি। আলতাফ গওহর লিখেছেন বইটি হলো– "Is not a confession but a long unending whimper from cover to cover." তাঁর মতে, বইটি হলো অপাঠ্য যার যোগ্য জায়গা ডাস্টবিন। এর কারণ, নিয়াজি হচ্ছেন পাকিস্তানের পরাজয়ের চূর্ণিত দম্ভের প্রতীক। আত্মসমর্পণের পর জেনারেল নিয়াজি পাকিস্তানিদের কাছে 'বাঘ' থেকে পরিণত হয়েছেন 'বিড়াল'-এ। অন্য কথায় বলা যায় পাকিস্তানিদের গর্ব সেনাবাহিনী 'বাঘ' থেকে পরিণত হয়েছিল 'বিড়াল'এ। এটি যে কোনো পাকিস্তানি তিনি যত লিবারেল-ই হন-না কেন, মেনে নেয়া কষ্টকর। কিন্তু

বইটি সম্পূর্ণ অন্য কারণে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। নিয়াজির দম্ভোক্তি, মিথ্যাচার বাদ দিলে আমরা এমন অনেক তথ্য পাই যা কোনো পাকিস্তানি জেনারেল স্বীকার করতে চাননি। নিয়াজিও চাননি কিন্তু নিজ স্বার্থে তাকে তা স্বীকার করতে হয়েছে। আলতাফ গওহরের বক্তব্য উল্টো করে বলা যায়, নিয়াজির মিথ্যাচার হলো whimper আর যা স্বীকার করেছেন বাধ্য হয়ে তা হলো confession.

সবশেষে বলব, নিয়াজির বই পড়ে এবং তার সঙ্গে আলাপ করে আমার মনে হয়েছে, নিয়াজি হলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর (অধিকাংশের) মূর্ত প্রতীক। এরা নিরেট, রোবটের মতো। দম্ভ তাদের প্রচুর এবং পাকিস্তানকেই তারা মনে করে বিশ্ব। পাকিস্তানি জেনারেলদের বুদ্ধিমান অংশ (মুষ্টিমেয়) এদের ব্যবহার করেছে সবসময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭১ সালে বুদ্ধিমান জেনারেলরা বুঝেছিলেন, অন্তিমে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে। তাই তারা কেউ এখানে আসেননি এবং যারা ছিলেন তারাও চলে গিয়েছিলেন। পরাজয়ের দায়দায়িত্ব নিতে তারা রাজি ছিলেন না। নিয়াজিকে বলা মাত্রই তিনি এসেছেন এবং সদর্পে লুটেরা, হত্যাকারী, ধর্ষণকারী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি যে যুদ্ধাপরাধী এই বোধও তার নেই। এখনও তিনি মনে করেন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, তাই হয়তো একসময় কনফেডারেশন হবে। আবার এও মনে করেন, বাঙালিরা হিন্দু ভাবাপন্ন; রাজাকাররা তার মিত্র, একান্ত প্রিয়। নিজ সৈন্যরাও নয়, যাদের সাহসের কথা বারবার তিনি উল্লেখ করেছেন। নিজ সৈন্যরা প্রিয় হলে বইটি তাদেরই উৎসর্গ করতেন, রাজাকারদের নয়। পাকিস্তানি জেনারেলদের মনোজগত বুঝতে হলে তাই নিয়াজির বইটি পাঠ করা দরকার।

লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির সাক্ষাৎকার

প্র: তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে আপনার সাধারণ ধারণার কথা বলবেন?

উ: পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে কখনও প্রকৃত সত্য বা বাস্তবতা কি তা জানান হয়নি। এর কারণ, যখন জেনারেল টিক্কা পূর্বপাকিস্তানে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি বিদেশী সাংবাদিক, রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যানদেরকে

হুঁশিয়ার করে দেন ও সেখান থেকে তাদেরকে অবমাননাকরভাবে বের করে দেন। এর পরিণতি হিসেবে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। আর সব বানোয়াট খবর প্রচার করতে ও ছাপাতে থাকে। তাদের ঐ সব কাহিনির উপাদান যোগাড় করত ঐ সময় যেসব লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে যাচ্ছিল তাদের কাছ থেকে। তাদের কথার ওপরই নির্ভর করছিল বিদেশী তথ্যমাধ্যমগুলি। ভারতীয়রা বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনের মাথা ধোলাই করছিল আর ভারতীয়রা যা-ই বলুক বিদেশীরা তা লুফে নিচ্ছিল। ফলে যা হবার তাই হয়, প্রকৃত সত্য কখনও বেরিয়ে আসেনি। যাহোক, তখন পশ্চিম পাকিস্তানেও সামরিক আইন বলবৎ ছিল। তাই জনসাধারণও পূর্বে কি ঘটছে তা খুঁজে পেতে জানার জন্য তেমন আগ্রহ বোধ করেননি। আমি যখন দায়িত্বভার নিই তখন সরকার পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা করেন। ইয়াহিয়া ও ভূট্টো চেষ্টা করেন বাংলাদেশে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। ভূট্টো ও ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিজেদেরকে আরও বলিষ্ঠ, শক্তিশালী করে তুলতে ও পশ্চিম পাকিস্তানকে শাসন করতে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে না ঘটছে তা তারা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্যের পত্রপত্রিকায় যা ছাপা হচ্ছিল তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। এর আরও একটা কারণ হলো, দেশের কাগজপত্রেও তখন ঘটনা সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ করা হচ্ছিল না।

প্র: জেনারেল আপনি এসব কথা বলছেন কারণ এখন আপনার এসব জানার সুযোগ হয়েছে। আপনি পরবর্তীকালে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। ভালো কথা। কিন্তু আমরা জানতে চাই, তখন তাদের চিন্তা-ভাবনা কী ছিল? তখন কি আপনি এ সব কথা জানতেন?

উ: না, জানতাম না। কারণ, আমি তখন আমার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে লক্ষ করি, ওখানকার জনসাধারণ আসল ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানে না, ওরা সব আমার কাছে নির্বোধসুলভ প্রশ্ন করছে। এর ফল হিসেবে সত্য-মিথ্যার আঁস্তাকুড়ে চাপা পড়ে থাকে, প্রহসন হয়ে ওঠে সবকিছু। কেউ-কেউ আসলে ঘটনা কী তা লেখেও, কেননা, কারা পাকিস্তান ভেঙেছে তা জানতে তারা আগ্রহী ছিলেন। এ ভাঙনের নায়ক ভূট্টো, এ ভাঙনের নায়ক মুজিব। তাই এই নির্মম, নিষ্ঠুর যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হলে বাইরের জগতের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তখন উপায় ছিল না।

প্র: এই বাইরের, বিদেশীরা কারা?

উ: তারা হলো, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, আফগানিস্তান ও ইসরাইল। এ কারণেই

তারা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলিতে নির্বাচনে লড়েনি।

প্র: না, কথাটা ঠিক নয়। কেননা, আওয়ামী লীগ তো পশ্চিম পাকিস্তানেও নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে, লড়েছে।

উ: কিন্তু ওরা নির্বাচনে জেতেনি। ওরা তা চায়ওনি।

প্র: আওয়ামী লীগের তো নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক দলীয় সংগঠন ছিল।

উ: ওরা ভোটের জন্য লোক খুঁজত বটে। তবে ভুট্টোর পার্টিই ছিল আধিপত্যশীল। আমি পাকিস্তানে ফেরার পর একটা দল গঠন করেছিলাম।

প্র: তা ঐ দলটির নাম কী ছিল?

উ: দলটির নাম... মুজাহিদ... না ফেদাইন পার্টি। তবে সরকার এ দল গঠনের অনুমতি দেয়নি।

প্র: কেন? কেন, এই অনুমোদন দেওয়া হলো না?

উ: কেননা, ওটা আমার দল, তাই! আর জানেনই তো ভুট্টোর সরকার আমার বিরুদ্ধে ছিল। আমাকে এ ব্যাপারে অনেক আশ্বাস, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে দলীয় একটা টিকেট আমাকে দেওয়া হবে। অবশ্য নানা মহলে যে কথা প্রচলিত তা হলো, টিকেট পাওয়ার জন্য কিছু লোকই থাকে যেখানেই যেতে চায় সেখানে যাবার টিকেট পেয়েও যায় তারা, পেয়ে যায় তা আবশ্যিকভাবেই। কাজেই কিছু জিনিস আছে যার প্রতিবন্ধকতা কখনও সরে না। তারপর আমি এই বইটি লিখি। আমার প্রায় নিশ্চিত আশঙ্কা ছিল যে, বহু লোক আমার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে। কেননা, আমার যা কিছু চোখে পড়েছে আমি তার সবকিছুই ফাঁস করে দিয়েছি কোনো রাখঢাক করিনি। প্রকৃত সত্য কী তা ছেঁকে তুলতে আমার ৫ থেকে ৬ বছর সময় লেগেছে গবেষণা-সমীক্ষায় আর তারপর যদি আমি বাস্তব প্রমাণসহকারে না বলি তাহলে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না কারণ আমি তো ক্ষতিগ্রস্ত। আপনারা যা জানতে চাচ্ছেন তার সব বিষয়ই আমি আমার এই বইয়ে সন্নিবেশিত করেছি। আবার আমি গোড়ায় ফিরে যাই, মুজিব সমর্থকও ছিল, মুজিববিরোধীও ছিল। কাজেই সত্যিকার অর্থে তখন ভুট্টোই সরকার হিসেবে কাজ করছিলেন। তার সমর্থকদের সেটিই ছিল কাম্য। কিন্তু নেপথ্যের আসল ঘটনা তারা কখনও জানতে পারেনি। তবে আমি আপনাদের কাছে একটা বড় জিনিসের উল্লেখ করতে চাই সেটি হলো আমাদের তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক দল-উপদল ছিল, মতভেদের অন্ত ছিল না পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে। সেদিন আমরা আত্মসমর্পণ করেছিলাম। যে সব অফিসার আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তারা ছিল আমার ছাত্র। তারা আমাকে ভালো করে চিনত। আমিও তাদের চিনতাম।

এদের তিনজন অফিসার মেসে থাকত আর আমি তাদের খরচ যোগাতাম। একদিন চোর হানা দেয় তাদের সেই মেসে, তাদের সবকিছু লাপাত্তা হয়ে যায়। এরপর সংশ্লিষ্ট ঐ অফিসারটি যখন এখানে ছিল তখন তার স্ত্রী আমাদেরকে ঠাট্টা করে বলত, আরে এখানে তো কোনো রুশী নেই! আসলেও ঐ সময়টায় সবরকমের প্রচারণা, রটনা চলছিল তার কোনো শেষ ছিল না। তা সে যা-ই হোক, আমি এখনও '৭১-এর নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতি নই। আমি এখানে তো ফিরে এলাম। আমি এখন আপনাদেরকে এ বিষয়ে কিছু উপকরণ দেব যা একজন ব্রিটিশ নাগরিকের প্রকাশনা যাতে পূর্ব পাকিস্তানিরা কী নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে। আমি ধরুন সেখানে ছিলাম, আপনারা ওখানে ছিলেন। এখন আসা যাক, কিভাবে ঘটনা গড়িয়েছে আপনাদের ওখানে। ৭০-এর মহাঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের দুর্যোগ ছিল দারুণ গুরুতর রকমের ঘটনা। ঐ সময় রিয়ার অ্যাডমিরাল এ কে এম আহসান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাধিনায়ক। আহসান ঐ সময় প্রথম দিকে ঘূর্ণিদুর্গতদের কাজে হেলিকপ্টার চেয়েছিলেন। সামরিক তরফে ক্ষমতাবান সাহেবজাদা ইয়াকুব সে অনুরোধ রাখেননি। অথচ সে সহযোগিতা করা তার জন্যে ছিল নৈতিক কর্তব্য। এতে যা হলো তাতে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বিপদের দিনে তাদের সেই দুঃখ-কষ্টের অংশীদার তিনি হলেন না। এর পরে আরেকদল যারা এলো, তাতেও অবস্থার তেমন রকমফের হলো না, ভালো কিছু হলো না। আর এর ফলে ওখানকার মানুষের মনে একধরনের সংশয়-সন্দেহ জন্ম নিল। ওরা ভাবল, 'আমাদের সঙ্কটের সময়ে ওরা আমাদের সাহায্যে এলো না'। তবে তারা যেসব মানুষকে দোষারোপ করতে চেয়েছে তারা কোনো সমষ্টি নয় আসলে একজন ব্যক্তিবিশেষ। কিন্তু একথাও সত্যি, তিনি তো আসলে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন কোনো এক জনসমষ্টির। আর তাই ব্যাপারটা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তবে সে সময়ে সেনাবাহিনীতে দেশের দুই অংশের সমতা ছিল। ১২ ব্যাটালিয়ান সৈন্য ছিল পশ্চিম ও পূর্ব উভয় তরফে। আর উভয় দিকেই ছিল ১ জন করে ইউনিট অফিসার। তাই বিভেদের রেখাটি ঠিক এখানে তৈরি হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তান উভয় অঞ্চলেই এসব ইউনিট অফিসাররা ছিল। আর সে কারণে একটা বৃহত্তর ধারণায় তখন সেনাবাহিনীতে একটা শৃঙ্খলা ছিল। তবে আনুষ্ঠানিকতা-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কিছুটা হতাশা ছিল।

এরপর আসে নির্বাচন। সেই সময়ে ইয়াহিয়া ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

আমরা তাঁকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে যেভাবেই জানি-না কেন, তিনি নিঃসন্দেহে স্বার্থপর ও লোভী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোনো-না-কোনোভাবে আইয়ুবকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন ও মুজিবকে এমন সব কাজে উৎসাহিত করেন যাতে সামরিক আইন জারি করার অবকাশ ঘটবে না, ওটা করা হবে না যদি তাকে (ইয়াহিয়াকে) ক্ষমতা থেকে সরাবার ব্যবস্থা না করা হয়। আর তাঁদের মধ্যে এই মর্মে একটা সমঝোতা ছিল যে, যদি মুজিব কথা দেন যে তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে তারপরেও ইয়াহিয়া ক্ষমতায় থেকে যাবেন তাহলে ইয়াহিয়া আপনারা যাকে বলেন প্যারিটি ও এক ইউনিট ভাঙার সেই প্যারিটি ও এক ইউনিট ভাঙার পর পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে ওঠে ৩৫%, পূর্ব পাকিস্তানও ৩৫%, তারপর আমরা আবার এক ইউনিটের সুবাদে...

প্র: আমি তো মনে করি, ভোটের বণ্টনের ব্যাপারটি সবসময় ঘটে থাকে জনসংখ্যা অনুপাতে...

উ: না, তবে প্যারিটির আওতায় ঠিক হয় হবে সমান সমান অনুপাতে; ৫০ আসন এখানে ৫০ আসন ওখানে... এভাবে। অন্যথায় যে অঞ্চলে জনসংখ্যা বেশি সেখানে ভোটও বেশি হওয়াই উচিৎ ছিল। তবে এ ব্যবস্থার আগে এরকম একটা আশঙ্কা ছিল ও তার কারণও এরকম ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে একটি শিক্ষিত হিন্দু জনসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। যদি তারা সরকার গঠনে একটা বড়রকমের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় তাহলে ঐ হিন্দুসম্প্রদায় সেখানে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবে।

প্র: তা পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কত ছিল?

উ: ঐ সময়ে প্রায় এক কোটি। তারা ছিল সবাই শিক্ষিত। তারা সবাই ভালো সরকারি পদে কায়েমি ছিল। ওদের মধ্যে অনেকে ছিল অধ্যাপক, শিক্ষক। ওদের প্রায় সকলেই ছিল শিক্ষক। এরকম অবস্থায় দেশের জন্য কোনো শাসনতন্ত্র রচনা ও সেটি অনুমোদন করতে হলে সে ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাদের জোর প্রভাব ফেলবে। অন্তত এখানে তখন সে ধারণাই কাজ করে।

প্র: কোথায় এ ধারণা দেওয়া হয়? পশ্চিম পাকিস্তানে?

উ: ঠিক তাই।

প্র: সে হোক, তবে আপনি নিজেও কি সেই একই ধারণা পোষণ করেন?

উ: আরে না, না, আমি তো একজন সৈনিক বৈ নই! আমার এসব নিয়ে কিছুই করার ছিল না। আমি সেভাবে বিষয়টি ভেবেও দেখিনি। আমাদের কালে আমরা প্রশিক্ষণ পেয়েছি তা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের সেই প্রশিক্ষণের আওতায় আমাদের বলা হতো : কি ঘটে-না-ঘটে তাতে তোমাদের মাথা

ঘামাবার কিছুই নেই, তোমরা তোমাদের দেশ ও শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত। আমরা তাই প্রতিষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত, ঘটনা যা-ই হোক তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।

প্র: কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনারা অনুগত?

উ: আমার ইউনিট, সেনাবাহিনী, প্রতিষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের প্রতি যার আওতায় আমি এ মর্মে শপথ নিয়েছি যে, আমি দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, বিশ্বস্ত থাকব...। সেই সময়ে আমরা অসামরিক লোকজন সম্পর্কে একটা শৃঙ্খলা মেনে চলতাম। কেউ বাইরে থেকে এলে, ও সে ব্যক্তি কোনো রাজনীতিক হলে আমি তাকে সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দিতাম না। এমনকি, আগন্তুক আমার বন্ধু হলেও তিনি যদি রাজনীতিতে লিপ্ত থাকতেন তাঁকেও আমি ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশের অনুমতি দেইনি। যাহোক ওখানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কারচুপি হয়। এ বিষয়ে আমাকে জানান মৌলভী...।

প্র: কোন নির্বাচনের কথা বলছেন আপনি? ১৯৭০-এর...।

উ: ১৯৭০-এর। একথা আমাকে বলেছেন ফজলুল কাদের চৌধুরী, মোনেম খান, মৌলভী ফরিদ আহমদ ও আরও বেশকিছু লোক যারা ছিলেন পাকিস্তানপন্থি। একটিমাত্র লোক এখানে সবকিছু ঘটানোর পরিকল্পনা করছে, সবকিছু করছে, তাকে থামানো দরকার। এ অবস্থায় সামরিক আইন প্রশাসন যদি বাংলাদেশে ঐসব লোককে নির্বাচনে আসতে না দিত আমরা নির্বাচনে বিভিন্ন নগর ও জনপদে ৫০ থেকে ৬০টি আসনে জয়ী হতে পারি। ঐ সময়ে আমাদের হাতে ৫০/৬০টি আসন থাকলে মুজিবুর রহমান এরকম বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেন না। আর সকল বিষয়ে তিনি এতখানি প্রভাব খাটাতেও পারতেন না। তবে সেক্ষেত্রেও সামরিক আইন-কর্তৃপক্ষকে নন্দঘোষ করা হয়। বলা হয়, এই কর্তৃপক্ষই তাঁকে নির্বাচনে আসতে দিয়েছে। এসবের আলোকে, পশ্চিমপাকিস্তানে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হলেও পূর্ব পাকিস্তানে তা হয়নি। আমি মনে করি, আপনাদের হয়তো মনে আছে যে, ফজলুল কাদের চৌধুরী... একজন মাননীয় ব্যক্তি, সবুর খান, মোনায়েম খান, টেকনাফের মৌলভী ফরিদ আহমদ– এরা সবাই ছিলেন পাকিস্তানপন্থি, তারা আমার কাছে আসতেন। সকলেই আসতেন। আপনারা হয়তো জানেন না যে, ময়মনসিংহে গিয়ে আমি বলতে গেলে জনতার মাঝে মিশে যাই। তাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, আমি তাদের কোনো ক্ষতি করছি না। আমি এভাবেই জনতার ভিড়ে মিশে যেতাম, তাতে আমার কোনো বিপদ ঘটেনি। মুজিব নির্বাচনে জয়ী হবার পর ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। তিনি তখন বলতে থাকেন, শেখ মুজিবুর

রহমান আমার ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। তবে মুজিব জবাবে জানান, কিন্তু আপনি আমার প্রেসিডেন্ট নন। কেন?... আপনি তো অঙ্গীকার করেছিলেন! মুজিব তাকে সাফ জানিয়ে দেন, দেখুন, আমি একজন রাজনীতিবিদ। এর ফলে ইয়াহিয়ার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়, তাঁর চৈতন্যোদয় ঘটে। তার ভাবখানা ছিল এই যে, আমি তাঁর জন্য এক ইউনিট ভেঙেছি, প্যারিটি ভেঙেছি তাঁরই কারণে, নির্বাচনে তিনি কী করছেন-না করছেন তাতে ভ্রূক্ষেপও করিনি আর সেই তিনি কি না এখন...! ইতোমধ্যে ভূট্টো যিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ৮২টি আসন পেয়েছিলেন তিনিও মুজিবের কাছে ছোটেন। তাঁর কাছে সরকারে নিজ দলের ভাগ চান তিনি। তিনি বললেন, আমাকে আপনার ২ নম্বর ব্যক্তি করুন। মুজিব তাতে বললেন, না। ভূট্টো বললেন, ঠিক আছে মন্ত্রিসভাতেই না-হয় কিছু প্রান্তিক দপ্তর দিন? 'না, তা-ও নয়'। 'ঠিক আছে, স্পিকারের পদটি তো দেবেন?' 'না'। ভূট্টো এরপর অন্য ধরনের পাঁয়তারা শুরু করেন। ইয়াহিয়া তাঁকে জানান, লোকটা আমাকে কথা দিয়েছে যে, সে আমাকে প্রেসিডেন্ট করবে। 'তো বেশ তো, আমিও আপনাকে প্রেসিডেন্ট বানাব!' 'কী করে আপনি আমাকে প্রেসিডেন্ট করবেন?' 'ও সেই কথা, ভাববেন না, পশ্চিম পাকিস্তান তো আমাদের থাকবে। আপনি হবেন প্রেসিডেন্ট আর আমি হব প্রধানমন্ত্রী। এসব কথাবার্তার আলোকে ভূট্টো তাকে শিকারের দাওয়াত দিয়ে লারকানায় নিয়ে যান। সেখানে তারা এক মতলব আঁটেন। এটিকেই বলা হয়, 'লারকানা পরিকল্পনা'। পরিকল্পনাটি ছিল এরকম : 'স্থলবর্তী হবার মতো সরকার না রেখেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমরা সরে পড়ব, বাস।" আমি এরকম দাবি আবারও করছি।

প্র: জি হ্যাঁ। আপনি সে কথা আপনার বইয়ে বলেছেনও। পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতায় কোনো উত্তরাধিকারী না রেখেই আপনারা সেখান থেকে সরে আসবেন। কিন্তু আপনারা লারকানা পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলেন কী করে?

উ: বিষয়টি গোপনীয়। কাজী আজম নামে একজন ডিএসপি ছিল। সিকিউরিটির লোকেরা তাকে লারকানায় পাঠায়। কাজী আজম লারকানায় গিয়ে এক লোকের সাথে দেখা করে। ঐ সময়ে ভূট্টো ও ইয়াহিয়া শিকার-ভ্রমণের নৌকায় বসে পরিকল্পনাটি করেন। ঐ আলোচনাকালে সেখানে এক লোক ছিল। আমি কাজী আজমের কাছ থেকেই বিষয়টি জানতে পারি, কাজী আজম জানতে পারে সেই লোকটির কাছ থেকে। তবে ঐ লোক তথ্য ফাঁস করার পর সেটি ভূট্টোর কানেও যায়। তিনি এটিকে চেপে যেতে চেয়েছিলেন এই মনে করে যে, বিষয়টি আর কেউ জানে না মনে করে। আর সে কারণেই ওটা

জানাজানি হয়ে যায়। না হলে ঘটনাটি গোপনই থেকে যেত। কিন্তু কেউ একজন বুদ্ধি করে পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেয়। পত্রপত্রিকাতেও তখন এ খবর ছাপা হয়।

প্র: কবে এ খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়?

উ: ঐ সময়ই। আমার ধারণা, তখন ফেব্রুয়ারি মাস চলছে। এরপর পরিকল্পনার হোতারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। একটি পরিকল্পনামাফিক কাজে সর্বোত্তম ফললাভের উপায় ছিল দেশের পশ্চিমাঞ্চলে জোরেশোরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যার অর্থ আমাদের এখানে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে লড়াই চালানোর জন্য সেনা সরবরাহ পাওয়া যাবে কম, বিপুল সেনা মোতায়েন থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানে। এভাবে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতকে পরাজিত করব আর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের কাছে পরাজয় বরণ করবে। লারকানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলেও ওরা একথাটি ভুলে যায় যে, তাদের বরাতজোর সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত করতে হলে পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে লড়েই সেটি জয় করে নিতে হবে। আর সে পরিকল্পনা শুধু ফলপ্রসূ হতে পারে যদি আমরা এখানে পরাজিত হই। যদি আমি ঘটনাক্রমে এখানে জয়ী হই বা কোনো নাজুক, জটিল প্রকৃতির একটা নিষ্পত্তি এখানে সম্ভব হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লারকানা পরিকল্পনা সফল হবে না। এ ধরনের নিষ্পত্তির আওতায় রাজনীতিবিদরা যদি সরকার করায়ত্ত করতে পারে তাহলে ইয়াহিয়া খানকে এজন্যে দায়ী করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। আর তেমন পরিস্থিতিতে ভূট্টোও কোথাও পাত্তা পাবেন না কেননা, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাতে বাধ সাধবে। কাজেই এই খেলায় যে বাদ পড়বে তাকে চলে যেতে হবে বিস্মৃতির নিভৃত নেপথ্যে।

প্র: এ কারণেই সঙ্কটের রাজনৈতিক মীমাংসার সকল সম্ভাবনাই পুরোপুরি নাকচ হয়ে যায়?

উ: সেটিই কারণ। ওটা হলে তো ঐ দুটি লোকের কারো তো আর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

প্র: কখন আপনি বুঝতে পারলেন যে, সঙ্কটের কোনো রাজনৈতিক সমাধান হতে যাচ্ছে না?

উ: পরিকল্পনাটি নিয়ে যখন তারা উদ্যোগী হন। পরিকল্পনাটি ছিল এই যে...,

প্র: আপনি ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের অধিনায়ক। আপনি জানতেন যে, লারকানা পরিকল্পনা বা চক্রান্ত একটা রয়েছে?

উ: না, জানা ছিল না। আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আমার বই লেখার সময় সেটি জানতে পারি।

প্র: ঐ সময়েই পত্রপত্রিকায় সে খবর ছাপা হলো আর আপনি তা আদৌ জানলেন না, এ কেমন কথা?

উ: তখন ইয়াহিয়া মারা গেছেন। ভূট্টোও ক্ষমতা হারিয়েছেন। আর সে সময়টাই বহু লোকের কাছ থেকে বহু তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে।... সে যা-ই হোক, তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকেন। তাদের ধারণা ছিল আমার পরাজয়ে তাদের ফায়দা হবে। তাদের বিশ্বাস ছিল, গেরিলাযুদ্ধ যারা করে তারা কখনও পরাজিত হয় না। অথচ আমি মাত্র ২ মাসে গেরিলাদের পরাজিত করেছিলাম। আমি নিজে ইন্দোনেশিয় গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়েছি, লড়েছি মালয়ে চীনা গেরিলাদের বিরুদ্ধে।

প্র: আপনি সেসব আপনার বইতে উল্লেখ করেছেন।

উ: সে সামর্থ্য আমার ছিল। আমার চোর ধরার ক্ষমতা যেমন ছিল, তেমনি চোর আমি নতুন কোনো বাড়িতে সেঁধিয়ে দিতেও পারতাম। দুমাসের মধ্যে আমি এমন এক অবস্থান নিয়েছিলাম ও অবস্থা যা দাঁড়ায় তা গেরিলাযুদ্ধে রীতিমতো বিদ্যুতগতিসম্পন্ন অভিযান বলেই বিবেচিত হয়। এসবের বিবরণ আমার বইয়ে রয়েছে।

প্র: কখন সেই গেরিলা যুদ্ধের শুরু?

উ: যেদিন আমি দায়িত্ব নিই সেইদিন থেকেই।

প্র: অর্থাৎ দিনটি?

উ: ১০ এপ্রিল, ১৯৭১। ঐ সময় আমি দারুণ খোশমেজাজে ছিলাম। ওরা এতদিন ছিল কাদামাখা, উর্দিহীন। কিন্তু ঐ দিন থেকে ওদের গায়ে উর্দি চড়ে। কর্নেল ওসমানী হলেন ঐ গেরিলাবাহিনীর প্রধান। ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন আমার বন্ধুমানুষ। একসময় ওসমানী ছিলেন পাকিস্তানের সেনা সদরদপ্তরে, আর আমি তখন ছিলাম এখানে। আমার অন্যতম খেতাব ছিল 'শেরা' (বাঘ)। তাই ওসমানী যখনই আমাকে টেলিফোন করতেন তখনই বলতেন, 'টাইগার! হ্যালো, আমি টাইগার বলছি।'

প্র: সেটার অভিজ্ঞতাও আপনার হয়েছে নিশ্চয়ই?

উ: আমি জবাবে বলতাম, আরে আপনি তো সিনিয়র টাইগার। আপনি তো ইস্ট পাকিস্তান (বেঙ্গল) রেজিমেন্টের লোক যাদের প্রতীক 'বাঘ'! এজন্য তাঁকে টাইগার হিসেবে ভালোই দেখাত। এভাবে ওসমানী হলেন প্রধান সেনাপতি। আমি এই ভেবে খুশি হলাম যে, আমি এখন উর্দিপরা সশস্ত্রবাহিনীর

বিরুদ্ধে লড়ব, কিছু অসামরিক লোকের বিরুদ্ধে নয়।

প্র: এই 'শেরা' ছাড়া আপনার খেতাব কী আছে?

উ: তারিখ বিন যিয়াদ, একজন পশ্চিম পাকিস্তানি আমাকে এই নামটা দেয়... আমার আরেক খেতাব মেরিডোন... আমি একসময় রাজপুত রেজিমেন্ট (ব্রিটিশ ভারতে) ছিলাম। আপনারা জানেন, রাজপুতরা রাজপুতানার লোক। রাজপুতরা সাহসী লোক। রাজপুতদের এক বীরনায়কের নাম অমর সিং রাঠোর। সেনাবাহিনীতে আমার মুসলিম সহকর্মীরা আমাকে ডাকত অমর সিং বাহাদুর বলে। এসব হলো গিয়ে... মানে এসবের তিনটি খেতাব ছিল আমার পাকাপোক্ত। তাই আমি যখন গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সীমান্ত অবধি পৌঁছে গেলাম... সে এক লম্বা কাহিনী গুছিয়ে বলতে গেলে...।

প্র: না, আপনি এসব বিষয় বিস্তারিত আপনার বইতেই লিখেছেন, লিখেছেন আপনার রণবিন্যাস সম্পর্কেও। আমরা বরং কিছুটা অন্য ধরনের প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব আপনার কাছে। আপনি ১০ এপ্রিল দায়িত্বে আসার পর জেনারেল টিক্কা খানের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল, বিদ্যুৎগতিতে এক অভিযান পরিচালনার। কথা ছিল সে অভিযান শুরু হবে ২৫ মার্চ। অভিযানের নাম ছিল : অপারেশন সার্চলাইট। এ অভিযানের পর পরই চলবে চিরুনি অভিযান (কম্বিং অপারেশন) ও অন্য আর সবকিছু। মনে করা হয়েছিল, এ অভিযানে বিক্ষোভ দমন হবে ও তাঁরা একটা রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে উপনীত হবেন। এ-ই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু আপনারা যদি, আপনাদের কথামতো দুমাসের মধ্যে বিদ্রোহী বা মুক্তিবাহিনীকে কব্জা করেই ফেলেন তাহলে তখন কেন আপনারা একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছাতে পারলেন না? কেন আপনারা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মতো বিকল্প বেছে নিলেন? শ্রীলঙ্কা হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আপনাকে পূর্ব পাকিস্তানে রসদ, অস্ত্র, সেনা সাহায্য পাঠানোর কাজটিকে সেক্ষেত্রে খুব কঠিন ছিল না?

উ: সে কথা আমি আপনাকে বলছি। ইয়াহিয়া ও সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ছিলেন। তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল যার নাম ছিল, 'অপারেশন ব্লিৎজ'।

প্র: '৭০-এর গোড়ার দিকে? নির্বাচনের আগে না পরে?

উ: না, না। নির্বাচনেরও অনেক আগে। এমনকি ১৯৬৯-এ তিনি এ পরিকল্পনা করেন।

প্র: আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, এ হলো সেই পরিকল্পনা যা তিনি তৈরি করেছিলেন...

উ: নির্বাচনের আগেই পরিকল্পনা করা হয়। ঠিক করা হয়, নির্বাচন হোক

বা না হোক যদি গোলযোগ দেখা দেয়, কোনোরকম গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে সে ধরনের উত্থান দমন করার জন্য তিনি এই পরিকল্পনা তৈরি করেন।

প্র: না, আমি বলতে চাই, আপনি আপনার বইয়ে অপারেশন ব্লিৎজ সম্পর্কে যা দাবি করছেন তার কিছু কিছু জবাব জেনারেল ইয়াকুব পত্রিকায় দিয়েছেন। আপনি কী তা দেখেছেন?

উ: দেখেছি। সেটি অন্য প্রশ্ন। ফিল্ড মার্শাল রোমেল বলেছেন, কোনো পরিকল্পনায় তার শেষাবধি প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে না। হুবহু একরকম থাকে না। যদি সেনাপতি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী লড়াই করেন তাহলে ভালো। কিন্তু তিনি কেমন করে সে লড়াই লড়বেন সেটি একান্তই ট্যাকটিক্যাল বা কৌশলের ব্যাপার। তাই রণপরিকল্পনা একটা রূপরেখামাত্র। যদি কোনো রণপরিকল্পনা করা হয় সে পরিকল্পনা যা-ই হোক না কেন তাতে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপার থাকবেই। বলপ্রয়োগ না করলে তেমন কোনোই সাফল্য আসবে না তা থেকে। তবে তিনি সময়ের বিষয় খেয়ালে রাখেননি। আর তাই মুজিব ও তাঁর সহযোগীরা ধ্বংসাত্মক ও নিষ্ঠুরতামূলক কার্যকলাপ নির্বিচারে শুরু করে দেন। এসবের উল্লেখ যা করা হয়নি আমি আমার বইয়ে সেসবের বিবরণ দিয়েছি। আর তিনি যখন এসব কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা নীরব ছিলেন। তিনি ঐ অবস্থায় সবকিছু অঙ্কুরেই খতম করে দিতে পারতেন। ঐ সময়ে তাঁর সে ক্ষমতাও ছিল। তখনও পূর্ব পাকিস্তানি সেনারা বিদ্রোহ করেনি। তারা আমাদের সাথেই ছিল। যারা গোলযোগ করছিল তারা অত্যন্ত অসংগঠিত কিছু জনতা মাত্র।

প্র: কখন তার অপারেশনে যাওয়া উচিত ছিল বলে আপনি মনে করেন?

উ: সাথে সাথে, তক্ষুনি।

প্র: সেটা ঠিক কখন?

উ: নির্বাচনের পরের দিনগুলিতে যখন ওরা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য হইচই করছিল।

প্র: তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ২৫ মার্চের আগেই?

উ: মার্চেই তার অ্যাকশানে যাওয়া উচিত ছিল যদিও তিনি তা করেননি। তিনি এতে বিলম্ব করেন ও পদত্যাগ করেন। আর এভাবে পাখি উড়ে যেতে দেন। এরপর টিক্কা পূর্ব পাকিস্তানে যান যখন বাঙালিরা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে তুলেছে। তারও আগে থেকে ওখানকার উর্দুভাষী লোকজনের বিরুদ্ধে হামলা চলছিল। ইয়াকুবের কারণে এগুলি ঘটে। তিনি অন্তত সেগুলি থামাতে পারতেন। তারপর সেখানে যান টিক্কা। তিনি ২৪ বা ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের

বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেন। গোয়েন্দা বিভাগের খবর অনুযায়ী ঐ একই রাতে (২৫ মার্চ) মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন বলে খবর পাওয়া যায়। জানা যায়, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন, ব্যবস্থাও নেবেন। তাই তিনি কয়েকদিন আগেই অ্যাকশান নেন। সেই অ্যাকশনের শক্তি ব্যবহার করা হয় কিন্তু তা ছিল খুবই কঠোর।

প্র: ২৫ মার্চের রাতের অ্যাকশানের কথা বলছেন?

উ: আমি সে কথাই বলেছি।

প্র: ব্যবস্থাটি খুবই কঠোর বলছেন?

উ: খুব বেশি রকমের কঠোর।

প্র: আমিও বলি খুবই নির্মম ধরনের কঠোর।

উ: কোন লোকের অধীনে এ অ্যাকশান চলছে তার ওপরই নির্ভর করে এর প্রকৃতি কী হবে। কেননা, আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি যখন ছোঁড়া শুরু হয়ে যায় তখন এসবে জড়িত লোকের আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত হয়ে ওঠে। দেখা গেল তখন কর্তাব্যক্তি হালকা মেজাজে বসে শিকার ধরার সংলাপে ব্যস্ত, সেই জোশে মত্ত। এর পরিণতি হিসেবে আমরা দেখি, তিনি বলছেন, আমি মানুষ নয়, মাটি চাই।

প্র: কে সেই লোক? টিক্কা খান?

উ: তিনিই। তিনিই বলেন, আমি মানুষ নয়, মাটি চাই। ইয়াহিয়া এসব দেখেশুনে ভড়কে গিয়ে টিক্কা খানকে ১০ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। বলা দরকার এখানে যে, যদি কোনো জেনারেল অপারেশানে থাকেন তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া এক ভয়ানক ব্যাপার। এটি ঐ জেনারেলের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানার শামিল। যাহোক, ঐ সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টি আগাগোড়া বিবেচনার পর কিছু লোককে দায়িত্ব নেবার জন্য বলেন। আর তারপর তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠিক করেন, সিনিয়রিটি নিয়ে ভাবার এখানে অবকাশ নেই, ওটা ভুলতে হবে। এখন যে কাজটা পারবে তাকেই সেখানে পাঠাও। শেষ পর্যন্ত আমাকেই এজন্যে বাছাই করা হয়। যদিও আমি বেশ কয়েকজনের পেছনের অবস্থানে ছিলাম। তখন একডজন জেনারেল ছিলেন আমার চেয়ে সিনিয়র। আমাকে পাঠানো হলো যেখানে আমার আগে আমার চেয়ে সিনিয়র দুই জেনারেল ব্যর্থ হয়েছেন। যাহোক আমাকে বাছাই করার পর আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসি। এখানে এসে দেখি সবকিছুই ওলটপালট হয়ে আছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্টগুলির চারপাশে লড়ে চলেছে। আর যে যে শহর-নগর তাদের কব্জায় রয়েছে সেখানেও চলেছে তেমনি লড়াই। প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ দখলে রয়েছে মুক্তিবাহিনীর। প্রাদেশিক সরকার অচল

হয়ে গেছে। দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত গায়েব হয়ে গেছে। হিন্দুরা সীমান্ত পারাপার করছে অবাধে। আমাদের তথ্যসূত্র অনুযায়ী আমি যখন দায়িত্বভার নিই তখন অন্যান্য স্থানে আমাদের সৈন্যরা চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত, রুদ্ধ অবস্থায় ছিল। তাদের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল হেলিকপ্টার। ঢাকা ও প্রদেশের বাকি অংশের সড়ক ও নৌ-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। এখন হলো কি, স্থানীয় লোকজনের মাঝে এক লোক ছিল (মুক্তিযোদ্ধা?) তাকে সবাই ফিল্ড মার্শাল বলে ডাকত। কেউ একজন আমাদের এই অবস্থার খবর দেয় তাঁকে। সেই ফিল্ড মার্শাল আমাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন এই বলে যে, তোমাদের অবস্থা তো কাহিল। আমাদের জন্য চমৎকার। তোমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আমরা এখন তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাব। আমিও পাল্টা তাকে ঠিক একই কথা বললাম : 'তোমাদেরকে আমরা ঘিরে ফেলেছি। তোমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। তোমাদের রসদ নেই। অবস্থা চমৎকার। আমি এখন আক্রমণ চালাব তোমাদের ওপর।' আমি আক্রমণও চালাই। এ আক্রমণটা ছিল সুনিশ্চিতভাবেই ভড়কে দেওয়ার মতো, এটা ওদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁরা এরকমটাই ভেবেছিল যে তাদের প্রতি গেরিলা যদি একজন করেও পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা করে তাহলে ওরা দুই মাসে খতম হয়ে যাবে। তাই তারা আশা করতে পারেনি যে আমি এ ধরনের আক্রমণ পরিচালনার সাহস করব। আমি এ ধরনের চকিত অভিযান শুরু করেই সৈন্যদের নির্দেশ দিলাম দ্রুততম গতিতে তোমরা সীমান্তের সম্ভব সকল জায়গায় পৌঁছে যাও– এটাই আমার নির্দেশ। আমি সরাসরি এরিয়া কমান্ডারদের কাছে গেলাম। তারবার্তায় কোনো কিছুই পাঠান গেল না কেননা কিছুই তাতে গোপন রাখা সম্ভব হতো না। টেলিফোন স্থাপনাগুলি বাঙালিদের দখলে ছিল। তাই আমাকে ওভাবেই যেতে ও খবর দিতে হয়। আমি সেই মোতাবেক সোজা সীমান্তে গিয়ে হাজির হই সবজায়গায় সবকিছু নিয়েই। আর তারপর আমরা সেখানে গিয়ে কাজ শুরু করে দিই। এটা গোপন রাখা হয়। একটা পরিকল্পনা ছিল এরকমের যে, যে সংখ্যক গেরিলা বাঙালিদের রয়েছে তা দিয়ে তারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আর ওদের ঠেকাতে হলে আমার দরকার হবে তিন লাখ সৈন্যের। কিন্তু আমার মোট সেনাশক্তি ছিল মাত্র ৪৫,০০০। এই ৪৫ হাজারের মধ্যে আবার ৩৪ হাজার ছিল নিয়মিত সৈনিক আর ১১ হাজার ছিল পুলিশ বা এ ধরনের আরও কিছু। বাহিনীর রেকর্ডে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে তার নিজ সৈন্য মোতায়েন করেছিল ৭ লাখ আর ঐ দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের মোট সরকারি সৈন্য ছিল ১০ লাখ। ভিয়েতনামে

৫০ হাজারের মতো গেরিলার বিরুদ্ধে নিয়োজিত ছিল ১৭ লাখ সেনার এক বিশাল বাহিনী। আলজিরিয়াতে ফ্রান্স ১০ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছিল। আমার ৪৫ হাজার সেনা লড়েছে ৪ লাখ গেরিলার বিরুদ্ধে যা ছিল বাঙালি, রুশ ও ভারতীয়দের গালে চড়ের শামিল। তখন ভারতীয়রা... মানে রুশরা বলছিল যে, গেরিলাদের সঙ্গে রয়েছে ৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্য। আমি যখন দায়িত্ব নিই তখনকার অবস্থা ছিল এরকম। আমাদের একটা জাহাজ ছিল কিন্তু তার কোনো রাডার ছিল না, রাতে দূরের কিছু দেখার যন্ত্রপাতি ছিল না কিন্তু আমরা সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আমি এখন ভারত সীমান্তে রয়েছি, আমাকে ভারত প্রবেশের অনুমতি দিন। কিন্তু ওরা তো আসলে আমার পরাজয় দেখতে চাচ্ছিল। কাজেই আমার সাফল্যের খবরে ওরা আঁতকে ওঠে। আমি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম ওরা হয়তো আমাদের থামিয়ে দিতে পারে। আর সেজন্যই আমি কী করছি তা আমি ওদের জানাইনি। তারা প্রত্যাশিতভাবেই আমাকে অগ্রাভিযান স্থগিত করতে বলে। বলে, ভারত ভূখণ্ডের ভেতরে যাওয়া চলবে না। এর দুদিন পর জেনারেল হামিদ পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। তাকে আমি বলি, আমি এখন ওদের ঠিক কলিজার কাছেই রয়েছি। ওরা পালাচ্ছে। আমরা ওদের সাফ করছি। তাদের দিকে গুলি চালাচ্ছি। আপনি যদি এখন ভারতের দিকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দেন, আমি বঙ্গের (পশ্চিমবঙ্গের) একটা বিশাল অঞ্চল কব্জা করতে পারব। আমি ব্রহ্মপুত্র ও নাগাল্যান্ডের এদিকে রয়েছি; সবকিছু আমাদের ঠিকঠাক রয়েছে। আপনি যদি একবার অনুমতিটা দেন, দুই ডিভিশন সৈন্য দেন কলকাতাও দখল করে নিই। আমি ভারতীয় বাহিনীকে চুরমার করে দিয়ে আসাম, বঙ্গ ও বিহারের গোটা অঞ্চলটিই পদানত করব। ভারত পরাজিত হবে। তিনি বললেন, বিলকুল ঠিক, আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু জেনারেল এসেছিলেন পরিস্থিতি দেখতে, ভারতের সাথে খোলাখুলি যুদ্ধ করার জন্য নয়। ভারতীয়রা তাদের লেখায় স্বীকার করেছে যে, ইয়াহিয়া যদি ঠিক ঐ সময়টায় আঘাত হানতেন তাঁর পক্ষে দেশের উভয় অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য জয় করা সম্ভব হতো। আমি বললাম, আমি কাশ্মীরেও ঢুকে পড়তে পারতাম... শিলিগুড়ির দিকে এগোতে পারতাম। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। তখনও ভারতীয়রা সবরকম অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে পারেনি। তাই সুযোগ ছিল অক্টোবর পর্যন্ত। অক্টোবরের পর আমার পক্ষে আর উল্লিখিত সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল না। আমার বাহিনীতে ১৮টি ভারী কামান, ৭৪টি মাঝারিপাল্লার কামান, একশ'টির মতো অ্যাটাক গান ও

ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান ঘাটতি ছিল। গোটা পদাতিকবাহিনীতে ছিল এই অবস্থা। তবে আমার যা কিছু ছিল তা হলো সেনাবাহিনীকে প্ল্যাটুন থেকে নির্দেশ দেওয়া। এসব প্ল্যাটুন আবার ১৮টি রণক্ষেত্রে লড়ছিল। ওরা ঐসব রণক্ষেত্রে অনড় অবস্থান নিয়ে বসেছিল। তাই কেমন করে যুদ্ধ চালাতে হবে সেটি আমিই জানতাম। যেসব লোক আমার সমুক্ষে ছিল তারা তখনকার চ্যালেঞ্জ নেবার লোক ছিল না।

প্র: বিমানবাহিনীর অবস্থা কেমন ছিল?

উ: বিমানবাহিনীর মাত্র একটি এয়ারক্র্যাফট ছিল। তাই বিমানবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেবার মতো সামর্থ্য ছিল না। এর আগে ছয়টি যুদ্ধবিমান ছিল। ছয়টিই খোঁয়া যায়। আমার হাতে কেবল স্থলবাহিনী তথা পদাতিকবাহিনীর শক্তিই অবশিষ্ট ছিল।

প্র: আমার মনে হয় আপনি যে অবস্থার কথা বলছেন তা বেশ চমৎকারই বলতে হয়। কিন্তু তখন বাংলাদেশের ভেতরের অবস্থা কী? আপনারা কি দরকার মতো সৈন্য-রসদ আনতে পারছিলেন? না, সিভিল আর্মড ফোর্সের লোকদের বেশি করে ব্যবহার করেছেন?

উ: যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা তাদের কিছু লোককে কাজে লাগিয়েছি।

প্র: আপনারা কখন এই অসামরিক সশস্ত্রবাহিনী তথা আল-বদর, আল-শামস বাহিনীতে লোক ভর্তির সিদ্ধান্ত নেন? এজন্য তো একটা লম্বা প্রক্রিয়ার দরকার?

উ: আমার যদ্দুর মনে পড়ে সেটা মে মাসের দিকে। মে মাসের দিকেই আমি ওদের রিক্রুট করতে শুরু করি।

প্র: ওরা কি সরাসরি আপনার কম্যান্ডে ছিল?

উ: তাই। কেউ-কেউ বলে, ওরা জামায়াতে ইসলামীর অধীনে ছিল। কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না। আল-বদর ও আল-শামস নাম হওয়ার নেপথ্যে জার্মানির এক শাসকের ধারণা রয়েছে। সেখান থেকে আমি ধারণাটি নিই।

প্র: আপনি আপনার বইয়ে বলেছেন, আপনি ওদের নেতাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন যারা...।

উ: হ্যাঁ, ওদের কিছু লোককে পাকড়াও করার জন্য লোকজন খোঁজাখুঁজি করছিল। ওরা ছিল অত্যন্ত পরিচিত। যেহেতু ওরা সকলের চেনা ওদের খতম করে দেওয়া হতো

প্র: কেন?

উ: কারণ, তাঁরা বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

প্র: ওদের পরিচয় কী?

উ: ওরা বাঙালি।

প্র: আপনি কি ওদের সম্পর্কে...?

উ: আমি জানতাম না, আমার স্টাফের লোকেরা তাদের চিনত, তাদের সাহায্য-সমর্থন করত।

প্র: সেটা কি জামায়াতে ইসলামী রাজাকার তৈরিতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে বলে?

উ: এমনকি, বাঙালিরাও আমাকে সমর্থন জানিয়েছে।

প্র: সে-তো বটেই। কেননা, জামায়াতে ইসলামীর লোকেরাও তো বাঙালিই বটে!

উ: তারা জামায়াতে ইসলামীর কেউ নয়। আমি রাজনীতিবিদদের ঘৃণা করি। যারা রাজনীতি করে আমি তেমন কাউকেই ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে দিই না। কাজেই আমি কেমন করে একাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতে কোনো রাজনৈতিক দলকে বলতে পারি?

প্র: রাও ফারমান আলির ভূমিকা কী ছিল? তিনি কী ছিলেন?

উ: তিনি ছিলেন গভর্নরের পরামর্শদাতা।

প্র: তাহলে তার কী কিছু করার ছিল না?

উ: যুদ্ধ কিংবা এসবে তার কিছুই করার ছিল না। তিনি কেবল গভর্নরের পরামর্শদাতা ছিলেন।

প্র: আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা ও নিরপেক্ষ তথ্যমাধ্যমগুলি পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অন্যসব ঘটনার ওপর রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তবে এজন্য দায়ী হবে সামরিক আইন-কর্তৃপক্ষ, গভর্নরের পরামর্শদাতা নয়। এই কী?

উ: পরামর্শদাতা... আবদুল মোতালিব মালিক যখন গভর্নর হন ইয়াহিয়া খান তখন আমাকে বলেছিলেন, দ্যাখো, মালিক কোনো আদেশ দিলে মনে করবে সে আদেশ আমার আদেশ। তাই তিনি আদেশ জারি করতেন।

প্র: আপনার বইতে তা বলেছেন।

উ: বলেছি যে, আমাদের আওতায় দেওয়া হয় সিভিল আর্মড ফোর্সকে আর গভর্নরের আওতায় থাকে পুলিশ...। আমরা পরিস্থিতির চাপজনিত কারণে ওদেরকে কোনো কোনো কাজে ব্যবহার করছিলাম।

প্র: কার্যত ওরা ছিল আপনার কম্যান্ডে।

উ: কিন্তু ওদের বেতন দেওয়া হচ্ছিল সিভিল...। আমি তো...।

প্র: ওরা ছিল আপনার কম্যান্ডে। দরকার মতো আপনি তাদের কাজে

লাগাতেন।

উ: কিন্তু ওদের বেতন দিত অসামরিক কর্তৃপক্ষ।

প্র: কিন্তু কাজ তো করাতে চাইত সামরিক আইন-কর্তৃপক্ষ। এমন হতে পারে তারা হয়তো এমন সব কাজ ওদের দিয়ে করাচ্ছিলেন যা বস্তুত অসামরিক-কর্তৃপক্ষ না-ও চাইতে পারে। পুলিশ এমন কাজ করছিল যা সরকার চাননি তারা তা করুক।

উ: না, আমি যখন দায়িত্ব নিই তখন টিক্কা খান ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সামরিক আইন-কর্তৃপক্ষের এতে কিছুই করার ছিল না। সামরিক আইন টিক্কা খানের এখতিয়ার। ফরমান ছিলেন তার পরামর্শদাতা।

প্র: না, তিনি ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।

উ: আমি টিক্কা খানের অধীনে কাজ শুরু করি। তিনি ছিলেন সিএমএলএ। আমি সেপ্টেম্বরে আমার দায়িত্ব পালন শুরু করি। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তা করেছেন টিক্কা খান।

প্র: কিন্তু আপনি আপনার বইয়ে লিখেছেন যে, রাও ফরমান আলী অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে, নিখুঁতভাবে ২৫ মার্চে টিক্কা খানের আদেশ পালন করেন ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না!

উ: ওরা তা করেছে ঠিকই, কিন্তু ওদের একটা পরিকল্পনা ছিল। জেনারেল টিক্কা যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তার দায়িত্ব ছিল তিনটি : এক. তিনি ছিলেন, সামরিক আইন প্রশাসক; দুই. তিনি ছিলেন গভর্নর; তিন. তিনি ছিলেন সেনাধিনায়কও। তাই সে রাতে তিনি ও রাজা খাদেম ঐসব আদেশ জারি করেন। কাজেই টিক্কা ছিলেন সুপ্রিম কম্যান্ডার। ঢাকায়...।

প্র: না, তিনি...

উ: টিক্কা লিখেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ-শ্যামল প্রান্তর লাল রঙে রাঙিয়ে দিতে হবে। আমার ধারণা, কাজী জাফর তাঁর এক রাজনৈতিক বক্তৃতায় এ কথার উল্লেখ করেছিলেন। তবে সে যা-ই হোক একটি ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ মাঠ লাল হয়ে যাওয়া উচিত। ওটা যারই লেখা হোক, লেখাটা দেখানো হয়েছিল ভূট্টো বা শেখ মুজিবকে, ঢাকায় দেখানো হয়েছিল। এখন ভূট্টো বা মুজিব কেমন লোক তা তো আপনারা জানেন। মুজিব এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি কিন্তু ভূট্টো তা ফাঁস করে দেন। তাদেরকে ঐ ডায়েরিটা তারিখসহ দেওয়া হয়।

প্র: আমরা এখন সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছি আপনার কাছে পূর্ব

পাকিস্তান ট্রাজেডির শেষের দিকটার যে বুদ্ধিজীবী নিধন ঘটে তার জন্য দায়ী কারা? রাও ফরমান দাবি করেছেন, তিনি এসবের কোনো কিছুতে জড়িত নন।

উ: বুদ্ধিজীবীরা আমার কাছে কোনো তাৎপর্যের অধিকারী ছিলেন না। আমার মাথাব্যথা ছিল আমার অস্ত্রধারী দুশমনদের নিয়েই। তাই বুদ্ধিজীবীরা আমার কোনো বিষয় নয়। তবে আলতাফ গওহর? একথা উল্লেখ করেছেন যে, কেউ একজন আমাকে জানায় যে, ফরমানের কাছে বুদ্ধিজীবীদের একটা তালিকা রয়েছে। তিনি তার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য কেউ একজনকে পাঠান আর তার অনুরোধে রাও ফরমান ঐ তালিকা থেকে দুটি নাম কেটে বাদ দেন। আমি বিষয়টা জানতাম না। আমি এটি আলতাফ গওহরের কাছ থেকেই জেনেছি।

প্র: তাহলে, ফরমান ছিলেন এর নেপথ্যে?

উ: সেটা হয়ে থাকতে পারে।

প্র: হয়েছিল কি না?

উ: আলতাফ এ বিষয়ে কিছু লিখেছে, আপনারা সেটা জানেন। আমি কেন এসব করতে যাব? কেন এমন তালিকা রাখার দরকার আমার হবে? আমি তো যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলাম?

প্র: আমি আসলে সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাই এ কথাই যে, আপনার ও বিষয়ে জানা থাকারই কথা কেননা...।

উ: আমি আপনাকে বলি, আমি বাঙালিদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এজন্য যে, তাদের প্রায় সকলেই ভারতের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে খুশি হতে পারেনি। তারা এজন্যে এটাকে দোষারোপ করছিল। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া আমি এতগুলি লোকের (?) বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারতাম না। আমি তো আর ফেরেশতা নই।

প্র: আপনি এখানে [বাংলাদেশে] ফিরে আসার পর আপনাকে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় কাটাতে হয়েছে– সেটা আপনি এখন বুঝেছেন, সে অবস্থায় আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি কী ছিল সেটা জানতে পারি, জেনারেল নিয়াজি? আমার একথা বলার কারণ, এখানকার মানুষ তো পাকিস্তানিই ছিল, তারাই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছে... তারাই পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রণেতা?

উ: আমি আপনাকে একটা কথা বলি...।

প্র: আপনার কি মনে এমন সন্দেহ ছিল যে, ওরা ঠিক যথার্থ পাকিস্তানি নয়?

উ: আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, তাঁরা মুসলমান।

প্র: তাহলে সেটাই আপনার ধারণা?

উ: আমি ওটাই লক্ষ করেছি। আমি ওটা আগে থেকেই জানতাম। কেননা ওরা এখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৬৫-র যুদ্ধে লড়েছে।

প্র: কিন্তু ঐ সেনাদের মস্তিষ্ক ধোলাই তো হয়েছিল যাদের দিয়ে তাদের তো সবাই প্রায় ছিল হিন্দু। আপনিই...।

উ: না, না, তা নয়। ওরা সবাই দেশপ্রেমিক। একটা কাহিনী বলি, শুনুন। এক প্রাণবন্ত হিন্দু তরুণ ছিল। তার বাড়ি দেশের একেবারে ভেতরের দিকে কোথাও। একদিন হলো কি, আমার রক্ষী তাকে কী কারণে যেন এই বলে হুমকি দেয় যে, আমি তোমাকে খুন করব। সে ছেলেটি রক্ষা পেতে আমার শরণাপন্ন হলো। মায় নে কাহা, কিউ, ইসকো তুম মারতে? তুম শায়েদ ইনকো মারতে, তো মায় ভি তো হো সাকতা, তুম মুঝে মারতে? ইন লোককো তুম মারতে একেলে, তো মারো, মায় একেলে, মারো। আমি আমার চায়নিজ রাইফেল তার হাতে তুলে দিয়েই কথাগুলি বললাম। বললাম, যে করছটা কী, নিজের কাজ কর, যাও, ভাগ! আমি আপনাকে বলেছি, আমার এ ধরনের ভাবনার কোনো অবকাশই ছিল না। আমি ছিলাম এসব থেকে অনেক দূরের লোক। আমি আপনাদেরকে বলেছি, জেনারেল হামিদ কিছু পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, আমি বলেছিলাম, বাঙালিরা সঙ্কটের একটা জটিল, নাজুক প্রকৃতির রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে রাজি। কেননা, ঐ সময় ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার কাছে ঘনঘন যাওয়া-আসা করছিলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন, আমি ঐসব লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে চাই কি ন্না। তারা এখন আমাদের কথা শুনতে তৈরি। তিনি আমাকে এ কথাও বলেছেন, নিয়াজি এ নিয়ে তোমার খুব উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই যদিও এটা আমার জন্য খুব শক্ত ব্যাপারই বটে, বিশেষ করে, ব্যাপারটা যদি নাজুক ও জটিল প্রকৃতির হয়। শুধু দ্যাখো একটা রফার প্রস্তাব তোমাকে দেওয়া হয় কি না। কেননা ওরা তো আর রাজনৈতিক সমাধান চায় না। এই রাজনৈতিক সমাধান ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর স্বার্থের পরিপন্থী। তারা এটা চায় না। নভেম্বর অবধি রাজনৈতিক সমাধানের একটা সম্ভাবনা ছিল। হতেও পারত। ভূট্টো যখন জাতিসংঘে যান তখনও রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল। এটা সম্ভব হতে পারত শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। পরে বাঙালিদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করলেই চলত। সেটিই হতো রাজনৈতিক নিষ্পত্তি। তাতে কোনো আত্মসমর্পণের প্রয়োজন হতো না। কিছুই দরকার হতো না। কিন্তু সেটা যে হবার নয়। আত্মসমর্পণের বিষয়ে একটি বিষয় বলার আছে। আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমি পরাজিত হইনি। আমাকে পরাজিত করা যেত না! সেটা যদি

করতেও হতো আমি আমার অবস্থা বুঝে সেটা তো করতে পারতাম। ওরা তো ওখানে বসে সময় কাটাচ্ছিল আর তাদের সিনিয়র ভূমিকা জায়েজ করছিল। ফলে তারা এখানেও হারে, পশ্চিম পাকিস্তানেও পরাজিত হয়। মালিক (গভর্নর মালিক) তাঁর সম্পর্কে লেখেন ইয়াহিয়াকে এই মর্মে সতর্ক করে যে, জেনারেল নিয়াজি যদি এখানে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে তাকে পশ্চিম পাকিস্তানও হারাতে হবে। এই মালিক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, সামরিক আইন প্রশাসক সবকিছু। সেই তিনিই একথা বলেন। এখন সেনাবাহিনী একই কথা বলে যে, এক আদেশে জানানো হয় যে, আমাকে... সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

প্র: আমার জিজ্ঞাসা হলো, আপনি বলেছেন যে, পূর্বপাকিস্তানের মানুষ অনেক ভালো মুসলমান। তাহলে আপনি *বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান* বা পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন? এই বিশ্বাসঘাতকতার অর্থ কী? পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম যদি অনেক ভালো মুসলমানই হয়ে থাকে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ: পশ্চিম পাকিস্তানের কথা বলছেন? ঠিক তা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিশ্বাসঘাতক ছিল না। ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও। এজন্যে দায়ী যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতায় ছিল, তারা ছিল সবকিছুর কর্ণধার... ইয়াহিয়া ও ভূট্টো... পাকিস্তানের সাধারণ নয়! পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ এখনও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের লোকজনকে পছন্দ করে, ভালোবাসে। বরং নাটের গুরু হলো ঐ সব লোভী লোক যারা তাদের ওপর শাসন চালাতে চেয়েছিল। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে দোষ দেব না।

প্র: তিন হাজার অফিসারকে হত্যা করা হয়। তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের ধর্ষণ করা হয়। আপনার এ খবরের সূত্র কী?

উ: কারণ, এ ঘটনা ঘটেছিল।

প্র: কিন্তু এ খবর তো খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। আমরাও এরকম কোনো খবর পাই নি? আপনার সূত্র কী?

উ: সূত্র হলো সংশ্লিষ্ট অফিসার ও ধর্ষিত মহিলারা। তারাই বলেছে।

প্র: কিন্তু এ-সংখ্যা আপনারা স্থির করলেন কী করে?

উ: কারণ, আমরা তো ওখানে ছিলাম।

প্র: কিন্তু আমি যদি বলি যে, ঘটনা আদৌ ঘটেনি, সে ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? ওটা কি কোনো রিপোর্ট ছিল?

উ: ওটা একটা রিপোর্ট।

প্র: ওটা একটা অনুমান কেননা, এমনকি রাও ফরমান আলী ও আরও অনেকে বলেছেন যে, এটা হওয়া সম্ভব নয়।

উ: আমার সূত্র জানিয়েছে, ওরা আর ফিরে আসেনি।

প্র: কিন্তু আপনি তো বললেন অফিসারদের স্ত্রী ও কন্যারা ধর্ষিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাই আমি জানতে চাই, আপনি কোন সূত্রে এ খবর পেয়েছেন?

উ: সূত্র...। সূত্র আমি দেইনি। কেননা, যারা ঐ সব ঘটনায় প্রাণে বেঁচে পালিয়েছিল ও ফিরে এসেছিল তারা আমাকে বলেছে। সেসব বিবরণই আমি বইতে দিয়েছি। ওদের বর্ণনা খুবই মর্মান্তিক।

প্র: তাহলে এসব আপনার বইয়ের কথা। ওটা থেকেই তথ্যগুলি আসছে?

উ: না, আমি অবশ্য বলতে চাচ্ছি না যে আমি ভুল করতে পারি না, ভুল হতেই পারে।

প্র: তাহলে কখনও কখনও আপনার এমনও মনে হয় যে, কিছু কিছু ভুল আপনি করেছেন?

উ: হ্যাঁ, আমি তা করেছি। এখন আপনাদের মতো ব্যক্তিদের কেউ-না-কেউ, কোনো কোনোভাবে কেননা আপনারা তো জানেন, প্রতিটি হিন্দুই একজন শিবাজি; তারা যাই করুক না কেন তা অহিংস ব্যাপার নয়। ওরা আমাদেরকে নির্মূল, উৎখাত করতে চায়। আপনাদেরকে ধ্বংস করা ওদের পক্ষে কঠিন কাজ নয়। ওদের কারণেই আমরা বিচ্ছিন্ন, একাকী। আমাদের এক হতে হবে।

প্র: কবে আপনি ভারতীয়দের সাথে প্রথম যোগাযোগ করেন?

উ: ১৪...।

প্র: ১৪ ডিসেম্বর, ১৪-র আগে নয়?

উ: আর সেটা করা হয়েছিল আমেরিকানদের মাধ্যমে, ভারত নয়। যখন অরোরা আমাকে সতর্ক করে দেন তখনও আমার হাতে তিন থেকে চার ডিভিশন সৈন্য ছিল। আর ওরা যখন এলো তাদের মধ্যে ছিল জ্যাকব, আর খার নামের এক কর্নেল। খারারা হলো রিসলপুরের শিখ বংশদ্ভূত লোক। মোগল সম্রাটের আমলে তার পূর্বপুরুষ সরনাম সিং সাঙ্গা ইসলাম গ্রহণ করে হন গোলাম মোস্তাফা খা। আমার সাথে দেখা করে একথা-সেকথা আলোচনা করে। সে আমার কাছে জানতে চায় আমাদের কত... আছে। তাঁর কথার ইশারা আমি ধরতে পারলাম। আমি বললাম, তুমি তো একজন শিখ।

তোমার তো শিখের মতোই হওয়া উচিত, তাই নয়? আমার ৯ ব্যাটালিয়ন সেনা রয়েছে। তোমাদের ১০ হাজার সেনার সাথে আমরা কি আর লড়ব। একগুণ, দ্বিগুণ হয় তাহলে না-হয় লড়ার প্রশ্ন উঠতেও পারে। কিন্তু ১০,০০০! সেটা সম্ভব নয়। সে আমাকে জেনারেল আরোরার নির্দেশ পড়ে জানিয়ে দিল, আমাদেরকে ফোর্ট উইলিয়ামে যেতে হবে।

প্র: এটা কোন সময়ের কথা?

উ: সে আসার পর, আর তখনই আমরা কোলকাতায় যাই। তখন ২০ ডিসেম্বর কিংবা ২১ ডিসেম্বর।

প্র: আপনাকে কি যুদ্ধবন্দি হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?

উ: না।

প্র: কিন্তু রাও ফরমান আলী তার বইয়ে...।

উ: তিনি তা লিখে থাকতে পারেন। না, আমাকে নয়।

প্র: কিন্তু আপনার এ বিষয়ে কিছু জানা নেই?

উ: ওরা তো আমাকে নিয়ে গেল। আমি ভারতীয় অফিসারদের সংস্পর্শে গেলাম। আমাকে সেখান থেকে ভারতের আরও ভেতরে যেতে হয়। এখন আপনি ধরুন দূরে রয়েছেন সেই সুযোগে আমি কিছু বলিনি সে-রকম কিছু ফাঁস করে দিতেও পারি!

প্র: এখন একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরে আপনার অনুভূতি কী, কেমন ছিল বলবেন? আপনি তো বলেন, দিনটি ছিল হিন্দুদের কাছে আত্মসমর্পণের দিন...।

উ: ওহ! সেদিনই তো আমার আত্মসমর্পণের দিন। আমি সেদিন চুপচাপ কাটিয়েছি। ম্যায় খামুশ থা। কেয়া করু। দেখুন, সেনাবাহিনী কার্যত একটা ঘোড়ার মতো। ইয়াকুবের অধীনে আমাদের সেনাবাহিনীর কোনো কিছু করার ছিল না। সেই একই সেনাবাহিনী টিক্কার অধীনে মানুষ মারতে শুরু করে দেয়। সেই একই সেনাবাহিনী পরে যুদ্ধ লড়েছে... লড়েছে কার্যত ক্লান্ত, ঘোড়ার মতো। এর আচরণ ছিল তারই সওয়ারের মতো। সওয়ার যদি দক্ষ না হয় তাহলে ঘোড়া লাথি মারে। যদি সওয়ার সুদক্ষ অশ্বারোহী হয় তাহলে সে ঘোড়া ছোটে তীর-বেগে। শিকারি কুকুরকে শিকারকে আমন্ত্রণ করে, পথ দেখিয়ে তাকে খাঁচায় ঢোকাতে, ওতে একরকমের অদ্ভুত মজা আছে। একই কথা বলা যায়, শাহীন বা শিকারি বাজপাখির বেলায়। একই কথা সেনাবাহিনীর বেলাতেও। শিকারির জানা উচিত কখন সে বাজকে তার মুঠো থেকে মুক্ত করে দেবে। কখন সে শিকারি কুকুরকে ছেড়ে দেবে শিকারের পেছনে...।

প্র: আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, অর্থাৎ আমি বলতে

চাই এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমাদের পক্ষে আনুমানিক ৩০ হাজার, হিন্দুরা অনেকে পালিয়েছে, মারা গেছে, আর মুক্তিবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি।

প্র: আর অসামরিক লোকজনের ব্যাপারে কি বলবেন আপনি?

উ: টিক্কা খান যে রাতে অ্যাকশনের আদেশ দেন তখন ৫০ হাজার লোক নিহত হয়।

প্র: আর পরের বাকি সময়ে?

উ: তেমন বেশি নয়।

প্র: আমি জানতে চাই এ জন্য একটা অফিসিয়াল হিসাবে তো থাকতে পারে! রেকর্ড নিশ্চয়ই! আপনাদের কি এ ধরনের কোনো সরকারি রেকর্ড ছিল?

উ: আমরা সেকথা উল্লেখ করেছি। আমরা ওটা সংগ্রহ করেছিলাম। আমরা একটা সিচুয়েশান রিপোর্ট তৈরি করতাম। তাতে হতাহতের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য থাকত।

প্র: ওটা তো আপনারা করতেন যুদ্ধ চলাকালে। ঘোষণা করা হয় ৩ ডিসেম্বর রাতে।

উ: ২১ নভেম্বর। ভারত এইদিন আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। আমাদের ১৩ হাজার সৈন্য ছিল।

প্র: তারা তো পুরোপুরি আধিপত্যমূলক অবস্থাতেই ছিল। ওদের সাথে কোনো সামনাসামনি লড়াইয়ের প্রশ্নই তো ছিল না।

উ: এখানে মুক্তিবাহিনীর লোকজনের হতাহতের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ৩০ হাজার।

প্র: কিন্তু আমি তো অসামরিক লোকজনের কথা বলছি।

উ: আমাদের কাছে সে হিসেব নেই। আমরা তো সিভিলিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করিনি।

প্র: আপনি কি জানেন, রাজাকাররা... আল-বদর, আল-শামস ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে জড়িয়েছিল?

উ: না। আমার ৩৮ হাজারের মতো সৈন্য ছিল। ওরা অকাতরে মারা পড়ছিল। তাই আমাকে মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ করতে হতো। আমি এসব আল-বদর ও আল-শামসদের বিভিন্ন সেনা ডিভিশনে নিয়োগ করতাম। সেনা ডিভিশনগুলি তাদের কাজে লাগাত... সেটি অন্য কথা। এসব আল-বদর ও আল-শামস অনেকে দলছুট হয়ে পালিয়ে গিয়ে এটা- সেটা তখন করেছে।

তাদেরকে একটা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়োগ করা হয়। তাদেরকে ব্যবহারও করা হয় সেভাবেই। এখন যদি ওরা বাড়াবাড়ি কিছু করে থাকে সেটা নিশ্চয় করে বলার জন্য সময় লাগবে। তাছাড়া ওদের হাতে তো অস্ত্রও দেওয়া হয়েছিল।

আমি আগে যেরকমটা বলেছি, ইয়াকুব যদি কাজটা ঠিকঠাক করতেন, টিক্কা আসতেন না। নিয়ন্ত্রণ করতেন কিছুই ঘটত না। সামরিক অ্যাকশানের দরকার হতো না। আমি সেখানে যেতাম না। যা কিছু করা হয়েছে ওখানে কোনোকিছুই করার দরকার হতো না। মুজিবকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হতো যে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল– সে ক্ষেত্রে এতসব ঘটনা ঘটত না। তিনি নির্বাচনে জিতেছিলেন তাঁকে ক্ষমতা না দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। ভূট্টো সে ক্ষমতা দিতে দেননি যা একজনের প্রাপ্য ছিল।

প্র: আপনি আপনার বই উৎসর্গ করেছেন রাজাকারদের উদ্দেশে, আপনার সৈনিকদেরকে নয়, কেন?

উ: আমাদের একটা কর্তব্য ছিল আর ওরা এসেছিল স্বেচ্ছায়।

৫৯

মেজর জেনারেল হাকিম আরশাদ কোরেশী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন লে. কর্নেল। যুদ্ধের আগ থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা সময় ছিলেন বাংলাদেশে। যুদ্ধবন্দী হিসেবে দেশে ফেরেন। চাকরি ফিরে পান এবং মেজর জেনারেল পদেও উন্নিত হন।

হাকিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় বদলি হন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দপুর, রংপুর ও দিনাজপুরে একটি পদাতিক বাহিনীর (২৬ এফএফ) দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯০ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তাকে পাঞ্জাব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়। সে পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৫ সালে।

অবসর গ্রহণের পর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লেখার পরিকল্পনা করেন। কারণ, সৈনিক জীবনে এটি ছিল তার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা। ইংরেজিতে লেখা তার বইটির নাম *দি ১৯৭১ ইন্দো-পাক ওয়ার। এ সোলজার্স ন্যারেটিভ*। ২০০২ সালে করাচির অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বইটি প্রকাশ করে। ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় সংস্করণ। এতে

অনুমিত হয়, পাকিস্তানে বইটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

হাকিম আরশাদ বইটি কেন লিখেছেন? তার মতে, ২৬ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও ১৯৭১ নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি।

বাস্তবতা এড়িয়ে সবাই এমনভাবে ঘটনা সাজাচ্ছে এবং ব্যাখ্যা দিচ্ছে যাতে উপসংহারটি নিজের মনমতো হয়। ১৯৭১ সালে তিনি দেখেছেন, কী ঘটেছে, তাই তিনি সে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে চান তরুণ ও মাঝারি র‍্যাংকের অফিসারদের জন্য যাতে পরিষ্কার হয়।

"The strengths and weaknesses of the planning and execution of operations in East Pakistan.'

বইয়ে অধ্যায়ের ২৫টি, মোট পৃষ্ঠা ৩২৫।

পাকিস্তানের জেনারেলরা যখন স্মৃতিকথা লেখেন, তখন সবাই স্বাভাবিকভাবেই তার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে যুক্তিগুলি সাজান। তাদের বর্ণনায় তফাৎ আছে কিন্তু ব্যতিক্রমী কেউ নন, কারণ, তাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক।

প্রথমেই দেখা যাক বইয়ের শিরোনাম। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ডিসেম্বরে ১৯৭১ সালের আগে রংপুর ও দিনাজপুরে কোথায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হলো? দ্বিতীয়, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কয়েকদিনের মধ্যেই রংপুর ও দিনাজপুরের পতন ঘটে। সে কয়দিন ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ভারত-বাংলাদেশ, যৌথ বা মিত্রবাহিনীর সঙ্গে লড়াই হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়োজিতরা বলতে পারে তারা ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যারা ছিলেন তাদের সে কথা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এই সত্যটি পাকিস্তানি জেনারেলরা কখনও স্বীকার করতে চাননি।

এরপর উৎসর্গটি দেখা যাক। সেখানেও পূর্বধারণা জোরদার। হাকিম বাগাড়ম্বর করে দশ লাইনের উৎসর্গ লিখেছেন :

"To/

the martyrs/ of the 1971 upheaval in East Pakistan,/who fearlssy committed themselves to the task/of preserving national integrity and unheistatingly laid down their lives/with the hope/that we may live with honour/and dignity as a free and progressive people."

জেনারেল নিয়াজি এত ভণিতা না করে এককথায় উৎসর্গ সেরেছিলেন রাজাকারদের। হাকিমও রাজাকারদেরই উৎসর্গ করেছেন। এটিই স্বাভাবিক। শিরেনাম আর উৎসর্গ দেখেই আমরা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি তিনি

কী লিখবেন। উৎসর্গে উল্লিখিত 'আপহিভাল' শব্দটি বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে।

৬০

হাকিমের বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম... 'টোটাল রিকল'। ১৯৮৫ সালে তিনি ছিলেন সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর মহা পরিচালক। পাক ভারত সীমান্ত পরিদর্শন করতে গিয়ে তার মনে পড়েছে ১৯৭১ সালের কথা। যুদ্ধবন্দী হিসেবে মাথা নিচু করে এই পথ দিয়েই এসেছিলেন। আজ সেই সীমান্তেই যাচ্ছেন মাথা উঁচু করে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হয়েছে ১৯৭১ সালের স্মৃতিচারণ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, হাকিম অনেক অধ্যায়েই কতগুলি প্রশ্ন তুলেছেন এবং দার্শনিক ভঙ্গিতে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এই পুরো প্রচেষ্টার কারণ, যাতে বইটিতে একটি 'নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ' ভাব জাগে এবং তিনি যে নির্মোহভাবে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তা প্রমাণিত হয়। এই কৌশল সত্ত্বেও কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে তার পূর্ব ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওয়াগা সীমান্ত চৌকি জাঁকজমকভাবে সাজানো হয়েছে। এত শত্রুতার পর এটি একটি ঐতিহ্য। সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর প্রধান তিনি যে দেশেরই হোন না কেন, সীমান্ত চৌকি পরিদর্শনে এলে, চৌকি সাজান হয়, দুদিকের রক্ষীদেরই তিনি পরিদর্শন করেন, নগদ টাকা ও অন্যান্য উপহার দেন।

পাকিস্তানি রক্ষীদের পরিদর্শন করে হাকিমের ভাষায়, 'আমি গেলাম ভারতীয় দিকে। আমাকে ইমপ্রেস করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা বিশেষ প্রচেষ্টা নিয়েছিল। এবং তারা ভালোই বলতে হবে তবে পাকিস্তানি রেঞ্জারদের মতো নয়।' তিনি ইংরেজিতে। 'awe-inspiring' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার বাংলা প্রতিশব্দ আমি পাইনি। তার দৃষ্টিভঙ্গি এরকম যে, ভারতীয় রক্ষীরা চৌকশ হতে পারে তবে পাকিস্তানিদের মতো চৌকশ হবে না। এই ধারণাটা পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে গেথে দেয়া হয়েছিল। এর ব্যতিক্রম তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

তার মনে পড়ল, ১৯৭১ সালে 'ভারতীয় বিজয়ী'দের ('কংকারারস' শব্দটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে, এটি করে তিনি খানিকটা ব্যঙ্গের ভাব আনতে চেয়েছেন) কাছে যে ৯০,০০০ (৪৫,০০০ সেনা) যুদ্ধবন্দী আত্মসমর্পণ করেছিল হাকিম ছিলেন তার একটি অংশ এবং এ পথ দিয়েই তারা এসেছিলেন। তারা যারা শহীদ হওয়ার থেকে আত্মসমর্পণ শ্রেয় মনে করেছিলেন এবং অর্ধেক অংশ

ছেড়ে এসেছেন। তখন তাদের বীরের মতো বরণ করা হয়েছিল যা ছিল অস্বস্তিকর ও বিষাদময়। পাকিস্তানির বিপদটা তার লেখায় বেশ স্পষ্ট–

"Now, after having given up half of the country and having preferred surrender to martyrdom, there we were being recieved like heroes, with bands playing stirring patriotic tunes." [পৃ.৩]

তার মনে পড়ল, ১৯৭০ সালে তিনি প্রমোশন পাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের সৈয়দপুরে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের ২৬তম ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব দিয়ে বদলি করা হয় ৩০ আগস্ট পা রাখলেন ঢাকায়। তার বন্ধু তাকে সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা দিলেন। সমস্ত সেনা সদস্যদের ভ্রমণের সময় সশস্ত্র রক্ষী রাখতে হতো। পুরো আবহাওয়া সন্দেহের বিষ বাষ্পে ভরা। সমস্ত অবাঙালিরাই ছিল অপছন্দের পাত্র।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনের আগে থেকেই দেখা যায় পাকিস্তানি সৈন্যরা সতর্ক ছিল। অর্থাৎ ১৯৭১ হতে পারে এই ধারণাটা ছিল। এবং সে কারণেই তাদের ঐ পরিস্থিতি মোকাবেলার একটি পূর্ব পরিকল্পনা ছিল। হাকিম কিন্তু তার লেখার বাবরার একথাই বলতে চেয়েছেন, পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ছিল না এবং তারা ছিলেন অসতর্ক। কিন্তু, তার বিবরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন।

পরের বর্ণনাটিও আমাদের যুক্তিকে সমর্থন করে। হাকিম লিখেছেন পরদিন রক্ষী ছাড়াই তিনি রওয়ানা হলেন রংপুরের দিকে, ট্রেনে। চারদিকে জনসমুদ্র, অর্ধনগ্ন, দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট, অবস্থা করুণা উদ্রেককারি। তাদের কাছে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্তি কোনো অর্থ বহন করেনি। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ এরকম মানুষদের নিয়েই কবিতা লিখেছিলেন, যারা আক্রোশে সব ছিড়ে খুঁড়ে ফেলতে চায় যাতে প্রভুরা বুঝতে পারে কী তাদের অবস্থা।

"হঠাৎ ঘাবড়ে গেলাম, শরীর কেঁপে উঠল।"

["Every where was a vast sea of humanity, half dressed, oblivious to the surroundings. Their poverty was visible their condition pitiable. Apparently, for them, freedom from British rule had been a hallucination, without any benefits. I was reminded of a poem-

"If only they would revolt
And teach arrogant man a lesson-
Tear his fancy clothes,
Bury their fangs in his bones.
If only someone
Would make them see their terrible degradation

I trembled all over, suddenly apprehensive." [পৃ.৩-৪]

ট্রেনে তার সঙ্গে আলাপ হয় ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সঙ্গে। হাকিমের মনে হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয়রা সবসময় নিজেদের করুণ অবস্থার জন্য দায়ী করেছে 'বিদেশী'দের। এখন পশ্চিম পাকিস্তান ভিলেনের জায়গায়। "আমরা ঘৃণার পাত্র।"

এই দুটি অনুচ্ছেদ তিনি এমনভাবে লিখেছেন যাতে সত্যটা ঢাকা পড়ে যায়। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর যদি পূর্ব পাকিস্তানের এই অবস্থা হয় তাহলে তো কেন্দ্রের [পশ্চিম পাকিস্তান] সরকারই দায়ি। কিন্তু সেটি মেনে নেয়া পাকিস্তানিদের জন্যও ছিল কষ্টকর।

রংপুরে তার সেকেন্ড ইন কমান্ড তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, রক্ষী ছাড়া ভ্রমণ করে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের নির্দেশ অমান্য করেছেন। হাকিমের কাছে তখন মনে হয়েছে রক্ষী, পরিখা, দুর্গসদৃশ্য প্রতিরক্ষা এসব কিছু ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আশেপাশের মূলধারার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। শাসক, প্রশাসক বা মিলিটারি কমান্ডারের মনের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে তার ফল হবে অতিরিক্ত ব্যবস্থা বা প্যানিক যা অন্তিমে ডেকে আনে বিপর্যয়। এ মন্তব্যে সত্যতা আছে। অবশ্য, তিনি এ মন্তব্য করেছেন পরবর্তী সময়ের গণহত্যার যৌক্তিকতা প্রদান করতে। অর্থাৎ গণহত্যাটি হয়েছে টেনশন বা প্যানিকের কারণে।

এরপর নিজ মনেই সেসব দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন কয়েক বছরের মধ্যে এরকম 'incomprehensible change' হলো কীভাবে? এটি কি শাসক এলিট যারা প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানি তাদের দাম্ভিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে? এর কারণ কি এই যে বাঙালিদের ধারণা জন্মেছে তাদের সবাইকে 'flunkies' হিসেবে ভাবা হচ্ছে? অথবা হতে পারে, এই অনুভব এসেছে যে স্বাধীনতা তাদের জন্য কিছুই বদল করেনি। তারা অনুভব করছে তারা এখনও ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন–শুধু প্রভু বদলেছে।

হাকিম সত্যটা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু রেটরিক আকারে প্রশ্নগুলি তুলেছেন। যাতে অনেক প্রশ্নের ভিড়ে সত্যটা অত চোখে না পড়ে।

৬১

হাকিম সৈয়দপুরে তার কমান্ড বুঝে নিলেন। এরপর তিন মাস, তার মতে ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। নিজের সৈন্যদের বুঝে নেয়ার জন্য মাঠে এ ধরনের প্রস্তুতিই ভালো। তার মতে, ভেতরে যে জ্বলন্ত লাভার উদগীরণ হচ্ছে তা

তখনও তারা বোঝেননি। প্রাদেশিকতার বীজাণু। যে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে তাও অনুধাবন করেননি। তার ভাষায় :

'had been unable to the extant to which the virus of provincialism, parochialism and ethnicity had permeated society.' [পৃ.৮]

আসন্ন বিদ্রোহ ছিন্নভিন্ন করে দেবে দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং চ্যালেঞ্জ করা হবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব তাও তাদের মনে হয়নি। এর প্রমাণ স্বরূপ বলেছেন, বাঙালি অফিসাররাও তাদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরের ফুটপাতে গেরিলা যুদ্ধের ওপর লেখা চে গুয়েভারার বইয়ের অনুবাদ বিক্রি হচ্ছিল যেখানে বোমা প্রস্তুত থেকে কীভাবে ব্রিজ ধ্বংস করতে হয় তার সব সচিত্র বিবরণ ছিল কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার নজরে তা পড়েনি। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন– এ হলো সে সময়ের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা। সব শেষে বলেছেন, আওয়ামী লীগ এত বড় বিজয় পাবে তা তারা আশা করেননি।

দু'টি বিষয় চলে আসে এখানে। তারা যে যুদ্ধের মহড়া বা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন তা কি রুটিন বা স্বতস্ফুর্ত নাকি পরিকল্পিত? কারণ, সাহেবজাদা ইয়াকুব যিনি ছিলেন সেনাপ্রধান তিনি এ সব প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করছিলেন। এর অর্থ সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি পরিকল্পনা ছক ছিল যে, যদি বিদ্রোহ হয় এবং ভারত জড়িয়ে পড়ে তাহলে কী হবে? হাকিমের মতো নিম্নপদস্থ কর্মচারির তা জানার কথা ছিল না। বাঙালি অফিসারদের সরিয়ে না নেয়ার কারণ, তাহলো এ পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়ে যেত। তবে, ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা কেউ অনুধাবন করেনি। হাকিমের শেষ মন্তব্যটিই সত্য। কেউ ভাবেনি আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।

এরিমধ্যে হাকিম তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এলেন। বিপদ যে আসবে তা তারা জানতেন না। সে কারণেই পরিবার নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তিনি অবাঙালি বহু বিহারিদের কথা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন তিনি, 'গণ্ডগোলের পুরোটা সময় তারা ছিল আমাদের সহায় এবং অন্তিম বিশ্লেষণে দেখা যায় সংঘর্ষে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

"a part from our national pride, professional prestige, and ideological moorings." [পৃ. ৯]

তার মতে, ইয়াহিয়া ঘোষিত এলএফও অনুযায়ী মুক্তির যে সব কথা বলছিলেন তা তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু, মুজিব এলএফও উপেক্ষা করেছেন কিন্তু কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। নির্বাচনী প্রচারে মুজিব পাঞ্জাবিদের দ্বারা 'এক্সপ্লয়েটেশনের' কথা বলেছেন যা ছিল বিকৃত। এসব

মন্তব্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলেছিল। ১৯ নভেম্বরের ঝড়ের কথা বলেছেন, সেনাবাহিনী যথাসাহায্য ত্রাণে সাহায্য করেছে, শেখ মুজিব নিজেও তা 'প্রাইভেটলি' স্বীকার করেছেন। তবে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো কর্মকর্তা বা রাজনীতিবিদ আসেনি। ফলে, মুজিবের সমর্থকরা ও প্রিন্ট মিডিয়া তা ব্যবহার করেছে, নিঃস্ব মানুষের কষ্ট পুঁজি করে। তার ভাষাটা এরকম–

'Who made full capital out of the misery of the people whose cause they were professedly champoining." [পৃ. ১০]

হাকিমের একবারও মনে হয়নি এই মহাদুর্যোগে কেন্দ্র থেকে কেউ আসা চরম অবহেলা এবং মানুষ তাতে বিক্ষুব্ধ হবেই।

এর পরের যে অভিযোগ করেছেন তা মারাত্মক। ঐ ঘটনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। সেনাবাহিনীর জিপ দেখলেই মানুষ গালাগালি করত। বাঙালি শভেনিস্টরা মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘোরাফেরা শুরু করল এবং সবাইকে শাসাতে লাগল এ বলে যে, আওয়ামী লীগকে ভোট না দিলে ফলাফল খারাপ হবে। এ পরিস্থিতিতে বড় পরিবারসহ একজন বাঙালি কী করতে পারে? খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছেন– "How could a poor hapless Bengali with a large family and limited means go against such 'sound advice'?" [পৃ. ১০]

আমাদের এবং আমাদের আগের জেনারেশনের যারা বেঁচে আছেন তাদের কি এমন কোনো ঘটনা কি মনে পড়ে?

এভাবেই জেনারেলরা আধা-সত্য আধা-মিথ্যার মিশ্রণে বা যা শুনেছিলেন গুজব হিসেবে বা পূর্ব ধারণা থেকে তাদের বয়ান দিতে থাকেন।

৬২

পরের অধ্যায় 'নির্বাচন এবং তারপর'। এ অধ্যায়ে তিনি এমন সব বিবরণ ও বক্তব্য দিয়েছেন যা আমাদের ইতিহাসে কখনও উল্লিখিত হয়নি। আগের অধ্যায়ের মতোই কিছু দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তর দিয়েছেন। কিছু কিছু শব্দ ঊর্ধ্ব কমার মধ্যে রেখেছেন।

হাকিম লিখেছেন, হাই কমান্ড তাদের নির্দেশ দিয়েছিল, নির্বাচন যাতে মোটামুটি স্বচ্ছ হয় তা নিশ্চিত করতে, তবে, ভোট কেন্দ্রের কাছাকাছি না যাওয়ার নির্দেশ ছিল যদি না নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠায়। এ নির্দেশ দেয়ার কারণ, তার মতে, কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টরা নিরপেক্ষ ও

যথাযথভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

এবার তার উথ্যাপিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করা যাক–

১. কীভাবে আওয়ামী লীগ এমন 'টোটাল ভিক্টরি' 'ম্যানেজ' করল?

২. একটি মুক্ত নির্বাচনে একটি দলের পক্ষে এমন আধিপত্য বিস্তার কি সম্ভব?

৩. যে সমাজ ভেতরে বিভক্ত, যেখানে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে আছেন মওলানা ভাসানী, সেখানে এক রাতের মধ্যে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় কীভাবে?

৪. হঠাৎ করেই কি মানুষ স্বেচ্ছায় 'প্যারোকিয়াল ফিলিং' বা 'ন্যারো সেলফ ইন্টারেস্ট' থেকে মুক্ত হতে পারে?

৫. নাকি এটি করা হয়েছিল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে?

৬. এ নাটকে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বাঙালি প্রশাসকরা কী ভূমিকা পালন করেছিল?

নিজেই লিখেছেন, উত্তর সবার জানা। সে উত্তরগুলি কী?

১. প্রাদেশিক সরকার মওলানা ভাসানীকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল তার ১,৪০০ সক্রিয় কর্মীকে গ্রেফতার করে।

এর অর্থ মোনেম খান আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবের পক্ষে ছিলেন।

২. সরকার মুসলিম লীগের পার্টি ফান্ড বাজেয়াপ্ত করায় মুসলিম লীগ বিপদে পড়ে যায়।

এর অর্থ মোনেম খান বা সবুর খান নিজেদের অর্থ নিজেরাই বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

৩. আওয়ামী লীগের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জামায়েত ইসলামী ও অন্যান্য দলকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল।

এ সম্পর্কিত রিপোর্ট তখনও পত্রিকায়, এমন কী জামায়াতের মুখপাত্রেও প্রকাশিত হয়নি। এমনকী পাকিস্তানের দালাল ও ঘাতক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারি জামায়েত নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে তা বলেনি।

৪. সিভিল প্রশাসক ও আওয়ামী লীগের কট্টরপন্থীদের যোগসাজশে এরকম 'কমপ্লিট ভিক্টরি' সম্ভব হয়েছে।

হাকিমের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া ও পরবর্তীকালের প্রেসিডেন্ট ভূট্টোও [যার সঙ্গে নিজের ছবি মলাটে ছেপেছেন] এধরনের অভিযোগ করেননি। না, এখানেও শেষ নয়, তিনি শুনেছেন, এখনও বাংলাদেশে লীগ কর্মীরা স্কুল শিক্ষকদের দলে টানে যারা পরবর্তীকালে নির্বাচনী ডিউটিতে থাকে লীগের পক্ষে ভোট কারচুপি করার জন্য।

এরকম কল্পনাশক্তি পাকিস্তানি জেনারেলদের ছাড়া আর কারো পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তার আফসোস, "আমরা কায়েমী স্বার্থের হাতে পুতুল ছিলাম" এবং "আমরা আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিলাম।" দায়িত্বটা কি ছিল আওয়ামী লীগ যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তা নিশ্চিত করা?

বাঙালি প্রশাসকরা কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল তার কারণ হাকিম বয়ান করেছেন। শুনুন তাহলে সে বয়ান।

ভারত বুঝেছিল, দেশ বিভাগের সময় নির্বিচারে মুসলমান হত্যা, তাদের সম্পত্তি ধ্বংস সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে, ১৯০৫ সালের তিক্ত স্মৃতির 'রিভাইভাল' এই সম্পর্ক আরো জটিল করে তুলেছিল। ১৯১১ সালে হিন্দুদের কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। এরপর তার ভাষায়–

'This big gap had to be bridged before Muslim Bengal could be brought to a common platform of language, heritage, and culture with the Hindu minority. They initiated measures for the credation of such a platform: 'conversion' through conviction, 'friendly persuasion', or coercion of young leadership amongst student bodies and the working classes. using a 'lethal' combination of wine, women and money, was started straight away." [পৃ. ১৩]

বাঙালি প্রশাসকদের জাতীয়তাবাদী হওয়ার এই হলো ইতিহাস। আমরা জানি, 'সিএসপি'রা ছিল একটি শ্রেণী। তাদের কারো কারো সহানুভূতি ছিল বাঙালিদের প্রতি, কেননা তারাও বঞ্চিত হতেন বিভিন্নভাবে। কিন্তু, তারা পাকিস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখেছিলেন এটি ভাবা ভুল হবে। শফিউল আজমের মতো সিএসপি বাঙালিদের মধ্যে কম ছিলেন না। ৭ই মার্চের ভাষণের পর সব অচল হয়ে গেলে সিএসপিরা আনুগত্য দেখিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি। লক্ষ্য করুন, ১৯৪৭ সালে খালি নির্বিচারে মুসলমান হত্যা ও তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে কী পরিমাণ হিন্দু নিহত হয়েছে, দেশ ত্যাগ করেছে তার হিসাব হাকিম দিতে কুণ্ঠিত কেন? ১৯৪৭ সালের পর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কথা কেন মনে হবে, সেটা বোঝা গেল না। আর এটি ভুল ধারণা যে, বঙ্গভঙ্গ শুধু মুসলমানরাই চায় নি, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাও চেয়েছিল। আমার গবেষণা তাই প্রমাণ করে। আর ভারতীয়রা মদ, মেয়েমানুষ আর টাকা দিয়ে সবাইকে এখানে বশীভূত করেছে এ ফ্যান্টাসির উত্তর কী হবে আমার জানা নেই।

একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমি সম্পর্কেও তার বক্তব্য আছে। এখানে যদিও ভাষা আন্দোলনকে 'দাঙ্গা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু পটভূমি খুব একটা বিকৃত করেননি। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, জাতীয়

ভাষা হিসেবে উর্দুকে ঘোষণা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অবাঙালিদের আধিপত্য এবং তাদের ঔদ্ধত্য। হাকিম জানাচ্ছেন, এরপর সারা দেশে 'শহীদ' মিনার স্থাপিত হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্থায়ী ঘৃণার প্রতীকে পরিণত হয়। ডিসিডেন্টদের সমাবেশের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এই প্রতীক।

ফুলবাড়ির কাছে জনতা একবার এক গরু চোরকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। দৃশ্যটি অবলোকন করে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল বঞ্চনার লজ্জাজনক প্রদর্শনী

[It was a shameful display of depravity, পৃ. ১৪]।

তারপর টিক্কা খানের ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণনা আছে। কিন্তু এ সময়টুকুর মধ্যে হাকিম উল্লেখ করেছেন, প্রতিদিন একজন দুজন করে সৈনিক মারা যাচ্ছিল

[The murder of army personnel, caught in ones and twos, became an everyday occurrence, পৃ. ১৬]

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার বিবরণ অন্যরকম। এই সময় বিক্ষোভ চলছিল নিয়মিত, শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন এবং নিয়ত সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছিল।

হাকিমের মূল বক্তব্য, চতুর্দিকে সেনা বা সরকার মাটি হারাচ্ছিল। তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এসব দেখেশুনে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা পরিবার পরিজন দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। স্থানীয় পত্রিকা এটি জেনে এমনভাবে সংবাদ ছাপতে লাগল যাতে মনে হলো পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্ষমতা ত্যাগ করছে। তখন সদর দপ্তর থেকে এ ধরনের 'evacuation' নিষেধ করা হলো। ফলশ্রুতিতে, এদের অনেকে লাঞ্ছিত, ধর্ষিত এবং নিহত হয়েছে।

বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার অর্ডার দেয়ার পর অনেক জায়গায় প্রতিরোধ হয়েছে। নিহতও হয়েছে কিন্তু ধর্ষণের খবর পাওয়া যায়নি। ঐ সময় কারো ধর্ষণের সময় ছিল না কারণ প্রাণ ছিল তখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

হাকিম লিখেছেন, চারদিকে ভয়ংকর সব গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল ফলে অবাঙালিরা [সেনাসহ] সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। শেখ মুজিব ৭ মার্চ বক্তৃতা করলেন। হাকিম ভুল করে লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছিলেন পল্টনে। তার ত, তখনই সরকারের ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল। সেই সময় আওয়ামী লীগে বিদ্রোহী অংশ [লক্ষ্য করুন শব্দটি] ও ভারতীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো। তার ভাষায়, "The course of history might have been changed if worthwhile action against chauvinistic, bellicose, and rebellion sections of the Awami League and the Indian

agents had been promptly initiated across the board." [পৃ. ১৮-১৯]

কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা করেননি। পরে কী হলো? বাঙালি যারা সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তারা শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সমর্থকদের খবরাখবর পৌঁছে দিতে লাগলেন। জানা গেছে, মেজর খালেদ মোশাররফ, একটি 'হাইলি সেনসিটিভি' খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের কাছে, খবরটি ছিল সৈন্যদের বলা হয়েছিল কার্ফু চলাকালীন সময়, কার্ফু ভঙ্গকারিরা যদি আক্রমণ না করে তাহলো গুলি না চালাতে। ফলে, সবখানে কার্ফু ভঙ্গ হতে লাগল।

পাকিস্তানি সৈন্যদের ঐ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিনা জানি না। সে সময় চাকরিরত বাঙালি অফিসাররা তা বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা দেখেছি আন্দোলনরত মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে শ্লোগান দিয়ে, মিছিল করে কার্ফু ভঙ্গ করেছে কারণ তা ছিল আন্দোলনের অংশ। কিন্তু, শ্লোগান ওঠা মাত্রই সেনাবাহিনী নিয়মিত গুলি চালিয়েছে। ৭ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত এ ধরনের গুলিতে নিহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি।

২৫ মার্চের আগে পূর্ব পাকিস্তানে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ছিল ১২০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি, বাঙালি ছিল ৬০০০ যার অধিকাংশ ছিল ইবিআরএ। তবে ইপিআরের সংখ্যা ছিল ১৫০০০ যার অধিকাংশ ছিল বাঙালি। পুলিশে কিছু বিহারি ছিল, আর ছিল স্থানীয় আনসার ও মুজাহিদ। সরকার অবাঙালিদের বিরুদ্ধে এই ভারসাম্যহীনতার বদল করার জন্য পুরানো ইউনিট বদলির অজুহাতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লোক আনা শুরু করল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি, পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর ছাপা হওয়ার কারণে। এই ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল মার্চ, ১৯৭১ সালে। কিন্তু এর আগে ১৯৭০ সালে তিনটি সম্পূর্ণ বাঙালি ইউনিট তৈরির আদেশ দেয়া হয়েছিল। তার মন্তব্য–

"What a profound understanding we had of coming events." [পৃ. ২০]

হাকিমের মূল বক্তব্যই হচ্ছে তারা বা পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের 'মতলব' বুঝতে পারেনি। কিন্তু উপরোল্লিখিত বক্তব্যে তার মূল থিসিস নস্যাৎ হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনা আনার কারণই ছিল নিষ্ঠুরভাবে গণহত্যা চালিয়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের দমন করা। হাকিমের মতো জুনিয়র অফিসার তা না জানতে পারেন কিন্তু সদর দফতর তা জানত এবং সেভাবেই

প্রস্তুতি নিয়েছিল। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নিশ্চয় ২৫ মার্চ রাতেই পরিকল্পিত হয়নি।

এরপর তিনি যে সব দার্শনিক প্রশ্ন তোলেন সেগুলি তুলেছেন এবং প্রচ্ছদে ভূট্টোর ছবি দেয়ার পরও স্বীকার করেছেন, ভূট্টো পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহের জন্য দায়ী।

হাকিমের সমস্যা হচ্ছে, ১৯৭১ কেন হয়েছিল তা তিনি জানেন, কেন তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছিল এ ভূখণ্ড থেকে তা তার অজানা নয়। কিন্তু সেগুলি বিকৃত করতে গেলে তা বাঙালিদের পক্ষেই যায় যেটি মেনে নেয়া কষ্টকর। এ ছাড়া আছে পূর্ব ধারণা। ফলে দেখা যায় কখনও যৌক্তিক কথা বলে পরের অনুচ্ছেদে এমন সব পূর্ব ধারণাকৃত মন্তব্য করেছেন যে, পুরো বিষয়টাই গোলমেলে হয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায় 'গ্রাউন্ড রিয়ালিটিজে' বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, তিনি লিখেছেন, পরিস্থিতি বিস্ফোরণমূলক হয়ে উঠছে।

"The behaviour of the leadership had ignited the fuse." [পৃ. ২৫]

মনে হবে তিনি ইয়াহিয়া খানের কথা বলছেন যেটি যৌক্তিক। কিন্তু পরের লাইনেই বোঝা যায় তিনি আওয়ামী লীগের কথা বলছেন। নিজেকেই কিছু প্রশ্ন করছেন–

> এরকম ফিরে না যাওয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো কেন?
>
> সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধুদের সৃষ্ট কিছু কৃষ্ণ চরিত্রের (ব্ল্যাকগার্ডস), কৌশলই কি এর জন্য দায়ী?
>
> বিশাল ষড়যন্ত্রের যার সামান্য অংশ মাত্র ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র তা আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি দেখেই কি এটি হলো?
>
> কেন আমরা আমাদের রাষ্ট্রের 'হোমোজেনিটি' হারালাম?

এর উত্তর যখন দিচ্ছেন তখন বিহারি ও পশ্চিমাদের ঔদ্ধত্যের, কেন্দ্রের অবহেলার কথা বলছেন, বাঙালিরাই যে পাকিস্তান আন্দোলনের পুরো ভাগে ছিল সেটিও উল্লেখ করেছেন। এর কিছু কারণ উল্লেখ করে ভারতের বিকৃত প্রচারণা এখানকার যুবকদের মন বিষিয়ে দিয়েছিল। তার ভাষায়–

"Furthermore, the Indians had been able to pollute the minds of Bengali youth by focusing their propoganda on perceived economic, administrative, and political disparities between East and West, most of the time falsifying facts to suit their claims." [পৃ. ২৮]

তিনি অভিযোগ করেছেন, শেখ মুজিব বড় বড় জনসভায় পশ্চিম পাকিস্তানকে আক্রমণ করে বিভিন্ন সংখ্যা তত্ত্ব তুলে ধরতেন "যা আমরা কাউন্টার

করতে ব্যর্থ হয়েছি।" তার তত্ত্বটি হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তান সব সময় ছিল একটি 'ব্যাকওয়ার্ড' এলাকা। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানকে দোষ দিয়ে লাভ কী?

তবে, মারাত্মক ব্যাপার হলো তার ভাষায়, উর্দুকে বাতিল করায় দু প্রদেশের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং এর সুযোগ নেয় বাঙালি সাহিত্যিকরা যার অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু। অথচ পশ্চিম বঙ্গীয়রা হিন্দি ভাষা জাতীয় ভাষা হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি করেনি।

পড়াশোনার মান নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। বরং আমি মন্তব্য করব এভাবে যে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থিতাবস্থায় সরলভাবে যা শেখান হয় তাহলো মুসলমান + উর্দু = পাকিস্তান এবং হিন্দু + বাংলা = হিন্দুস্তান।

বাঙালিরা যুক্ত হবে বাংলা ঐতিহ্যের সঙ্গে উর্দুর সঙ্গে কেন সেটির ব্যাখ্যা তিনি দেননি। মুসলমান বলে? তাহলে ভারতীয় হিন্দুদের কী হবে যারা উর্দুতে অভ্যস্ত? না পাকিস্তানের জেনারেলদের সেগুলি বোঝানো বাতুলতা।

প্রথম চারটি অধ্যায়ে হাকিম মূলত যা বলতে চেয়েছেন, তাহলো কর্তৃপক্ষ যদি অনেক আগেই সতর্ক হতো এবং বাঙালিদের দমন করত তাহলে ইতিহাস অন্যরকমভাবে লেখা হতো।

৬৩

পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত আছে প্রধানত যুদ্ধের বর্ণনা। ২৫ মার্চ থেকে মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ, পাকিস্তানি সেনাদের দখল হয়ে যাওয়া এলাকা পুনর্দখলের লড়াই ইত্যাদি। পুনর্দখলের লড়াইতে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রত্যুৎপন্নমিতা, সাহস ইত্যাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে। কীভাবে তাদের অফিসাররা 'দেশ' রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে তারও বর্ণনা আছে। আমি যুদ্ধ বিশারদ নই তাই ঐ সব বর্ণনা ও তার বিশ্লেষণে যাব না। কারণ এই বর্ণনার বিপরীতে যারা ঐ এলাকায় লড়াই করেছেন তাদের বিবরণ মেলাতে হবে। তা হলেই ভারসাম্যপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। আমি এসব বর্ণনার মাঝে বাঙালি ও বাংলাদেশের প্রতি হাকিমের দৃষ্টিভঙ্গিটুকু শুধু তুলে ধরব।

দেশের অভ্যন্তরে ভয়ংকর নিরপত্তাতজনিত অবস্থার সৃষ্টি হলে তা মোকাবেলার জন্য অপারেশন ব্লিৎজ নামে একটি পরিকল্পনা করা হয়। পরবর্তীতে টিককা খান এটিকে উন্নীত করে নাম দেন 'সার্চ লাইট'।

২৫ মার্চ হাকিমরা নির্দেশ পেলেন অপারেশন ব্লিৎজ কার্যকর করতে। এর উদ্দেশ্য ছিল তিনটি–

১. স্পর্শকাতর জায়গাসমূহ আয়ত্তে নিয়ে সংরক্ষরণ করা।

২. নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও ঝামেলা পাকায় এমন সব লোককে গ্রেফতার করা।

৩. পুলিশে সন্দেহভাজনদের নিরস্ত্র করা।

তার মতে ২৫/২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা যদি সক্রিয় ভারতীয় সাহায্যে [অ্যাকটিভ ইন্ডিয়ান কোলাবরেশন] বিদ্রোহ করতে চায় তা ব্যর্থ করে দেয়া।

হাকিমের এই বক্তব্যেই স্পষ্ট পাকিস্তানিরা অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হলে যদি ঝামেলা হয় তাহলে তা আগেই দমন করতে হবে।

এরপর হাকিম জেনারেল ফজল মুকিম খানের বইয়ের সূত্র ধরে জানাচ্ছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও মুক্তিবাহিনীর 'গডফাদার' ওসমানী ভারতীয় সাহায্যে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তি পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার পর দুই প্রদেশের অসম অবস্থা সমতায় নিয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। এবং তা যদি না হয় তাহলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে বিদ্রোহ করতে হবে। সবশেষ উপায় হলো, বাঙালি সৈনিকরা সমব্যথীদের সীমান্ত পার হবে। এসব সমব্যথীদের অধিকাংশ হিন্দু এবং তারা বিদ্রোহ শুরু করবে। তিনি তিনটি বইয়ের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, ঐ সব বইয়ে এ ধরনের পরিকল্পনার উল্লেখ আছে। বই তিনটি হলো : মেজর রফিকুল ইসলাম বীরোত্তমের, অশোক রায়ের *A Tale of Millions, Inside Raw* এবং বিগ্রেডিয়ার জগদেব সিংয়ের *Dismemberment of Pakistan.*

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলি, মেজর রফিকের বইয়ে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার কথা লেখা নেই। তারা বরং পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের ভয় করছিলেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ২৫ মার্চের আগে চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়ার পর এই সন্দেহ ঘনীভূত হয়। আত্মরক্ষার জন্য কী করা যায় যে পরিকল্পনাই তিনি করছিলেন। রায়না ও সিংয়ের বই দুটি আমি পড়িনি সুতরাং, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব না।

বাঙালিদের সে এরকম পরিকল্পনা ছিল তা প্রমাণের জন্য তিনি উল্লেখ করেছেন, ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা সমান্তরালে পাকিস্তানপন্থী বাঙালি, বিহারি এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের হত্যা। এ সংখ্যা তার মতে, শান্তাহারে ১৫০০০, চট্টগ্রামে ১০০০০, সিরাজগঞ্জে ৩৫০, ময়মনসিংহে

২০০০। পাবনার পুরো সেনাদল ৩০০ এবং কুষ্টিয়ায় ১৫০।

প্রথমত, এরকম পরিকল্পনা থাকলে ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে গণহত্যায় এত মানুষ মারা যেত না। ২৪ মার্চ পর্যন্ত আলোচনা চলেছে। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে থাকা এ.কে. খন্দকার সে খবর জানান এবং তখন আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, জিয়াউর রহমান কীভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন তা নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে। তা পুনরুল্লেখ করব না। শুধু বলব, জিয়াউর রহমানকে হঠাৎ হাতের কাছে পেয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীরা একটি ঘোষণা দিতে অনুরোধ করে।

তৃতীয়ত, চট্টগ্রাম ও শান্তাহারে ঐ দিন ২৫০০০ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল এটি অসম্ভব ঘটনা। তাই যদি হতো, তাহলে শান্তাহার ও চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী এত সহজে সাফল্য পেত না।

পাবনা ও কুষ্টিয়ার কথা লিখতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, সেখানে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর একটি দল ছিল যাদের কাছে গোলাবারুদও তেমন ছিল না। ভারতীয় এজেন্টদের সহযোগিতায় বাঙালি চরমপন্থীদের আক্রমণ রোখা সম্ভব হয়নি।

["They were ill equipped to face the onslaught of Bengali militants, supported by Indian agents, when it came, repostedly pre-planned and probably triggered by the army action." [পৃ. ৩৬]

এর বিপরীতে লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীর কুষ্টিয়া প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিবরণ পড়লে বোঝা যাবে হাকিমের উক্তি কতটা পূর্ব ধারণা আক্রান্ত।

দিনাজপুর শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। দিনাজপুর পাকিস্তানি সৈন্যরা পরিত্যাগ করে। ফলে অনুগত পাকিস্তানিদের ঠেলে দেয়া হয়, 'ক্রিমিনাল কনডাক্ট অব দি ইনসারজেন্টসের' সম্মুখে। পশুর মতো তাদের খুঁজে বের করে এমনভাবে হত্যা করা হয় যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়ে। এদের অনেককে রাস্তায় টেনে হেঁচড়ে নিয়ে অপমান করে– ধর্ষণ করে, হত্যা করা হয়। শহর পুনর্দখলের পর পুনর্ভবা নদী থেকে এরকম ক্ষতবিক্ষত অনেক লাশ উদ্ধার করা হয়। ভারতীয়রা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে এভাবে বিহারি ও বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সফল হয়।

অথচ এর আগে তিনি উল্লেখ করেছেন, বিহারিরা মূল স্রোতের সঙ্গে স্বইচ্ছায় মেশেনি অর্থাৎ বিভেদ ছিল। আমি ছেলেবেলার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। চট্টগ্রামে আমাদের কলোনিতে প্রচুর সংখ্যক অবাঙালি ছিল। তাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের খেলার সাথী ছিল। কিন্তু কখনও তারা আমাদের

সঙ্গে বাংলা বলেনি, বরং আমরাই উর্দু বলতাম, সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্কও ছিল না আমাদের। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জেতার পর থেকে বিহারিরা ক্রমেই শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং কয়েক জায়গায় দাঙ্গার সৃষ্টি করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিহারিরা প্রকাশ্যে পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু অনেকবার বাঙালিদের পরামর্শ দিয়েছেন সবরকমের উসকানির মধ্যে তারা যেন শান্ত থাকে। উত্তরাঞ্চলে অনেক শহরে অবাঙালিদের হত্যা করা হয়নি এমন কথা বলব না, বাঙালিও হত্যা করা হয়েছে এবং দু'পক্ষে তখন যুদ্ধ চলছিল। একপক্ষে ছিল পাকিস্তানিরা, তাদের সহযোগী বাঙালি স্বাধীনতা বিরোধী ও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালিরা। অন্যপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিত অনুমেয়। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ খুনের কথা উল্লেখ করেছেন তাহলে পুরো নয়মাস এত অবাঙালি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করত না। তবে তিনি এও উল্লেখ করেছেন, একবার খবর পেলেন এক বাঙালি অনেক অবাঙালি মহিলা আটকে রেখেছে। তার অফিসার গিয়ে দেখেন এক বাঙালি বৃদ্ধ বেশ ক'জন অবাঙালি মহিলাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ২৫ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ ঢাকার মিরপুরে যখন বিহারিরা বাঙালি হত্যা করছিল তখন আমাদের অবাঙালি প্রতিবেশী আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। শত্রুতা ছিল এবং দু'পক্ষই মানবিকতা না ভুলে পরস্পরকে আশ্রয় দিয়েছে কখনও কখনও। প্রতিদেশেই দাঙ্গা এবং যুদ্ধের সময় এমন ঘটনা ঘটে।

পরে, তিনি নিজেও বিষয়টি স্বীকার করেছেন অবশ্য অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। এক পাকিস্তানি সৈন্য এক মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল। তিনি তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, "I can recall one individual who would happily have taken it upon himself, to eliminate all suspected Indian collaborators, specially Hindus, as a reaction to the devastation caused by them, had he not been restrained, and another who abhorred insurgents and took pleasure in scaring the day lights out of them by creating an illusion of savagery. The possibility that the add irresponsible hand might have inflicted injury on helpless opponents in response to wanton killings by the other sider, can not be entirely ruled out." [পৃ. ৮৯]

এরপর এক দার্শনিক অনুচ্ছেদে তিনি জানিয়েছেন যার সংক্ষিপ্তসার হলো যত্রতত্র হত্যা কাপুরুষের কাজ, এ হত্যা তার নৈতিক আচরণের ক্ষতি করে, এ কারণে হয়তো সে পরে আত্মহত্যাও করতে পারে। সৈনিকদের উচিত ভারসাম্য রক্ষা করা। অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয় না বরং তা প্রতিষ্ঠানের বদনাম করে। "সুতরাং সন্দেহভাজনদের সঙ্গে সতর্ক ব্যবহার

করতে হবে।”

যদি হাকিম সাহসী হতেন তবে লিখতেন পাকিস্তান বাহিনী ঠিক এ কারণে সারা বিশ্বে নিন্দিত হয়েছিল।

না, তিনি তা লিখতে পারবেন না, লেখেনওনি। বরং দেখাতে চেয়েছেন অধিকাংশ বাঙালি তাদের পক্ষে ছিল, না'হলে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে তিন-চার কোটি লোকের বিরুদ্ধে থাকা যেত না। তিনি বলতে যেটি ভুলে গেছেন তাহলো, বাঙালিরা সব নিরস্ত্র ছিল [মুক্তি বাহিনী ছাড়া] এবং তারা সব সশস্ত্র ছিলেন। যদি বাঙালিরা আগে পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র টের পেত বা বুঝত এবং সশস্ত্র থাকত তাহলে পাকিস্তানি বাহিনী ন'মাস বাংলাদেশে থাকতে পারত না।

এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, পরবর্তীকালে ভূট্টোকে 'tumultuous welcome' দেয়া হয়। এটি পুরোপুরি সত্য নয়, অভ্যর্থনা দেয়া হয় তবে 'tumultuous' নয়। বঙ্গবন্ধুও স্বাধীনতার পরপর লাহোর গেছেন ও মঞ্চে যখন উঠেছেন তখন দর্শকরা করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এতে কি প্রমাণিত হয় যে পাকিস্তানিরা তাকে ভালোবাসত?

তিনি লিখেছেন, পাকিস্তান আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করলে বাঙালিরা এত খুশি হয়েছিল যে তাদের সামলাবার জন্য পুলিশ ডাকতে হয়েছিল অথচ ভারত বোমা বিস্ফোরণ করায় মানুষ তত খুশি হয়নি। এমন ঘটনা আমার মনে পড়ে না। যখন তারা যুদ্ধবন্দী হিসেবে দিনাজপুর ছেড়ে যাচ্ছেন তখন মানুষ বিষণ্ন ছিল। তার ভাষায়–

“The quiet remorse expressed by the man in the street during our passage through Dinajpur as Pows” [পৃ. ৯১]

রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের সময়ও নাকি একই অবস্থা বিরাজ করছিল। এসবই প্রমাণ করে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও অস্ত্রের ব্যবহারের কারণে মানুষ বাধ্য হয়ে বিরোধিতা করেছিল। তার ভাষায়–

“The stunned silence of the bewildered majority during the surrender ceremony at the Race Course Ground-all these things point to a people coerced into following the Awami League's diktats by terror and force of arms.” [পৃ. ৯১]

এখানে তিনি জামায়েত, মেজর জিয়া ও খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। জামায়াতের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, “তারাও 'মটিভেটেড বেঙ্গলি মুসলিমস'রা শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা তাদের পরিত্যাগ করেছি। ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে তারা কবরে যেতেও

রাজি ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমরা শ্বেত পতাকা উত্তোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।" [পৃ. ৯২] এটি অর্ধাংশে সত্য এবং জামায়েত সম্পর্কে এখনও বলা চলে পাকিস্তানের জন্যও তারা জান কোরবান করতে রাজি। আর ইসলামকে অপব্যবহার করতে।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে জিয়া ও তার স্ত্রী সৈয়দপুরে হাকিম দম্পতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জিয়াকে তার পছন্দ হয়েছিল সুতরাং তার পরবর্তী আচরণ একজন 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'খুনি' ভাবা কঠিন। পরবর্তীকালে তার কমান্ডিং অফিসারকে তিনি খুন করেন। জিয়ার প্রতি তিনি নমিত, তিনি যাই করেন না কেন? এর উত্তর তিনি দেননি। হয়তো ১৯৭৫ সালের ঘটনা হাকিমকে প্রভাবিত করেছিল। জিয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করার আগে তিনি "in those days of madness" এবং 'alleged' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন যা অন্য বাঙালিদের সম্বন্ধে প্রায় ব্যবহৃত হয়নি।

আবার অন্যদিকে খালেদ অন্যরকম ব্যবহার করেছেন। চাকরিতে থাকার সময় বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতেন, গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু, তিনি তার কমান্ডিং অফিসার ও অন্য পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের নিরস্ত্র করে আগরতলায় ভারতীয়দের কাছে তুলে দেন 'বাধ্য' হয়ে। এবং আগরতলা যাবার পুরোটা সময় তিনি ছিলেন 'অ্যাপোলোজেটিক'। তিনি শেষে লিখতে পারতেন সেনা অফিসারের এরকম হওয়াই উচিত। কিন্তু লেখেননি। খালেদ মোশাররফ এরকম করেছিলেন কিনা জানি না কিন্তু পাকিস্তানিরা কোনো বাঙালি অফিসারকে হয়তো করেনি।

দার্শনিকভাবে শেষে মন্তব্য করেছেন, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের নামে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয়েছে। এটি সত্য। তার প্রমাণ হাকিম ও তার সহকর্মীরা যারা ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল।

দশম অধ্যায়ের শেষে বাঙালিদের আবার বেশ প্রশংসা করা হয়েছে। 'A very cultured people' বলে। কিন্তু বিদ্রোহ বা দুর্যোগ মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। এরপর লিখেছেন, ১৯৭০ সালে বন্যার পর বন্যা উপদ্রুত থানায় প্রতিটি লাশ কবর দেয়ার জন্য নগদ টাকা দেয়া হতো। মৃতের প্রিয়জনরা পরদিন আবার সে লাশ খুঁড়ে বের করত যাতে আবার কবর দেয়ার জন্য নগদ টাকা পাওয়া যায়। এরকম কোনো ঘটনা তখন খবরে আসেনি। আমাদের দেশে কম ধর্মপ্রাণ মানুষও মৃতের এমন অবমাননা করবে বলে বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি বলতে চেয়েছেন এসব ঘটনা তাকে নিস্পৃহ করে তুলেছিল। ১৯৭৭ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি আবার কেঁদেছিলেন।

তবে ৫ থেকে ১৫ অধ্যায়ে তিনি বারবার মনে করিয়ে দিতে ভুলেননি যে, ভারতীয়রা ছিল সবকিছুর মূলে [পৃ. ৬৮] এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, বছরের পর বছর ধরে ভারতীয়রা আমাদের সমাজের বিভিন্ন পর্যায় ছাত্র, সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রিন্টমিডিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিল। 'এখানকার মানুষদের অনিরাপত্তা ও বঞ্চনাকে তারা ব্যবহার করেছে বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে। এবং "They had been able to capture the imagination of a segment of our people who mattered." [পৃ. ১২২]

৬৪

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যুদ্ধের ও আত্মসমর্পণের বিবরণ। এ বিবরণে বারবার আত্মজিজ্ঞাসার বিষয়টি এসেছে যা আগেও হাকিম অনেকবার উল্লেখ করেছেন। তার মূল বক্তব্য হলো– পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা উচিত হয়নি কারণ পাকিস্তান সেভাবে প্রস্তুত ছিল না যার সুযোগ ভারত পুরোপুরি নিয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকা ও চীন পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে আসছে এ গুজবও ক্ষতি করেছে। একটি ঘটনার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায়, "আমাদের উৎফুল্ল ব্রিগেড কমান্ডার তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ভারতীয় প্যারাট্রুপারদের চীনা ভেবে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল। বলাই বাহুল্য তারা সবাই বন্দী হয়েছিল এবং ভারতীয় প্রচার মাধ্যম তা প্রচার করেছিল।" এ ধরনের ঘটনা ছিল ডিপ্রেসিং।

ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী কেমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তার বিবরণ আছে। ভারতীয় দুই সৈনিককে গ্রেফতারের পর তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয়রা তাদের দিনাজপুর থেকে হটাতে পারত না কিন্তু তখনই ঘোষিত হলো আত্মসমর্পণের কথা যাকে হাকিম 'অন্তিম লজ্জা বা আলটিমেট শেম' বলে উল্লেখ করেছেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ও তার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন সৈয়দপুরে। তারপর সৈয়দপুরেই তাদের রাখা হয়। ২১ ডিসেম্বর বাসে করে তারা রওয়ানা হন। তার বর্ণনা, "রাস্তার বাঙালিরা আমাদের চিনেছে। প্রায় সবাই হাত নেড়ে বিদায় জানাল, অনেকের চোখে পানি। কেউ আমাদের দিকে সুনির্দিষ্ট হাত ওঠায়নি, স্লোগানও দেয়নি যদিও তারা জানে আমরা বন্দী, প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা নেই।" [পৃ. ১৮৮]

এই বর্ণনায় তিনি তার আগের থিসিসই প্রমাণ করতে চেয়েছেন অধিকাংশ বাঙালি তাদের বিরুদ্ধে ছিল না। কিন্তু ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে এমন কোনো দৃশ্য সম্ভব? হাকিম বলতে পারতেন, বাঙালিরা কিছু বলেনি কারণ তারা প্রতিশোধপরায়ণ নয় এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে তারা করুণার চোখে দেখছিল।

এরপর তাদের বাঁচাতে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের যেভাবে রাখা হয়েছে তার বর্ণনা দেখে বলতেই হয় ভারত জেনেভা কনভেনশন মেনে চলছিল। বাঙালিদের পাকিস্তানে কীভাবে রাখা হয়েছিল তার যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে হাকিম বোধহয় তা পড়েননি। পড়লে জানতে পারতেন ভারতীয় ও পাকিস্তানি সেনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা। অবশ্য, পড়লেও বিশ্বাস করতেন না। তাদের পূর্বধারণাই হচ্ছে যা কিছু খারাপ তার প্রতীক হচ্ছে ভারত বা হিন্দু।

জীবিত থেকে তারা পালাবার চেষ্টা করেন কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। শাস্তিস্বরূপ তাদের কয়েকজনকে আগ্রা জেলে রাখা হয়। সেখানে তারা কীভাবে কাটিয়েছিল তার বর্ণনা আছে। ভারতীয়রা মাঝে মাঝে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি' তত্ত্ব। সেগুলি তারা খাঁটি পাকিস্তানির মতো অগ্রাহ্য করেছেন।

সেখানে একবার গুজব শুনেছেন ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। হাকিম ভেবেছিলেন তিনিও সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। আফসোস করে লিখেছেন, একজন ব্যক্তি হয় 'ওভার রিঅ্যাক্ট' করতে পারে কিন্তু তারা সবাই 'ব্রান্ডেড' হচ্ছেন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অথচ দোষ তো তাদের নয়; কারণ আইনগত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তার ভাষায়– "but now we were all being branded as war criminals for actual or contrived acts of desperation committed under circumstances created by there who had rebelled against lawful authority." [পৃ. ২২৯]

অর্থাৎ কোনো কিছুর জন্যই তারা দোষী নয়।

ফিরে যাওয়ার সময় তার অনেক স্মৃতি মনে হয়েছে কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি বা পরিকল্পনাহীনতাই তার কাছে বড় মনে হয়েছে। তার সেই পূর্ব ধারণা তখনও বলবৎ। তিনি লিখেছেন, একে একে বিচার করলে "আমরা ভারতীয়দের থেকে ভালো।" বিশ অধ্যায় পর্যন্ত এসব বর্ণনার মাঝে তার সেই লক্ষ্যহীন দার্শনিক রেটরিকের কমতি নেই।

অবশেষে তিনি পাকিস্তানে ফেরৎ যান এবং তাকে আবার সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

৬৫

২১ অধ্যায় পর্যন্ত যা লিখেছেন ২২ থেকে ২৫ অধ্যায়ের মধ্যে তার মূল্যায়ন করেছেন। আগের অধ্যায়গুলিতে যে বর্ণনা দিয়েছেন যা আমি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি সেগুলিই আরো সংহতভাবে বর্ণনা করেছেন মাত্র। তাতে নতুন কিছু নেই। তবে, তার সমস্যা হচ্ছে দোদুল্যমানতা। তিনি জানেন কেন ১৯৭১ হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে কী হয়েছিল? কিন্তু তার উদ্দেশ্য, বর্ণনা এমনভাবে দেওয়া যাতে মূল বিষয় এড়িয়ে যাওয়া যায়। যেমন– 'অ্যা রিঅ্যাপরাইজাল' অধ্যায়ের উপসংহারে লিখছেন, যা হয়েছে তার জন্য ব্যক্তি (যেমন– নিয়াজি, ইয়াহিয়া, ভূট্টো, মুজিব) কয়েকজনকে দোষ দিয়ে বাকি সবাইকে দোষ দিলে তা ঐতিহ্য অনুযায়ীই হবে। অর্থাৎ সত্যকে এড়িয়ে ভবিষ্যতকে (posterity) বিকৃত করা।

"Unless we probe, discover and remove the drawbacks in our modus operandi for advancement of genuine leadership in public institutions of national importance we shall continue to throw up new incompetents to torment us." [পৃ. ২৫৮]

এ ধরনের পরামর্শ ২২ থেকে ২৫ অধ্যায় পর্যন্ত লক্ষণীয়।

যেমন আরেক জায়গায় লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে তার অভিজ্ঞতা বলে, শক্তির ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় না। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, সহমর্মিতা, সরকারের সঙ্গে জনগণ ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।

২৪ অধ্যায়ের শিরোনাম 'দি মিলিটারি অ্যাকশন'। এতে অনেকগুলি উপ অধ্যায় আছে। প্রথমটি 'এর কি প্রয়োজন ছিল?'

বাংলাদেশে কি সামরিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ছিল? এর উত্তর প্রথমে তিনি একটি পটভূমি দিয়েছেন যা আগেও উল্লেখ করেছেন। পটভূমি হলো, পূর্ব পাকিস্তানে অনেক বিষয় ছিল যা ইস্যুভিত্তিক নয় 'caught the peoples imagination (পৃ. ২৬৬)। শব্দ তিনটির ব্যবহার লক্ষণীয়। এবং তারা 'অশৃঙ্খলিত' (আনফেটারড) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল। এ সমস্ত দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন শুরু হয়। সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও 'perecived economic exploitation' (পৃ. ২৬৬)

[শব্দ তিনটি লক্ষ্য করুন] চরমপন্থার বিকাশ এবং আইনগত ভিত্তি নিয়ে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা অতি শিঘ্র রাষ্ট্রবিরোধীরা হাইজ্যাক

করে নেয় এবং এটিকে 'ভায়োলেন্ট এজিটেশনে' পরিণত করে যা 'এথনিক কিলিং'সের পথ করে দেয়। পরিণতিতে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে পটভূমি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার সঙ্গে এর অমিল নেই। কিন্তু কিছু শব্দের ব্যবহার বিষয়টিকে উল্টে দিয়েছে এবং ৭১ সম্পর্কে পাকিস্তানিদের ধারণাটিকে আরো স্পষ্ট করেছে। যেমন, বঞ্চনার ব্যাপারটা মানুষকে আহত ও ক্ষুব্ধ করেছে 'পিপলস ইমাজিনেশানে' ধরেনি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 'অশৃঙ্খলিত' মানে কেন্দ্র'কে মানা হবে না এবং এরই নাম ৬ দফা। অর্থনৈতিক 'এক্সপ্লয়েটেশন' তো ছিলই, সংখ্যাতত্ত্বই তা বলে, এটি 'পারসিভড' বা ধারণাগত হবে কেন? রাজনৈতিক আন্দোলন 'হাইজ্যাক' করল কারা রাষ্ট্রদোহিরা অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরা এবং তার ফলে 'এথনিক কিলিং' অর্থাৎ বিহারি হত্যা শুরু হলো, সবশেষে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ২৫ মার্চ অপারেশন 'ব্লিৎজ' বা 'অপারেশন সার্চলাইট' তাহলে ঘটেনি? সুতরাং, লক্ষ্য করুন পটভূমিটা কীভাবে পাল্টে গেল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে হাকিম মনে করেন, শক্তি প্রয়োগ দরকার ছিল ["The use of force was also necessary for individual and collective survival. [পৃ. ২৬৬] অথচ, আগে আবার বলেছেন শক্তি প্রয়োগে রাজনৈতিক সমাধান হয় না।

এ ধরনের উপসংহারই স্বাভাবিক। এবং পাঠক যাতে কনভিন্সড হয় সে জন্যই পটভূমিটি ঐভাবে লেখা।

এর পরের বিষয়টি হচ্ছে বাঙালিরা স্বাধীনতা চায়নি। এ থিসিস প্রমাণ করতে গিয়ে আবার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা আগের পটভূমির বিপরীত।

শেখ মুজিবের বাসায় হানা দেয়ার নেতৃত্ব দেয় মেজর বিলাল। তিনি বিলালকে বলেন, সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার মতো কোনো কাজ তিনি করেননি। তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য কী? যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নাকি সহানুভূতি আকর্ষণ?

পাকিস্তানি সৈন্যরা আওয়ামী লীগের করা যে খসড়া শাসনতন্ত্র উদ্ধার করেছিল তাতে দুটি দেশের উল্লেখ নেই বরং কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের [আগের অনুচ্ছেদে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত মন্তব্য দেখুন] কথা আছে। এটি সত্য হলে সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে না [আগে বলেছেন হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় ছিল]।

হাকিম বলছেন, পূর্ব পাকিস্তানি অনেকে তার বন্ধু ছিলেন, সেখানে দুঃসময়ে কাজ করেছেন এবং এখনো তিনি বিশ্বাস করেন না সংখ্যাগরিষ্ঠরা

বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ছিল

["I am not covinced, even today, that it was the wish of the majority to break away from the west." পৃ. ২৬৭]

বিশ্বস্ত এক সূত্র মতে, জেলে বসে মুজিব যখন আসন্ন ভারতীয় আক্রমণ সম্পর্কে শুনলেন তখন তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন টেলিভিশনে বক্তৃতা দিয়ে ভারতকে জানাবেন যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। জেনারেল ইয়াহিয়া তাতে রাজি হননি কারণ কয়েকদিন আগে যাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন তাকে আবার স্বীকার করবেন কীভাবে?

এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, পাকিস্তানের জেল থেকে যখন প্লেনে দেশে ফিরছেন তখনও শেখ মুজিব ভারত বিদ্বেষী। পাকিস্তানীর পক্ষে মন্তব্য করেছেন।

জেনারেল গুলাম জিলানী খান জানিয়েছেন, শেখ মুজিব সবসময় বলেছেন, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, সুতরাং তিনি সারা পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেবেন। সুতরাং তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে পারেন না।

এসব উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠরা পাকিস্তান ভাঙ্গতে চেয়েছে এটি বলা ঠিক হবে নাকি সংকটময় মুহূর্তে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা এর কারণ?

তারপরই তিনি বলছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ একরাতে চিন্তা করে শুরু করা যায় না। হাকিম মনে করেন, এটি পরিকল্পিত, আগরতলা ষড়যন্ত্র থেকে শুরু এবং ভারত অব্যাহতভাবে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য কাজ করেছে। তবে, পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃত্ব এবং সেনারা এই পরিকল্পনার সচেতন পক্ষ ছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

উপসংহারে বলছেন, ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ মুসলমানদের একাংশকে শক্তি, অন্তর্ঘাতের দ্বারা বশীভূত করে এবং বোঝায় যে ভারতের সাহায্যে পাকিস্তানের জোয়াল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, প্রগতির নতুন পথ খুলে যাবে। তার ভাষায়–

"By 1971, the Awami League had, through coercion, subversion and clever manipulation of the print media managed to blur the thinking of a section of the Bengali Muslims, who had come to believe that freedom from Pakistani yoke would, with Indian help, open up a new world of progress for them. A mind-boggling ideological turnaround!" [পৃ. ২৭১]

প্রতিটি অনুচ্ছেদ প্রতিটি অনুচ্ছেদের বিপরীত।

তার দ্বিতীয় হাইপথেসিস অতিরিক্ত শক্তি কি প্রয়োগ করা হয়েছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরেও তিনি তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে পুরানো বক্তব্য নতুনভাবে দিয়েছেন যার প্রচ্ছন্ন অর্থ শক্তি তেমন প্রয়োগ করা হয়নি তার ভাষায়–

"However, the magnitude of force deployed by us, though inevitable in view of the display of street power by the militant to over a number of weeks did provoke a backlash." [পৃ. ২৭২]

তার মতে, ভারত এর সুযোগ নিয়েছে যা পাকিস্তানের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। হাকিমের মতে, শক্তি প্রয়োগ হলেও তা বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে।

পরের হাইপথেসিস সামরিক হস্তক্ষেপ কি এড়ান যেত? এ প্রশ্নের উত্তরে আগের মতো তিনি অনেক প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়েছেন। যেমন, হ্যাঁ এড়ান যেত যদি যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা অন্যভাবে ব্যবহার করতেন। যদি জুলফিকার আলী ভূট্টো বিরোধী দলে বসতেন ইত্যাদি। মূল প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্টভাবে দেননি।

পরের বিবরণের শিরোনাম গণহত্যা ও ধর্ষণ।

বাংলাদেশের পক্ষে যে বলা হয় ত্রিশ লক্ষ শহীদ হয়েছে ও ধর্ষিত হয়েছে কয়েক লক্ষ তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটি প্রমাণ করার জন্য লন্ডন থেকে জামায়েত প্রভাবাধীন সংস্থা থেকে প্রকাশিত বই ও পাকিস্তানিমনা বিএনপির লে. কর্নেল আকবর হোসেনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিসাব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেই আগের মতো প্রশ্ন রেখেছেন :

১. বিরাট সংখ্যক বাঙালি রাজাকার শেষ অব্দি পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করেছে যার অর্থ এ ধরনের 'Extermination programme' এ তারা অংশ নিতে পারে না। অথচ আমরা জানি বাঙালি জামায়েত ও রাজাকাররা কীভাবে গণহত্যা ও ধর্ষণে অংশ নিয়েছিল।

২. বাংলাদেশ হওয়ার পর একটি ছাড়া কি কোনো গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে? আমি মুক্তিযুদ্ধ কোষ সম্পাদনা করছি। এ পর্যন্ত আমরা ১০০০ গণকবরের বিবরণ সংগ্রহ করেছি।

৩. কতজন গর্ভপাত করিয়েছিল বা কতজন ধর্ষিত হয়েছিল? পাকিস্তানি সেনারা বাংলাদেশ ত্যাগ করার পর কতজনের সন্তান হয়েছিল ইত্যাদি? ধর্ষণ হয়নি, হলেও দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে।

আমি এখানে বাঙালি বা পাকিস্তানি কারো সাক্ষ্য দেব না। আমি সদ্য প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ার শল্য চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিসের কথা উল্লেখ করতে চাই। তাঁর পর্যবেক্ষণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের *বাংলার বাণী*তে।

"সিডনীর শল্য চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিস সম্প্রতি লন্ডনে বলেন, ন'মাসে পাক বাহিনীদের দ্বারা ধর্ষিত ৪ লাখ মহিলার বেশিরভাগই সিফিলিস অথবা গণোরিয়া কিংবা উভয় ধরনের রোগের স্বীকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে ভ্রূণহত্যাজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।....

ডা. ডেভিস বলেন, বাংলাদেশে কোনো সাহায্য এসে পৌঁছার আগেই পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের ফলে ২ লাখ অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলার সংখ্যাগরিষ্ঠাংশ স্থানীয় গ্রামীণ ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটিয়েছেন।..."

এ প্রসঙ্গটি পাকিস্তানের প্রখ্যাত কলামিস্ট নকভীর সাক্ষাৎকার দিয়ে শেষ করব। করাচিতে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম বছর পাঁচেক আগে। 'পাকিস্তানি বাহিনী ছিল', অকম্পিত স্বরে জানালেন নকভী, "বিশৃঙ্খল লুটেরা বাহিনী। এরা লুট করেছে, ধর্ষণ থেকে শুরু করে সবরকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের মন্তব্য। ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন তাকে লুট, ধর্ষণ, হত্যা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি বলেন ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত। তিন হাজার, মাত্র তিন হাজার ধর্ষিত হয়েছে..." নকভী এরপর যা বলেছিলেন তা হলো, একজনকেও যদি ধর্ষণ করা হয় সেটিও অপরাধ। রাষ্ট্রের রক্ষক তো ধর্ষণ করতে পারে না। ইসলাম ধর্মে আমানত-খেয়ানত করার মতো বড় পাপ খুব কমই আছে।

তারপর হাকিম এনেছেন ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন। তার মতে, শর্তহীন ক্ষমা চাওয়ার অর্থ সেনাবাহিনী ও তৎকালীন নেতৃত্বকে দোষারোপ করা। আর যে সেনাবাহিনী দেশ গড়ার নামে যুদ্ধ করেছে, বীরত্বসূচক পদক পেয়েছে সেগুলি নাকচ হয়ে যায় যা সেনাবাহিনীর ভবিষ্যতে অভিঘাত হানবে। ক্ষমা চাওয়া উচিত বরং মি. জিন্নাহর কাছে। তার মতে, অর্থবহ ক্ষমা চাইতে হলে দু'পক্ষকেই করতে হবে।

["For any apology to be meaningful, it must be mutual."]

শেষ অধ্যায়টির শিরোনাম 'কনক্লুডিং অবজারভেশন'। আগে উল্লিখিত বিবরণ ও যুক্তিসমূহের সারাংশই দিয়েছেন যার মূল্যায়ন দরকার নেই।

হাকিম আরশাদের বিবরণ পড়ে যা জানতে পারি, তা হলো, ১৯৭১ সালে ভারতীয় প্ররোচনায় ও সাহায্যে আওয়ামী লীগ বাধ্য করেছিল সেনাবাহিনীকে দ্বন্দ্বে যেতে। সেনাবাহিনী বাধ্য হয়েছে তা প্রতিরোধ করতে। বাঙালিদের অধিকাংশ সেনাবাহিনীর পক্ষে ছিল। গণহত্যা-ধর্ষণের যেসব কথা বলা হয় সেগুলি অতিরঞ্জিত। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তি ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি তারা

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

উপসংহার, তার মতে, ১৯৪৭ সালের পর একজন ব্যক্তিই সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তিনি হলেন মি. জিন্নাহ। আর একটি প্রতিষ্ঠান সে রকম প্রশংসিত তাহলো সেনাবাহিনী।

["The only other institutions that have invoked such admiration have been the Armed Forces, particulary the Army." পৃ. ২৯২]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো সদস্যের এর বাইরে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই।

৬৬

মেজর জেনারেল এ.ও. মিঠার নামটি নিয়াজি বা টিক্কাখানের মতোই আমাদের কাছে পরিচিত কারণ মার্চের দিনগুলিতে হানাদার বাহিনীর আক্রমণ পরিচালনায় তারও ভূমিকা ছিল। মিঠা সেটি অস্বীকার করেননি কিন্তু তার বর্ণনায় এমন একটা ভঙ্গি আছে তাতে এটি যে সে সময় একটি জঘন্য কাজ ছিল তা মনে হবে না। কারণ, বাঙালির প্রতি তার কোনো তীর্যক মন্তব্য নেই। ভাবটি এমন, তিনি একজন সামরিক অফিসার যার কাছে দেশ রক্ষাই প্রধান কাজ। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দেশ রক্ষার, তিনি তা করেছেন। তবে সম্পূর্ণ বইটি পড়লে অনেকের তার প্রতি সহানুভূতি জাগতে পারে বটে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি মন্তব্যে তার পূর্ব ধারণা প্রকট হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানের অন্যান্য সামরিক অফিসারের সঙ্গে মিঠার খানিকটা পার্থক্য ছিল। এ. ও. মিঠার জন্ম কসমোপলিটান বোম্বে বা মুম্বাইয়ে ১৯২৩ সালে এক ধনী মেমন পরিবারে। সুতরাং, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাদেশিকতা ছিল না। দারিদ্র্যের কারণে নয় নিজ ইচ্ছায়ই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৯৪২ সালে। বার্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। প্রেমে পড়েছিলেন বাঙালি খ্রিস্টান জেনারেল, তার বস রুদ্রের বোন ইন্দুর সঙ্গে। বিয়েও করেছিলেন তাঁকে। সে কথায় পরে আসব।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার পরপরই পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। ত্রাণ কাজ করার জন্য মিঠাদের পাঠানো হলো কলকাতায়। ত্রাণ ও ওষুধ নিয়ে পূর্ববাংলায় তিনি ঘুরেছেন। সেই সময় তার মনে হয়েছে, এই অঞ্চলের মুসলমানরা গরিব এবং শোষিত। যে কোনো

সমাবেশে তিনি দেখেছেন, হিন্দুরা চারপেয়েতে বসে আছে আর মুসলমানরা মেঝেতে। প্রশ্ন হলো, হিন্দুরা কি মেঝেতে বসত না? সে সময়কার রীতিই ছিল 'ভদ্রলোক' বসতেন চেয়ারে বা চারপেয়েতে বাকিরা মেঝেতে। পশ্চিম পাকিস্তানে কি এই প্রথা ছিল না? মিঠা লিখেছেন, তিনি কখনো সাম্প্রদায়িক ছিলেন না কিন্তু "plight of the Muslims was so bad that one could not help notcing it." [পৃ. ৬৯]

দেশভাগের দাঙ্গার সময় তিনি দিল্লিতে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, শিখ, হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরকে হত্যা করছে। সেদিন থেকে নেহেরু এবং গান্ধীর ওপর তার আস্থা চলে যায়। তিনি লিখেছেন, এ ধরনের নৃশংসতা তিনি ফের দেখেছেন ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে। তবে, দ্বিতীয়বার তিনি আর বিস্মিত হননি।

মিঠা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে চলে আসেন। তার পুরো পরিবার থেকে যায় মুম্বাই। ইন্দুর বাবা তার বিয়েতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু, জোর-জবরদস্তি করে ইন্দু চলে আসেন করাচি। সেখানেই তারা বিয়ে করেন।

মিঠার বিবরণ পড়ে মনে হয়, প্রথমদিকে পাকিস্তানে যারা ছিলেন সেনাবাহিনীতে, তারা ব্রিটিশ আমলের। সেনাবাহিনীর মধ্যে তখনো এক ধরনের সহনশীলতা ছিল। আক্ষরিক অর্থেই সেনাবাহিনীর লোকজনের নুন আনতে পান্তা ফুরাত। কিন্তু, প্যাকিস্তান আমলে সেনা রিক্রুট হতে থাকলে চালচিত্রটা বদলে যায়। সেই সময় মিঠা নিজেও মুম্বাই গেছেন কয়েকবার, তার আত্মীয়স্বজন, শ্বশুর বাড়ির লোকজনও পাকিস্তান ঘুরে গেছেন। পরবর্তীকালে তা ছিল অসম্ভব ব্যাপার এবং ১৯৫৮ সালের পর মিঠার প্রতিও গোয়েন্দা বাহিনী নজর রেখেছিল।

১৯৬২ সালে মিঠা কর্নেল পদে উন্নীত হন। এ সময় ইয়াহিয়া, হামিদ প্রমুখের সঙ্গে তার সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সময়ই তাকে পাকিস্তানের কমান্ডো বাহিনী বা স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (এস এস জি) গড়ে তোলার ভার দেয়া হয়। সাফল্যের সঙ্গে তিনি তার কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৬৬-৬৮ সালে পাকিস্তান মিলিটারি কলেজেরও অধ্যক্ষ ছিলেন।

মেজর থাকা অবস্থায়ই মিঠা পাকিস্তান বাহিনীতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ করেন। লাহোরে অবস্থানের সময় তার ওপরঅলা তাকে একটি তালিকা ধরিয়ে দেন। মিঠা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলে তিনি বলেন এটি কাদিয়ানী অফিসারদের। মিঠা তখনো এর কারণ বুঝতে না পারলে জিওসি তাকে বলেন আগের এম এস ছিলেন কাদিয়ানী। তিনি ব্রিগেড ও সদর দপ্তরগুলোতে

কাদিয়ানী অফিসারদের নিয়োগ দিয়েছেন। প্রায় ৩০ ভাগ কাদিয়ানী ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়ান কমান্ডার। আইয়ুব খান নির্দেশ দিয়েছেন এই অবস্থা পরিবর্তনের। হামিদ ছিলেন তখন জিওসি। মিঠা লিখেছেন, মুম্বাইতে বড় হওয়ার কারণে তিনি এ লাইনে চিন্তাই করেননি। কারণ, যার যার ধর্ম তার তার। মিঠা জানতেন না এ বৈষম্য বাঙালিরা তো আগেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন।

১৯৬৩ সালে মিঠাকে পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বদলি করা হয়। বদলির আদেশ পেয়ে তিনি রওয়ানা হন পূর্ব পাকিস্তান। তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে চলে যান মুম্বাই ছুটি কাটাতে।

৬৭

ঢাকা বিমান বন্দরে মিঠা নামছেন আর তার পূর্বসূরি করাচি যাচ্ছেন। পূর্বসূরিকে সিঁড়ির গোড়াতেই বিদায় জানালেন। সেদিন রাতে ঢাকায় থাকলেন তিনি। পরদিন সকালে পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করলেন। ইয়াহিয়া তাকে জানালেন, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে একমাত্র পদ্ধতি হবে গেরিলা পদ্ধতি। সুতরাং মিঠা কি এক ইনফেনট্রি ব্রিগেড গড়তে পারবেন যারা গেরিলা হিসেবে যুদ্ধ করতে পারবে? যদি এতে সাফল্য আসে তাহলে বাকি ব্রিগেডকেও একই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ছয়মাস সময় দিলেন তিনি মিঠাকে তার মতামত জানাবার জন্য। তিনি আরো বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা পূর্ব পাকিস্তানিদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তিনি এ ধরনের আচরণ সহ্য করবেন না। মিঠাও যেন দেখেন তার ব্রিগেডে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে। কুমিল্লায় ভার নেবার একমাস পর ক্লাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। ইনফেনট্রির দুজন ক্যাপ্টেন বাঙালি অফিসার ও তাদের স্ত্রীদের সামনে এ ধরনের আচরণ করেন। মিঠা তখনই তাদের ক্লাব থেকে বের করে দেন। পরের দিন ইয়াহিয়াকে ঘটনাটি জানান এবং তাদের অন্যত্র বদলির অনুরোধ করেন। পরের দিন তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়।

ইয়াহিয়া যে রণকৌশলের কথা বলেছিলেন তা যুক্তিযুক্ত তবে পাকিস্তানি সামরিক কর্তারা তাতে গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তিকালে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা এই কৌশল অবলম্বন করেই পাকিস্তানিদের পরাজিত করে। ইয়াহিয়া ধরতে পেরেছিলেন বাঙালিদের প্রতি অবাঙালিদের আচরণ ভালো নয়, তা প্রতিবিধানেও সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেই ইয়াহিয়াই মাত্র ৮ বছর পর পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার নির্দেশ দেন।

কুমিল্লায় পৌঁছার পরদিন ভোর ৬টায় টেলিফোন পেলেন ইয়াহিয়ার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন মিঠা লাঠি টিলার নাম শুনেছেন কিনা। না, জানালেন মিঠা। ইয়াহিয়া বললেন ব্রিগেড মেজর থেকে তা জেনে তখুনি সেখানে যেতে কারণ সেখানে ঝামেলা দেখা দিয়েছে। মিঠা লাঠি টিলা পৌঁছে দেখেন সেটি চার একরের জঙ্গলাবৃত একটি টিলা যা দুদেশই দাবি করছে। প্রতি বছরই সেখানে ঝামেলা হয় এবং পাকিস্তানের দু-একজন মারা যায়। মিঠা দেখলেন, 'সিচুয়েশন' ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের নিয়ন্ত্রণে আছে। কয়েকদিন এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর ও পড়াশোনা করে মিঠা ইয়াহিয়াকে একটি চিঠি দিয়ে জানালেন, চার একর 'unproductive land' নিয়ে ঝামেলা করা 'unnecessary waste of lives'. সুতরাং ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ করে স্থায়ী একটি সমাধানে আসা উচিত। মিঠা লিখেছেন, পরদিন ইয়াহিয়া তাকে বেদম ঝাড়লেন। ['I got a terrific rocket from Yahya'] । ইয়াহিয়া জানালেন মিঠার চিঠি তিনি নষ্ট করে ফেলছেন, মিঠাও যেন চিঠির কপি ধ্বংস করে ফেলে। মিঠা লিখেছেন, এ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেননি ইয়াহিয়া কেন এরকম আচরণ করেছিলেন কারণ সাধারণত সে রকম আচরণ তিনি করতেন না।

মিঠা জানাচ্ছেন, তার স্ত্রী খুব খুশি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তিনি ছিলেন বাঙালি এবং "Her interest in and knowledge of music and dance and her admiration of Tagore and Nazrul Islam were greatly appreciated by the East Pakistanis." [পৃ. ২৪৫] ইন্দু ওস্তাদ বাহাদুর খান ও আয়াত আলী খানের মতো লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তারা ক্যান্টনমেন্টে এসে বাজিয়েছিলেনও। মিঠা জানাচ্ছেন, বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের ভালো ছিল। ইন্দুর কারণে তা উন্নীত হয়েছিল। আর বাঙালিরা বিশ্বাস করতেন না যে ইন্দু খ্রিস্টান। তারা ভাবতেন ইন্দু, ব্রাহ্ম, নয়তো একজন মুসলমানকে বিয়ে করে কীভাবে?

মিঠা দম্পতি তাদের মেয়েদের পাঠিয়েছিলেন কুমিল্লার স্কুলে। ক্যান্টনমেন্টে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, হোয়াইটওয়াশ বা এ ধরনের কাজ থেকে প্রশিক্ষণে তিনি আগ্রহী। ইয়াহিয়ার কথা মতো এক ইউনিটকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়াও হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করায় গেরিলা ব্রিগেড গঠন করা হয়নি।

মিঠা জানিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানে কয়েক সপ্তাহ কাটানোর পর তিনি লক্ষ করেন ১৯৪৬ থেকে যে ইয়াহিয়াকে তিনি চিনতেন সে ইয়াহিয়া বদলে গেছেন। সব সময় অস্থির, অসহিষ্ণু, কাজে মন নেই। একবার অবশ্য মিঠাকে

জানিয়েছিলেন, পারিবারিক কিছু ঝামেলা আছে যা তিনি মেটাতে চান এবং এ জন্য ছুটি নিবেন। হয়তো এ কারণেই তিনি পেশোয়ার বদলি হয়ে যান।

ইয়াহিয়া একবার কুমিল্লায় এলেন পরিদর্শনে। রাতে ডিনার। ডিনার প্রস্তুত। ইয়াহিয়াকে তাগাদা দেয়া হচ্ছে। তিনি কর্ণপাত করছেন না। মদ খাচ্ছেন আর কথা বলছেন। মিঠা তখন অন্যান্য অফিসারদের বললেন, খাওয়া শুরু করতে। ইন্দু তখন ইয়াহিয়ার পাশে বসলেন তাকে ডিনারে নিয়ে আসার জন্য। ইয়াহিয়া ইন্দুকে বোঝাতে লাগলেন যে, তাকে তিনি তার হাঁটু সমান থাকতে দেখেছেন। তারপর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড আলীকে ডেকে বললেন, "অ্যাই শুয়ার কা বাচ্চা ইধার আও।" আলী এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি আলীর সন্তান, আমি শুয়ারের বাচ্চা হলাম কীভাবে?' ইন্দু তখন ব্যান্ডকে বাজনা শুরু করতে বললেন। ইয়াহিয়া ইন্দুর সঙ্গে নাচতে চাইলেন। ইন্দু ইয়াহিয়ার হাতে হাত রেখে তাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে এসে বসালেন। খানিক পর ইয়াহিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'Have I behaving badly' ইন্দু বললেন, 'হ্যাঁ'। ইয়াহিয়া তারপর ডিনার শেষ করে মেসে ফিরে গেলেন।

পরদিন সকাল ৬-১৫ মিনিটে মিঠার ইয়াহিয়াকে তুলে নেয়ার কথা। মিঠা রেডি হচ্ছেন। অর্ডারলি এসে জানালো, ইয়াহিয়া চলে এসেছেন। কাপড় পরে মিঠা তাড়াতাড়ি বেরুলেন। ইয়াহিয়া তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্দু কোথায়?' মিঠা জানালেন, ঘুমুচ্ছে। ইয়াহিয়া তখন বললেন, গত রাতের ব্যবহারের জন্য তিনি ইন্দুর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছেন। মিঠা জানালেন, ইন্দুকে তিনি তা জানাবেন। মিঠা মন্তব্য করেছেন, "That was Yahya at the time- an arrogant boor when drunk, a through gentleman when soaber, and not afraid to apologize." [পৃ.২৪৮]

দুবছর দায়িত্ব পালনের আগেই মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খানকে জিওসি হিসেবে আনা হলো। ইয়াহিয়া ও মুকিম পরস্পরকে পছন্দ করতেন না আবার মুকিমও ইয়াহিয়াকে পছন্দ করতেন না। সুতরাং মিঠা ও মুকিমের বনাবনি হয়নি। অবস্থা এমন হলো যে, মিঠা মুকিমকে জানালেন যে, তার ওপর কনফিডেন্স না থাকলে মিঠাকে যেন বদলির বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় মিঠা এখানে ছিলেন। তেমন কিছু ঘটেনি পূর্ব পাকিস্তানে, তবে তিনি সিভিলিয়ান পদক সিতারাই কায়েদে আজম পেয়েছিলেন।

মিঠা লিখেছেন, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬-এই তিন বছর তিনি কুমিল্লায় ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। লিখেছেন তিনি, "আমার কাছে মনে হয়েছে বাঙালি আর্মি অফিসার ও তাদের স্ত্রীরা

উদারমনা ও সেক্যুলার। পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও তাদের স্ত্রীদের থেকে তাদের জানার পরিধি বেশি, নাচ ও গানের ভক্ত এবং সংস্কৃতিবান। তবে, বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে যে অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ বিদ্যমান তাও অনুভব করছিলাম।" এই ক্ষোভ অন্তর্হিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় যখন দেখা গেল তাদের দেশপ্রেমও কম নয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে। মিঠার এই ইংরেজি বাক্যে একটি শব্দ আছে 'Proved'। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিরা দেশপ্রেমিক এটা তো স্বতসিদ্ধ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানিরা প্রমাণ করেছে তারাও দেশপ্রেমিক এবং তাদের থেকে বেশি। এই একটি শব্দই তিনি নিজেকে যত মেট্রোপলিটন বলে প্রমাণ করুন না কেন তার পূর্ব ধারণাই তুলে ধরে। তার ভাষায়, "during the 1965 War, when the East Pakistanis of all classes proved themselves as Patriotic as any West Pakistanis, in fact more so. Despite to the feeling of complete isolation. They never lost heart and were willing to fight in the bitter end." [পৃ. ২৬]

পূর্ব পাকিস্তানে থাকার সময় মোটামুটি বন্ধুহীন ও নিঃসঙ্গ কাটালেও দু-একজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। এদের একজন ইরফান ও তার স্ত্রী খুরশীদ। মদ্যপানে প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁকে অনেকেই পছন্দ করতেন। লিবিয়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত করা হয়েছিল যাতে তিনি কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন, মদ্যপান কমে। বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে তাঁকে আবার একই জায়গায় রাষ্ট্রদূত করা হয়। কিন্তু সে পদ গ্রহণের আগেই তিনি পরলোকগমণ করেন। খুরশীদের ছোট বোনকে বিয়ে করেন ড. কামাল হোসেন যাকে মিঠা উল্লেখ করেছেন। 'more catholic than the Pope' হিসেবে।

অবসর গ্রহণের পর লিখেছেন মিঠা, তিনি জানতে পারেন, খুরশীদ করাচিতে আছে। ঠিকানা খুঁজে বের করে তিনি সস্ত্রীক তার সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু খুরশীদ তার সঙ্গে খুব শীতল ব্যবহার করেন। মিঠার ভাষায়, "We went to see her and were shocked and very upset to be received with a cold and hostile attitude. Neither of us has understood the reason for this attitude to this day..." [পৃ. ২৫৯]

মিঠার এ বক্তব্যে বরং আমরা বিস্মিত হই। ১৯৭১ সালে মার্চে যে গণহত্যা চালানো হয় যাদের নির্দেশে মিঠা ছিলেন তাদের একজন। 'পাকিস্তান রক্ষায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন' বা 'হুকুম মেনেছেন'– এসব কথা বলে সে দায় এড়ানো সম্ভব না। এ সহজ সত্য মিঠারা কখনো বোঝেনি।

এর অনেক পর আবার তার মেয়ে ইয়ামিনা ঢাকা এলে খুরশীদ তাকে

আপ্যায়ন করেন। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান কিন্তু একবারও ইন্দুর কথা জিজ্ঞেস করেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে মিঠা যে মন্তব্য করেছেন সেখানে বোঝা যায়, গণহত্যার বিষয়টি তার মনে আছে কিন্তু ব্যক্তি দায় তো তার নয়, তা হলে কেন এত বছরের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে। তার ভাষায়– "It is puzzling and heart-rending how there 'partitions' seem to lead to the break up of life-long friendships especially as neither friend seems to have done anything wrong personally." [পৃ. ২৫৯]

৬৮

পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে তিনি পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ কাজটিতে তিনি যাকে বলে 'জব স্যাটিশফ্যাকশন' তা পেয়েছিলেন। তারপর ১৯৬৮-৭০ সাল পর্যন্ত ১ আর্মার্ড ডিভিশনের কমান্ডার নিযুক্ত হন। জেনারেল জিয়াউল হকের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। জিয়া ছিলেন তার জুনিয়র। এরপর তিনি সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৭১ সালের মার্চে তিনি ঢাকা আসেন। গণহত্যার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা তখন থেকেই।

'ইল উইন্ডস' অধ্যায়ে ১৯৭১ সাল আলোচিত হয়েছে তবে ধারাবাহিকভাবে নয়। পুরো অধ্যায়টি ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে বর্ণনা করব।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান [পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি] রাওয়ালপিন্ডি এলেন জিএইচকিউ ও মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে আলোচনা করতে। মিঠা লিখেছেন, তিনি শুনেছেন, ইয়াকুব বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের বিষয় নিয়ে চিন্তিত না হতে। এই সময় ইয়াকুব দেখা করতে এলেন মিঠার সঙ্গে।

আলোচনার সময় মিঠা জানালেন তিনি বুঝতে পারছেন না এত কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইয়াকুব কীভাবে অবস্থা সামলাবেন। সুতরাং তিনি যেন আরো বেশি সৈন্য চান। ইয়াকুব একমত হলেন তবে তাকে আরো সৈন্য দেয়া হবে কিনা তা নিয়ে তিনি সন্ধিহান ছিলেন। মিঠা জানালেন, পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাই জানে, সুতরাং সৈন্য তিনি পাবেন। মিঠা বললেন, ইয়াকুবের অনুরোধের ১৮ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

ইয়াকুব চলে যাওয়ার পর লজিস্টিকের পরিচালককে মিঠা আলোচনার বিষয় জানালেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে এক ব্রিগেড সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে

বললেন। কোয়েটায় অবস্থানরত একটি ব্রিগেড ঠিক করা হলো এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটালিয়নকে ঢাকা পাঠানো হলো। বাকি ইউনিটগুলো ৭২ ঘণ্টার মধ্যে করাচি এলো। এ সময় কেন জানি ইয়াকুব খবর পাঠালেন, তার আর ট্রুপসের দরকার নেই। মিঠা জানিয়েছেন, এরপর থেকে তিনি শুনেছেন, ইয়াকুব নার্ভাস হয়ে গেছেন এবং শেখ মুজিবের দাবির কাছে নতি স্বীকার করেছেন। তার ভাষায়, "..... it seems that Yaqub lost his nerve and gave in to the demand made by Mujib that the troops, who were doing duty in aid of the civil power should be withdrawn."

মিঠা ইয়াকুবের পদত্যাগের বিষয়টিও মেনে নিতে পারেননি। কারণ তখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ হয়েছে এবং দেশের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন। তাছাড়া তার পদত্যাগ তার অধীনস্ত সহকর্মী ও কর্মীদের ত্যাগের সামিল যা সেনা এথিকসে অমার্জনীয়। "I believe that an officer has the right to resign if he does not agree with the government on some important policy matter, but not when the country's existence is at stake and open rebellion is taking place. Moreover by resigning when he did, he actually deserted the officers and men under his command, which is unforgivable according too military ethics.' [পৃ. ৩৩১]

ইয়াকুব প্রসঙ্গে তিনি আরো অনেক মন্তব্য করেছেন কিন্তু মূল বিষয়টি হলো, ইয়াকুবের পদত্যাগ দেশকে সাহায্য করেনি। পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং তা সামাল দেবার মতো মন-মানসিকতা তার ছিল না।

এ থেকে প্রতীয়মান যে, মিঠা অন্যান্য পাকিস্তানি জেনারেলের মতো শুরু থেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে বিদ্রোহ হিসেবে দেখছিলেন।

১৯৯৮ সালে জেনারেল ইয়াকুবের ইসলামাবাদের বাসভবনে এ বিষয় নিয়ে আলাপ হয়। আমি এবং মহিউদ্দিন আহমদ তার সঙ্গে আলাপ করি যার বিস্তৃত বিবরণ আছে আমাদের সম্পাদিত *পাকিস্তানিদের চোখে মুক্তিযুদ্ধ* (২০০৫) গ্রন্থে। আমি এখানে তার বয়ানের সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তো আপনি বিশেষ এক ভূমিকা পালন করেছিলেন। সে সম্পর্কে কিছু বলুন :

মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'কঠিন সময়। আমি আসলেই কিছু বলতে চাই না।'

'আপনাকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় একটা বিতর্ক চলছে, দেখেছেন নিশ্চয়?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'হ্যাঁ, নিয়াজির বইটি বের হবার পরই এ বিতর্ক শুরু হয়েছে। আলতাফ

গওহরও লিখেছেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে, নিয়াজির বইটির আশ্রয় যে ডাস্টবিন সে সম্পর্কে আমি একমত। প্রশ্ন উঠেছে : পূর্ব পাকিস্তানে যে সামরিক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তা আমার কি না? জেনারেল টিক্কা ও নিয়াজী সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন কি না? এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি আলতাফ গওহরকে পাঠিয়েছি, সঙ্গে পদত্যাগপত্রের কপিও। এসব কিছু এর আগে প্রকাশিত হয়নি।' বলে কিছু কাগজপত্র আমাকে দিলেন। সাক্ষাৎকার নিলে হয়তো তিনি এ বিষয়গুলোই বলতেন। এখানে আমি সেই নথিপত্রের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তাহলে কীভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে সে বিষয়ে ১৯৭০-এর নভেম্বরে জেনারেল ইয়াকুব জিওসি হিসেবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যার নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ব্লিৎজ'। এবং আরো বলা হয়, এটি কার্যকর করতে হবে 'Using minimum force.'

টিক্কা খানের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করেন তিনি ৭ মার্চ এবং ১১ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। আরো দু'সপ্তাহ পর সামরিক বাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুতরাং হতে পারে ২৫ মার্চের ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল 'অপারেশন ব্লিৎজ'-এর পরিবর্তিত রূপ। ইয়াকুব জানাচ্ছেন, তাঁর সময় অপারেশন ব্লিৎজ কখনো কার্যকর হয়নি এবং তিনি ও গভর্নর আহসান সব সময় প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছেন রাজনৈতিক মীমাংসার। ৫ মার্চ (১৯৭১) প্রেসিডেন্টকে তিনি একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন–

"Only solution of present crisis is a purely political one. Only President can take this far-reaching decision by reaching Dacca by 6th. which I have repeatedly recommended. Am convinced there is no military solution which can make sense in present situation. I am consequently unable to accept responsibility for implementing a mission. namely a military solution which would mean civil war and large scale killing of unarmed civilians and would achieve no sane aim. It would have disastrous consequences. I therefore confirm tendering my resignation...."

গভর্নর হিসেবে ইয়াহিয়াকে তিনি আরো দুটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে সবিস্তারে ঐ সময়ের পরিস্থিতি ও তাঁর নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোও আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি। চিঠি দুটিতেও তিনি বার বার রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছেন, না হলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন। একটি চিঠিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন–

"d. W. Pak leaders must make up their mind regarding "the price"

they are prepared to pay in the political and economic spheres for integration.

e. It should be our endeavour to place the responsibility for their failure on their shoulders or at worst they-at least the W. Pak leaders-must be made to share with us the responsibility for decisions which are bound to lead disintegration under the most unfavorable and bitter circumstances."

আসলে ইয়াকুব 'রাজনৈতিক সমাধান' চেয়েছিলেন। অন্য জেনারেলরা তা চাননি। এ কারণেই ইয়াকুবের প্রতি অন্য কোনো জেনারেলের মন্তব্য সদয় নয়। রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ ছিল, শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। পশ্চিম পাকিস্তান এস্টাবলিশমেন্ট তাতে রাজি ছিল না।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে লিখেছেন মিঠা, পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সেনাবাহিনীর সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয় 'আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা' [শব্দ তিনটি লক্ষ করুন]। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান সব ঠিকঠাক করার জন্য মিঠাকে ঢাকা যাওয়ার নির্দেশ দেন। ৭ কি ৮ তারিখ মিঠা ঢাকা পৌঁছান এবং ১২ দিন পর ফিরে আসেন।

এ সময় মিঠা সবকটি ক্যান্টনমেন্ট সফর করেন। টিক্কা খান সবে এসেছেন, পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। ১৪ ডিভিশনের কর্নেল স্টাফ কর্নেল সাদুল্লা তাকে খোলাখুলি বলেছিলেন, পরিস্থিতি যা তা সেনাবাহিনী সামাল দিতে পারবে না। সাদুল্লার ভাষায়, "We'll be killed like pye dogs and our bodies will rot in the streets." মিঠা লিখেছেন, এ মন্তব্যে তিনি অবাক হন, কারণ সাদুল্লাকে তিনি জানতেন একজন আশাবাদী ও সাহসী মানুষ হিসেবে। সাদুল্লার আত্মজীবনী যা আগে উল্লেখ করেছি তাতে কিন্তু এ ধরনের কোনো মন্তব্য নেই। ক্যান্টনমেন্টগুলি সফর করার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন, সৈনিকদের 'morale' ভালো নয় কিন্তু সাদুল্লার মতো কেউ এমনভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেনি। আরো দুজন তাকে একই কথা বলেছিলেন। একজন জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। (১৪ ডিভিশনের জিওসি), অন্যজন ২ কর্পস সিওএস ব্রিগেডিয়ার এল ইদ্রুস। শেষোক্তজনকে এর পরপরই অবসরে পাঠানো হয় 'নৈরাশ্যবাদী' আখ্যা দিয়ে। তবে, মিঠা মনে করেন, সত্যি কথা বলার জন্যই তাকে সরিয়ে দেয়া হয়।

সফরের শেষ দিকে মিঠার বন্ধু আমান যিনি কামাল হোসেনের বোনকে বিয়ে করেছিলেন আমন্ত্রণ জানান নৈশভোজে। ভোজে কামাল হোসেন, রেহমান সোবহান আর ব্যবসায়ী টুলু ছিলেন। কামাল ও সোবহান জানতে চাইলেন,

বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে 'অ্যাকশন' নিতে বলা হলে সেনাবাহিনী কী করবে? মিঠা জানালেন, সেনাবাহিনী হুকুম তামিল করবে। এতে তারা ক্ষুব্ধ হন। মিঠার ভাষায়, "I warned them that the soldier would shoot to kill" [পৃ. ৩৩৩] সোহবান উত্তরে বললেন, 'তাতে কী? ইতিহাসে দেখা যায় মতপার্থক্যের কারণে রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে।' মিঠা জিজ্ঞেস করলেন, 'কার রক্ত?' এতে বিরক্ত হলেন রেহমান সোবহান। মিঠার মন্তব্য, যখন সময় এলো অর্থাৎ ২৫ মার্চ তখন তিনি চলে গেলেন ('disappeared')। বিদেশে তাঁকে দেখা গেল এবং বাংলাদেশ বাস্তব না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফেরেননি।

১৯ মার্চ রাওয়ালপিন্ডি ফিরে মিঠা জেনারেল হামিদকে সব জানালেন বিশেষ করে উপর্যুক্ত তিনজন সেনা অফিসারের মন্তব্য। হামিদ শুনলেন কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না।

মিঠা যখন পূর্ব পাকিস্তানে তখন ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন এবং বিকেলে গভর্নমেন্ট হাউসে একটি সভা ডাকলেন। টিক্কা খান মিঠাকে বললেন, সভায় থাকতে। মিঠা জানালেন তিনি ইচ্ছুক নন। যেহেতু তিনি আমন্ত্রিত নন। টিক্কা বললেন, তাকে আসতে। গেলেন মিঠা। সভায় উপস্থিত ছিলেন, জেনারেল রাও ফরমান আলী, এয়ার কমোডর 'মিট্টি' মাসুদ, জেনারেল এস. জি. এম পীরজাদা, জেনারেল আকবর, জেনারেল পীরজাদা রাজা, জেনারেল টিক্কা ও মিঠা।

ইয়াহিয়া অবস্থা পর্যালোচনার জন্য সবাইকে বললেন। জেনারেল পীরজাদা ও আকবর জানালেন, তারা আশাবাদী এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। সমস্যার সমাধান একটা পাওয়া যাবেই। টিক্কা সতর্কভাবে বললেন, পরিস্থিতির গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে।

রাজা ও মাসুদ পরিষ্কারভাবে জানালেন, পরিস্থিতি এমন যে সেনাবাহিনীর পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। মিঠাকে কিছু জিজ্ঞেস করা না হলেও নিজ থেকে তিনি বললেন, পরিস্থিতি খারাপ এবং "We should not fool ourselves into believing that it would he an easy task to control it." মিঠা বলেছেন, এম. এ. বাসিতের *দি ব্রেকিং অব পাকিস্তান : বাংলাদেশ ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটসম্যান্টসে* ইয়াহিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐকমত্যে পৌঁছা গেছিল যে পাকিস্তানকে ভাঙতে দেয়া যাবে না [" a consensus developed that they can not actively permit the disintegration of Pakistan."] এবং উমর ও হামিদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মিঠা বলেছেন, এটি অসত্য। উমর-হামিদ সেখানে ছিলেন না। মিঠা

লিখেছেন, ইয়াহিয়া তখন বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। তিনি যদি দাবি মেনে নিতেন যা ছিল বিদ্রোহ তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনী তা মেনে নিত না এবং ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারতেন না। আসলে, মিঠার এই মন্তব্যটিই সত্য।

২৩ মার্চ সিওএসের পক্ষ থেকে তাকে জানানো হলো তাকে ঢাকা যেতে হবে। মিঠা জানালেন তিনি মাত্র ফিরেছেন। জানানো হলো এটি সিওএসের অর্ডার এবং তাকে বলা হলো গুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। গুল জানালেন তিনি এসব কিছুই জানেন না।

২৪ মার্চ বিকেলে মিঠা ঢাকা পৌঁছলেন। তাকে সোজা টিক্কার বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে জেনারেল হামিদ অবস্থান করছিলেন। ড্রইংরুমে তারা দুজন বসে ছিলেন। হামিদ জানালেন, মিঠাকে ডেকে আনা হয়েছে টিক্কাকে সহায়তা করার জন্য কারণ টিক্কা এ অঞ্চলের ভূগোল জানেন না। তাকে আরো জানানো হলো ২৫ মার্চ হচ্ছে ডি-ডে [D-Day]। মিঠা বলেন, তার যথাযথ একটি পদমর্যাদা লাগবে না হলে তার কার্যক্রম সফল হবে না। ঠিক হলো তার পদমর্যাদা হবে অপারেশনের চার্জে ডেপুটি কর্পস কমান্ডার। এটি লিখিতভাবে দেয়া হয়নি বটে তবে সবাই তা জানে। এরপর তিনি অপারেশন রুমে গেলেন। কিন্তু 'ডি-ডে' যেখানে ঠিক হয়ে গেছে সেখানে আর তার করার কিছু ছিল না।

২৫ ও তার পরবর্তী দিনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন খুবই নিরাসক্ত ভাবে। এতে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই।

যেমন ২৫ মার্চ সম্পর্কে লিখছেন, "যখন আমাকে বলা হলো এবং তা সন্দেহ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই যে, চরমপন্থী মুসলমান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হয়েছে। তারা সশস্ত্র এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বুদ্ধিজীবীরাও যে জড়ো হয়েছে ("Hindu intellectuals holed up in Dhaka university") তা আমাকে জানানো হয়নি। সেনাবাহিনী তাদের বের করতে গেলে তখন তারা আক্রমণ করল, মারাও গেল কয়েকজন। বলা হয়েছে যারা মারা গেছে তারা নিরস্ত্র হিন্দু বুদ্ধিজীবী যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।" এ ধরনের সংবাদের জন্য দায়ী করেছেন সাংবাদিকদের। সাংবাদিকদের আটকে রাখা হয়েছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। এ জন্যে তাদের মনে ক্ষোভ ছিল। "I think, they were misled and willing to accept anything said against the army." (পৃ. ৩৩৫]

মিঠার এসব বক্তব্য সর্বৈব অসত্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালের

২৬ মার্চ ঘটেছিল কী তা সবার জানা। পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

মিঠা এরপর চট্টগ্রাম 'মুক্ত' করার কথা আলোচনা করেছেন, কর্নেল জেড. এ. খানকে নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে জেড. এ. খানের বর্ণনাও আছে যা আগে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এখানে আর তা উল্লেখ করলাম না। মিঠা লিখছেন, ২৭ অথবা ২৮ মার্চ হামিদ চলে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। মিঠা হেলিকপ্টারে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে রাতে যেতেন পুর্বোল্লিখিত আমানের বাসায়। সেখানে নানা পেশার মানুষরা আসতেন। তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিঠার মনে হয়েছে শতকরা পঁচানব্বই ভাগই স্বাধীনতা চায়নি তবে ৬ দফার প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। মিঠার ভাষায়– "The impression I got was that at least 50 percent of the populace were not in favour of secession but were all for the six points, about 20 percent were setting on the fence, while about 30 percent were very bitter about the army action and all for Bangladesh." [পৃ. ৩৩৮]

মিঠা সবিস্তারে এরপর তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। কীভাবে বাঙালিদের নিরস্ত্র করা হলো, কেন করা হয়েছিল, তার বাড়তি সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ [যা গৃহীত হয়েছিল] ইত্যাদি। মিট্টি মাসুদ অন্যান্য বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার পক্ষে ছিল না। মিঠা যেভাবে বিবরণ দিয়েছেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই ফাঁক আছে অনেক। যেমন, তিনি লিখেছেন, বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকজন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের খুন করেছে। মাঠ পর্যায়ের সৈনিকরা ছিল কনফিউজড। কারণ, তাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান তখনও পাকিস্তানের অংশ। তাদের বলা হচ্ছে তাদের দেশবাসীর ওপর গুলি করতে, প্রত্যুত্তরে 'দেশবাসীরা'ও গুলি করছে। এই বিমূঢ় অবস্থা কাটতে সময় লেগেছিল। তার ভাষায়–"....to shoot and kill those who were their own countrymen and to find they did the same in return was a shock from which they took time to recover" [পৃ. ৩৩৯] এই কনফিউশানের শুরু ২৫ মার্চের আগে থেকে যখন 'সিভিল পপুলেশন' বাঙালিদের মধ্যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকা পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর 'atrocities' চালাচ্ছিল। সৈন্যরাও সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারাও একধরনের 'isolation' এ ভুগছিল।

তার এই বর্ণনা আগে উল্লিখিত জেনারেলদের বর্ণনা থেকে নতুন কিছু নয়। উল্লেখ্য, মিঠা কথিত এই 'পশ্চিম পাকিস্তানি'দের পাকিস্তান সরকার এখনও স্বীকার করেনি এবং পাকিস্তানে তাদের প্রত্যাবর্তনেও রাজি হয়নি।

মিঠা আরো লিখেছেন, বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার পর তিনি তার

পার্সোনাল স্টাফ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেন মেজর আলী আহমদ নামে এক বাঙালিকে। এ কথা বোঝাতে যে, পাকিস্তানিরা সব বাঙালিকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে না এবং যাদের বিশ্বাস করা যায় তাদের বিশ্বাস করে। দুঃখ করে তিনি লিখেছেন, এ কারণে বেচারা আলী আহমদকে বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীকালে অবসর প্রদান করে।

হেলিকপ্টার দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন গ্রামে তিনি নামতেন। এরকম প্রায় ২০টি বা তারো বেশি গ্রামে তিনি অবতরণ করেছিলেন। কোথাও কেউ 'শত্রুতামূলক' আলোচনা করেনি এবং 'সবখানে আমাদের ডাব বা চা দিয়ে ভদ্রতার সঙ্গে আপ্যায়ন করা হয়েছে। আমি দেখলাম অধিকাংশ মানুষ বিভ্রান্ত তারা জানে না কী ঘটছে বা "were sitting on the fence for the time being." [পৃ. ৩৩৯]

এ না হলে সৈনিক! নিরস্ত্র গ্রামে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি নামবেন আর গ্রামবাসী কি তার ওপর ঝাপিয়ে পড়বে নাকি আত্মরক্ষার্থে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা তুলবে? আর মানুষজন তখনও বিভ্রান্ত এ কথা বিশ্বাস করানো মুশকিল ১৯৭১-এর জেনারেশনের কাছে।

২৮ মার্চ আমান মিঠাকে খবর পাঠালেন যে তার বোন জামাই কামাল হোসেন তার কাছে একটি সংবাদ পাঠিয়েছেন। ২৫ তারিখ মুজিবের অন্যান্য 'লেফট্যানেন্ট'দের সঙ্গে কামাল হোসেনও হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন। এখন কামাল অন্যান্যদের মতো ভারত যেতে চান না। তিনি চান তাকে গ্রেফতার করা হোক। তিনি চিন্তিত তার জীবন নিয়ে ["... he wanted to be taken into custody, as he was worried that his life was in danger"] "আমি তাকে তার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে তুলে নিলাম ডিভিশনাল এইচকিউ মেসে প্রহরাধীন রাখলাম। পরের দিন বিমানে তাকে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হলো। পশ্চিম পাকিস্তান ফেরার পর হরিপুর জেলে মাসে একবার হলেও আমি দেখা করতে যেতাম কেননা তিনি হলেন আমানের বোনের জামাই আর আমান আমার ভালো বন্ধু। কামালকে পছন্দ দূরে থাক, ঘৃণাই করতাম, আমানের বাসায় ঐ নৈশভোজে কথাবার্তার পর। তার ও রেহমান সোবহানের বাক্যের ফুলঝুরি ছিল কিন্তু কেউই দেশের জন্য রক্ত দেয়নি। কামাল বরং তাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল যাদের সে শত্রু বলে গণ্য করত। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের হত্যার পর তারা একই ঘটনা ঘটায়। কামাল মিলিয়ে যায় যুক্তরাজ্যে আর সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে।"

১০ মার্চ লে. জেনারেল নিয়াজী মিঠার কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে নেন।

মিঠাকে টিক্কা খান বা হামিদ কেউই কিছু জানাননি। মিঠা ফিরে যান এবং হামিদকে সব জানিয়ে বলেন, প্রথম পর্যায় এখনও চলছে এবং এ সময় নিয়াজীকে দায়িত্ব দেয়া ঠিক হয়নি। হামিদ জানালেন, এটি ইয়াহিয়ার ইচ্ছা। বাহাদুর শেরকে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তিনি রাজি হননি। কারণ তার মতে, বাঙালিদের তিনি এত ঘৃণা করেন যে, 'অবজেকটিভলি' কিছু বিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইয়াহিয়া তা মেনে নেন। মিঠার মতে, তখনই তিনি অনুধাবন করলেন যে, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় শৈথিল্য দেখা দিয়েছে এবং ইয়াহিয়ার কর্তৃত্বও শিথিল হয়ে আসছে।

১২ বা ১৩ এপ্রিল ইয়াহিয়া খান একটি বৈঠক ডাকলেন যেখানে হামিদ, সুলতান খান [পররাষ্ট্র সচিব], রোয়েদাদ খান [তথ্য সচিব], গুল এবং মিঠা উপস্থিত ছিলেন। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ যে নৃশংস অত্যাচার করেছে তা প্রকাশ করা হবে কি হবে না? মিঠা লিখেছেন, "আমি তা প্রকাশের পক্ষে ছিলাম এবং এর পক্ষে সব রকমের তথ্য, আলোকচিত্র, সাক্ষী ইত্যাদি ছিল। কিন্তু অন্যান্যরা তা প্রকাশের বিপক্ষে ছিল, কারণ তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া হতে পারে। আমি এ যুক্তির কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না, কারণ শত শত পশ্চিম পাকিস্তানি ফিরে আসছে এবং মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়বে।"

এ বিষয়টি নিয়ে প্রায় সব জেনারেলই বলেছেন এবং এ নিয়ে আগে মন্তব্য করেছি দেখে পুনরুক্তি করলাম না।

দুমাস পর মিঠা আবার এসেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান। বিভিন্ন স্থান পরির্দন করেছেন। তার কাছে মনে হয়েছে বাস্তব অবস্থা ও প্রতিদিনের সিচুয়েশন রিপোর্টে ছিল বিস্তর ফারাক। শেষোক্তটিতে অতিশোয়েক্তি ছিল বেশি। তবে, সৈন্যরা আগে থেকে ছিল বেশি আত্মবিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত, তার মনে হয়েছে, সৈন্যরা সারা পূর্ব পাকিস্তানে 'thinly spread'। কৌশলগতভাবে তা ঠিক ছিল না। গুল হাসানও পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান সফর করে একই ধরনের রিপোর্ট দিয়েছিলেন।

মিঠা উল্লেখ করেছেন ঐ সফরে তিনি জানতে পারেন পূর্ব পকিস্তানে গোয়েন্দা সংস্থা এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। মানুষজন যাদের ৯৯ ভাগ মুসলমান তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং পরে আর তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক পেশার সঙ্গে জড়িত। "আমি বুঝতে পারছিলাম না", লিখেছেন মিঠা, "কেন এ ধরনের ভয়ংকর

পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। এর ফলাফল ছিল যারা তখন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল তারাও বিপক্ষে চলে গিয়েছিল।"

এসব কটি বিষয় নিয়ে তিনি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কথাবার্তাও বলেছিলেন কিন্তু ফলাফল ছিল শূন্য। মিঠা আরো উল্লেখ করেছেন গুল হাসান ও হামিদের সঙ্গে জুলাইয়ে একটি বৈঠক হয়েছিল। তাদের মত ছিল, ভারতের ইচ্ছা আছে পাকিস্তান আক্রমণ করার কিন্তু সে তা করবে না। মিঠার মতে, এটি ঠিক নয়। ভারত পূর্ব পাকিস্তানিদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছে এবং সুযোগ পেলে পাকিস্তান ভাঙবে কারণ, পাকিস্তান কখনো ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মন্তব্য করেছেন তিনি, ইয়াহিয়া হামিদের মতো বুদ্ধিমান লোকের কেন এ ধারণা হয়েছিল তা তার ধারণার বাইরে।

৬৯

উপসংহারের আগে শেষ অধ্যায়ে মিঠা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৭১ সালের এ অধ্যায়টিতে তার বয়ানটি ছিল। এ বয়ানের সংক্ষিপ্তসার দিলে পূর্ব পাকিস্তান ও ১৯৭১ সাল সম্পর্কে মিঠার দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

(১) পূর্ব পাকিস্তান হারানোর জন্য ইয়াহিয়া খানকে দায়ী করা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি আংশিক সত্য কারণ তিনিই ছিলেন 'বস'। তবে, দায় [বেশিরভাগ] বর্তায় দু'জন রাজনীতিবিদের ওপর। তারা মুজিব এবং ভূট্টো। ক্ষমতার জন্য যাদের তৃষ্ণা ছিল প্রবল তাতে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও কিছু আসে যায় না। তার ভাষায়, "Mujib and Bhutto, who lusted for power at any cost and were willing to let the country be split as long as each was the role master in his bailiwick." [পৃ. ৩৬৩]

আগে উল্লিখিত জেনারেলরাও একই মন্তব্য করেছেন। সামরিক শাসন ও জনপ্রতিনিধি শাসন– বিষয় দুটি বিস্তারিত আলোচনায় কখনো তারা আসেননি।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার জন্য ইয়াহিয়া দায়ী নয়। এ সমস্যার শুরু ১৯৫২ থেকে যখন ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ক্ষমতায় আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং মানুষকে তারা (brainwashed) বোঝায় যে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের 'exploit' করেছে। মুজিব ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তান বিরোধী এবং সেই সময় থেকে তিনি বাংলাদেশ চেয়েছেন। তাঁর কন্যা হাসিনাও সেটি স্বীকার করেছেন।

একশো ভাগ প্রমাণ আছে যে আগরতলা মামলা সত্যি এবং মুজিব ছিলেন একজন 'ট্রেইটর'। রাজনৈতিক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ছিল হতাশাজনক।

ইয়াহিয়া এভাবেই সমস্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তার ভুল ছিল মুজিব ও ভূট্টোর ক্ষমতা তৃষ্ণা না বোঝা এবং "Misjudged his own ability to deal with these men." [পৃ. ৩৬৩] তিনি ভেবেছিলেন, দেশের স্বার্থে যুক্তি, দেশপ্রেম ও সমঝোতার ইচ্ছা তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে যে শুরু থেকে কলোনি হিসেবে ধরা হয়েছিল এবং এর সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানার জন্যই যে জাতীয়তাবোধ তীব্র হয়েছিল সেটি তার মনে হয়নি। পাকিস্তানের আমলা ও রাজনীতিবিদরা যে পূর্ব পাকিস্তানকে শুরু থেকে ক্ষমতার অংশীদার করতে চায়নি সেটিও তার মনে হয়নি। বর্ণবাদ সমস্যা যে ছিল সেটিও চোখে পড়েনি যদিও নিজেকে তিনি মেট্রোপলিটন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, অ্যাকাডেমিশিয়ানরা এ বিষয়গুলো এখন স্বীকার করে নিয়েছেন।

(৩) পূর্ব পাকিস্তানের দাবি মেটাতে ইয়াহিয়া সব করেছেন। পরে বুঝেছিলেন, মুজিবকে তিনি যেমন ভালো পাকিস্তানি মনে করেছিলেন আসলে তিনি তা নন। অন্যদিকে ভূট্টোও ক্ষমতার দাবি তুলে মানুষজনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। ভূট্টো যে 'কো-প্রাইম মিনিস্টার' হওয়ার দাবি তুলেছিলেন তা ছিল হাস্যকর। বোঝা যাচ্ছিল তিনি ক্ষমতা না পেলে সন্তুষ্ট হবেন না। ইয়াহিয়ার কিছু করার ছিল না।

আমি নিজে খুব একটা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম বেনজীর ভূট্টো থেকে শুরু করে অনেক রাজনীতিবিদ ও জেনারেলকে। প্রশ্নটি ছিল, নির্বাচনে যে জয়ী হয় তাকেই ক্ষমতা দেয়া হয়। এখানে আলোচনা, মীমাংসার তো দরকার নেই। আগেও যারা নির্বাচনে জিতেছে তারাই ক্ষমতায় গেছে। ১৯৭১ সালে এর ব্যতিক্রম হলো কেন? কেউ এর জবাব দেননি।

(৪) ইয়াহিয়া ও তার সরকার ভেবেছিল ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নগ্ন হামলা করবে না। তার এ মন্তব্য পড়ে মনে হলো ইয়াহিয়া ও তার জেনারেলরা বোধহয় নাবালক ছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান যে প্রথম আক্রমণ করে ভারতকে এ সত্যটি জেনারেল কোথাও লেখেননি।

(৫) নিয়াজীকে পরাজয়ের জন্য দায়ী করা যায় না পুরোপুরি। ইয়াহিয়া যুদ্ধ বিরতি মেনে ঠিক করেছিলেন। না হলে পাকিস্তানের বাকি অংশও হয়তো অটুট থাকত না।

মিঠার আত্মজীবনী প্রথম ভাগ পড়লে মনে হয় মুম্বাইয়ের একজন হিসেবে মেট্রোপলিটন মন ছিল তার। নিজে 'সংখ্যালঘু' মুসলমান [মেমন] হয়েও বর্ণবাদ বা সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হননি।

পাকিস্তানে আসার পরও তিনি নিজেকে অটুট রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু ঘটনা যতই এগাতে থাকে দেখা যায় তিনি একজন নিষ্ঠুর পাকিস্তানি জেনারেল হয়ে উঠছেন হয়তো নিজ অজান্তে।

তার একটি মন্তব্যই তা প্রমাণ করে। তিনি লিখেছেন, "একটি বিষয় আমি গুরুত্ব দিতে চাই। আমি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসি তখন দু-একজন ব্যবসায়ী ছাড়া সবাই বলেছে, ২৫ মার্চ যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তা সঠিক। সবাই নিশ্চিত ছিল খুব শিঘ্রই বিদ্রোহ দমিত হবে। আমি তা ভাবিনি এবং সদর দফতরকে তা জানিয়েছিলামও। এখন আমি যখন এর উল্টোটা শুনি এবং সেই উল্টোটা বলছে তারা যারা তখন প্রশংসা করেছিল বা জন্মগ্রহণ করেনি। তখন আমার ঘেন্না হয়।

২৫ মার্চের পর আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা [শব্দটি লক্ষ করুন] যে atrocities চালিয়েছিল তা যেন কারো জানা নেই। 'আমি একজন পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারকে জানি যাকে তার সহকর্মীরা জীবন্ত সেদ্ধ করে হত্যা করেছিল। জিজ্ঞেস করুন বিহারিদের ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদের ওপর কী করা হয়েছিল, যাদের আমরা পরিত্যাগ করেছি এবং যারা বাস করে নোংরা ক্যাম্পে। অথচ মুসলমান ভ্রাতা হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি লক্ষ লক্ষ আফগানকে।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। একজন নিজেকে যত ভদ্র, যৌক্তিক, অসাম্প্রদায়িক, মেট্রোপলিটন মানসিকতাযুক্ত ভাবুক না কেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে থাকলে সে ছাঁচে গড়া একজন পাকিস্তানি জেনারেলই হবে।

৭০

১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টো একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কী তদন্ত করতে বলা হয়েছিল কমিশনকে? পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান তার সৈন্যসামন্তসহ কোন পটভূমিকায় আত্মসমর্পণ ও অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন তা নির্ণয়ের জন্যে কমিশনের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে। কমিশনের অন্য দুজন সদস্য ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এস. আনোয়ারুল

হক ও সিন্ধু এবং বালুচিস্তানের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তোফায়েল আলী আবদুর রহমান। কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল আলতাফ কাদির। এ তদন্ত কমিশনই পরিচিত হামুদুর রহমান কমিশন নামে।

ছয় মাসে ২১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে ১২ জুলাই, ১৯৭২ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে প্রেসিডেন্টের কাছে। কমিশন বলেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণের যে কারণগুলো খুঁজে পেয়েছে তা আপাতত স্থিরীকৃত বা টেন্টটেটিভ। ঘটনার কুশীলবরা যুদ্ধবন্দি। তারা ফিরে এলে আরো কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে। তাহলে রিপোর্টটি আরো সংহত হবে।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে যুদ্ধবন্দিরা দেশে ফেরে। কমিশন তখন আবার কাজ শুরু করে। এ সময়, ঘটনার বা ১৯৭১-এর পাকিস্তানি নায়ক জেনারেল নিয়াজী, ফরমান আলী প্রমুখের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের শেষে সম্পূরক রিপোর্ট পেশ করা হয়। সম্পূরক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মূল রিপোর্টে যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে সম্পূরক রিপোর্ট শুধু তা জোরদার করবে। সুতরাং মূল ও সম্পূরক রিপোর্টের সিদ্ধান্তসমূহ এক। তবে শেষোক্ত রিপোর্টে 'পূর্ব পাকিস্তান' সম্পর্কে অনেক তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

বছর কয়েক আগে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে ইন্টারনেটে অংশ বিশেষ পাওয়া যেত। রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে লাহোরের ভ্যানগার্ড। ৫৪৪ পৃষ্ঠার ডাবল ক্রাউন সাইজের বিশাল গ্রন্থটির পুরো নাম *The Report of the Hamoodur Rahman Commission of Inquiry into the 1971 War.*

কমিশনের পুরো বৃত্তান্ত যে উন্মুক্ত করা হয়েছে তা নয়। কিছু কিছু অংশ এখনো ক্লাসিফায়েড রয়ে গেছে।

গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব মূল রিপোর্ট যা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সেগুলি হলো : ভূমিকা, রাজনৈতিক পটভূমি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সামরিক দিক এবং বিবিধ। এরপর সম্পূরক রিপোর্ট। প্রথম রিপোর্টটি ছিল প্রাথমিক কারণ, যুদ্ধবন্দি হিসেবে তখন ভারতে অবস্থান করছিল অনেক কুশিলব। তারা ফেরত আসার পর কমিশন ফের বসে এবং সম্পূরক রিপোর্ট দেয়া হয় যেটিকে ফাইনাল রিপোর্ট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্পূরক রিপোর্টেরও অধ্যায় সংখ্যা পাঁচটি : ভূমিকা, ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, সামরিক দিক, পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ এবং নৈতিক দিক।

পুরো রিপোর্ট পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানি জেনারেলদের যে

পূর্ব ধারণা এ থেকেও কমিশন মুক্ত নয়। তবে, এর সদস্য ছিলেন বিচারপতিরা। তাদের মন জেনারেলদের মতো একরৈখিক নয়। সুতরাং অনেক যুক্তিতর্ক, রেটরিক আছে। নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য কিছু কড়া কথাও আছে। তবে, সব আক্রমণের লক্ষ্য জেনারেল ইয়াহিয়া ও তার চক্রের সদস্যরা। কমিশনের রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রচুর তথ্যের সমাহার। এসব তথ্য পাকিস্তানি জেনারেলদের মুখোশ উন্মোচন করেছে। জেনারেলরা যেভাবে জেনারেল ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের দেশপ্রেমি, ইসলামভাবাপন্ন ও বীর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কমিশন সে চেষ্টা করেনি। এর কারণও আছে, কারণ, তখন পুরো পাকিস্তান চক্রের বিরুদ্ধে উন্মত্ত যেহেতু তারা অজেয় পাকিস্তানিদের পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছে। জুলফিকার আলী ভূট্টো ক্ষমতায় আর ইয়াহিয়া খান বন্দি। জুলফিকার আলী ভূট্টো কেন কমিশন করেছিলেন? তাহলে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করতে হবে।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান টেলিভিশনে ঢাকায় জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দৃশ্যটি দেখানো হয়েছিল। পাকিস্তানের অনেকে আমাকে বলেছেন, সে দৃশ্য দেখে পাকিস্তানিরা উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠেছিল। টেলিভিশনে সে দৃশ্য আর দেখানো হয়নি। ক্ষমতায় বসে ভূট্টো বুঝেছিলেন, পাকি-বাহিনীর আত্মসমর্পণ পাকিরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সুতরাং, কেন, জেনারেলরা আত্মসমর্পণ করল তার কারণ খুঁজে বের করার জন্য কমিশন করা হলো। যদিও যুক্তিযুক্ত হতো পাকিস্তান কেন ভাঙলো তার কারণ অনুসন্ধান করলে। রিপোর্টটি ভূট্টো প্রকাশ করতে চাননি কারণ তিনি তা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তিম হাতিয়ার হিসেবে রেখেছিলেন। আরেকটি কারণ থাকতে পারে সেনাবাহিনী ভূট্টোকে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুতরাং রিপোর্টটি প্রকাশ করে তিনি সেনাবাহিনীর বিরাগভাজন হতে চাননি।

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, রিপোর্টে কী আছে মোটামুটি অনেকেই তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। ভূট্টোর পর অনেক শাসক এসেছেন পাকিস্তানে কিন্তু কেউ রিপোর্টটি প্রকাশ করেনি। পাকিস্তানে অনেকের ধারণা মূল রিপোর্ট নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সম্পূরক রিপোর্টের কপি হয়তো কারো কাছে ছিল। সেটি ভারতে পাচার করার পর 'ইন্ডিয়া টুডে' তা প্রকাশ করে।

করাচিতে এক সাক্ষাৎকারে (১৯৯৮) বেনজির ভূট্টোকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, "আমার বাবার কাছে একটি রিপোর্ট ছিল। তাতে পরিষ্কারভাবে তাকে দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সামরিক

শাসকরা যখন তাকে গ্রেফতার করে তখন কপিটিও নিয়ে যায়।" তিনি আরো বলেছিলেন, "এখন [নওয়াজ শরীফ তখন প্রধানমন্ত্রী] যখন রিপোর্ট নিয়ে কথা উঠছে তখন তা প্রকাশ করা উচিত।"

"আপনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তা করলেন না কেন?" জিজ্ঞেস করি আমি।

"বাধা ছিল।"

বেনজির ভূট্টো অবশ্য এটি বললেন না যে তাঁর যেমন বাধা ছিল রিপোর্ট প্রকাশে, নওয়াজ শরীফেরও তেমন বাধা থাকতে পারে। সে বাধাটি হলো সেনাবাহিনী। বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ্ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছেন। পাকিস্তানের ওপরে আল্লাহ্, নিচে মিলিটারি। এছাড়া আছে সামন্ত জমিদার ও আমলারা, যারা পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করে।

আলমদার রাজা আবেগপ্রবণ মানুষ। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ঢাকার কমিশনার। এখন তিনি আইন ব্যবসা করেন। ১৯৯৭ সালে লাহোর হাইকোর্টে তিনি একটি রিট পিটিশন করেন। রিটে তিনি দাবি তুলেছিলেন 'ওয়ার কমিশন' বা হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য। তাঁর দাবি, ২৫ বছর সরকারি নথিপত্র জাতীয় অভিলেখগারে পাঠানোর নিয়ম কিন্তু এ সংক্রান্ত নথিপত্র এখনো পাঠানো হয়নি। যারা দোষী তাদের শাস্তি দেয়া হয়নি। সুতরাং, যারা দোষী তাদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। তাঁর আরজিটির কয়েকটি যুক্তি তুলে দিচ্ছি যেখানে প্রকাশ্যে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তিনি ছিলেন তৎকালীন ঢাকার সিভিল প্রশাসনের প্রধান। সুতরাং, তাঁর কথা গুরুত্বহীন নয়। কমিশনের সামনে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং রিপোর্টে কী আছে তাও খুব সম্ভব জানতেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন যা পাকিস্তানে তখনো কেউ বলেছিল কিনা সন্দেহ– "g. That large scale extra judicial and custodial killings, looting, raping was not stopped and the culprits were not punished.

j. That the persons guilty of major crimes of vivisection of the country, surrender of eastern command, killing, raping and looting were protected and no action was taken against them.

o. That on an average about half a million people have lost their lives and Pakistans basic concept has been eroded. The wave of crimes let loose in East Pakistan still continues in Pakistan."

আলমদার রাজা ইসলামাবাদে আমাকে বলেছিলেন, তিনি যখন আদালতে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলির বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন বিচারপতি বারবার বলছিলেন, "এটা কি সত্যি?" তারপর পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক এক তরুণী

ধর্ষণের ঘটনা যখন তিনি বর্ণনা করছেন তখন বিচারকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি রিট পিটিশন গ্রহণ করে জানান আগামীকাল রায় দেবেন। সেই আগামীকাল এখনও আসেনি। আসবেও না। কারণ, পাকিস্তানের উচ্চ আদালত সামরিক বাহিনীর কাছে জিম্মি।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কী ঘটেছিল বাংলাদেশে? যারা চল্লিশোর্ধ্ব বা তার কাছাকাছি তারা তা জানেন। ১৯৭১ সালে সমগ্র বিশ্বও তা জানত। সে সময় এমন কোনো দেশ খুব কমই ছিল যেখানে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ওঠেনি। কিন্তু মনে হয় জানত না একটি দেশ এবং এর অধিবাসীরা। সে দেশটির নাম পাকিস্তান।

অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু যদি এ ধারণা সত্যি হয় তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে কী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিচার করত বাঙালিদের। অর্থাৎ বাঙালিরা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। অবশ্য, আক্ষরিক অর্থে, এ বক্তব্য গ্রহণ না করাই ভালো। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান দখলে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এ জন্য যা যা করা দরকার তা-ই করেছে। কারণ, তাদের ভাষায়, তাদের দরকার ছিল মাটি, মানুষ নয়। আর এ বিষয়টি তাদের দেশের কেউ জানে না, তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে, ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের অনেকের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। এর সহজ-সরল উত্তর পাওয়া যায়নি। উত্তরগুলোর ধরন রকম– ১. জানতাম কী হচ্ছে; ২. কী ঘটছে তার কিছু কিছু জানতাম, সবটা নয়; ৩. [জানতেন কিন্তু এখন বলছেন] কিছুই জানতাম না।

১৯৯৮ সালে পাকিস্তান সফরে যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁদের অধিকাংশ অবশ্য বলেছেন, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানতেন না ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কী ঘটছে। নিতান্ত 'দায়িত্ববান' ব্যক্তিরাও তা বলেছেন। এর কারণ কী? উত্তর হচ্ছে– ১. রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচার; ২. সম্পূর্ণ সেন্সরশিপ।

প্রশ্ন উঠতে পারে [১৯৭১ সালে] মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কি পাকিস্তানের 'মধ্যবিত্তে'র কাছে রেডিও বা ট্রানজিস্টার ছিল না। তবে, পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো 'রেডিও'তে তারা আগ্রহী ছিল না। আমাদের আরো মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান কওম নিয়ে বাঙালিরা যত চিন্তিত ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনোই তত চিন্তিত ছিল না। পাকিস্তান বলতে তারা পশ্চিম-পাকিস্তানকেই বুঝত। পূর্ব পাকিস্তানকে নয়। এ বিষয়ে তাদের কোনো দ্বিধা ছিল না দেখে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাদের নীতির কখনো পরিবর্তন হয়নি এবং ১৯৭১ সালে এ দেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালাতেও তাদের বাধেনি।

আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম দেখে আমাদের ভুগতে হয়েছে, মাশুল দিতে হয়েছে। তৎকালীন হানাদার বাহিনীর জনসংযোগ পরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) এ আর সিদ্দিকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল করাচিতে। তিনি বলছিলেন, সরকার পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক তা প্রচারে ব্যগ্র ছিল এবং নিয়ত তা প্রচার করছিলও। ২৫ মার্চের ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী যে এত তীব্র হবে তা শাসকরা অনুধাবন করেননি। সরকার একদিকে বলছিল সব স্বাভাবিক এবং এ খবরও দিচ্ছিল 'দুষ্কৃতকারী'দের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে [বা হয়েছে] এবং তাদের দমন করা হচ্ছে। এ প্রচারে যে স্ববিরোধিতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। গড়পড়তা পশ্চিম পাকিস্তানি বিশ্বাস করেছে; সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে খাসা কাজ করছে এবং এ কারণে নিয়ত তারা প্রশংসার যোগ্য। সদ্য প্রকাশিত তাঁর বইয়ে সিদ্দিকি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– "Most people in the west wing sang hosannas to him and wished him all the luck and success in his mission."

১৯৭১ সালে কী ঘটেছিল এখন তাদের তা জানতে হচ্ছে, এটি তাদের ভালো লাগার কথা নয়।

অন্যদিকে বাঙালিদের একটা কৌতূহল ছিল এ রিপোর্ট সম্পর্কে। অনেকে মনে করছেন, যাক এ রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, হত্যা, লুট ও ধর্ষণ হয়েছে। কিছু অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু, পাকিস্তানের স্বীকার-অস্বীকারে আমাদের কী আসে যায়? সারা বিশ্ব কী দেখেনি ১৯৭১ সালে কী ঘটেছিল বাংলাদেশে? হামুদুর রহমান কমিশন এবং সেই সব ঘটনাকে আড়াল করেছে। কিছু হত্যা, লুট ও ধর্ষণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। না করলে তো রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকত না। প্রকৃতপক্ষে হামুদুর রহমান কমিশন বাংলাদেশের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করেনি, সম্ভবও ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী দল আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বিষোদগার করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে মিথ্যাবাদী রূপে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অল্প কিছু সেনা কর্মকর্তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টকে আমাদের এখানে বিবেচনা করা হয়নি।

৭১

প্রথম রিপোর্টের রাজনৈতিক পটভূমিটি কয়েক পর্বে ভাগ করা হয়েছে– ১. শাসনতান্ত্রিক সময় আগস্ট ১৯৪৭, অক্টোবর ৭, ১৯৫৮; ২. প্রথম সামরিক

শাসনামল অক্টোবর ৭, ১৯৫৮–৬ জুন, ১৯৬২; ৩. দ্বিতীয় শাসনতান্ত্রিক আমল ৭ জুন, ১৯৬২ থেকে মার্চ ২৪, ১৯৬৯ এবং ৪. দ্বিতীয় সামরিক শাসনামল ক. ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এবং খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭১-২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১। এখানে অবশ্য একটু সংশোধন করা যায়। তা হলো আইয়ুব খানের আমলও পুরোপুরি শাসনতান্ত্রিক বলা যাবে না, কোনো সামরিক আমলার সময়ই পুরোপুরি শাসনতান্ত্রিক থাকে না, সেনাবাহিনীর দীর্ঘ ছায়া সেখানে থাকবেই।

১৯৪৭ সালেরও আগে থেকে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা গতানুগতিক বিবরণ এবং আমাদের অজানা কিছুই নেই। সে প্রসঙ্গে পরে যাব। রাজনৈতিক পটভূমির শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের জন্য সুনির্দিষ্টভাব দায়ী করা হয়েছে জেনারেল ইয়াহিয়া ও তার পাঁচ কুচক্রী হামিদ, গুল হাসান, পীরজাদা, মিঠা ও উমরকে। এদেরকে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল ও ভোগের জন্য দায়ী করা হয়েছে। কমিশনের ভাষায়– "We are therefore, driven to the reluctant conclusion that in the illegimate usurpation of power therefore Generals were active and consenting agents." [পৃ. ১২৫]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যায়ে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিদেশি প্রেস, জাতিসংঘ ও অন্যান্য সুপার পাওয়ারের প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছে। কমিশন এক্ষেত্রে দুটি বিষয় পর্যালোচনা করেছে। প্রথম বিষয়টি বেশ মজার। কিছু রাজনৈতিক নেতা যাদের মধ্যে ন্যাপের খান ওয়ালি খানও আছেন এবং সাংবাদিক প্রশ্ন রেখেছিলেন, আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখল এবং পাকিস্তান ভেঙে যাওয়া কোনো আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ কি না। অনেক যুক্তি-তর্ক দেখিয়ে কমিশন পরে বলেছে না, এটি কোনো চক্রান্ত নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি পাকিস্তানের এমন ছিল যার কারণে ইয়াহিয়া খান এত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন? এর উত্তর দিয়েছে কমিশন এভাবে যে, আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ সব সময় একটি রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন কিন্তু ইয়াহিয়া খান সেপথে যাননি। স্বাভাবিকভাবেই সবশেষে, ভারতকে দোষী সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারত পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছে। নভেম্বর ১৯৭১ সালের মধ্যেও যখন ভারতের এই পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তখনো ইয়াহিয়া বলছেন, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে না। ভারত সুযোগ পেল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ, স্বাধীকারের জন্য ভয়ঙ্কর দাবি এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা দাবি। অর্থাৎ যা কিছুই ঘটুকু না কেন অন্তিমে উপসংহার ভারত ও আওয়ামী লীগই পাকিস্তান ভেঙ্গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে সামরিক দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্বভাবতই মুক্তিযুদ্ধকে জেনারেলদের মতোই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। পূর্বাঞ্চলে পরাজয়ের অনেক কারণ দাঁড় করানো হয়েছে কিন্তু পশ্চিম অংশে, পশ্চিম পাকিস্তান বা বর্তমান পাকিস্তানও যে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছিল এটি কিন্তু জেনারেলদের বইয়ে পাওয়া যাবে না। কমিশন কিন্তু ঐ অধ্যায়ের অন্তিমে পরিষ্কার জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর কারণে "আমরা সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তান তো হারালামই পশ্চিম পাকিস্তানেরও বেশ কিছু অংশ গেল। ভারতের তেমন কিছু হলো না।" কমিশনের ভাষায়– "The net result, therefore, is that we have not only lost the whole of East Pakistan but also considerable potions of our territory in West Pakistan with almost negligible losses to the Indians." [পৃ. ২৮১]

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম যদিও বিবিধ, কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে সেখানে মাত্র একটি বিষয়ে তা হলো সেনাবাহিনীর নৈতিক দিক। সম্পূরক রিপোর্টের পঞ্চম অধ্যায়টি সম্পূর্ণ এ বিষয়ে। এই নৈতিক দিকটি নিয়েই খানিকটা আলোচনা করব, কেননা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সবসময় নৈতিকতা ও ধর্মের কথা বলে এবং ধর্মের নামেই তারা পাকিস্তান শাসন করতে চেয়েছিল এবং শুধু তাই নয় ১৯৭১ সালে ধর্ম রক্ষার জন্যই তারা যুদ্ধ করেছে। জেনারেলদের যে লেখাগুলি পড়েছি সেখানে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে দুজন একত্র হলেই মদ্যপান করছে যা ইসলামে হারাম। আর হামুদুর রহমান কমিশনে দেখা যায় সেনা সদস্যরা চুরি, জোচ্চুরি, ঘুষ খাওয়া, মদ্যপান করা, রমণী ভোগ এবং ধর্ষণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেনাবাহিনীর মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য কমিশনের এই অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ।

৭২

মূল রিপোর্টের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৪০টি অনুচ্ছেদ। অর্থাৎ, নতুন সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে কমিশন বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি আলোচনা করেছে। এর কারণও আছে। কমিশন জানত, সারা বিশ্ব এই গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করছে। খুনি হিসেবে পাকিস্তানিরা পরিচিত হচ্ছে। রিপোর্ট পড়লে বোঝা যায় কমিশন একটি বাতাবরণ তৈরি করতে চাচ্ছে। যাতে বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে, একটি যুদ্ধ হলে তো কিছু লোক নিহত হবেই। তার জন্য তাকে গণহত্যা বলা যায় না। কমিশনের এই অধ্যায়টি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ের প্রতিটি বাক্য ও

শব্দ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কমিশন পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ প্রায় অস্বীকার করেছে।

এই অধ্যায়ের শিরোনাম 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথিত নৃশংসতা'। লক্ষ্য করুন, 'কথিত' শব্দটি। অর্থাৎ এই নৃশংসতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পাকিস্তান বাহিনী যখন 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল তখন বিভিন্ন মহল থেকে তা বেশ সমালোচিত হয়েছিল। মূল রিপোর্টের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫-৮ অনুচ্ছেদে তা বিবৃত হয়েছে। নতুন সাক্ষ্যের আলোকে সম্পূরক রিপোর্টে বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ্য 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি' শব্দ দুটি। দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে সরকার আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। সে জন্য ব্যবহার হয়েছে 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি' শব্দ দুটি। এ শব্দ দুটি ব্যবহারের মাধ্যমে কমিশন ১৯৭০ সালে নির্বাচন থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলি, এককথায় বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমিকা অস্বীকার করেছে।

এর পরের অনুচ্ছেদের শিরোনাম 'আওয়ামী লীগের চরমপন্থীদের দুষ্কর্ম'। পুরো বাক্যটিই পক্ষপাতদুষ্ট। অর্থাৎ কমিশন পাঠকদের আগেই বলে রাখছে আওয়ামী লীগ দুষ্কর্ম করেছে। সাক্ষ্য প্রমাণের আগেই রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিরোধী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তৎকালীন পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক বা সংগঠন হিসেবে নয়। এর অর্থ এরা শত্রুপক্ষ এবং যেহেতু শত্রুপক্ষ সেহেতু তাদের সমস্ত কার্যকলাপই দুষ্কর্ম।

পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেছে তা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কমিশনের মতে, ভুলে যাওয়া উচিত হবে না জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ১ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে আওয়ামী লীগের চরপন্থীরা ভায়োলেন্স ও নিষ্ঠুরতার পথ বেছে নেয়। এ অভিযোগ করেছে কমিশন। অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান বা সামরিক জান্তা যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের দাবি অস্বীকার করেছে তা মূল বিষয় নয়। আওয়ামী লীগাররা কী ভায়োলেন্স বা নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল? আমরা কেন, সারা পৃথিবীর সেই সময়কার সংবাদপত্র দেখলে দেখা যাবে ১ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। মহাত্মাগান্ধীর পর ঐ প্রথমবারের মতো অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়।

অথচ, কমিশন বলছে, ঐ সময়ের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি, খুলনা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বগুড়া, নওগাঁ, শান্তাহার ও অন্যান্য এলাকায় দুষ্কৃতকারীরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ চালায়। এ কাহিনীগুলি বর্ণনা করেছে ব্যাপক সংখ্যক বিহারি ও পশ্চিম পাকিস্তানিরা যারা পালিয়ে এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের সেনা ইউনিটগুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের পরিবাররা পেয়েছে অমানবিক ব্যবহার এবং অনেক ('লার্জ নাম্বার') পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের হত্যা করেছে তাদের পূর্বতন বাঙালি সহকর্মীরা।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন একজন পাক সাংবাদিক ও তার লেখা একটি বইয়ের উল্লেখ করেছে। সাংবাদিক, কমিশনের ভাষায় "renowned journalist of high standing।" নাম কুতুবউদ্দিন আজিজ। তার সম্পাদিত বইয়ের নাম *ব্লাড অ্যান্ড টিয়ার্স*। পূর্বাঞ্চল থেকে প্রত্যাগত বিহারি, পাকিস্তানিদের জবানবন্দি হচ্ছে বইটির ভিত্তি। আজিজ লিখেছেন, মার্চ-এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা সারা দেশে ১,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ লোক হত্যা করেছে। কমিশন কুতুবউদ্দিনের বইকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। এ বিশ্বাসযোগ্যতার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সেখানে বসবাসরত অবাঙালিদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে চাচ্ছে যা তুলে ধরে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে।

এই ছোট অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় :

প্রথম, সারা বাংলাদেশ জুড়ে এতসব ধ্বংসযজ্ঞ হলো কিন্তু বিদেশী কোনো পত্রিকা দূরে থাক, পাকিস্তানের কোনো পত্রিকাও খবরগুলো ছাপাল না! কেন?

কমিশন জানত, এই প্রশ্ন উঠবে। তাই, তারা উত্তর দিয়েছে, এ খবরগুলি ছাপা হলে পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। সে কারণে তৎকালীন সরকার এসব সংবাদ প্রকাশিত হতে দেয়নি। কুতুবউদ্দিন আজিজও একই কথা লিখেছেন। সেই সঙ্গে তিনিও নাকি এ ধরনের সংবাদ শুনেছিলেন এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কর্মকর্তারা বলেছিলেন এ ধরনের সংবাদ ছাপা যাবে না। [এ নির্দেশ বাঙালি তথ্য সচিবের] কারণ–

"It would exacerbate the current tension in the relations between the two wings," he argued, "and it would also undermine the prospects of a negotiated settlement with the Awami League," The argument had an element of sound logic and a humanitarian veneer. Consequently the

news media in West Pakistan faithfully followed the federal governments instructions to suppress all news pertaining to the genocidal frenzy unloosed by the Awami League against the hapless West Pakistanis, Biharis and other non-bengalis in rebellion-hit East Pakistan."

মেনে নিলাম এই যুক্তি। তা বিদেশীরা কী করছিল বাংলাদেশে? তারা কেন সেই সব সংবাদ ছাপায়নি? আজিজ জানেন এ প্রশ্ন উঠবে, তাই এর উত্তরও তিনি দিয়েছেন তার বইতে। ১৯৭০ সালের সাইক্লোনের পর বিদেশীদের সমবেদনা ছিল বাঙালিদের প্রতি। আর আওয়ামী লীগের জনসংযোগ এত চমৎকার ছিল যে বিদেশীরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আওয়ামী লীগের আর যত গুণই থাক জনসংযোগের গুণটি নেই। বরং, মানুষকে অযথা চটানোর গুণ যথেষ্ট। যা হোক আজিজের ভাষায়ই তার যুক্তি তুলে ধরছি–

"Many of the American Journalist in this motley crowd of foreign reporters (whose souls were saturated with compassion for the Bengali Victims of the November, 1970 cyclone tragedy) were so charmed by the public relations operatives of the Awami League that they were just not prepared to believe that their darlings in this fascist organization could commit or instigate the murder of the non-Bengalis."

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পড়ার পর অনেক খুঁজে পেতে আমি কুতুবউদ্দিন আজিজের সংকলনটি যোগাড় করেছি, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে করাচি থেকে। ঐ সময় ভূট্টো ক্ষমতার শীর্ষে। অবাঙালিদের ফেরত নেয়ার প্রশ্নটি বারবার উঠছে। যুদ্ধবন্দিরা ফিরছে। বাঙালিদের প্রত্যাগমনও শুরু হবে। সব মিলিয়ে ১৯৭১-এর প্রশ্ন আবার বড় হয়ে দেখা গিয়েছিল পাকিস্তানে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কুতুবউদ্দিনের বই। কুতুবউদ্দিন যে বাঙালি বিদ্বেষী ও একদেশদর্শী ছিলেন তা তার বইয়ের উপশিরোনাম ও উৎসর্গ পড়লেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বইয়ের উপশিরোনাম–

"170 eye-witness accounts of the atrocities committed on West Pakistanis, Biharis and other non-Bengalis and pro-Pakistan Bengalis in 55 towns of East Pakistan by Awami League militants and other rebels in March-April, 1971."

৫৫টি এলাকার ১৭০ জন। গড়ে প্রতি এলাকায় তিনজন। সৈয়দপুর বা ঢাকা শহরের বর্ণনা যদি বিভিন্ন স্থানে মাত্র তিনচারজন দেয় তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? আর সময়টা হচ্ছে মার্চ-এপ্রিল। কুতুবউদ্দিন লিখেছেন, মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে শংকিত ৫,০০০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি ও অবাঙালি চট্টগ্রাম

থেকে জাহাজে পৌঁছেছিল করাচি। অথচ, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো পত্রিকায় তাদের দুরবস্থার কথা লেখা হলো না বরং স্থানীয় একটি পত্রিকা জানাল, যারা ফিরে এসেছে তারা জানিয়েছে, অবস্থা সেখানে স্বাভাবিক। এ কথা লিখে ক্ষোভ জানিয়েছেন আজিজ। এখন ঐ ধরনের হত্যাকাণ্ড না ঘটলে কীভাবে তারা বলবে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে? বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে–

"To those Hunderds of Thousands of Innocent men, women and children who were killed or Maimed in the Awami Leagues Rebellion and Genocide and the Mukti Bahinis Reign of Terror in East Pakistan in 1971."

কুতুবউদ্দীন অভিযোগ করে বলেছেন, যে মাসে ছয়জন বিদেশী সাংবাদিকের ডেসপ্যাচ ছাপা হয়েছিল যেখানে বিহারি হত্যার বিবরণ ছিল। কিন্তু বাঙালিদের সমর্থক মার্কিন, ভারতীয় ও বাঙালিরা বললেন, ওগুলি মিথ্যা। রিপোর্টে উল্লিখিত গণকবরগুলি বিহারিদের নয়, বাঙালিদের। ধর্ষিতা রমণীরা অবাঙালি নয় বাঙালি। কুতুবউদ্দীনের কাছে সেসব আলোকচিত্র পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে ধর্ষিতা মহিলারা অবাঙালি।

কুতুবউদ্দীনের কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে কার বক্তব্য? কার আবার, জুলফিকার আলী ভূট্টোর। ভূট্টোর *দি গ্রেট ট্র্যাজেডি* প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে। কুতুবউদ্দীনের কাছে বইটির বক্তব্য সঠিক মনে হওয়ার কারণ–

"Shed revealing light on the genesis of the East Pakistan crisis, the secessionist ambitions of the Awami Leagues leadership, Sheikh Mujibur Rahman's obdurate and uncompromising stance in the constitutional talks in Dhaka in the third week of March, 1971 and the Pakistan Peoples Party's efforts for forging a Grand Coalition of the majority parties of the two wings" within the framework of a single, united Pakistan. Mr. Bhutto's vindication of the constitutional stand and role of his party was forceful and logical, "The Great Tragedy" deserved global circulation on a mass scale which to our loss, was then denied to it."

এই বক্তব্যের মূল নির্যাস হলো : আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব, শেখ মুজিবুর রহমানের একগুঁয়েমীর কারণে ১৯৭১-এর ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনা নিরোধে পিপলস পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং ভূট্টো ও তার দলের ভূমিকা ছিল জোরালো এবং যুক্তিযুক্ত (শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে)।

সুতরাং এই বইয়ের অপক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ কথা কিছুতেই বলা সম্ভব নয় এবং কমিশন এ বইটিকেই বেছে নিয়েছিল ১৯৭১-এর সেনাবাহিনীর নৃশংসতার যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য। কমিশনের সঙ্গে ভূট্টোর সঙ্গে জোরালো যোগাযোগ এ পরিপ্রেক্ষিতে অস্বীকার করা দুরূহ।

মার্চ-এপ্রিলে বিহারি হত্যা হয়েছিল না বাঙালি হত্যা? মার্চ, ১৯৭১ সালের লন্ডনের অবজারভারে সিসিল ডানের এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কার্ফু ভঙ্গের জন্য মানুষকে গুলি করা হচ্ছিল এবং কার্ফু কারা ভঙ্গ করছিল? বিহারি না বাঙালিরা? ডান লিখেছেন–

"Our corresponden puts the death toll at 'about 200' and says this relatively low figure is due to the restraint so far shown by the Army, even though angry crowds are everywhere defying the curfew imposed on the province. The Sheikh has appealed to his people to calmdown and to do nothing to aggravate the crisis unless they get his orders to behave differently."

বিহারি হত্যার প্রসঙ্গটা বিস্তৃত আকারে উল্লেখ করার কারণ আছে। সমস্ত পাকিস্তানিরা এ বিষয়টি বিশ্বাস করে কারণ ১৯৭১ সালে তাদের তাই বোঝানো হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

মার্চের শেষ সপ্তাহে আমি মিরপুর ছিলাম। বিহারিরা কীভাবে বাঙালিদের কচুকাটা করেছে তা আমরা দেখেছি। ঢাকায় [এবং মীরপুরেও] যারা ছিলেন তাদের কাছে কমিশনের বক্তব্য হাস্যকর মনে হবে না? বিহারিদের একটি বড় কলোনি ছিল সৈয়দপুরে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ.টি.এম. হামিদুল হোসেন তারেক *জল ছবি ৭১*-এ লিখেছেন–

"...১৯৭১-এর দিনগুলিতে স্থানীয় বিহারিদের বাঙালি বিদ্বেষপ্রবণতা প্রকটভাবে দেখা যায়। প্রায়ই কোনো-না কোনো অজুহাতে বাঙালি 'কতল' করার ফন্দি ওরা খুঁজে বেড়াত। এরই জের হিসেবে ৪ মার্চ, ১৯৭১ দিবাগত রাতে স্থানীয় বিহারিরা সৈয়দপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে মল-মূত্র লেপে রাখে। পরের দিন, এই সংবাদ সব গলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লে সৈয়দপুরের বাঙালিরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে বিহারিরা পাল্টা মিছিল বের করে। শহরে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়।" ২৫ মার্চ "গোপন সূত্রে খবর এলো অনেক বাঙালিকে রেলওয়ের ওয়ার্কশপের জ্বলন্ত বয়লারে পুড়িয়ে মেরেছে।

ভোর রাতে বিহারিদের আক্রমণ এলো। ওরা বাড়ির প্রায় চতুর্দিক থেকে 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' বলে আক্রমণ করল। শটগান ও রাইফেলের অবিরাম গুলি চালাতে লাগল বাড়ি লক্ষ্য করে।"

এরপর আসে বিহারিদের পাকিস্তান চলে যাওয়ার প্রশ্ন। ১৯৭২ সাল থেকে তারা পাকিস্তান যেতে চাচ্ছে। যে বিহারিদের জন্য এত দরদ সেইসব

সাংবাদিকদের তারা তাদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো সময় কিছু লেখেনি। পাকিস্তানের কোনো সরকারও তাদের নিতে চায় না। বাংলাদেশই তাদের মানবেতর জীবন থেকে বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানকে বারবার অনুরোধ করেছে এদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। আর কমিশন তার কী ব্যাখ্যা দিয়েছে?

এ পরিপ্রেক্ষিতে কুতুবউদ্দীন আজিজের বইয়ের বিবরণ যখন কমিশন 'অথেনটিক' (authentic) মনে করে, বিশ্বাস করে বাংলাদেশে ১০,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ হত্যাকাণ্ড বা অবাঙালি হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ এবং এ কারণে সেনাবাহিনী কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তখন একজন বিচারক হিসেবে হামুদুর রহমানের [ও অন্য দুইজন বিচারক] নিরপেক্ষতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে।

৭৩

কমিশনের রিপোর্টে একটি মাত্র বইয়ের ওপর ভিত্তি করে কেন পটভূমিকা রচিত হলো? এর উত্তর বিচারকরাই দিয়েছেন। তারা মনে করিয়ে দিয়েছেন, উপর্যুক্ত যুক্তি তারা পাকিস্তান বাহিনীর কথিত নৃশংসতা ও অন্যান্য অপরাধের যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য দেননি, বরং একটি সঠিক বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যাতে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাবলি বিচার করা যায়। ঘটনাবলির একটি হলো আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতকারীদের [আগে বর্ণিত] আচরণ ক্ষুব্ধ করেছিল পাক-বাহিনীকে। আওয়ামী লীগ বা মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তাদের যে অজ্ঞতা পাহাড় প্রমাণ তা বোঝা যায় ভূট্টো কন্যা বেনজীর ভূট্টোর কথায়। করাচিতে তার সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি বলেছিলেন :

"বাবা মার্চ মাসে আলোচনার জন্য ঢাকা গিয়েছিলেন। যে হোটেলে ছিলেন মুক্তিবাহিনী তা সিল করে দিয়েছিল।"

"সে সময় মুক্তিবাহিনীর সৃষ্টি হয়নি," জানাই আমি, "ওরা ছিল পাকিস্তানি।"

"ওরা পাকিস্তানি!" খানিকটা বিব্রত হয়ে বললেন বেনজির, "আমাদের ধারণা ছিল তারা মুক্তিবাহিনীর। আসলে, আমি বলতে চাই পাকিস্তানি সৈন্যরা উধাও হয়ে গিয়েছিল আর...।"

"আপনি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কথা বলছেন?" জিজ্ঞেস করি আমি।

"তা নয়, আমি সশস্ত্র সামরিক লোকজনের কথা বলছি।"

"এরকম সশস্ত্র লোকের অস্তিত্ব তখন ছিল না," শান্তস্বরে জানাই আমি। বিব্রত বোধ করে প্রসঙ্গ পাল্টালেন বেনজির।

আরো আছে। পাকিস্তানি বাহিনীকে অপমান বা 'হিউমিউলেট' করা হয়েছে। এটিই মূল বক্তব্য। আল্লাহর পর জমিনে তো মিলিটারি, তাদের অপমান করেছে বাঙালিরা। কীভাবে? ক্যান্টনমেন্টে কোনো ঠিকাদার খাবার দিচ্ছিল না। সৈন্যরা ব্যারাক ছেড়ে আসতে পারছিল না। তাদের সাথীদের অপমান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারণ ছাড়া হত্যা করা হচ্ছিল। কমিশনের ভাষায়–"

"...but were also subjected to the serverest of humiliations. They had seen their comrades insulted, deprived of food and ration, and even killed without rhyme of reason."

প্রশ্ন হচ্ছে ২৫ মার্চের আগে পাকিস্তানি সৈন্যদের কোথায় হত্যা করা হয়েছে? বরং, পাকি সৈন্যদের গুলিতে নিরস্ত্র বাঙালিরা নিহত হয়েছে। কমিশন উল্লেখ করেছে [চতুরতার সঙ্গে এখানে কোনো সময় উল্লেখ করা হয়নি] অনেক ইউনিটের পশ্চিম পাকিস্তানি অফিস্যার ও তাদের পরিবার পরিজনদের পাইকারিভাবে হত্যা পাকিস্তানি বাহিনীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারাও তো মানুষ, কমিশনের ভাষায়, "আফটার অল হিউম্যান"।

অর্থাৎ পাকিস্তানের অপরাধ বর্ণনার আগে কমিশন সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখছে। এর অর্থ পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছুকাজ করেছে কিন্তু কেন করেছে? কারণ, তারা তো মানুষ। এই পটভূমিকার পর তারা অপরাধীদের অভিযোগগুলি বিচার করেছে।

প্রায় সব পাকিস্তানিই এ কথা বিশ্বাস করে। আরো বিশ্বাস করে, ভারত [হিন্দু] পাকিস্তানকে [মুসলমান] ভাঙার জন্য কাজ করেছে দীর্ঘ দিন, বাঙালিরা ছিল হিন্দুঘেঁষা। অর্থাৎ এদের বিরুদ্ধে জেহাদ উত্তম। আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতকারীদের বাড়াবাড়ি না করলেও চলত [অর্থাৎ ভুট্টোর সঙ্গে সমঝোতা করা উচিত ছিল, না করাটাই বাড়াবাড়ি]। এসব বিষয়ের ইঙ্গিতও আছে কমিশনে। কমিশন বলতে চেয়েছে, এ সব কিছুই পটভূমি তৈরি করেছে এবং সৈন্যদের মন-মানসিকতায় প্রভাব ফেলেছে সেই পটভূমিকা।

উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপের বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ লেঘারিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসত এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো তাহলে কি সংকট অতিক্রম করা যেত?'

"আমার মনে হয়", লেঘারি উত্তর দিলেন, "কারণ ফেরার পথ আর তখন ছিল না। পাকিস্তানি আর্মি অ্যাকশন, তারপর পরিস্থিতির চরম অবনতি

ঘটিয়েছে। হয়েছে গৃহযুদ্ধ, ভারতের হস্তক্ষেপ। সেনাবাহিনী অ্যাকশনে গেছে ঠিকই, তবে পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছে ঐ অ্যাকশনে যেতে। কারণ, মুক্তিবাহিনীর তখন আবির্ভাব হয়েছে, সেনাবাহিনীর অ্যাকশনে না গিয়ে কি উপায় ছিল?" লক্ষ্য করুন ২৫ মার্চ আর্মি অ্যাকশনে গেছে। মুক্তিবাহিনীর আবির্ভাব আরো মাসখানেক পরে। তাহলে কী আর্মি মে মাসের আগে অ্যাকশনে যায়নি?

প্রখ্যাত সাংবাদিক খালেদ আহমদ আমাকে বলেছিলেন, "পাকিস্তানের ডানপন্থী মানসিকতা কখনো বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি এবং করেও না। এদের কাছে ১৯৪৭-এর পর আর কোনো ইতিহাস নেই। আর এই মানসিকতার কেন্দ্রস্থল পাঞ্জাব।... শাসকরা সব সময় মনে করেছে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে ডুবিয়েছে, সুতরাং সে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানকার ইতিহাসগুলিতে সে ধারণাই বিধৃত হয়েছে।"

লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী আলী কাজেম করেছিলেন, "আমার তখন মনে হয়েছিল, মুক্তিবাহিনীর ব্যাপার-স্যাপার বোধহয় ঠিক নয়, আমার কেন, এখানকার অনেকেরই সে মত ছিল।"

বেনজির ভূট্টোর মতে, "আমাদের ধারণা ভুল হতে পারে, কিন্তু আপনাদের ওখানে যে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন চলছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। অনেকে ভেবেছিলেন, সামরিক অ্যাকশন নেয়া হলে দম ফেলার ফুসরত পাওয়া যাবে। কিছু হয়েছিল তা আমরা জানতে পারিনি।"

এ বিষয়ে ভূট্টোর ঘনিষ্ঠজন ও এক সময়ের মন্ত্রী রফি রাজা যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "উই ডিড নট ওয়ান্ট টু নো অর উই ডু নট নো–যেভাবেই নেন। পিপলস পার্টির লোকেরা ভেবেছিল, আর্মি অ্যাকশনের পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেঙ্গলিস কুড বি সর্টেড আউট। কিন্তু হয়নি। তবে এ ঘটনায় নো বডি ইন দা আর্মি রিগ্রেটেড ইট।" তারপর আপন মনেই বললেন, "উই হ্যাভ এ ভেরি ব্রুটালাইজড সোসাইটি আফটার দ্যাট।"

এ কথা যে সত্যি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হামুদুর রহমান কমিশন তার একটি প্রমাণ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণত যে সব অভিযোগ করা হয় কমিশন তারপর সেগুলি উল্লেখ করেছে–

১. ২৫ ও ২৬ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে শক্তি প্রয়োগ ও গুলি ব্যবহার করা ["ইউস অব ফোর্স অ্যান্ড ফায়ার পাওয়ার"]।

২. গ্রামাঞ্চলে নির্বিচারে লুট ও খুন ["সেন্সলেস অ্যান্ড ওয়ানটন"]।

৩. নিরস্ত্র বা বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে ইবি আর, ইপি আর, পুলিশ হত্যা।
৪. সামরিক আইন কার্যকর করার সময় বেসামরিক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া।
৫. ইচ্ছাকৃত প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তান বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের বিরাট সংখ্যক মহিলা ধর্ষণ।
৬. ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের হত্যা।

এইসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি আছে কি না কমিশন এরপর তা বিচার বিশ্লেষণ করেছে। সাক্ষীসাবুদে অনেকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন, বলেছেন লুট ও ধর্ষণের কথা। হিন্দুদের হত্যার জন্য মৌখিক আদেশ দেয়া হয়েছিল তাও কেউ কেউ বলেছেন। রাও ফরমান আলী যে 'সবুজ লাল করে দেয়ার' কথা নোটে লিখে রেখেছিলেন সে প্রসঙ্গও এসেছে।

জেনারেল নিয়াজী যেমন বলেছেন, কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। রাও ফরমান আলীও বলেছেন, লুট, ধর্ষণ ও হত্যা ইত্যাদির কথা শুনেছেন এবং লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন ভালো ব্যবহার করে মানুষের হৃদয় জয় করার। এ ক্ষেত্রে তার বক্তব্যটি লক্ষ্য করার মতো– "I wrote out an instruction to act as a guide for decent behaviour and recommended action required to be taken to win over the hearts of the people." লুট, ধর্ষণ ও হত্যা বন্ধের জন্য সুস্পষ্ট করে লিখিত কোনো নির্দেশ দেননি।

ব্রিগেডিয়ার শাহ আবদুল কাসিম বলেছেন, ২৫ মার্চ ঢাকায় কোনো সংঘর্ষ হয়নি। সে রাতে অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধান্বিত হয়ে তারা 'অপারেশন' চালিয়েছে। ব্রিগেডিয়ার মিয়া তাসকিনউদ্দিন বলেছেন, দুষ্কৃতকারী দমনের অছিলায় অনেক জুনিয়র অফিসার নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল।

মেজর জেনারেল নজর হুসাইন শাহ, কর্নেল বোখারী, লে. কর্নেল নঈম স্বীকার করেছেন, বাঙালিদের তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। রংপুরে দুইজন অফিসারসহ ৩০ জনকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সময় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ মারা পড়েছে। লে. কর্নেল মনসুরুল হকের সাক্ষ্যটি বেশ চমকপ্রদ। তিনি বলেছেন, যে কোনো বাঙালিকে যদি মুক্তিবাহিনী বা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে সন্দেহ করা হতো তাহলে তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হতো। বিনা বিচারে হত্যার সাংকেতিক নাম ছিল বাংলাদেশে পাঠানো। ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার মীর মোহাম্মদ আশরাফও একই কথা বলেছেন, তার সাক্ষ্য সামগ্রিক অবস্থা বা পাকিস্তানিদের ভূমিকা কী ছিল

তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"There was no Rule of Law in East Pakistan. A man had no remedy if he was on the wanted list of the Army...Army officers who were doing intelligence were raw hands, ignorant of the local language and callous of Bengali sensibilities."

ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ মালিক মে মাসে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন হিন্দুদের হত্যা করার জন্য। বলেছেন লে. কর্নেল আজিজ আহমদ খান।

এইসব সাক্ষ্যসাবুদ সত্য যদিও তা ১৯৭১-এর ভয়াবহতা তুলে ধরে না। একটা কথা আমরা ভুলে যাই, পশ্চিম পাকিস্তানি বা পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা কখনো বাঙালিদের মানুষ হিসেবে গণ্য করেনি। করাচির একজন নামকরা আলোকচিত্র শিল্পী ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ আন্দোলনের নেতা আমাকে বলেছিলেন, "আসলে মনোভাবটা তখন কী রকম ছিল বলি। ড. মুবাশ্বির হাসান ছিলেন ভূট্টোর ঘনিষ্ঠ। ফেডারেল মন্ত্রী হয়েছিলেন তার সময়ে। ২৫ মার্চ ভূট্টোর সঙ্গে ছিলেন ঢাকায়। ঢাকা থেকে ফেরার পরপর তার সঙ্গে আমার দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী, কী হচ্ছে সেখানে? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, '৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্য লাখ খানেক মরেছে, এখনো না হয় মরবে, তাতে কী?"

এ মনোভাব তখন নয়, পরবর্তীকালেও ছিল। না হলে ৩০ নং অনুচ্ছেদে কীভাবে কমিশন মন্তব্য করে যে সব অভিযোগ [হত্যা, লুট, ধর্ষণের] করা হয়েছে তা চূড়ান্ত নয়। শেষোক্ত শব্দটি লক্ষণীয়। তারপর বলা হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানি ব্যক্তিদের নিরস্ত্র করার সময় হয়তো আরো কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং, সেনা কর্তৃপক্ষের উচিত একটি তদন্ত করে সত্য নিরূপণের মাধ্যমে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ।

৭৪

কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে? এ ক্ষেত্রে কমিশন চূড়ান্ত ভণ্ডামীর পরিচয় দিয়েছে। আশ্রয় নিয়েছে চতুরতার, বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে বিশ্ববাসীকে [যদি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় সে পরিপ্রেক্ষিতে], আশ্বস্ত করতে চেয়েছে জেনারেল ও রাজনীতিবিদদের।

এ প্রসঙ্গে একই অধ্যায়ের ৩১ নং অনুচ্ছেদের বক্তব্যটি তুলে ধরছি।

হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিণাম নির্ধারণ করাটা কঠিন। কারণ ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করে। সেখানে আওয়ামী লীগের চরমপন্থী এবং পরে পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংস ও

হত্যার সঠিক পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আরো মনে রাখতে হবে, ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনী অ্যাকশনে যাওয়ার পর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও আওয়ামী লীগ 'স্পনসরড' মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের শান্ত গ্রামগুলিতে হত্যা, ধর্ষণ ও লুট চালিয়েছে। তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছে। আরো চেয়েছে যারা পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের শায়েস্তা করতে। সুতরাং, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর কথিত নৃশংসতার পরিমাপ করতে গেলে সম্পূর্ণ সময়ে আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা যে মৃত্যু ঘটিয়েছে ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এবং তাদের ভাইবোনদের ওপর যে নৃশংসতা দেখিয়েছে তাও মনে রাখতে হবে। কমিশনের ভাষায়–

"In any estimate of the extent of atrocities alleged to have been committed on the East Pakistani people, the death and destruction caused by the Awami League militants throughout this period and the atrocities committed by them on their own brothers and sisters must, therefore, always be kept in view."

এখানে বাক্য গঠন ও শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয়। ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কতদিন আওয়ামী লীগ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে আর পাকিস্তান চালিয়েছে কতদিন? বাক্যটি এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে, পড়লে মনে হবে সারাটা সময় আওয়ামী লীগের 'চরমপন্থীরা' মারমার-কাটকাট করেছে, কোনো একটা সময় পাকিস্তানিরা এসেছিল, অর্থাৎ তাদের ভূমিকা গৌণ।

২৫ মার্চের পর আওয়ামী চরমপন্থী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা [অর্থাৎ হিন্দুরা] লুটপাট ও হত্যা করেছে এবং পাকি বাহিনীর নৃশংসতা হচ্ছে কথিত। কমিশন এভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ, মুক্তিবাহিনীর ওপর দায় চাপিয়েছে বাংলাদেশের গণহত্যার। কোনো সভ্য দেশের সভ্য বিচারক বা বিচারকবৃন্দের এমন কাজ করা সম্ভব কিনা জানি না।

পাকিস্তানে যদি কেউ কোনো কিছু না-ই জানবে তাহলে ১৯৭১ নিয়ে পাকিস্তানে প্রতিবাদ হয়েছিল কেন? এবং কী নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছিল? প্রতিবাদ কম হতে পারে, প্রতিবাদে সোচ্চার সাধারণ মানুষ বা রাজনীতিবিদের সংখ্যা কম হতে পারে কিন্তু যদি নাই জানেন তবে নিয়মিত পাকিস্তানি সৈন্যদের ঢাকায় পাঠান হচ্ছিল কেন? ইয়াহিয়া খানই বা কাদের মে মাসে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন? উপ-নির্বাচনই বা কেন হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে? এবং কেন-ই বা বেসামরিক গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে পাকিস্তানে প্রতিবাদের ধরনটি উল্লেখ করছি। এর ধরন দেখলেই বোঝা যবে, লুট, ধর্ষণ, গণহত্যার বিষয়টি নীতিনির্ধারক বা

রাজনীতিবিদদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না।

১৯৭১ সালে যারা বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী সংঘটিত কার্যাবলীর প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

সাহিত্যিক আহমদ সেলিম ইসলামাবাদে আমাকে বলেছিলেন, ২৭ মার্চ লাহোরে সূফী লাল হুসেইনের মাজারে মিছিল করে যাওয়ার সময় তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আহমদ সেলিম লিখেছিলেন কবিতা–

"হে লাল হুসেইন! লালনের ভাই
জেগে ওঠ! বাংলায় হত্যা করা হচ্ছে তোমার মধুদের
বারবার তারা গুলিবিদ্ধ করেছে লালনের গান
আটচল্লিশে, বায়ান্নতে এবং তারপরেও
আর আজ প্রজ্বলন্ত
রবি ঠাকুর ও নজরুলের গান
জেগে ওঠ লাল হুসেইন, মধু আজ নিঃসঙ্গ
আলিঙ্গন করো তাকে
তার দিকে ছুটে আসা বুলেটের মোকাবিলা করো
তোমার গান দিয়ে
জেগে ওঠ লাল হুসেইন
বাংলার ভাইরা এগিয়ে আসছে
জেগে ওঠ কবি, কোথায় তোমার বন্দুক?"
[মফিদুল হক অনূদিত]

আহমদ সেলিম ও তাঁর বেশ কিছু সাথীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেলিম জানিয়েছেন, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তানে অনেকে কবিতা/গান লিখে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন যার সংকলন করলে বেশ মোটাসোটা একটি বই হবে। কিন্তু কেউ এর খবর জানে না। বিখ্যাত কবি হাবিব জালেবি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তাকে জেলে পোরা হয়।

লাহোরের তাহেরা মজহার ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী মিলে মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রতিবাদও কিছু হয়েছে যা আমাদের জানা নেই। যেমন ড. তারিক রহমান। ১৯৭১ সালে ছিলেন সেনাবাহিনীর ক্যাডেট। তিনি কমিশন পাওয়ার পরপরই পদত্যাগ করেন। কোর্ট মার্শাল হতো তাঁর। কিন্তু বাবা ব্রিগেডিয়ার হওয়ায় বেঁচে যান। এখন থাকেন ইসলামাবাদে। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, এতে সাহসের কোনো ব্যাপার নেই। মানবিকতার বাইরে আমি যেতে পারি না। তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তাই সংহতভাবে লিখেছেন

আহমদ সেলিমের একটি বইয়ের ভূমিকার উপসংহারে–"আসুন আমরা সবাই মিলে লিখি, কথা বলি, ছবি আঁকি– স্মরণ করি ১৯৭১ সালকে এর সকল নির্মম বাস্তবতাসমেত। আসুন আমরা ক্ষমা চাই মৃতদের কাছে। আসুন আমরা সচেষ্ট হই সমঝোতা ও ক্ষমা অর্জনে। এতে করে অতীত পাল্টে যাবে না তবে হয়তো ভবিষ্যৎ বদলাতে পারে। এটা সহায়তা করবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন গড়তে এবং আরো যা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের সাহায্য করবে আরেকটি বাংলাদেশ সৃষ্টি পরিহারে।" বর্তমান পাকিস্তানে যে–সহিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এ মন্তব্য করেছেন।

সাংবাদিক আই এ রেহমান ঐ সময় যেমন, এখনো তেমন কঠোর ভাষায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরছেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, "হিন্দু ও ব্রিটিশরা যে পরিমাণ মুসলমান হত্যা করেছে আমরা মুসলমান হিসেবে তার থেকে বেশি মুসলমান হত্যা করেছি।" কথাটি সত্য। কিন্তু এই সত্য বলার সাহস আছে কয়জনের?

আই এ রেহমান বলেন, "অনেকে বলেন ১৯৭১-এ কী হয়েছে এখানকার বাসিন্দারা তা জানত না। এগুলি খোড়া যুক্তি। কমবেশি তারা জানত। কারণ তারা Supported the massacre of their compatriots in the eastern wing. With a vary few honourable exceptions, the West Pakistan population, led by politicians, academics, bureaucrats and opinion makers, chose to back the senseless carnage, and there were many who fought over the spoils."

সুতরাং, পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশে কী ঘটছে তা জানতেন না এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। জানতেন, কিন্তু কমিশনে তা তিনি উল্লেখ করতে পারেন না। বরং হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা হ্রাস এবং তাকে ঘিরে বাতাবরণ তৈরি করাই ছিল কৌশল। সে প্রচেষ্টাই তিনি নিয়েছেন রিপোর্ট রচনার সময়।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে কমিশন বলছে, (অনুচ্ছেদ ৩৮) ২৫ মার্চের সময় এবং পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনী যে অতিরিক্ত করেছে তা ঠিক তবে ঢাকা কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্ক যে বিবরণ ও পরিসংখ্যান বলে তা অতিরঞ্জিত ও কল্পনাপ্রসূত। কথিত কিছু ঘটনা ঘটেইনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কল্পনারঞ্জিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যাতে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বিশ্বের সহানুভূতি অর্জন করা যায়। আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীকে প্রবলভাবে প্ররোচনা যুগিয়েছে। তাছাড়া কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য কঠোর সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও কমিশন মনে করে পাকিস্তানি

বাহিনী অতিরিক্ত যা করেছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং, যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আসল ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি পাকিস্তানিরা এড়াতে চায়। ভান করে যে, তারা কিছুই জানত না। তৎকালীন পাকিস্তানের তথ্য সচিব রোয়েদাদ খান, নিরাপত্তা পরিষদের সচিব জেনারেল উমর, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভূট্টো, পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজী–সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, ২৫ মার্চ বা তার পরবর্তীতে বাংলাদেশে কি ঘটেছে তা তারা জানেন কী না? সবাই অস্বীকার করেছেন বা এড়িয়ে গেছেন।

এবার দেখা যাক, মূল বিষয় গণহত্যা সম্পর্কে কমিশন কী মনে করে?

কমিশনের মতে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মতে পাকিস্তানি বাহিনী ত্রিশ লক্ষ বাঙালি ও দুই লক্ষ রমণী ধর্ষণ করেছে। এ সংখ্যা যে অতিরঞ্জিত তা বোঝাবার জন্য যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষেও এত হত্যা ও ধর্ষণ সম্ভব নয়। কারণ, পাকিস্তানি বাহিনী সব সময় মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও পরে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। শুধু তাই নয়, ব্যস্ত ছিল তারা যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা ও ৭ কোটি মানুষকে খাওয়ানোর কাজে। সুতরাং ঢাকার কর্তৃপক্ষ গণহত্যা ও ধর্ষণের যে হিসাব দিচ্ছে তা হাস্যকর ও কল্পনারঞ্জিত ['Fantastic and fanciful']।

তাহলে, হত্যার পরিমাণ কত? কমিশন অনেক ভাবনা চিন্তা করে জানাচ্ছে, সদর দফতর যে হিসাব দিয়েছে সেটিই গ্রহণযোগ্য , নিহতের সংখ্যা ছাব্বিশ হাজারের বেশি নয়।

এ বিষয়ে বাকবিতণ্ডা পাকিস্তানি ও বাংলাদেশী পাকিস্তানিরা করতে পারে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই তা নিয়ে বিতর্ক করবে না। তবুও নতুন প্রজন্ম ও যারা বাংলাদেশের পাঠক নয় তাদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি উদাহরণ দেব।

বেশ কয়েক বছর আগে, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আমরা খুলনার চুকনগর গিয়েছিলাম তথ্য সংগ্রহে। সেখানে আমরা গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া দুশো জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তথ্য সংগ্রহে। চুকনগরে ১৯৭১ সালের মে মাসে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টায় কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত কম সময়ে এত মানুষ হত্যার নজির বিরল। খালি কী চুকনগরে? বাংলাদেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে, বড় শহরে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড হয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে মাঠ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য বরিশালের স্বরূপকাঠির গভীর এক গ্রামে গিয়েছিলাম। ছোট গ্রাম। কয়েক ঘর চাষী বাস করেন। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা এখানে এসেছিল কি না? তারা জানালেন, গানবোটে করে এসেছিল এবং মানুষ হত্যা করেছিল। আমি যখন ঐ অঞ্চলে যাই তখন যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তারপরও সে গ্রামে পৌঁছতে আমার বেশ সময় লেগেছে। ১৯৭১ সালে সে গ্রামে পৌঁছা আরো কষ্টকর ছিল। তারপরও পাকিস্তানিরা সেই গ্রামে গিয়ে মানুষ হত্যা করেছিল। অর্থাৎ, বাংলাদেশের এমন কোনো স্থান নেই যেখানে পাকিস্তানি ও তাদের অনুচররা গিয়ে মানুষ হত্যা করেনি। ৬৪ হাজার গ্রামে গড়ে ১০ জন করে হত্যা করলেও তো সে সংখ্যা হয় প্রায় সাড়ে ছয় লাখ। আমাদের হিসাব বাদ দিই, রাও ফরমান আলীও তো পঞ্চাশ হাজারের কথা স্বীকার করেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানের দুই নম্বর ব্যক্তিটিই যদি একথা বলেন তখন কমিশনের ২৬০০০ সম্পর্কে আর কী বলব?

এখানে আরো উল্লেখ্য, কমিশন কিন্তু বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য প্রথমেই একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বলেছে গণহত্যার বিষয়টি কল্পনারঞ্জিত। বিচারের শুরুতেই রায় দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানি বিচারকদের এটি অবশ্য একটি ঐতিহ্য।

৭৫

তারপর আসে ধর্ষণের বিষয়। কমিশন বলছে, শেখ মুজিব যে বলছেন, বাংলাদেশের দুই লক্ষ ধর্ষিত হয়েছে তা ভ্রান্ত। কারণ, গর্ভপাত ঘটানোর জন্য ১৯৭২ সালে ব্রিটেন থেকে যাদের [ডাক্তারদের দল] তিনি এনেছিলেন তারা একশো বা তার কিছু বেশি গর্ভপাত ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ শেখ মুজিব যে ত্রিশ লক্ষ হত্যা ও দুই লক্ষ ধর্ষণের কথা বলেছে তা মিথ্যা।

যৌন নির্যাতনের বর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই কম পাওয়া গেছে। কারণ নির্যাতিত কোনো মহিলা তার ওপর নির্যাতনের হুবহু বর্ণনা দিতে পারেন? তবুও কোনো কোনো বিবরণে এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। রাবেয়া খাতুন নামে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এক সুইপার এ রকম একটি বিবরণ দিয়েছেন। তাঁকে ২৬ মার্চেই হানাদার সেনারা খুঁজে পায় এবং ধর্ষণ শুরু করে। পুলিশ লাইনের ময়লা পরিষ্কার না হতে পারে বিধায় তাকে আর প্রাণে মারা হয়নি। তিনি বলেছেন, এরপর শহরের বিভিন্ন

অঞ্চল থেকে কিশোরী, তরুণী, মহিলাদের দলে দলে ধরে আনা হতে লাগল পুলিশ লাইনে এবং–

"এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙালি নারীদের ওপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবি সেনারা কুকুরের মতো জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উন্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগল। ওরা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। ...উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা এই নিরীহ বাঙালি মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয়নি–আমি দেখলাম পাকসেনারা সেই মেয়েদের ওপর পাগলের মতো উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারালো দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্যত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

যে সকল বাঙালি যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করল দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জারি সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছেদন করে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দুপা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম। পাঞ্জাবিরা যে কোনো কুকুরের মতো মদ খেয়ে সবসময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল।

শুধু সাধারণ পাঞ্জাবি সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয়নি, সকল উচ্চপদস্থ পাঞ্জাবি সামরিক অফিসাররাই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মতো হয়ে দুই হাত বাঘের মতো নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙালি মহিলাদের ওপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকত। কোনো মেয়ে, মহিলা যুবতীকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেয়া হয়নি, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এ সকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্য মেয়েরা আরো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং স্বেচ্ছায় পশুদের

ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করত।

যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের হাসি-তামাশায় দেহ দান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয়নি। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের ওপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যৌন ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এরপর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মতো লাথি মারতে মারতে, পশুর মতো পিটাতে পিটাতে উপরে হেড কোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চারতলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবি সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভেতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে চলে যেত। এরপর বহু যুবতী মেয়েকে হেড কোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয় প্রতিদিন পাঞ্জাবিরা সেখানে যাতায়াত করত। সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোলের মাংস ব্যাটন দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকত, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে কেউ হাসতে হাসতে তাদের যৌন পথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ ধারালো চাকু দিয়ে কোনো যুবতীর পাছার মাংস আস্তে আস্তে কেটে কেটে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত বক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারালো দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে আনন্দে অট্টহাসি করত। কোনো মেয়ে এসব অত্যাচারে কোনো প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে, শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবি সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলোপাতাড়ি বেদম প্রহার করে যেত।

প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারো মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দুদিকের মাংস কামড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙে, থেঁতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মহিলা ও মেয়েদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেয়া হতো না একমুহূর্তের জন্য। হেড কোয়ার্টারের উপর তলার বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায়

লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করত–আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতাম।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙালি যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবি সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলায় সেখানে সেই সকল বন্দি মহিলাদের পুতগন্ধ, প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেড কোয়ার্টার অফিসের উপরতলা হতে বহু ধর্ষিত মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙালি যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবি সেনারা প্রহরা দিত। কোনো বাঙালিকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনো সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না।"

বিস্তারিত বিবরণটি উদ্ধৃত করলাম একটি কারণে। যারা সমন্বয়ের রাজনীতি করেন, যেসব যুবক বলেন, ১৯৭১ সালে কী হয়েছিল কে জানে বা যেসব তরুণী স্টেডিয়ামে প্ল্যাকার্ড বহন করে পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে বিয়ে করতে চায় তারা জানুক তাদেরই প্রতিবেশীরা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল বা এটুকু যেন ভাবে তাদের পরিবারের কেউ এভাবে নির্যাতিত হলে কেমন লাগত।

নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন। হামুদুর রহমান কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছে শ'খানেকের মতো। এ সংখ্যা কখনো নির্দিষ্ট করা যায়নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এ দেশেও।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি ডা. ডেভিসের বক্তব্যের উদ্ধৃতি আগে দিয়েছি, তাই এখানে আর তা উল্লেখ করলাম না। টিক্কা খান ধর্ষিতা মহিলার যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন হামুদুর রহমান কমিশন অন্তত এই সংখ্যাটি উল্লেখ করলেও বুঝতাম যে কমিশন পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু, হামুদুর রহমানরা ধর্ষণের কথা স্বীকার করতে রাজি হননি। অথচ, জেনারেল নিয়াজী লিখেছিলেন, সৈন্যরা এমন উন্মত্ত হয়ে ধর্ষণ করেছে যে পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলারাও ধর্ষিত হয়ে যেতে পারে।

কমিশন বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ফরমান আলীকে এই দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। পাকিস্তানি জেনারেলদের অনেকে মনে করেন বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল মুক্তিবাহিনী অথবা ভারতীয় বাহিনী। এ যে কত বড় মিথ্যাচার তা বলাই বাহুল্য। তিনি কী ভুলে গেছেন বুদ্ধিজীবীদের শুধু ১৪ ডিসেম্বর নয় এর আগে থেকে হত্যা করা হচ্ছিল?

রিপোর্টের পঞ্চম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে কতিপয় সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তার পেশাগত দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশন বলেছে, বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ শুনে কমিশন অভিযুক্ত করেছে ছয়জন সামরিক কর্মকর্তাকে। তারা হলেন–

১. লে. জে. আলীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী
২. মে. জে. মোহাম্মদ জামশেদ
৩. মে. জে. এ. রহিম খান
৪. ব্রিগেডিয়ার জি. এম বাকির সিদ্দিকী
৫. বিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত
৬. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আসলাম নিয়াজী

বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে তিনজনের বিরুদ্ধে। তারা হলেন–

১. ব্রিগেডিয়ার এস. এ. আনসারী
২. ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমদ
৩. ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান

এরপর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলা হয়েছে, তিনি ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। এবং যুদ্ধের সময় তার ওপর সামরিক কোনো দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল না। বিভিন্ন পদে তিনি আন্তরিক, সদিচ্ছাসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান একজন স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন– ["Maj. Gen. Farman Ali merely functioned as an intelligent, well-intentioned and sincere staff officer in the various appointment held by him..."]

সুতরাং ফরমান আলী ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেলেন টিক্কা খানও। এর একটি কারণ, তিনি ঢাকা ছেড়ে অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন। 'টিক্কা খানকে তো পাকিস্তানিরাই বেলুচিস্তানের কসাই উপাধি দিয়েছিলেন)। পাকিস্তানের সম্মানিত রাজনীতিবিদ শেরবাজ খান মাজারির আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। উল্লেখ্য ভুট্টো টিক্কা খানকে সেনাপতি করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, ভূট্টোর সময় (খুব সম্ভব) প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় ফরমান আলী একটি পদ পেয়েছিলেন।

এ ছাড়াও কমিশন আরো কয়েকজনকে অভিযুক্ত করেছে এ কারণে যে তারা ষড়যন্ত্র করে সংবিধান উল্টে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ১৯৭১ সালে তাদের আচরণও লজ্জাজনক। কমিশনের ভাষায়–

"who have brought disgrace and defeat to Pakistan by their subversion of the constitution, usurpation of political power by cirminal conspiracy, their professional incompetence, culpable negligence and wilful neglect in the performance of their duties and physical and moral cowardice in abandoning the fight when they had the capability and resource to resist the enemy."]

কমিশনের ভাষায় তাদের 'পাবলিক ট্রায়াল' হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ কেউ না করে। কমিশন যাদের 'পাবলিক ট্রায়ালের' কথা বলেছে। তারা হলেন–

১. জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
২. জেনারেল আবদুর হামিদ খান
৩. লে. জে. এস. জি. এম. এম. পীরজাদা
৪. লে. জে. গুল হাসান
৫. মে. জে. মোহাম্মদ উমর
৬. মে. জে. মিঠা।

৭৭

এছাড়াও কমিশন আরো বেশ কিছু খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ করেছে যা আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু, এত সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণ করেও কমিশন মাত্র একডজনকে অপরাধী করেছে। যাদের কমিশন অপরাধী করেছে তাদের বিষয়ে আমাদেরও দ্বিমত নেই। এদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ব্যবস্থা নেবে কী না তাও তাদের ব্যাপার।

আমরা বিষয়টিকে অন্যভাবে বিচার করতে চাই। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ১৯৭১ সালকে সামনে নিয়ে এসেছে। ১৯৭৫ সালের পর, এই প্রথমবার গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আমরা করছি সেই ১৯৭২ সাল থেকে। কিন্তু, বিচার হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের তালিকাও পাওয়া যায়নি।

এখন প্রযুক্তি বিকশিত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকাও সরকার তৈরি করেছিল ১৯৭২ সালে তা পাওয়া গেছে [দেখুন : শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি], নতুন প্রজন্মের [বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই তারা] তরুণ-তরুণীরা এদের নাম জানুক এবং প্রযুক্তির সাহায্যে পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বে এদের নাম ছড়িয়ে দিক এবং এদের বিচারের জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি করুক। ইন্টারনেটের আর ই-মেইলের সাহায্যে কি সিয়াটলে প্রবল শক্তিশালী বিশ্ব ব্যাংকের সম্মেলন লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হয়নি?

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে ৫০০ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রস্তুত করেছিল। পরে তা হ্রাস করে ২০০-তে নামিয়ে আনা হয়। সেই তালিকায় শুধু যারা যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতে ছিল তাদের নামই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে সরকার অভিযোগনামাও তৈরি করেছিল। শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত উপর্যুক্ত বইয়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। নয় জনের বিরুদ্ধে তৈরি অভিযোগনামা পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে নিয়াজী ও ফরমান আলী ছাড়া বাকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির সংক্ষিপ্ত সার ও যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা উদ্ধৃত করা হলো।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আমাকে একজন প্রথিতযশা আইনজীবী বলেছিলেন, ড. কামাল হোসেন ও এস. আর. পালসহ আরো অনেকে অভিযোগনামা তৈরি করেন। কাগজপত্রসহ ট্রাংকটি অ্যাডভোকেট এস. আর পালের বাসায় ছিল। তারপর এসবের খোঁজ আর কেউ করেনি। এস. আর. পাল এখন প্রয়াত। হয়তো পরে ঐ ট্রাংকটি সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ নিয়ে গেছে। হয়তো অবহেলায় কোনো মন্ত্রণালয়ের স্টোরে তা পড়ে আছে [বিশেষ করে আইন মন্ত্রণালয়ে খোঁজ করে দেখা যেতে পারে]। অনুসন্ধিৎসু যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আছেন তারা হয়তো এ বিষয়ে খোঁজ-খবর করলে এ বিষয়ে নতুন অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরি করা হয়েছিল এবং যা পাওয়া গেছে তা উদ্ধৃত করছি–

১. নাম. ব্রিগেডিয়ার মনজুর হোসেন আতিক

২. নং : পিএ ৩৫৪৭

৩. ইউনিট

৪. পদ : কুমিল্লার ১১৭ ব্রিগেড কমান্ডার, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ফেনীর উপসহকারী সামরিক আইন প্রশাসক (এর আগে সে বরিশালে লে. কর্নেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে)।

৫. তার বিরুদ্ধে অগণিত অভিযোগসমূহ : বরিশালে নির্যাতন ক্যাম্পে যেসব মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়, তাদের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডে আতিক সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সে এবং তার অধীনস্থ সৈন্যরা এসব এলাকায় যে ব্যাপক ও বর্বর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং তার প্রচুর তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৬. প্রস্তাবিত চার্জ : গণহত্যা, হত্যা, গণহত্যার নির্দেশনা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ পরিচালনা, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লংঘন, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা।

১. নাম : মেজর জেনারেল আনসারী

২. নং : পিএ-৪৪০৪

৩. ইউনিট :

৪. পদ : স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা (২৫, মার্চ '৭২-এর পূর্ব পর্যন্ত)। স্টেশন কমান্ডার, চট্টগ্রাম, ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থলাভিষিক্ত। জিওসি ৯ম ডিভিশন, সেক্টর তিন এর সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক।

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ : প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী অভিযুক্ত আনসারী ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ সামরিক অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে। গণহত্যা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার মতো অসংখ্য উচ্চ পর্যায়ের স্টাফ ও অপারেশন প্লান বৈঠকে সে অংশগ্রহণ করে। সে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত বাঙালি সৈন্যদের পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করে। ডিভিশনের জিওসি এবং সেকশন তিন-এর উপ-সামরিক আইন প্রশাসন হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার কারণে যশোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল, খুলনা, মংলা পোর্ট, সাতক্ষীরা, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভোলা ও বাগেরহাটসহ ব্যাপক এলাকার দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়।

১৯৭১-এর জুলাই মাস থেকে আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত এসব অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে সে অথবা তার অধীনস্থ সৈন্যরা যে বর্বর হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ নির্যাতন ও বন্দিশালা পরিচালনা করে তার অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে।

৬. প্রস্তাবিত চার্জ : মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা মাফিক গণহত্যা বাস্তবায়ন ও সামরিক অভিযান পরিচালনা নির্দেশ প্রদান, ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন প্রদান।

১. নাম : ক্যাপ্টেন আবদুল ওয়াহিদ

২. নং : পিএসএস-৮৪৬৪

৩. ইউনিট : ৩০ এফ এফ

৪. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ : ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাতে সামরিক পাক-বাহিনী নিরীহ জনগণের উপর হামলার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ঢাকা শহরে চাকুরিরত ছিল। সেদিন ঢাকায় খুন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগসহ যেসব দুষ্কর্ম সংঘটিত হয়, তাতে অভিযুক্তের অংশগ্রহণের প্রমাণ রয়েছে।

৫. উত্থাপিত অভিযোগ : খুন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোজ এবং নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা।

১. নাম : মেজর খুরশীদ ওমর

২. নং : পিএ-৪৫৫৩

৩. ইউনিট : (অভিযুক্ত যশোর ক্যান্টনমেন্টের ৬১৪ ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে সংযুক্ত ছিল)

৪. কর্মস্থল :

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ : অভিযুক্ত খুরশীদ ওমর '৭১-এর মার্চ মাস থেকে আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত যশোর ক্যান্টনমেন্টের গোয়েন্দা ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ঐ সময় ঐ এলাকার রাজনৈতিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব ছিল তার ওপর।

গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাঙালি সেনা সদস্য এবং বেসামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করা এবং এ সকল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ঘটনার সাথেও অভিযুক্ত ব্যক্তি জড়িত ছিল। কমপক্ষে ৯০০ ব্যক্তিকে তার নির্দেশে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয় এবং এদের অনেককেই তার আদেশে বা তত্ত্বাবধানে নির্যাতন করা হয়। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের ফলে অনেকেই পরবর্তীতে মারা যায়। নির্যাতনের নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল বিশেষজ্ঞ।

৫. উত্থাপিত অভিযোগ : পরিকল্পনা মাফিক গণহত্যা কার্যকর, খুন, নির্যাতন, মিথ্যা গ্রেফতার, বিনাবিচারে আটক রাখাসহ অন্যান্য ঘটনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন।

১. নাম : মেজর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

২. নং : পিটিসি-৫৯১১

৩. ইউনিট :

৪. কর্মস্থল : উপ-সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক সাবসেক্টর-১২ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ : ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর-এ অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবজেল থেকে ৫০ ব্যক্তিকে বের করে এনে পায়িরতলা ব্রিজের নিকট হত্যা করে। পরবর্তীতে ওই স্থানের মাটি খুঁড়ে ৪২ জনের লাশ পাওয়া যায়। অনেকে এ ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পূর্বে লে. জেনারেল নিয়াজী এবং মেজর জেনারেল মজিদ খান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ স্থানটি পরিদর্শন করে।

ওই গণহত্যা পরিকল্পনার প্রামাণ্য দলিলপত্রও প্রকাশিত হয়েছে।

৬. উত্থাপিত অভিযোগ : গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড, মিথ্যা গ্রেফতারসহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

১. নাম : কর্নেল ইয়াকুব মালিক

২. নং : পিএ-৩৮৩৭

৩. ইউনিট : ৫৩ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট (৫৩ ব্রিগেড ১৪ ডিভিশন)

৪. পদ : সিও

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে তার ইউনিটের অবস্থান ছিল কুমিল্লাতে এবং আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সেটি বাংলাদেশে অবস্থান করছিল। ২৫ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে তার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার-এ ৩০০ বাঙালি সৈন্যকে অস্ত্রহীন করে আটকে রাখে। এর বাইরেও ১৬০০ বেসামরিক লোককে আটক করে। ৩০ মার্চ বন্দিদেরকে ২৫ জন অথবা ২০ জনের গ্রুপে ভাগ করে, বাইরে এনে গুলি করে হত্যা করে। একই রাত প্যাট্রোমেক্স লাইটের সহায়তায় মৃতদেহগুলোকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে গণকবর দেয়। এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনার পুরো সময়ে অভিযুক্ত কুমিল্লাতে উপস্থিত ছিল। বিশেষ করে যেসব দিনগুলোতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, সে সময় ইয়াকুব মালিক হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করছিল।

৬ প্রস্তাবিত চার্জ : পরিকল্পিত গণহত্যা বাস্তবায়ন, নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন।

১. নাম : লে. কর্নেল সামস্-উল-সামস (কর্নেল সামস্ নামেও পরিচিত)

২. নং : পিএ-৪৭৪৫

৩. ইউনিট : ২২ এফএফআর এবং ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন (১০৭ ব্রিগেড. ১৪ ডিভিশন)

৪. পদ : ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত খুলনাতে সহকারী সাব মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

৫. বিস্তারিত অপরাধসমূহ : ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত অভিযুক্তের

কর্মস্থল ছিল যশোর। পরে সে খুলনাতে যায় এবং ধারণা করা হয় কখনো কখনো সে যশোর ফিরে আসত। বাংলাদেশের দুঃসহ দিনগুলিতে সে খুলনাতে ছিল। তার বিরুদ্ধে যশোর ও খুলনাতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় '৭১-এর ৪ মার্চ সে সদলবলে যশোর শহরের চাচড়া মহল্লায় নির্বিচারে গুলি করে ২৫০ জনকে হত্যা করে। ওই বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন দলে প্রায় ২০০০ ব্যক্তিকে নিয়ে আসে, খুলনা সার্কিট হাউস ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্যাতন করে এবং সার্কিট হাউস থেকে ২০০ গজ দূরে ফরেস্ট ঘাটে নিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এ সময়ে অভিযুক্ত সামস্ সার্কিট হাউজেই থাকত এবং সশরীরে নির্যাতন চেম্বার পরিদর্শন করত।

৬. প্রস্তাবিত চার্জ : পরিকল্পিত গণহত্যা বাস্তবায়ন, নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুতর লংঘন, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশনসহ অন্যান্য চার্জ।

যুদ্ধবন্দিদের ভেতর অভিযুক্ত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্র. নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
		পিএ-৪৭৭	লে. জে.	আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী	ইস্ট কমান্ড	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা গণহত্যা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটায়
২	২	পিএ-১১৭০	মেজর জে.	নাজার হোসেন শাহ	১৬ ডিভিশন	ঐ
৩	৩	পিএ-৪৪০৪	মেজর জে.	মোহাম্মদ হোসেন আনসারী	৯ম ডিভিশন	ঐ
৪	৪	পিএ-৮৮২	মেজর জে.	মোহাম্মদ জামশেদ	ডিজিইপিক্যাফ	ঐ
৫	৫	পিএ-১৭৩৪	মেজর জে.	কাজী আঃ মজিদ খান	১৪ ডিভিশন	ঐ
৬	৬	পিএ-১৩৬৪	মেজর জে.	রাও ফরমান আলী খান মেজর জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের উপদেষ্টা	বেসামরিক বিষয়ক	ঐ
৭	৭	পিএ-১[illegible]৭৪	ব্রিগেডিয়ার	আব্দুল কাদির খান	৯৩ ব্রিগেড (বিডিই)	ঐ
৮	৮	পিএ-২২৩৫	ব্রিগেডিয়ার	আরিফ রাজা	সিগন্যাল হেড কোয়ার্টার	ঐ
৯	৯	পিএ-১১০৯	ব্রিগেডিয়ার	আতা মোহাম্মদ খান মালিক	৭ ব্রিগেড	ঐ
১০	১১	পিএ-১৮৯৭	ব্রিগেডিয়ার	বশির আহমেদ	সি এ এফ	ঐ
১১	১২	পিএ-১০০০৮৮	ব্রিগেডিয়ার	ফাহিম আহমেদ খান	ইসি হেড কোয়ার্টার	ঐ
১২	১৩	পিএ-১৭৩৮	ব্রিগেডিয়ার	ইফতেখার আহমেদ রানা	৩১৩ ব্রিগেড	ঐ
১৩	১৬	পিএ-৩৪১৪	ব্রিগেডিয়ার	মনজুর আহমেদ	৫৭ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
১৪	১৭	পিএ-৩৫৪৭	ব্রিগেডিয়ার	মনজুর হোসেন আতিক	১১৭ ব্রিগেড	ঐ

১৫	১৮	পিএ-২১১১	ব্রিগেডিয়ার	মিয়া মুনসুর মোহাম্মদ	৩৯ ডিভিশন	ঐ
১৬	১৯	পিএ-১১৪৮	ব্রিগেডিয়ার	মিয়া তাসকিন উদ্দীন	৯১ ব্রিগেড	ঐ
১৭	২০	পিএ-২৭২৯	ব্রিগেডিয়ার	মীর আবদুল নাঈম	৩৪ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
১৮	২২	পিএ-১৯৯৯	ব্রিগেডিয়া	মোহাম্মদ আসলাম	৫৩ ব্রিগেড	ঐ
১৯	২৩	পিএ-২১০৩	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ হায়াৎ	১০৭/৪০৭ ব্রিগেড হেডকোয়া:	ঐ
২০	২৪	পিএ-১০৪৪	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ শফি	২৩ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
২১	২৫	পিএ-১৭০২	ব্রিগেডিয়ার	এন এ আশরাফ	সিএমডি নাটোর গ্যারিশন	ঐ
২২	২৬	পিএ-৩৪৩০	ব্রিগেডিয়ার	এস এ আনসারী	রংপুর গ্যারিশন	ঐ
২৩	২৭	পিএ-৩৫৪৮	ব্রিগেডিয়ার	সাদ উল্লাহ খান এস জে	২৭ ব্রিগেড	ঐ
২৪	২৮	পিএ-১৮৮০	ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ আসগর হাসান	সিলেট ফোর্স	ঐ
২৫	২৯	পিএ-২১১০	ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ শাহ আবুল কাশম	সি সি আর্টিলারি ইসি	ঐ
২৬	৩০	পিএ-২১৩০	ব্রিগেডিয়ার	তাজাম্মাল হোসেন মালিক	২০৫ ব্রিগেড হেড কোয়া:	ঐ
২৭	৩৫	পিএ-১৮১৭	কর্নেল	ফজলে হামিদ	৩১৪ ব্রিগেড হেড কোয়া:	ঐ
২৮	৩৭	পিএ-৩৭৯৯	কর্নেল	কে কে আফ্রিদি	৯ ডিভিশন	ঐ
২৯	৪৪	পিএ-১৯৬৩	কর্নেল	মোহাম্মদ খান	আই এস আই	ঐ
৩০	৪৫	পিএ-১০০১১৫	কর্নেল	মোহাম্মদ মোশারফ আলী	১৪ প্রশাসনিক ডিভিশন	ঐ
৩১	৫৮	পিএ-২২০০	লে. কর্নেল	আব্দুল গাফফার	হেড কোঃ এসআইজিইএ	ঐ
৩২	৬৭	পিএ-৪৪৮৯	লে. কর্নেল	আফতাব হোসেন কোরায়েশী	৩৩ বেলুচ	ঐ
৩৩	৫৭	পিএ-৩৫৬৮	লে. কর্নেল	আব্দুল রেহমান আওয়ান	সিএএফ	ঐ
৩৪	৬০	পিএ-৩৩৪৭	লে. কর্নেল	আব্দুল হামিদ খান	মার্শাল ল হেড কোয়ার্টার	ঐ
৩৫	৬৫	পিএ-৪০৮৭	লে. কর্নেল	আব্দুল্লাহ খান	ইপিক্যাফ	ঐ
৩৬	৬৮	পিএ-৪৩১৮	লে. কর্নেল	আহমেদ মোক্তার খান	৩০ এফ এফ	ঐ
৩৭	৭২	পিএ-৪০৬২	লে. কর্নেল	আমীর মোহাম্মদ খান	৭ সেকশন মার্শাল ল	ঐ
৩৮	৭৪	পিটিসি-৪৩২৯	লে. কর্নেল	আমীর নেওয়াজ খান	১৩ এফ এফ	ঐ
৩৯	৭৩	পিএ-৫০২৭	লে. কর্নেল	আমীর মোহাম্মদ খান	৩৪ পাঞ্জাব	ঐ
৪০	৫৫	পিএ-৪৭৪৫	লে. কর্নেল	এ সামস উল জামান	২২ এফ এফ	ঐ
৪১	৭৮	পিএ-৪৬০৮	লে. কর্নেল	আশিক হোস্যাইন	২৪ এফ এফ	ঐ
৪২	৮১	পিএ-৩২৩৮	লে. কর্নেল	আজিজ খান	৩২ বেলুচ	ঐ
৪৩	২০২	পিটিসি-৩২৩৯	লে. কর্নেল	গোলাম ইয়াসিন সিদ্দিকী	স্টেশন হেডকোঃ, ঢাকা এএ এবং কিউ এম জি	ঐ
৪৪	৯৭	পিএ-৩৭১১	লে. কর্নেল	ইসারত আলী আলাভী	১৪ হেডঃ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন	ঐ
৪৫	১৬৭	পিএ-৪৪৪১	লে. কর্নেল	মুক্তার আলম হিজাজী	ইপিক্যাফ	ঐ
৪৬	১৭০	পিএ-৩৬০০	লে. কর্নেল	মুস্তাফা আনোয়ার	১৫ বেলুচ	ঐ
৪৭	১১৬	পিএ-৪১০০	লে. কর্নেল	এম আর কে মির্জা	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
৪৮	১২৮	পিএ-৪৩০১	লে. কর্নেল	মতলুব হোসেন	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
৪৯	১৪০	পিএ-২৭০০	লে. কর্নেল	মোঃ আকরাম	তচি স্কাউট	ঐ
৫০	১৫২	পিএসএস-২৫৭০	লে. কর্নেল	মোহাম্মদ আকবর	ইপিক্যাফ	ঐ
৫১	১৪৭	পিটিসি-৩৬৪৫	লে. কর্নেল	মোহাম্মদ নেওয়াজ	১৫ বেলুচ	ঐ
৫২	১৬৯	পিএ-৪৪৬৬	লে. কর্নেল	মুস্তাজ মালিক	ইস্ট কমান্ড হেড কোয়াঃ	ঐ
৫৩	১৩৮	পিএ-৪৪১৬	লে. কর্নেল	এম এম এম বাইজ	৮ বেলুচ	ঐ
৫৪	৪৮	পিএ-১০০২০৭	লে. কর্নেল	মোহাম্মদ মতিন	৭২	ঐ
৫৫	১২৯	পিএ-২৯১৭	লে. কর্নেল	মাজহার হোসেন চৌহান	আই এস এস সি	ঐ
৫৬	১৬৮	পিএ-৩৬১০	লে. কর্নেল	মোক্তার আহমেদ সাঈদ	মার্শাল ল অ্যাডঃ হেড কোয়াঃ	ঐ
৫৭	১৭১	পিএসএস-২৮৯৯	লে. কর্নেল	মুস্তাফাজান	মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জোন হেড কোয়ার্টার	ঐ

৫৮	১৭৫	পিএ-২৮২১	লে. কর্নেল	ওমান আলী খান	জরিপ বিভাগ	ঐ
৫৯	১৮০	পিএ-৫০৭৪	লে. কর্নেল	রিয়াজ হোসেন জাভেদ	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৬০	১৭৮	পিএ-৪৫৫০	লে. কর্নেল	রশিদ আহমেদ	ইপিক্যাফ হেড কোয়াঃ	ঐ
৬১	১৯৬	পিএ-৪৮১৭	লে. কর্নেল	শেখ মোহাম্মদ নাঈম	৩৯ বেলু	ঐ
৬২	১৯২	পিএ-৩৯৩২	লে. কর্নেল	সরফরাজ খান মালিক	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৬৩	১৮১	পিএ-৪৯২০	লে. কর্নেল	এস এফ এইচ রিজভী	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
৬৪	১৮২	পিএ-৪৫৬০	লে. কর্নেল	এ এইচ বোখারী	২৯ সিএভি	ঐ
৬৫	২০৫	পিএ-৪৩৬৮	লে. কর্নেল	সৈয়দ হামিদ শফি	প্রতিরক্ষা ক্রয়	ঐ
৬৬	২০১	পিএ-৩৮১৭	লে. কর্নেল	সুলতান বাদশা	৮ ইপিক্যাফ	ঐ
৬৭	২০০	পিএ-৫১৭৪	লে. কর্নেল	সুলতান আহমেদ	৩১ বেলুচ	ঐ
৬৮	১৯৯	পিএ-৪৫১৮	লে. কর্নেল	এস আর এইচ জাফরী	সিগন্যাল ইএ হেড কোয়াঃ	ঐ
৬৯	২১৬	পিএসএস-৩৭৪৩	লে. কর্নেল	জাহিদ আগা খান	ইএফ লগ হেড কোয়াঃ	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
৭০	২২২	পিএ-৩৮৩৭	লে. কর্নেল	এম ওয়াই মালিক	১৪ ডিভিশন হেড কোয়াঃ	ঐ
৭১	২৩১	পিএ-৭০৫৯	মেজর	অ. ুল গফ্রান	ইস্ট কমান্ড	ঐ
৭২	২৮৪	পিএ-৫৬৪০	মেজর	আনিস আহমেদ	২০৫ ইনফ্যান্টি ব্রিগেড হেঃ	ঐ
৭৩	২৯০	পিএ-৭২১৪	মেজর	আরিফ জাভেদ	২২ ক্যাভ	ঐ
৭৪	৩০৪	পিএ-৬৭৩৬	মেজর	আতা মোহাম্মদ	২৯ বেলুচ	ঐ
৭৫	২৩৩	পিএএসএস-৮৩৯৪	মেজর	আব্দুল হামিদ	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৭৬	৩০১	পিএ-৭২৯৯	মেজর	এ এস পি কোরায়েশী	২৫ পাঞ্জাব	ঐ
৭৭	২৯৪	পিএ-৭৫৩০	মেজর	আশফাক আহমেদ চীমা	৩৯ বেলুচ	ঐ
৭৮	২৪১	পিএসএস-৮৫৪৭	মেজর	আব্দুল খালেক কায়ানী	৬ পাঞ্জাব	ঐ
৭৯	২৫৬	পিটিসি-৪৬৬৪	মেজর	আব্দুল ওয়াহিদ মুঘল	২২ বেলুচ	ঐ
৮০	২৩৫	পিএ-৩৮৩৮	মেজর	আবদুল হামিদ খটক	মার্শাল ল হেড কোয়াঃ	ঐ
৮১	২৬২	পিএ-৭২৫১	মেজর	আহমেদ হাসান খান	ইপিক্যাফ	ঐ
৮২	২৮৩	পিআরআর-৪৪৩৮	মেজর	আনিস আহমেদ খান	১৫ বেলুচ	ঐ
৮৩	২৫৫	পিএ-৪৯৯০	মেজর	আব্দুল ওয়াহিদ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
৮৪	৩২০	পিএ-৫৮৬৮	মেজর	সি এইচ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	মার্শাল ল অ্যাডঃ জোন বি হেড কোয়াঃ	ঐ
৮৫	৩৮৪	পিএ-৪১২২	মেজর	গোলাম মোহাম্মদ	২ বেলুচ	ঐ
৮৬	৩৫৮	পিটিসি-৪৩৯০	মেজর	গোলাম আহমেদ	ইপিক্যাফ	ঐ
৮৭	৩৪৪	পিএ-৭৪৩৯	মেজর	গজনফার আলী নাসির	ইপিক্যাফ	ঐ
৮৮	৩৬৩	পিএ-৬৯৫৯	মেজর	হাদী হোসাইন	২৪ এফ এফ	ঐ
৮৯	৩৬৭	পিএ-৬৬৪৬	মেজর	হাসান মুজতবা	৮ বেলুচ	ঐ
৯০	৩৭৬	পিটিসি-৫৭৩৩	মেজর	ইফতেখার উদ্দীন আহমেদ	৩৩ বেলুচ	ঐ
৯১	৩৭৪	পিএ-৬৭২৯	মেজর	ইফতেখার আহমেদ	৮ পাঞ্জাব	ঐ
৯২	৭১২	পিএ-৫২৫০	মেজর	শাহ্ মোহাম্মদ ওসমান ফারুকী	৭ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
৯৩	৪১৯	পিএ-৪৫৫৩	মেজর	খুরশিদ ওমান	৮১৪ এফআইইউ	ঐ
৯৪	৪২৩	পিটিসি-৩৯৪৭	মেজর	খুরশিদ আলী	জরিপ বিভাগ	ঐ

৯৫.	৪১৪	পিএ-৭৫৭৬	মেজর	খিজার হায়াৎ	৮ এফ এফ	ঐ
৯৬	৪৮৫	পিএ-৭৬৫৭	মেজর	মেহের মোহাম্মদ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
৯৭	৪৩১	পিটিসি-৫৯১১	মেজর	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান	২৭ ব্রিগেড	ঐ
৯৮	৫৩৩	পিএ-৭২৫৩	মেজর	মোহাম্মদ আফজাল	৮ বেলুচ	ঐ
৯৯	৪৪১	পিএ-৭৪০৫	মেজর	মোহাম্মদ ইসহাক	ইপিক্যাফ	ঐ
১০০	৫৫৩	পিটিসি-৩২৪৬	মেজর	মোহাম্মদ হাফিজ রাজা	৩৪ পাঞ্জাব	ঐ
১০১	৫৯৫	পিএ-৬৮৭০	মেজর	মোহাম্মদ ইউনাস	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১০২	৫০৪	পিএ-৬৭৯৩	মেজর	মোহাম্মদ আমিন	১০৭ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১০৩	৪৮১	পিএস-৩৯৩৭? ২৯৩৫	মেজর	মোহাম্মদ লোদী	নাটোর গ্যারিশন	ঐ
১০৪	৪৯৩	পিএ-৬৫৫৪	মেজর	মির্জা আনোয়ার বেগ	৮৮ অর্ডিন্যান্স সিওওয়াই	ঐ
১০৫	৪২৮	পিএ-৪১৫৭	মেজর	এম এ কে লোদী	১৬ ডিভিশন হেড কোয়াঃ	ঐ
১০৬	৪৫৯	পিএসএস-৪২৪৫	মেজর	মাদাদ হোসেন শাহ	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১০৭	৫৪৪	পিটিসি-৩০০৭	মেজর	মো. আয়ুব খান	৯৭ ব্রিগেড	ঐ
১০৮	৫৬৮	পিএসএস-৬১১০	মেজর	মো. শরীফ আরাইন	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১০৯	৫৫৫	পিএ-৫৯৬৪	মেজর	মোহাম্মদ ইফতিখার খান	২০২ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১১০	৪৫৫	পিএ-২৮১৮	মেজর	এম. ইয়াহিয়া হামিদ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১১১	৫৯২	পিএসএস-৬১৫০	মেজর	মোহাম্মদ ইয়ামিন	এ এস সি	ঐ
১১২	৫২৭	পিএ-৫১৪১	মেজর	মোহাম্মদ গজনফার	আই এস এস সি	ঐ
১১৩	৫৮৩	পিএ-৭২৩১	মেজর	মোহাম্মদ সারওয়ার	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১১৪	৫৭৯	পিটিসি-৩০১৬	মেজর	মোহাম্মদ সিদ্দিকী	২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেঃ	ঐ
১১৫	৫৪৩	পিএসএস-৬০৯২	মেজর	মোহাম্মদ আশরাফ	ইপিক্যাফ হেড কোয়ার্টার	ঐ
১১৬	৫০৬	পিএসএস-৪৬৩৪	মেজর	মোহাম্মদ আশরাফ খান	৫৩ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১১৭	৬০৪	পিএ-৫৩১২	মেজর	মোহাম্মদ সাফদার	আই এস এস সি	ঐ
১১৮	৪৯৬	পিএ-৬০৬৭	মেজর	এম এম ইস্পাহানি	ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোঃ	ঐ
১১৯	৫৬২	পিএ-৬৪৪০	মেজর	মোহাম্মদ জামিল	ইপিক্যাফ	ঐ
১২০	৫৮০	পিএ-৭৫৫৯	মেজর	মোহাম্মদ শফি	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১২১	৫৪৭	পিএসএস-৪৩২০	মেজর	মোহাম্মদ আলী কুরায়েসী কুরেস	আই এস এস সি	ঐ
১২২	৫২৫	পিএ-৬৪৬০	মেজর	মোহাম্মদ জুলফিকার রাথোর	১৩ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১২৩	৬১৫	পিএ-৫৯৬২	মেজর	মুস্তাক আহমেদ	৬৩০ এ এস সি	ঐ
১২৪	৬৩৪	পিএসএস-৭৯৯৬	মেজর	নাসির খান	২৬ এফ এফ	ঐ
১২৫	৬৩২	পিএ-৪৭৪৮	মেজর	নাসির আহমেদ	৪০৯ GHQFIU	ঐ
১২৬	৬৪৫	পিটিসি-৪৬৩২	মেজর	রানা জহুর মোহাইদ্দীন খান	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১২৭	৬৬৬	পিএ-৮৬৫৫	মেজর	রিফাত মাহমুদ	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১২৮	৬৬৭	পিএসএস-৬১৪৮	মেজর	রুস্তম আলী	৩১৪ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১২৯	৬৫১	এসিও-৩৯০	মেজর	আর এম মুমতাজ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
১৩০	৭০২	পিএ-৬০৩৬	মেজর	সর্দার খান	মার্শাল ল অ্যাডঃ হেডঃ কোঃ	ঐ
১৩১	৫১০	এসিও-২০৯৯	মেজর	মোহাম্মদ আযম খান	১২ এ কে	ঐ
১৩২	৬৮৬	পিআরআর-৩৩৮৯	মেজর	সাইফ উল্লাহ খান	আই এস এস সি	ঐ
১৩৩	৬৭৪	পিএ-৬৮৯৩	মেজর	এস টি হোসেন	৭৩৪ এফআইসি	ঐ
১৩৪	৭৩০	পিএসএস-৪২২৪	মেজর	এস এম এইচ এস বোখারী	২৪ এফ এফ	ঐ
১৩৫	৬৮৯	পিএসএস-৮০১৫	মেজর	সাজিদ মাহমুদ	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১৩৬	৭৩২	পিএ-৭৪১৫	মেজর	শের উর রেহমান	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৩৭	৬৯৫	পিটিসি-৫৯৩০	মেজর	সালামত আলী	ইপিক্যাফ	ঐ
১৩৮	৬৯০	পিএ-৬৮৫৮	মেজর	সাজ্জাদ আক্তার মালিক	আই এস আই	ঐ

১৩৯	৬৯৮	পিএ-৫৬৮৪	মেজর	সালিম এনায়েত খান	৫৭ মার্শাল ল হেঃ জোন বি	ঐ
১৪০	৭৩৫	পিএ-৭২৮৯	মেজর	সুলতান সাউদ	ইপিক্যাফ	ঐ
১৪১	৭০৫	পিএ-৫৪২	মেজর	সরফরাজ উদ্দীন	আই এস আই	ঐ
১৪২	৭২০	পিএ-৫০৮০	মেজর	শওকাতুল্লাহ খটক	৩৬ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৪৩	৭৩৭	পিএ-৭৪২৮	মেজর	সুলতান সুরখ্রো আওয়ান	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১৪৪	৭০৪	পিএ-৭০৭৬	মেজর	সরফরাজ আলম	ইপিক্যাফ	ঐ
১৪৫	৭০৬	পিএ-৬৮৫১	মেজর	সারওয়ার খান	তচি স্কাউট	ঐ
১৪৬	৭৫৬	পিএ-৬২৭২	মেজর	তাফায়ের-উল-ইসলাম	নাটোর হেড কোয়ার্টার	ঐ
১৪৭	৭৮৫	পিএসএস-৮১২৪	মেজর	জাওমুল মালুক	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৪৮	৮০৬	পিএসএস-৮৪৬৪	ক্যাপ্টেন	আব্দুল ওয়াহিদ	৩০ এফ এফ	ঐ
১৪৯	৮১৭	পিএ-১০২০২	ক্যাপ্টেন	আফতাব আহমাদ	৩১ বেলুচ	ঐ
১৫০	৮৫৮	পিএএস-৮৮৩৬	ক্যাপ্টেন	আরিফ হোসেন শাহ	আর্টিলারি	ঐ
					ইআইজেডআই ইএমডি	
১৫১	৮১৫	পিএসএস-৯৬৩৪	ক্যাপ্টেন	আরবার হোসেন	৩০ এফ এফ	ঐ
১৫২	৮৫৩	পিএসএস-৯৯৫৯	ক্যাপ্টেন	আমজাদ সাব্বির বোখারী	৩১ ফিল্ড রেজিঃ আর্টিলারি	ঐ
১৫৩	৮৭৬	পিএ-১০১২৯	ক্যাপ্টেন	আওসাফ আহমেদ	৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৫৪	৭৫০৮৯	পিএ-১০১৮৫	ক্যাপ্টেন	আব্দুল কাহার	ইপিক্যাফ	ঐ
১৫৫	৮৬৯	পিএ-১০৯৮৫	ক্যাপ্টেন	আশরাফ মির্জা	১২ একে ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেঃ	ঐ
১৫৬	৮০২	পিএসএস-৯৯০৪	ক্যাপ্টেন	আবদুল রশিদ নায়ার	১৯ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৫৭	৮৪৯	পিএসএস-৮০০৫	ক্যাপ্টেন	আমান উল্লাহ	নাটোর গ্যারিশন হেড কোঃ	ঐ
১৫৮	৮৮২	পিএসএস-৯৩৬৩	ক্যাপ্টেন	আজিজ আহমেদ	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৫৯	২২১	পিএসএস-৯৪৪০	ক্যাপ্টেন	গুলফ্রাজ খান আব্বাসী	২২ এফ এফ	ঐ
১৬০	৯৫১	পিএসএস-৮১৪৪	ক্যাপ্টেন	ইকরামুল হক	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৬১	৯৪৭	পিএ-১০২৪১	ক্যাপ্টেন	ইজাজ আহমেদ চীমা	আই এস আই	ঐ
১৬২	৯৪১	৮৮৬৭	ক্যাপ্টেন	ইফতেখার আহমেদ গোনদাল	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
১৬৩	৯৬৪	পিএসএস-৮৮২১	ক্যাপ্টেন	ইসহাক পারভেজ	২৪ এফ এফ	ঐ
১৬৪	৯৬০	পিএসএস-৯৬১৪	ক্যাপ্টেন	ইকবাল শাহ	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৬৫	৯৭৬	পিএসএস-৬৯১০	ক্যাপ্টেন	জাভেদ ইকবাল	৩৩ বেলুচ	ঐ
১৬৬	৯৭২	পিএসএস-৯৭৬৫	ক্যাপ্টেন	জাহাঙ্গীর কোয়ানী	আর এফ টি ক্যাম্প	ঐ
১৬৭	৯৮৫	পিএ-৭৮৩৮	ক্যাপ্টেন	করম খান	৩১৫ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১৬৮	১০৪৭	পিএ-১১৫৫৪	ক্যাপ্টেন	মনজার আমিন	২৫ এফ এফ	ঐ
১৬৯	১২৫৫	পিএসএস-৯৩৮৭	ক্যাপ্টেন	মোজাফফর হোসেন নাকভী	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৭০	১১৭৮	পিএ-১১৫৫১	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ সাজ্জাদ	৮০ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৭১	১২০১	পিএসএস-৮৮২০	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ জাকির রাজা	আই এস এস সি	ঐ
				(মো. জাকার খান, আর্টিলারি)		
১৭২	১১২৬	পিএ-৭৮৬২	ক্যাপ্টেন	মো. আরিফ	১৪ ডিভিশন হেড কোঃ	ঐ
১৭৩	১১৩১	পিএসএস-৯০১৮	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ আশরাফ	১২ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৪	১১৪৯	পিএসএস-৮৯৭৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ ইকবাল	১২ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৫	১০৯৬	পিএসএস-৯৯২৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ রফী মুনির	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৬	১১৫৯	পিএসএস-১০২৮৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ জামিল	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৭	১২৩৮	পিএসএস-৯০৭৭	ক্যাপ্টেন	নাঈম সাদিক	৪০৯ এফআইইউ হেড কোঃ	ঐ
১৭৮	১৩৫১	পিএসএস-৯৪৫৪	ক্যাপ্টেন	শের আলী	৩৯ বেলুচ	ঐ
১৭৯	১৩২২	পিএসএস-৮০৯৩	ক্যাপ্টেন	সালমান মাহমুদ	২৬ এফ এফ	ঐ
১৮০	১৩২৫	পিএস-১১০০৯	ক্যাপ্টেন	সামশেদ সারোয়ার	আর এল এফ ক্যাম্প	ঐ
১৮১	১৩৪৩	পিএসএস-৭৭৪৫	ক্যাপ্টেন	শহীদ রেহমান	২৯ ক্যাভ	ঐ

১৮২	১৩২১	পিএসএস-১০৪৩১	ক্যাপ্টেন	সালেহ হুসাইন	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৮৩	১৩৫০	পিএসএস-৯৫০৮	ক্যাপ্টেন	শওকত নেওয়াজ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৮৪	১৩৯৬	পিএ-৭৮৯৮	ক্যাপ্টেন	জাহিদ জামান	৫৩ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১৮৫	১৫০৫	পিএসএস-১১৮৪৩	লেফটেন্যান্ট	মুনীর আহমেদ বাট	৩১ বেলুচ রেজিমেন্ট	ঐ
১৮৬	১৫৫৩২	পিএসএস-১২১৯১	লেফটেন্যান্ট	জাফর জং	৩৮ এফ এফ	ঐ
১৮৭	৬৪১	পিএসএস-৬১২৭	মেজর	নিসার আহমেদ খান শেরওয়ানী	৩২ পাঞ্জাব	নরহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী
১৮৮	৩৩৮	পিএসএস-৮৫৩৪	মেজর	ফায়েজ মাহমুদ	২৯ বেলুচ	ঐ
১৮৯	৪৮৭	পিএ-৪৯৯২	মেজর	মিয়া ফখরুদ্দীন	৯১ ইনফ্যানট্রি, ব্রিগেড হেঃ	ঐ
১৯০	৯২৪	পিএসএস-৮৮৮০	ক্যাপ্টেন	হেদায়েত উল্লাহ খান	২৯ বেলুচ	ঐ
১৯১	১১০২	পিএসএস-১০৮২৮	ক্যাপ্টেন	মো. সিদ্দীক	২৭ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৯২	৯৯৩	১০১৪৭	ক্যাপ্টেন	খলিল-উর-রহমান	সিওডি, ঢাকা	ঐ
১৯৩	৬২৮	পিএ-৭৬২৬	মেজর	নাদির পারভেজ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৯৪	৯৩৪	পিএসএস-১০৩৮৪	ক্যাপ্টেন	হাসান ইদ্রিস	ইপিক্যাফ	ঐ

পাকিস্তান বিমান বাহিনী

১৯৫	৬৫৪৮৩	পি-৯৫৩	এয়ার কমডোর	ইনাম-উল-হক খান	পিএফ ঢাকা	ঐ
১৯৬	৬৫৪৮৪	পিএএফ-১০৬৯	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	এম এ মজিদ বেগ	পিএফ ঢাকা	ঐ
১৯৭	৬৫৫১০	পাক-৫৩৩২	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	খলিল আহমেদ	পিএএফ	ঐ

পাকিস্তান নৌ বাহিনী

১৯৮	৭১৭৫৫	পি-১৩৮	রিয়ার অ্যাডমিরাল	মোহাম্মদ শরীফ		ঐ
১৯৯	৭১৭৫৬	পিএন-১০৮	কমডোর	ইকরামুল হক মালিক	পোর্ট ট্রাস্ট	ঐ
২০০	৭১৭৫৭	২১৯	কমডোর	খতিব মাসুদ হোসেন	বেজ কমান্ড	ঐ

৭৮

সম্পূরক রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম–'পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত অফিসারদের মধ্যে মারাত্মক নৈতিক স্খলন'। মূল রিপোর্টে এ কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছিল জে. ইয়াহিয়া খান, জে. আবদুল হামিদ খান, মে. জে. খুদা দাদ খান, লে. জে.এ.এ. কে নিয়াজী, মে. জে. জেহানজেব এবং ব্রিগেডিয়ার হায়াতুল্লাহকে। শেষোক্ত তিনজন ছিলেন বাংলাদেশে। এই তিনজনকে নৈতিক স্খলনের প্রমাণস্বরূপ যে সব তথ্য তারা জেনেছিলেন সেগুলিই রিপোর্টে বিবৃত হয়েছে। ১৪ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে অভিযোগগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর থেকে সেনা কর্মকর্তাদের নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। সেনা কর্মকর্তাদের আনুগত্য লাভে ও তাদের সে কারণে সন্তুষ্ট করার মানসে তাদের বিভিন্ন সিভিল পদে বসানো হতে থাকে। তাদের যেমন, পেনসন, সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয় এবং জমি বিলি করা হয়। বিভিন্ন

স্থানে তারা বাড়ি নির্মাণ করে থাকে সামরিক কর্মকর্তাদের। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করি।

১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক স্খলনে প্রধান আসামি করা হয়েছে ইয়াহিয়া খানকে। ইয়াহিয়া প্রচুর মদ্যপান করতেন, অনেক রমণীর সঙ্গভোগ করতেন [“extremely firendly with a number of ladies of indiffernt repute” পৃ. ২৮৯], যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধের সময়ও তিনি না বলে কয়ে হারিয়ে যেতেন। যারা নিয়মিত তার কাছে যেতেন তারা হলেন– বেগম শামিম কে. এন. হুসেন, পূর্ব পাকিস্তানের আইজি’র স্ত্রী [তিনি ছিলেন বিচারপতি আমিন আহমদের কন্যা], জুনাগড়ের বেগম, গায়িকা নূরজাহান, আকলিম আক্তার যিনি জেনারেল রানী নামে বেশি পরিচিত, করাচির জনৈক ব্যবসায়ীর স্ত্রী নাজলি বেগম, মিসেস মনসুর হিরজি, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল লতিফ খানের প্রাক্তন স্ত্রী জয়নাব, মালিক স্যার খিজির হায়াত খান ডিওয়ানার প্রাক্তন স্ত্রী জয়নাব, ঢাকার শিল্পপতি আনোয়ারা বেগম, ঢাকার মিসেস লিলি খান, ঢাকার লায়লা মুজাম্মিল। প্রেসিডেন্ট হাউসের (করাচি ও ইসলামাবাদে] অতিথিদের গমন থেকে যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিদিন ইয়াহিয়ার কাছে কমপক্ষে একজন মহিলা আসছেন। এরা ছাড়াও প্রচুর মহিলার নাম আছে সেখানে। এমনও দেখা গেছে একই দিনে দুজন আসছেন, একই সময়ে। এইসব বেগমরা মাঝে মাঝে একই সঙ্গে স্বামী নিয়েও আসতেন। তবে ইয়াহিয়ার বেশি প্রিয় ছিলেন শামীম। শামীম ও তার স্বামীকে পরে সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত করা হয়। এইসব মহিলারা প্রেসিডেন্টের নাম ভাঙ্গিয়ে জাগতিক সুবিধা আদায় করতেন। জেনারেল হামিদও মাঝে মাঝে প্রেসিডেন্টের সঙ্গী হতেন।

পুলিশের আরেকজন কর্মকর্তার স্ত্রী মিসেস সাঈদ আহমদ খান প্রেসিডেন্ট তো বটেই অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল খুদাদাদ খানেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন নিজের স্বামীর প্রমোশন ছাড়াও অনেক সুবিধা নিয়েছেন।

১৪ থেকে ২০ অনুচ্ছেদ ব্যয়িত হয়েছে জেনারেল নিয়াজীর অবৈধ ব্যবসা ও যৌন কাতরতা নিয়ে। পাকিস্তানের উচ্চতর মহল বিষয় দুটি জানত। ঢাকা থেকে পান পাচার করতেন নিয়াজী। তার যৌন কাতরতা নিয়ে অনেক কথা শোনা যাবে পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে। লাহোরে জেনারেল নিয়াজীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। স্বাভাবিক কারণেই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে না বাচক উত্তর দিয়েছিলেন যেমনটি দিয়েছিলেন কমিশনের সামনে। কমিশন তার কথা বিশ্বাস করেনি। আমাদেরও বিশ্বাস করার প্রশ্ন আসে না। রাও ফরমান

আলী রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, এপ্রিলের দিকে এক বেসামরিক কর্মকর্তার স্ত্রী নিয়াজীর কাছে এসেছিলেন তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয় জানতে। নিয়াজী সেই অসহায় মহিলাকে অফিস কক্ষেই ধর্ষণ করেন। বিষয়টি সবাই তখন জানত।

নিজের স্বামীর প্রমোশন ছাড়াও অনেকে সুবিধা নিয়েছেন।

জেনারেল নিয়াজী লাহোরের গুলবার্গের মিসেস সাঈদা বুখারির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন যিনি 'সিনোরিটা' হোম নামে একটি পতিতালয় চালাতেন। জেনারেলের হয়ে সাঈদা ঘুষ ও অন্যান্য কারবারের অর্থ নিতেন। শিয়ালকোটের শামীম ফেরদৌস নামেও একজন নিয়াজীর হয়ে একই ধরনের কাজ করতেন। ১৯৭১ সালে সাঈদা ঢাকা এসে পানের অবৈধ ব্যবসা করতেন। লাহোরের জিওসি থাকার সময় [সামরিক শাসনামলে] নিয়াজী সামরিক শাসনের নামে ক্রিমিনাল, স্মাগলারদের কাছে নিয়মিত বখরা নিয়ে লাখ লাখ টাকা করেছেন। ১৯৭১ সালে ঢাকায় থাকার সময়, রমযান মাসে নাচনেওয়ালি নিয়ে আসতেন। পাকিস্তানের এক সময়ের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন এ. জে. কারদার ১৯৭১ সালে ছিলেন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা, এপ্রিল-মে মাসে তিনি ঢাকা আসেন। তিনি বলেছিলেন, সারা শহরের মানুষ জানত জেনারেল নিয়াজী রাতে বেশ ফুর্তিতে কাটাতেন "... The impression created was there was a Pakistan force representing a Muslim country indulging in these things." [পৃ. ২৯২]

মেজর জেনারেল জেহানজেব চুরি চামারির সঙ্গে নিয়মিত ঘুষও খেতেন। যুদ্ধ চলার সময় পশ্চিম সীমান্তে ব্রিগেডিয়ার হায়াতউল্লাহ বাংকারে রমণী নিয়ে এসেছিলেন (১১ ও ১২ ডিসেম্বর) এরকম আরো অনেক কথা আছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের কথা মাত্র উল্লেখ করলাম।

৩৬ ডিভিশনের প্রাক্তন জিওসি মে. জে. মো. জামসেদের বিরুদ্ধেও তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনা হয়েছে। আবার, এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে ঐ তহবিল অডিটের আওতার মধ্যে পড়ে না। একই অভিযোগ ছিল মে. জে. ফরমান আলীর বিরুদ্ধে। কিন্তু, তাকে এই অভিযোগ থেকে খালাস দেয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার জেহানজেব আরবাবসহ ৩৬ ডিভিশনের বেশ কিছু অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে লুট ও ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ১,৩৫,০০,০০০ রুপি চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে।

কমিশনে বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন তা নতুন একটি বিষয়। এম. ভি. নকভী আমাকে বলেছিলেন, এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর অবধি পূর্ব পাকিস্তান থেকে

সৈন্যরা মনি অর্ডারে বাড়তি [বেতনের বেশি] টাকা পাঠিয়েছে। এই টাকাটা তো এসেছে লুটপাট থেকে। ধরা যাক, একজন সৈন্য তার বেতন অনুসারে প্রতিমসে পরিবারকে একশো টাকা পাঠাত। এপ্রিল থেকে দেখা গেল সে দুশো বা তিনশো টাকা পাঠাচ্ছে, পরিবার পরিজনরাও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন টাকাটা কীভাবে আসছে। লুটের খবর ওদের দফতরও জানত। হয়তো, ভাগ-বাটোয়ারার অংশ তারাও পেত। বা তাদের মনে হয়েছিল 'বিজিত দেশ'-এ লুট জায়েজ। ১৫ এপ্রিল (১৯৭১) নিয়াজী এক মেমোতে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা ধর্ষণ, লুট ও হত্যায় ব্যস্ত। এবং তাঁর ভাষায়–

"It is not uncommon in history when a battle has been lost because troops were over indulgent in loot and rape."

সুতরাং, কয়েকজন জেনারেল মাত্র নয়, সেনাবাহিনীর প্রায় সব সদস্য কোনো না কোনোভাবে লুটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ অধ্যায়ের উপসংহারে কমিশনের বক্তব্য সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসাধুতা ও নৈতিক স্খলনের বিরুদ্ধে তদন্ত করার ইচ্ছে কমিশনের নেই। পাকিস্তানের মুসলিম সেনাবাহিনীর নৈতিকতা, ঐতিহ্য ইত্যাদি রক্ষা করতে হলে তাদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। এখানে লক্ষণীয় 'মুসলিম' শব্দটি। কারণ, ভারতীয়রা হিন্দু, বাঙালিরাও হিন্দু, তাদের সেনাবাহিনী বা মুক্তি ফৌজও হিন্দু। পাকিস্তানিরা তো এদের থেকে আলাদা, মুসলমান। হামুদুর রহমান কোথাও এই প্রশ্ন রাখেননি, মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিনা কারণে মুসলমানদের হত্যা ও মুসলমান রমণীদের ধর্ষণ করতে পারে কি না?

কমিশন উপসংহারে মন্তব্য করেছিল ".... extensive and prolonged involvement of the Pakistan Army in Martial Law duties and civil administration had a disastrous effect on its professional and moral standards." [পৃ. ৫০২]

কমিশন সুনির্দিষ্টভাবে বলেছে, ইয়াহিয়া খান ও জান্তা কখনই ক্ষমতা ভাগ করতে চায়নি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরুর যে কথাবার্তা বলা হয়েছে তা ছিল ভাওতাবাজি এবং শেখ মুজিবকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসেই।

কমিশন ঢাকায় যে হামলা চালানো হয়েছে এবং নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়েছে তা স্বীকার করেছে তবে বলেছে, ঢাকা এ বিষয়ে যা বলছে তা অতিরঞ্জিত। আসলে, তাদের ভাষ্য হচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের দুষ্কর্মের কারণে সেনাবাহিনী উত্তেজিত ছিল তাই কিছু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু বিশ্ব সমবেদনা লাভের জন্য তা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। মিথ্যা বলা হয়েছে। তবে এটাও ঠিক

সেনাবাহিনীর এসব করা উচিত হয়নি। কারণ তারা তো পাকিস্তানের ভেতরই কাজ করছিল। তবুও কমিশন মনে করে যারা এসব করেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। এখানে মূল ভাষ্য উদ্ধৃতি করছি–

"...The versions and estimates put forward by the Dacca authorities are highly coloured and exaggerated. Some of the incidents alleged by there authorities did not take place at all and on others a fanciful interpretations has been deliberately placed for the purpose of maligning the Pakistan Army and gaining world sympathy. We have also found that strong provocation was offered to the Army owing to the misdeeds of the militants of the Awami League." [পৃ. ৫১৪]

উল্লেখ্য গণহত্যার ব্যাপারেও কমিশনের মতামত একই রকম। তারা ৩০,০০০ বেশি মানুষ মরেছে বলে বিশ্বাস করতে চায় না। ধর্ষণ কিছু হয়েছে বটে তবে, তাদের মতে, যা দাবি করা হয় তা নয়।

১৯৭১ সালের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দোষী করা হয়েছে ইয়াহিয়া ও তার চক্রকে [তারা তখন ক্ষমতাচ্যুত], ভূট্টোরও কিছু দোষ আছে [ভূট্টো তখন ক্ষমতায়], তবে, মুজিব বা আওয়ামী লীগ এতটা বাড়াবাড়ি না করলে হয়তো এসব ঘটনা ঘটত না। অবশ্য এও স্বীকার করা হয়েছে, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মুজিবকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ছিল। কিন্তু এই শেষ মন্তব্যটি মনে মনে স্বীকার করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ তা স্বীকার করতে চায় না। এমনকী বেনজীর ভূট্টোর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তিনিও নন।

কমিশনের প্রধান ও সদস্যরা বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু তাদের উপসংহার পড়ে মনে হবে, পাকিস্তানের বিচারকদের মনও জেনারেলদের মতো।

৭৯

একটি বিশেষ সময়ে জুলফিকার আলী ভূট্টো নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হামুদুর রহমান কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশনের যারা সদস্য ছিলেন স্বাধীনচেতা হিসেবে তাদের কোনো খ্যাতি ছিল না। থাকলে ভূট্টো তাদের কমিশনের সদস্য করতেন না। কমিশন তাই ভূট্টোর কথা মনে রেখে রিপোর্ট তৈরি করতে চেয়েছে। তারা ভালোভাবেই জানতেন যে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কী করেছে। সুতরাং সব কিছু অস্বীকার করলে রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে। তাই তারা কিছু ঘটনা, কিছু হত্যাকাণ্ড, কিছু ধর্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি পটভূমিকা তৈরি করে লুণ্ঠন,

হত্যা ও ধর্ষণের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ এটি না হলে ওটি হতো না। ফলে রিপোর্ট নির্যাস হলো আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতকারী, অনুপ্রবেশকারীদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের ফলেই পাকিস্তানিদের কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ রিপোর্ট পক্ষপাতমূলক, আংশিক সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বানোয়াট। আমরা এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করি।

এ রিপোর্ট যে পক্ষপাতমূলক তা বোঝা যায় ১৯৭১ সালের ঘটনার জন্য ইয়াহিয়া খান ও কিছু সামরিক অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু, নাটের গুরু জুলফিকার আলী ভূট্টো সম্পর্কে কমিশন নীরব। অথচ পাকিস্তানের এলিট ও সাধারণ মানুষরা দোষী করেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভূট্টোকেও। সামরিক অফিসারদের মধ্যেও ভূট্টো যাদের পছন্দ করতেন তাদের দোষী করা হয়নি। যেমন, টিক্কা খান ও ফরমান আলী।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তানে কেন রিপোর্টটি নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে? তার প্রধান কারণ, সেনাবাহিনী।

পাকিস্তানিরা সব সময় সেনাবাহিনীকে ভজনা করেছে। পঞ্চাশের দশক থেকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একটি ইমেজ গড়ে তোলা হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। শাসকরা সব সময় সামরিক বাহিনীর শৌর্য-বীর্যের একটি মিথ গড়ে তুলতে চেয়েছে। তারাই ইতিহাসের স্রষ্টা এ কথা সব সময় তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭১ সালে এ মিথ ভেঙে যায়। পাকিস্তানিরা মানসিকভাবে তা মেনে নিতে পারেনি। এ রিপোর্টেও সামান্য হলেও পাকিস্তানি বাহিনী সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তাও সাধারণের মানতে কষ্ট হচ্ছে। মানসিকভাবে তারা বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে গণহত্যার কারণে তারা যে যাতনা বিদ্ধ হচ্ছে তা নয়। তাদের মনে হচ্ছে, কয়েকজন সামরিক অফিসারের কারণেই পাকিস্তানের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সে জন্য তারা গুটিকয় সামরিক অফিসারের বিচার চাচ্ছে।

অনেক রাজনীতিবিদও এখন সেই সব সামরিক কর্মকর্তাদের বিচার চান। উল্লেখ্য, তারাও বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি এড়িয়ে যান। তারা এখন বিচার চান এ কারণে যে, তাতে সামরিক বাহিনীকে হেনস্থা করা যেতে পারে। তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কারণ, যারা এখন হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হোক চান, ক্ষমতায় থাকতে তারা তা প্রকাশ

করেননি।

অন্যদিকে, পাকিস্তানে আরেকটি ধারা আছে, সংখ্যাগলঘিষ্ঠদের ধারা, যারা ১৯৭১ ও তারপরও বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার চেয়েছে এবং এখনো চাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা চান, পাকিস্তান তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থন করুক। তারা আন্তরিক। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। আমরাও তাই চাই। ১৯৭২ থেকেই আমরা সে দাবি করে আসছি।

আলমদার রাজা বলেছেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো এত বড় বিপর্যয় থেকেও আমরা কোনো শিক্ষা নেইনি। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছি যারা এর জন্য দায়ী তাদের রক্ষা করতে। পুরো সামরিক সম্মানে ইয়াহিয়া খানকে দাফন করা হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫ জন, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে তাদের শাস্তি দেয়া হয়নি।"

আলমদার রাজা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন করেছেন হামুদুর রহমান কমিশন প্রকাশের জন্য যাতে যারা দায়ী তাদের শাস্তি দেয়া যায়। আরজির ৫২ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন যারা বড় ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের শাস্তি না দেয়াতে পাকিস্তান এখন বিশ্বের কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। এবং এর ফল কী হয়েছে, "The internal effect of this has been such that the extra judicial and custodial killing have become a part of national tradition." শেষোক্ত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান নির্বাহী সাংবাদিক আই. এ. রেহমান লাহোরে আমাকে বলেছিলেন, পাকিস্তান যা করেছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। বাঙালিদের জানমালের আক্রমণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। যুদ্ধের নীতির মধ্যে তা পড়ে না। যদি অল্প কয়েকজন মানুষও নিহত হয়ে থকে বিনা কারণে, যদি একজন নারীও ধর্ষিতা হয়ে থাকে, হত্যা করা হয়ে থাকে কয়েকজন শিশুকে (যার কোনো কারণ নেই) তাহলেও পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তিনি খুব সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে যা মূল ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করছি–

"If we sincerely believe that in 1971 a great tragedy befell us, then a catharsis of the same order in necessary for the restoration of our mental health and our perception of justice and equity. So long as we believe, and continue to teach our children, that we were not responsible for killing our own innocent people in Bengal, we will never be able to understand what actually happened."

এ প্রসঙ্গে নিজেদের কথাও কিছু বলতে হয়। আমরা পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ, অত্যাচারের কথা কতটা মনে রেখেছি? জাতি হিসেবে আমরা কী যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, বিচার চাই তাদের? যদি চাই তাহলে তা হয় না কেন? অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও উল্লেখ করি, ১৯৭০ সালে নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগের মশিউর রহমানকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল। হত্যার আগে "ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাক হানাদার বাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে নীতিচ্যুত করার জন্য নানান ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে আগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখানো থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। অত্যাচারে যখন তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল তখনো তাঁর মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমেনি, সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, 'আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারব না।"

"সত্যিই তিনি তা পারেননি। হানাদার বাহিনী যখন তাঁর বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ ঠোঁট দুটো একটুও কাঁপেনি। প্রতিদিনে একে একে হানাদার পশুরা যখন তাঁর দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনো একটু কেঁপে ওঠেনি তাঁর দৃঢ়ভাবে বন্ধ ঠোঁট দুটো।"

তারপরও কি আমাদের বারবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলতে হবে? হানাদার বাহিনীর সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে বসবাস করতে হবে? সমন্বয়ের রাজনীতিকে স্বাগত জানাতে হবে? মানুষ হলে তা সম্ভব? যদি আপনার পিতা বা ভ্রাতার ওপর এ ধরনের অত্যাচার চালানো হতো তাহলে কি যুদ্ধাপরাধ মেনে নির্বিকার থাকতেন নাকি আমাদের মতো সোচ্চার হতেন?

পাকিস্তানিরা কি কখনো এসব অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছে বা গণহত্যার কথা? না, কখনোই নয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ তা স্বীকার করেন, কিন্তু সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনোই নয়। এ প্রসঙ্গে এসে যায় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের কথা।

১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের নীতি নির্ধারণে আইএসআইয়ের ভূমিকা ছিল প্রবল। বাংলাদেশে পরাজিত হওয়ার পর 'হৃতগৌরব' পুনরুদ্ধারের জন্য আইএসআই পাকিস্তানকে নিয়ে যায় আফগানিস্তানে। সেখানে জড়িয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের পরিস্থিতি কী হয়েছে তা পাকিস্তানে গেলেই বোঝা যায়। এখন আবার কাশ্মির নিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে উপমহাদেশে।

অন্য কথায় বলা যায়, উপমহাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আইএসআই বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কারণ, তাহলে পাকিস্তানে সামরিক জান্তার (নাকি জন্তু) স্বার্থরক্ষা করা যায়, যথার্থতা প্রমাণিত করা যায়।

ইউরোপ, আমেরিকা কথায় কথায় মানবাধিকারের কথা বলে, সন্ত্রাসী সংস্থাকে দমনের কথা বলে। আইএসআই এখন একটি সন্ত্রাসী সংস্থা। বাংলাদেশেও এখন তারা বিভিন্ন ঘটনা সৃষ্টি করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ইউরোপ বা আমেরিকা আইএসআই দমনের কথা বলছে না কেন? উপমহাদেশের গণতন্ত্রমনা মানুষের একটি দাবি হওয়া উচিত, অচিরেই আইএসআই-কে বিলুপ্ত করতে হবে যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির গেস্টাপো বা এসএস সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল।

সবশেষে, পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী, কবি আহমদ সেলিমের প্রসঙ্গ নিয়ে শেষ করি। ১৯৭১ সালের ঘটনার প্রতিবাদ করায় ন্যাপকর্মী হিসেবে সে সময় তিনি জেল খেটেছেন। ইসলামাবাদে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখনো তিনি বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার ও পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনার দাবি করছেন। তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশের অনেকে পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনার দাবি ও যারা দোষী তাদের শাস্তি দাবি করেছেন। এটি যৌক্তিক। কিন্তু, যদি প্রশ্ন করি, বাংলাদেশে যারা কোলাবরেটর ও একই রকম দোষে দোষী এবং যুদ্ধাপরাধী তাদের বিষয়ে বাংলাদেশ কী করছে?"

এ প্রশ্ন সেখানে ও বিদেশে আমাকে অনেকে করেছেন। বলা বাহুল্য আমি তার উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু, আমি বা আমরা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। এবং সে প্রশ্নের উত্তর হওয়াটা অনেকাংশ নির্ভর করছে আমাদের সরকারের ওপর।

৮০

"এমন একদিন আসবে, যখন আমি বেঁচে থাকি বা না থাকি তখন পাকিস্তানের জনগণ অনুধাবন করবে কিভাবে এবং কে পাকিস্তান ভাঙল।" হামুদুর রহমান কমিশনের সামনে পেশকৃত লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

মূল রিপোর্টে ইয়াহিয়ার বক্তব্য আছে। লাহোর থেকে আবদুল বাসিত সম্পাদিত *দি ব্রেকিং অব পাকিস্তানে* ইয়াহিয়ার বক্তব্যটি ছাপা হয়েছিল। রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর, সঙ্গে ছিল ইয়াহিয়ার রিট আবেদনের কপি।

এটি অনেকের অজানা যে, ১৯৭৮ সালে ইয়াহিয়া লাহোর হাইকোর্টে একটি হেবিয়াস কার্পাস রিট করেছিলেন। এ অধ্যায়ে ইয়াহিয়ার বক্তব্য ও আর্জি দুটিই বিশ্লেষণ করব।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টোর নির্দেশে ইয়াহিয়াকে বন্দি করে বান্নিতে পাঠানো হয়। খারিয়ার সেনানিবাসের কাছে, বন বিভাগের এক ডাকবাংলোতে তাকে পাঠানো হয় ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর। বলা যেতে পারে নির্জন করাবাস ছিল এটি। এর মধ্যে হামুদুর রহমান কমিশন গঠন করা হয় এবং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় ২৪ জানুয়ারির (১৯৭২) মধ্যে বক্তব্য পেশ করতে। ইয়াহিয়া লিখেছেন, সম্পূর্ণ স্মৃতির ওপর নির্ভর করে তিনি এ বক্তব্য পেশ করেছেন, ফলে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তবে তার কিছু 'বন্ধু' জনসমক্ষে তাকে যেরকম মাতাল হিসেবে তুলে ধরেছেন, তিনি তা নন। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কেই তিনি তার বক্তব্য পেশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে, কমিশনের প্রধান পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি যিনি কলকাতার একজন বাঙালি। মন্তব্যটি তির্যক। কেননা, তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, কমিশন প্রধান বাঙালি এবং কমিশনের প্রধান বিষয়ও বাঙালি। সুতরাং, কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু বাঙালি হয়ে জন্মগ্রহণ করলেই যে কেউ কেউ বাঙালি হয় না তা আমাদের চেয়ে বেশি আর কে জানে।

ইয়াহিয়া জানিয়েছেন, তিনি ছিলেন পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান সুতরাং কমপক্ষে তার কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত। তা যদি না হয় তাহলে কমিশনের সামনে তাকে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করা উচিত প্রকাশ্যে। তাহলে মানুষ জানতে পারত আসল সত্যটি কী? ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ইয়াহিয়া ছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তিনি জানিয়েছেন, "পিছনে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি কী কী ভুল করেছি। অনেক সময় অযথা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক সময় দেরি করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বীকার করি, কিছু ব্যক্তি পাকিস্তান বিনষ্টের যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি।"

ইয়াহিয়া লিখেছেন, ক্ষমতা গ্রহণের পর তার একটিই উদ্দেশ্য ছিল তা হলো সাধারণ নির্বাচন দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যারাকে ফিরে যাওয়া। সে কারণে, যে সব রাজনীতিবিদ ষড়যন্ত্র করছিল পাকিস্তান এবং তার বিরুদ্ধে তাদের সহ্য করেছেন। তার ভাষায়,

"This is why I tolerated political leaders who were hatching all types of conspiracies throughout my tenure in office... against me and even against Pakistan."

কিন্তু ধৈর্য সহকারে সব সহ্য করেছেন তিনি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য। পাকিস্তানের মানুষ একদিন বুঝবে, পাকিস্তান কারা ভাঙল। অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন, "পাকিস্তান ভাঙার জন্য এককভাবে কাউকে দায়ী করা যাবে না। অনেকে একসঙ্গে পাকিস্তান ভাঙার জন্য কাজ করেছে। তাদের সবার মুখোশ উন্মোচিত হবে। তারা সবই নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য পাকিস্তানের ঐক্যের বিপক্ষে কাজ করেছে। আমার বিশ্বাস আমি তাদের একজন নই।"

তার কারণে ভারত জিতেছে এটি স্বীকার করতে ইয়াহিয়া নারাজ। পাকিস্তানের একটি "গ্র্যান্ড স্ট্যাটেজি" ছিল এবং তাতে কোনো ভুল ছিল না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুহূর্তে দুপক্ষের যে অবস্থা ছিল তাতে একজন হাবিলদারও ভারতীয়দের জন্য জয় ছিনিয়ে আনতে পারত। পাকিস্তান পরাজিত হয়েছিল কারণ, যে অবস্থায় সেনাবাহিনী পড়েছিল তাতে কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে জেতা সম্ভব ছিল না। এরপর তিনি সত্য কথাটি বলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানকে ডিফেন্ড করে আমি বা কেউ কেউ জনসমক্ষে যা বলেছি তা ভুলে যান। প্রথম দিন থেকেই আমি জানতাম। পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধের ফল কী হবে।"

তাঁর ভাষায় "Forget about the public speeches I and others have made to defend East Pakistan. I knew the result of the India-Pakistan war on the Eastern from day one. To be frank, I knew it even before the first shot in the regular war was fired."

কেন পরাজিত হতো পাকিস্তান? তার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তার ভাষা ব্যবহার লক্ষণীয়। তার ভাষায়, সাময়িক পাগলামীর কারণে পূর্ব পাকিস্তনের মানুষ পাকিস্তান আদর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিল যেখান থেকে পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত মেনে নিতে তারা রাজি ছিল। তিনি আরো লিখেছেন, "আমি পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কথা বলছি না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আপনারাই তদন্ত করে দেখুন, কেন মরিয়া হয়ে বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিল।"

এরপর ইয়াহিয়া ১৯৬৯ থেকে তার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

৮১

১৯৬৯ সালে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনে আইয়ুব খান হতাশ হয়ে পড়লেন। এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এলেন। এ সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন,

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ সামরিক কর্তা সে সব বক্তব্যই দিয়েছেন। এতে নতুনত্ব নেই। ইয়াহিয়া বলেছেন, সবচেয়ে সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে তাকেই ক্ষমতা নিতে হয়েছিল, তিনি ক্ষমতা চাননি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন বেসামরিক কর্তৃত্বই সবার ওপারে। ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর একটাই এজেন্ডা ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর।

এরপর ইয়াহিয়া যা বলেছেন তার সঙ্গে তার আগের মন্তব্য খাপ খায় না। তিনি বলেছেন, খুব কাছে থেকেই আইয়ুব খানের সরকার পরিচালনা তিনি দেখেছেন এবং যা দেখেছেন তা তার ভালো লাগেনি। সুতরাং, ক্ষমতা নিতে তার খারাপ লাগেনি কারণ তার বিশ্বাস আর কোনো জেনারেল তার থেকে বেশি গণতন্ত্রমনা নন।

ইয়াহিয়ার ভাষায়–

"I openly admit that I welcomed the chance to take away power from Ayub. I knew that if any army commander would restore civil rule it would be myself. I took power because I trusted myself. I did not knew any army general more 'democratic' than myself"

এরপর তিনি রাজনীতিবিদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা পাকিস্তানের ব্যাপারে যতটা প্রযোজ্য বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ততটা প্রযোজ্য নয়। হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের আসল ট্র্যাজেডি হলো, রাজনীতিবিদরা সবসময় প্ররোচিত করেছেন সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা নিয়ে যতদিন খুশি শাসন চালাতে। জেনারেলদের পিছে থেকে কাজ করার ইচ্ছা তাদের প্রবল।

ইয়াহিয়া মনে করেন, তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। আর এই ঘোষণার ফলে, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার বিশ্বাসঘাতক চিন্তা যারা লালন করছিল তারা এক হয়ে যায়। লিখেছেন তিনি, "আমার বিশ্বাস এই বিশ্বাসঘাতকরা না থাকলে পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকত।"

অনেকে লিখেছেন এবং পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরাও বলেছেন যে, সামরিক জান্তা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ইয়াহিয়া বলেছেন, কথাটা ঠিক নয়। নির্বাচনের ফলাফল যে এরকম হবে তা তারা জানতেন। কিন্তু, পাকিস্তানের দুই অংশ দুই প্রান্তে। আঞ্চলিকভাবে "immature" দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দুজন 'charismatic individuals' এবং এর মধ্যেই নিহিত ছিল বিচ্ছিন্নতার বীজ। পূর্ব পাকিস্তান

থেকে প্রধানমন্ত্রী, দেশ থাকবে না–পাকিস্তানে এ ধরনের কথাবার্তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া মনস্থির করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান থেকেই হবে। তবে, এ ধরনের পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের ওপর যথেষ্ট অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। ইয়াহিয়া লিখেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের আস্থা আমি অনেক অর্জন করেছিলাম। কিন্তু, এই আস্থা নষ্ট করার জন্য শক্তিশালী চক্র সবসময় সচেষ্ট ছিল। অন্তিমে এই সন্দেহই জয়ী হয়। অযৌক্তিক ফোবিয়া কারও পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। সবশেষে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ হয়ে যায় অযৌক্তিক, পাঞ্জাব এবং সামরিক বাহিনীবিরোধী।" ইয়াহিয়া সব কিছু মেনে নিতে চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীর বিরোধিতা ছাড়া। তিনি সব বিষয়ে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন এমনকি বাঙালি সেনাপ্রধান নিযুক্তিতেও। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থাকবে না এটি মানতে রাজি ছিলেন না। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। জেনারেলরা যতই গণতন্ত্রের কথা বলুন না কেন সেটি কথার কথা। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব সবখানে থাকুক এটা তারা চান। এই কর্তৃত্ব না থাকলে তারা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। কিন্তু, এখানে একটি বিষয় অস্পষ্ট। তা হলো, ইয়াহিয়া হঠাৎ সেনাবাহিনী প্রসঙ্গটি কেন আনলেন? এ বিষয়ে কি কারও সঙ্গে তার দর কষাকষি হচ্ছিল? এসব বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। তবে, একটি সত্য এ প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন। সেটি হলো, সেদিন পাকিস্তানি সেনারা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা শুরু করেছিল, সেদিনই পাকিস্তান শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার ভাষায়,

"This is the time to submit that in my assessment the battle for Pakistan was lost when the army confronted the civilians on the street of East Pakistan."

৮২

গণতন্ত্র নিয়ে ইয়াহিয়া তার ভাষ্যে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু, এর মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা আছে অনেক। তাতে বোঝা যায়, গণতন্ত্র ততটুকুই তারা চেয়েছিলেন, যতটুকু তারা মনে করেন দেয়া যায়।

ইয়াহিয়া বলেছেন তিনি জানতেন, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে বাস করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠই দেশ শাসন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ রকম হলো কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ইয়াহিয়া দেননি। আমি পাকিস্তানের

অনেক নীতিনির্ধারকের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। কিন্তু, কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেননি। যদিও সবাই বলেছেন, গণতন্ত্রে তাঁরা বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসের ধরনটা হচ্ছে, পাকিস্তানিদের কখনো ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না এবং এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭০-পরবর্তী ঘটনাবলি পরিচালনা করা হয়েছিল। ইয়াহিয়ার ভাষ্যেও তার প্রমাণ আছে।

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া ঠিক করলেন পূর্ব পাকিস্তান সফর করবেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করবেন। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন মুজিব যাতে বুঝতে পারেন যে, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। নির্বাচন হয়েছে, এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে ইয়াহিয়া চলে যাবেন ব্যারাকে, এটাই তো হওয়ার কথা। শেখ মুজিবকে বোঝাবার কী ছিল? এখানেই ইয়াহিয়া মূল কথাটা বলে ফেলেছেন। "আমি জানতাম এর দরকার আছে", লিখেছেন ইয়াহিয়া "কারণ ভারতীয় এজেন্টরা তার মধ্যে সেনাবিরোধী ফোবিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছে।" তার ভাষায়, "I knew that there was a real need for this as Indian agents had implanted a phobia in his mind against the Pakistan Army."

ইয়াহিয়া, শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার কী ধারণা প্রেসিডেন্টের আসলে কোনো ক্ষমতা নেই? শেখ সাহেব ঠিকই উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যতদিন জেনারেলরা তাঁর সঙ্গে আছে ততদিনই তিনি ক্ষমতাধর। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি শেখ মুজিবের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর 'ট্রেন্ডস' সম্পর্কে তিনি কী জানেন? এবং ইয়াহিয়া বিস্মিত হলেন জেনে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে শেখ মুজিব যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

ইয়াহিয়া বলেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন শেখ মুজিবের আশপাশে যেসব পাকিস্তানবিরোধী আছে তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করে মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে। এটি যে মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যই তো শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁকে মানসিকভাবে ইয়াহিয়া কী প্রস্তুত করবেন?

ইয়াহিয়া বলছেন, তিনি শেখ মুজিবকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক করতে চেয়েছিলেন। ছেলেমানুষী প্রস্তাব বলে মুজিব তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তা যথাযথই ছিল। তখন ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেছিলেন এমন কোনো সেনা অফিসার যাকে তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর নাম দিয়ে ইয়াহিয়া তাঁকে সামরিক আইন প্রশাসনের কাঠামোয় স্থান দেবেন। মুজিব বললেন, তিনি পরামর্শ করে

জানাবেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, এই পরামর্শের কথা শুনেই তিনি বুঝে নিলেন প্রস্তাবটি মাঠে মারা গেছে এবং ঠিক তাই হলো। তিনি পরে জানালেন, সেনাবাহিনীর ৭৫% ছাঁটাই করে দিতে হবে। ইয়াহিয়া কি আর তা মানতে পারেন? তবে ইয়াহিয়ার মতে, তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন শেখ মুজিবের আস্থা অর্জনে এবং এক সময় তার মনে হয়েছে, মুজিব তাকে বিশ্বাসও করেছেন। কিন্তু, সেনাবাহিনীকে তিনি কখনো বিশ্বাস করেননি। এবং কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা এতে আরো ফাটল ধরিয়েছেন। তবে, ইয়াহিয়া তাঁদের নাম বলেননি।

এরপর ইয়াহিয়া কী করতে চেয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন। সেটি বড় কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো তার এই মন্তব্য যে, ভূট্টোকে তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি বলছেন ভূট্টো যখন বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে, কিন্তু তার একক ইচ্ছায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দিতে পারা যায় না, তখন ইয়াহিয়া মনে করেন, এটি "ভ্যালিড পয়েন্ট"। কিন্তু গণতন্ত্র মানলে, (যেখানে তিনি বলছেন, তার মতো গণতন্ত্রী জেনারেল ছিল না) ভূট্টোর দাবিকে "ভ্যালিড পয়েন্ট" বলা যায় না।

জানুয়ারি ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া এসেছিলেন ঢাকায়। শেখ মুজিবকে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ফেব্রুয়ারির (শেষ দিকে) আগে সংসদের অধিবেশন ডাকা যাবে না, তখনই তিনি কঠোর এবং বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি জানালেন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে অধিবেশন ডাকতে হবে। এবং এ ব্যাপারে তিনি কারও সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক নন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, "আমি বলব এটি আন্তরিক মনোভাব নয়, যদিও এর লজিক অস্বীকার করা যায় না।" তাঁর ভাষায়, "I must say that this was not a sincere stand although its logic could not be faulted". এই একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, শাসকরা কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন।

শেখ মুজিব যে ইয়াহিয়ার কথায় কান দিলেন না এটাই তাঁর দোষ হয়ে গেল! কারণ, এরপর ইয়াহিয়া সেই মান্ধাতা আমলের মন্তব্যগুলো করেছেন, যা শুধু অযৌক্তিক নয়, মিথ্যাও বটে।

তিনি লিখেছেন, তার কাছে যেসব খবরাখবর আসছিল তাতে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগে বামপন্থী ও চরমপন্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর সঙ্গে কাজ করছিল ভারতীয় প্রভাবিত এজেন্টরা। কারণ, তারা বাংলাদেশ তৈরির পটভূমিকা তৈরি করেছিল। এবং যত দিন যেতে লাগল ততই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তান ভাঙার

মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে সময়টিকে বিবেচনা করছে। শেখ মুজিবের বিভিন্ন বক্তৃতায়ও তা প্রতিভাত হয়ে উঠতে লাগল। "আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি" লিখেছেন ইয়াহিয়া "একটি সময় উঠে দাঁড়াতে হয় এবং লড়াই করতে হয়। আমি ঠিক করেছিলাম বেসামরিক বিদ্রোহ দমনে আমি সেনাবাহিনী ব্যবহার করব না। কিন্তু অবাধ্যতা যদি ব্যবহার করা হয় আলাদা দেশ গঠনে তাহলে তা দমন করার জন্য প্রয়োজন তা করব। যা পরিকল্পনা করেছিলাম তাই করেছি।" অর্থাৎ জানুয়ারিতেই ইয়াহিয়া ঠিক করে ফেলেছিলেন সেনাবাহিনী দ্বারা বিদ্রোহ দমন করবেন। সে সময় থেকে মার্চ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা ছিল লোক দেখানো। এ সময়টি ছিল পাকিস্তানের প্রস্তুতি গ্রহণের সময়।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি শেখ মুজিবকে বলেছিলেন ভূট্টোর সঙ্গে আলাপ না করে ছোট দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। এ কথায় মুজিব অবাক হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চাপে পড়ে ইয়াহিয়া এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি চাপে পড়ে একথা বলেননি। তাহলে কেন তিনি এ কথা বললেন তার বিশদ ব্যাখ্যা করেননি। তবে, মনে রাখা দরকার, এরই মধ্যে তিনি লারকানায় গিয়ে ভূট্টোর সেই বিখ্যাত শিকার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন, সেনাবাহিনী কখনো পূর্ব পাকিস্তানের কারও কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তিনি বার বার বলেছেন, ইয়াহিয়ার ভাষায়, "Yahya my friend but not Pak Army." ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সামনে তিনটি বিকল্প পথের কথা তুলে ধরেছিলেন।

এক. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র তৈরি করতে পারে কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদের জন্য কার্যকর হবে না।

দুই. পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ এগোতে পারে, কিন্তু ভূট্টোকে সঙ্গে না নিলে মুজিব কার্যকরভাবে শাসন করতে পারবেন না। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ করে পাঞ্জাবে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তিন. আওয়ামী লীগ পিপিপিকে নিয়ে একটি কোয়ালিশন গঠন করতে পারে।

ইয়াহিয়া বার বার শেখ মুজিবকে অনুরোধ করছিলেন ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে, এক পর্যায়ে মুজিব মুচকি হেসে বললেন, "ভূট্টোর সঙ্গে কি আমি একা কথা বলব না ভূট্টো ও তার সেনা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব?" ইয়াহিয়া লিখেছেন, মুজিব তাকে বুঝিয়ে দিলেন জেনারেলরা না থাকলে তিনি

ক্ষমতাহীন। লিখেছেন ইয়াহিয়া, "To be honest, I could not be too dogmatic about it either. I put up a brave fece but even I knew that Sheikh Mujib knew that it was only a brave face."

উল্লেখ্য, এ কথাটি আগে ইয়াহিয়া স্বীকার করতে চাননি। তিনি কয়েকবার মন্তব্য করেছেন, ক্ষমতা তারই হাতে। আরেকটি বিষয় এখানে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, ইয়াহিয়ার মাধ্যমে সেনা কর্মকর্তা ও ভূট্টো এ কথাই শেখ সাহেবকে বার বার বলতে চেয়েছেন যে, ভূট্টোকে ক্ষমতার অংশীদার না করলে তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর সামনে আর কী পথ খোলা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া?

৮৩

জানুয়ারির শেষ দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকে এবং এর জন্য দায়ী ছিল আওয়ামী লীগ কর্মীরা, জানাচ্ছেন ইয়াহিয়া খান। এ ধারণা শুধু তারই নয়, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানিদের। তারা আওয়ামী লীগকে সামগ্রিকভাবে জনগণ থেকে আলাদাভাবে বিচার করতে চায়। এ কথা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যেতে চায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমগ্র জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। ১৯৭১-এ যা ঘটেছে তা শুধু আওয়ামী লীগ কর্মীদের কারণেই নয়, জনগণের কারণে। এ পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান কিছু মিথ্যারও আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন লিখেছেন, বন্দুক দেখিয়ে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছিল। যারা আওয়ামী লীগার নয় তাদের পরিকল্পিতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছিল, তাদের সম্পদ লুট করা হচ্ছিল। সংক্ষেপে সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। হ্যাঁ, সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথা বিকল্প একটি রাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছিল, তার মানে এ নয় যে, বন্দুকের মুখে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছিল বা লুটপাট করা হচ্ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের বিষয় নিয়ে ইয়াহিয়া দুজন প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। গভর্নর আহসান কোনো রকম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্যদিকে ইয়াকুব আগ্রহী ছিলেন এসব 'বিশৃঙ্খলা' দমনে। ইয়াহিয়ার মনে হয়েছিল, জেনারেল ইয়াকুব খাঁটি একজন সামরিক আইন প্রশাসকের মতোই কথা বলেছিলেন এবং তা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু আসল সময়ে এই জেনারেল কাবু হয়ে গিয়েছিলেন, জানিয়েছেন ইয়াহিয়া। "I felt disgusted with him."

পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন যা আলোচনার প্রয়োজন নেই এবং এ বিবরণে আবারও অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিহারিদের নিয়ে আসা হয়েছে। যা হোক এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া একটি সত্য মন্তব্য করেছেন। তার মতে, ১৯৭১ সালের আগেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মন তারা হারিয়েছিলেন এবং "মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, দীর্ঘস্থায়ী সামরিক শাসনের কারণে আমরা পাকিস্তানিরা এই দাম দিয়েছি। পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনী জয় করেনি। তাদের সাহায্যে স্থানীয় জনগণই তা নিয়েছে..."।

তার ভাষায়– "East Pakistan was not conquered by the Indian Army. On the otherhand, it was taken over by the local population with their aid...the triumph of disgusted Pakistan over their own motherland."

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি যখন এ রকম, তখন ইয়াহিয়া বার বার শেখ মুজিবকে জানিয়েছিলেন যে, যেহেতু তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন সেহেতু তিনি যেন সংযম প্রদর্শন করেন। কিন্তু তার হঠাৎ মনে হলো, মুজিব যেন আর প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। "তিনি নিজেই নতুন একটি রাষ্ট্রের পিতা হতে চান। নিজেকে তিনি বিচার করেছেন তখন আব্রাহাম লিঙ্কন অথবা কায়েদে আজমের কাতারে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন ম্যাগালোম্যানিয়াক। এ ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য একা ছিলেন না। অনেকের মধ্যেই এই ধারা দেখা দিচ্ছিল।" এই অনেকের নাম অবশ্য ইয়াহিয়া উল্লেখ করেননি।

তারপর সেই বিখ্যাত লারকানা বৈঠকের উল্লেখ করব এবং পাঠককে বিশেষভাবে বিবরণটি পড়ার জন্য অনুরোধ করব। আমি নিচে তার হুবহু অনুবাদ করছি।

"ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে আমি পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে লারকানায় গেলাম জুলফিকার আলী ভূট্টোর সঙ্গে দেখা করতে। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবে তিনি অনুরোধ জানালেন, জাতীয় সংসদ বসার আগে এ ধরনের আলোচনার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন (reasonable time)। অন্তিমে, এ আলোচনা হয়েছিল যখন পিপিপি-র নেতারা ঢাকায় গিয়েছিলেন। বেশ কয়েক দফা আলোচনার পর পিপিপি নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে এলেন। আমাকে জানানো হলো, দুটি প্রধান দলের মধ্যে আরো আলোচনা প্রয়োজন। আমি নিশ্চিম হলাম যে, দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতার অবকাশ আছে।"

এখানে যে বিষয়টি ইয়াহিয়া তুলে ধরেছেন তা হলো ভূট্টো আলোচনায় প্রস্তুত ছিলেন এবং সামগ্রিক বিষয়ে তার কোনো ভূমিকা ছিল না। ফেব্রুয়ারি

থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে অধিবেশন আহ্বান করা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রেসিডেন্ট অধিবেশন আহ্বান করলেন। কিন্তু তখনই পিপিপি অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করল। তারা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে লাগল।

কেন তারা এমন করছিল সেটা জুলফিকার আলী ভূট্টোই কমিশনকে বলতে পারবেন। ইয়াহিয়ার এতে একটু খারাপ লেগেছিল। কারণ সৈনিক হিসেবে তিনি রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপারগুলি বুঝছিলেন না। তার ভাষায়, "Soldiers like myslelf sometime cannot see the finer points of political interaction. Frankly, I could not see it at all. May I say that I was dismayed with this attitude." দেখুন, ভাষা কত নমিত! পরিস্থিতি আরো সঙ্কটময় হয়ে উঠলে জেনারেল ইয়াকুবকে গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হলো। ইয়াহিয়া লিখেছিলেন, মার্চের ২, ৩ তারিখে তিনি ইয়াকুবকে লিখিতভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, যে কোনো মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে। সে সময় ভূট্টো ইয়াহিয়ার রুমে ছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভূট্টো কেন সে সময় ইয়াহিয়ার রুমে ছিলেন এবং ইয়াহিয়া তার সামনেইবা কেন ইয়াকুবকে নির্দেশ দিলেন? ইয়াহিয়া এর ব্যাখ্যা দেননি। তিনি লিখেছেন, "ভূট্টো উৎসাহের সঙ্গে আমাকে সমর্থন জানালেন, বললেন, জেনারেল আপনি পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন।" আমার নিজের অবশ্য তা মনে হচ্ছিল না, বুঝছিলাম পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে। জুলফিকার ভূট্টোকে বললাম, "মনে রাখবেন এর মূল্য হয়তো পাকিস্তান নিজেই। ভূট্টো এটা তো চিন্তার মধ্যে আনলেনই না বরং বখে যাওয়া ছেলের মতো ব্যবহার করলেন।"

জেনারেল ইয়াকুব এর মধ্যে পদত্যাগ করলেন। এ পদত্যাগে ইয়াহিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তিনি ইয়াকুবকে কাপুরুষই শুধু বলেননি, বিদেশী চর হিসেবও ইঙ্গিত করেছেন। আরো অনেক সেনা কর্মকর্তাও চলে আসতে চাচ্ছিলেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনিই শুধু তার স্থানে অটল ছিলেন এবং তারপর কেন তাকে এভাবে রাখা হয়েছে তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

৮৪

মার্চ মাসের যে বিবরণ ইয়াহিয়া দিয়েছেন তা পড়লে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, তিনি তো সব ঘটনা যথাযথভাবেই উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু এই উপস্থাপনায় মাঝে মধ্যে এমন সব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, অন্তিমে উপসংহারে

পৌঁছতে হয় যে, দোষটা তাহলে সেনাবাহিনীর নয়।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, মার্চের ১০ তারিখ তিনি ঢাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তার সঙ্গে বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২৫ তারিখ সংসদের অধিবেশন আহ্বানের মনস্থিরও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, সেনাবাহিনীর কেউ তাকে ঢাকা যেতে দিতে রাজি নয়। বরং তারা মুজিব থেকে তাকে দূরে রাখতে চায়। "This made no sense to me" লিখেছেন ইয়াহিয়া। মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান আসতে রাজি নন। স্বার্থান্বেষী মহল বলছিল, এই প্রত্যাখ্যান সেনাবাহিনীর মুখে চপেটাঘাত। ইয়াহিয়া এটা মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি মুজিব নন। তার ভাষায়–"After obtaining a massive vote of confidence from Pakistani Electorate, he stood transformed as the accredited representative of East Pakistan." লক্ষ্য করুন, বলা হচ্ছে পাকিস্তানের ভোটে জেতার পর তার মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু পাকিস্তানিদের ভোটেই নির্বাচিত হলে তিনি পাকিস্তানের স্বীকৃত প্রতিনিধি নয় কেন? এটিই মূল বিষয়। শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্ত ানিরা পাকিস্তানের নেতা হিসেবে মানতে রাজি ছিল না। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তো সারা দেশের নেতা। অঞ্চলবিশেষের নয়। গণতন্ত্রের এই মূলনীতি।

ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। ঢাকায় এসে দেখলেন যে, রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণে নেই। রাজধানীর জীবনযাত্রা স্থবির। তার মতে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অবাঙালি ও যারা আওয়ামী লীগের সমর্থক নয় তাদের প্রতিনিধি হত্যা করা রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ষণ, লুট, গণহত্যা হচ্ছিল আকছার। এবং "আমার চোখের সামনেই তা হচ্ছিল।" তার ভাষায়–"In rapid sequence, the state of affairs deteriorated to an extent where the killing of non-Bengalis and non-conformist became a routine affair. Arson, rape, loot and other genocidal atrocities became rampant. This took place right under my nose."

ইয়াহিয়া খান শুধু নয়, পাকিস্তানিরা প্রায় সবাই এই তত্ত্ব ব্যবহার করেন।

ইয়াহিয়া খান বলছেন, সেনাবাহিনীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা শুকনো খাবারের ওপর বেঁচে ছিল, তাদের নিয়ত গালিগালাজ করা হচ্ছিল (যেমন, ইয়াহিয়া কুত্তা)। সবচেয়ে জঘন্য ছিল ইংরেজি পত্রিকা 'দি পিপল' যা শেখ মুজিব স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করতেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসব প্ররোচনার মুখেও চরম ধৈর্য ধরেছিল। "আমি তাদের ব্যবহারে গর্বিত এবং এ জন্য আমি

তাদের সালাম জানাই।"

ইয়াহিয়া লিখেছেন, "একটা সময় আসবে যখন আওয়ামী লীগ বুঝবে তারা বাঘের লেজ মোচড়াচ্ছিল কেননা তারা [সেনাবাহিনী] বেসামরিক লোকদের প্রতি পোষা মার্জারের মতো আচরণ করছিল। শুধু দেশাত্মবোধের কারণেই সেনাবাহিনী এ ধরনের ব্যবহার করছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ টিকবে না। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। আমি তার ব্যক্তিগত সাক্ষী।"

পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে গণহত্যা করেনি এটি বোঝাবার জন্যই ইয়াহিয়া খানের এই ভনিতা। শুধু তাই নয়, কৌশলে তিনি বরং উল্লেখ করেছেন, আওয়ামী লীগাররা ২৫ মার্চের আগে থেকেই গণহত্যা চালাচ্ছিল।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, সময় নষ্ট না করে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন, পুরানো ধাঁচে বাঙালিরা আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না। তিনি চারটি দাবি জানালেন। এর একটি হলো, জাতীয় সংসদের দুটি অধিবেশন আহ্বান, একটি বাঙালিদের আরেকটি পশ্চিম পাকিস্তানিদের। এটি ছিল কনফেডারেশনের একটি প্রেসক্রিপশন। ইয়াহিয়া এটা মানতে রাজি ছিলেন না।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইয়াহিয়া মুজিবের বাকি তিনটি দাবির ব্যাপারে চুপ। তিনি শুধু একটি দাবি তুলে ধরেছেন। কিন্তু নিশ্চয় এটি ছিল চরম এবং শেষ বিকল্প। এখানে ইয়াহিয়া ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শেখ মুজিব প্রথম থেকেই চরম সব দাবি করছিলেন যা মেনে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এ পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের ডেকে পাঠালেন। যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন, ভূট্টো, ওয়ালী খান, দৌলতানা, মুফতি মাহমুদ, খান কাইয়ুম, সরদার শওকত হায়াত, বিজাঞ্জো এবং আরো কয়েকজন। ইয়াহিয়া তাঁদের সব জানিয়ে বললেন, মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে। তাঁরা কথা বললেন এবং ফিরে এসে জানালেন, মুজিবের দাবি মান্য তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কী করণীয় সে সম্পর্কে তারা কিছু জানালেন না। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, "আমাকেই" এসব ভাবনা ভাবতে হবে। একমাত্র জুলফিকার আলী ভূট্টো জানালেন, শক্তি প্রয়োগ করতে, এতে যতজনই মারা যাক না কেন বা সমগ্র বিশ্ব যাই ভাবুক না কেন? তার ভাষায়–

".....Advised me to restore the authority of the administration by massive use of armed forces regardless of the number of civilian casualities or the world reaction to such moves."

ভূট্টো আরো জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানকে এভাবে ভাঙতে দেয়া যায় না। "আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি যেভাবে বলছেন সেভাবে বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ব্যবহার করা যায় কি না? কেন নয়? এটা কী প্রকাশ্য বিদ্রোহ নয়? " বললেন তিনি। আমি বললাম, এটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিদ্রোহ। এটির সঙ্গে যুঝবে রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনী নয়। তিনি সরাসরি আমাকে বললেন, বিদ্রোহ দমনের জন্য তখনই তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। আমি বললাম, ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তো একমাত্র মুজিবকেই করতে হবে। বুঝলাম, জুলফিকার আলী ভূট্টো আমার এই–"Obdurate pro-Mujib attitude."-এ হতাশ হলেন।

ইয়াহিয়া খান লিখেছেন, ভূট্টোর এই পরামর্শ শুনলে তখনই পাকিস্তান ভেঙে যেত। তিনি ভূট্টোর এই প্রস্তাব নিয়ে অন্য নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা একবাক্যে ভূট্টোর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অনেকে এও বললেন, যে, নির্বাচনের ফলাফল যতদিন 'ভ্যালিড' থাকবে ফেডারেশনেও ততদিন পূর্ব প্যাকিস্তান থাকবে। সবাই একবাক্যে বললেন, ভূট্টোকে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের একক নেতা হিসেবে মানতে রাজি নন। "আমি জানতাম", লিখেছেন ইয়াহিয়া, "এসব আলোচনা ভূট্টোর ভালো লাগছিল না। অবশ্য, তিনি জানতেন, আমি তাকে পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করলেও শেখ মুজিবের সঙ্গে সমমর্যাদায় ফেলতে রাজি ছিলাম না এবং এখন পর্যন্ত আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার কোনো কারণ নেই।"

৮৫

ইয়াহিয়া এর পর সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। যারা তখন ঢাকায় ছিলেন তারা হলেন : জেনারেল হামিদ, টিক্কা, পীরজাদা, উমর, মিঠা, ফরমান, খাদিম রাজা এবং আরো কয়েকজন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা হলো, পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হতে তারা দেবেন না। শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া এ বার্তা পাঠালেন যে, জাতীয় সংসদের মাধ্যমে তিনি যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন, সেনাবাহিনী তা-ই মেনে নেবে। শেখ মুজিব জানালেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ হবে সেনাবাহিনীর বাজেট হ্রাস করা। এমনভাবে হ্রাস করা যাতে সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, সেনাবাহিনী সিভিল কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার শপথ নিয়ে যদি তিনি তা করতে চান অবশ্যই করবেন।

এই যে বিবরণ এর মধ্যে সত্যতা কতটুকু? যেখানে আলোচনা চলছে জাতীয় সংসদের সেখানে বলা নেই কওয়া নেই শেখ মুজিব বলবেন, প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর প্রথম কাজ হবে সেনাবাহিনীকে সাইজ করা! এটি অবিশ্বাস্য। ইয়াহিয়া তার বিবরণের শুরুতেও মুজিবের এ ধরনের দুয়েকটি সংলাপ দিয়েছেন। প্রথম থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর যে ছবিটি আঁকতে চেয়েছেন তা হলো অনমনীয় এবং সেনাবিদ্বেষী এক ব্যক্তিত্ব। সেনাবাহিনী কেন গণহত্যা চালাল এ বিষয়টির কারণ হিসেবেই এ যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে যে, সেনাবাহিনীকে অপমান করা হচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল তা ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এ সময় ইয়াহিয়া খবর পেলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং কোনো রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সে সিদ্ধান্ত বদল করা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে সেনা কমান্ডারের একটি অংশ চাপ দিতে থাকে ভূট্টোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের। কিন্তু ইয়াহিয়া তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আওয়ামী লীগের "defiant attitude" থেকে "আমি ঠিক করলাম সামরিক বিকল্পই ব্যবহার করব।" লিখেছেন ইয়াহিয়া, "২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে পাকিস্ত ানি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলাম বেসামরিক প্রশাসনে সহায়তা করতে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে।" লক্ষ্য করুন 'সশস্ত্র' শব্দটি। ২৬ মার্চের আগে সশস্ত্র বিদ্রোহ হলো কোথায়? ইয়াহিয়া আরো লিখেছেন, "আমি নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলাম 'মিনিমাম ফোর্স' ব্যবহার করতে। শেখ মুজিবসহ সমস্ত বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করতে এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাকে যেন শারীরিক কোনো ক্ষতি না করা হয় এবং সম্মানজনক ব্যবহার করা হয় তারও কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলাম। বন্দি অবস্থায়ও শেখ মুজিবের প্রতি প্রধানমন্ত্রী (নির্বাচিত) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একতরফাভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য এটি ছিল পুরস্কার। "তখন থেকে" লিখেছেন ইয়াহিয়া, "পাকিস্তানের ভাগ্য হয়ে গেল জুয়াখেলার মতো। অন্তিমে এই জুয়ায় লাভ হয়নি। আমি সেই ঝুঁকি নিয়েছিলাম এবং সে জন্য শাস্তি পেতেও প্রস্তুত। ইতিহাসই এর বিচার করবে।"

ইয়াহিয়া লিখেছেন, অনেকে বলেন, সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা আগে থেকেই করা ছিল এবং "আমি তা কার্যকর বা তত্ত্বাবধান করতে এসেছিলাম। This is nonsense. পূর্ব পরিকল্পনা হলে কোনো নেতা পালাতে পারতেন না।" ইয়াহিয়া তারপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী পাঠাতে থাকেন এবং এ জন্য তিনি বেশ গর্বিত। লিখেছেন তিনি, "This historic airlift was a remarkable feat a military planning and execution." তার মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ধরনের সরবরাহের নজির কোথাও নেই। পাকিস্তানি

সেনাবাহিনী এ জন্য গর্বিত হতে পারে।

ইয়াহিয়া বলেছেন, এরপর ভারতীয় প্রচারণা নতুন মোড় নিল। তারা বলল, বাস্তুত্যাগীদের চাপের কারণে তাদের সামরিক হস্তক্ষেপ করতে হবে। ইয়াহিয়া স্বীকার করেছেন, অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায় ভারত চলে গেছে। ইংরেজিতে বাক্যটি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

"A large nimber of Hindus had, indeed voluntarily migrated to India."

এর অর্থ স্বেচ্ছায় ভারতে বসবাসের জন্য তারা গেছে যা আদৌ সত্য নয়। তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগও সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য অনেককে প্রেরণ করেছে। কিন্তু পশ্চিমী মনে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা চালিয়েছে। এটি মোটেও সত্য নয়। তার ভাষায়, "This was far from truth." পাকিরা যদি বার বারও বলে গণহত্যা হয়নি, তা হলেও এর জবাব দেয়ার কিছু নেই। যেহেতু শাসকরা সেখানে স্বৈরাচারী সেহেতু তাদের ধারণা গোয়েবলসের মতো একই মিথ্যা বার বার বললে মানুষ তা সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবার নয়। 'গণহত্যা হয়নি'– এ কথা বার বার বলা সত্ত্বেও কেউ তা বিশ্বাস করেনি। এমনকি অনেক পাকিস্তানিও এখন প্রকাশ্যে গণহত্যার কথা বলছেন।

ইয়াহিয়া বলছেন, প্রচার যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে গেছে। এবং পৃথিবীকে ভারত মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিল যে কারণে, পূর্ব পাকিস্তান ভারত 'দখল' করে নিলেও কেউ কিছু বলেনি। নগ্ন আগ্রাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক হস্তক্ষেপ।

ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ভেবেছেন। তার উপসংহার হলো, বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তান দেরি করে ফেলেছে। তার ভাষায়–"Pakistan woke up too late to take punitive action against its many traitors with suitable cudgels." দেশপ্রেমিক জনগণকে সংগঠিত করা উচিত ছিল এর বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা তার কিছুই করেননি। ফলে অবস্থাটা গৃহযুদ্ধের মতো জটিল হয়ে পড়ত, ঔপনিবেশিক মুক্তির আন্দোলনের চেহারা নিত না। ইয়াহিয়া এ ক্ষেত্রে সত্য কথাটি বলেছেন। পাকিস্তানিরা সব সময় ১৯৭১-এর যুদ্ধকে বলে গৃহযুদ্ধ। ইয়াহিয়া স্বীকার করেছেন যে, এটি ছিল 'কলোনিয়াল ওয়ার'। এর অর্থ পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান শোষিত হচ্ছিল এবং শোষণ থেকে বাঁচার জন্য তারা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিল। তার এই বাক্যেই মুক্তিযুদ্ধ যৌক্তিকতা পেয়ে যায়।

পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের তিনি এই একবার দোষী করেছেন। তারপর

আবার পুরানো গৎ-এ ফিরে গেছেন। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ভারতীয় সমর্থনে আওয়ামী লীগ একটি গণআন্দোলন তৈরি করতে পেরেছিল। একা আওয়ামী লীগের পক্ষে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করা সম্ভব হতো না। এটা সম্ভব হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ দল ও ব্যক্তিসমূহ না বুঝে ভারতের এই ফাঁদে পা দিয়েছিল। স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের জন্য পাকিস্তান ভেঙে গেছে যাদের মুখোশ এখনো উন্মোচিত হয়নি। আর দোষটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে "আমার মতো মানুষের ওপর।" ইয়াহিয়া হতাশ এখানেই। তিনি কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, কমিশন খুঁজে দেখুক কে দোষী। হয়তো তাদের বেশি দূর খোঁজাখুজি করতেও হবে না। কারণ, অনেক বিষয়কে চাপা দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং এ কারণে ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে বিচার দাবি করেছেন। তার ভাষায়–"I have an uneasy feeling that attempts are being made to push things under the rug where I do not belong. The commission must ask the question : is it right to push the commander under the rug? Should I not be brought out and put on public trial instead?"

এরপর ইয়াহিয়া অনেক পাতা ব্যয় করেছেন এ কথা বোঝাতে যে, পাকিস্তানের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল চমৎকর। ভারতীয়রা স্থল ক্ষেত্রে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি যা এই আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। জবানবন্দি শেষে স্বাক্ষর করেছেন এভাবে– ইয়াহিয়া খান, বেআইনীভাবে আটক একজন জেনারেল।

৮৬

হামুদুর রহমান কমিশনে জবানবন্দি দেবার সাড়ে ছয় বছর পর ইয়াহিয়া খান লাহোর হাইকোর্টে রিট করেন। তিনি তখনো অন্তরীণ। ১৯৭৮ সালে রিট করা হয়। রিটে তিনি যে এফিডেভিট করেছিলেন তাতে আবার নিজ প্রসঙ্গ ছাড়াও ১৯৭১ সাল ফিরে এসেছে। কারণ, ১৯৭১-এর কারণেই তাকে অন্তরীণ করা হয়েছে।

ইয়াহিয়া আরজিতে জানিয়েছিলেন যে, তিনি একজন পেশাদার সৈনিক, যিনি মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ব্রিগেডিয়ার পদ লাভ করেছিলেন। এত কম বয়সে আগে কেউ ব্রিগেডিয়ার হননি। আগাগোড়াই তিনি সৈনিক এবং সৈনিক থাকতে চেয়েছেন, যে কারণে ক্ষমতার বিষয়টি নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করেননি। এবং সৈনিক ছাড়া তিনি কিছু হতে চাননি। তার ভাষায়–"One reason power did

not go to may head is that I do not have Bonapartist tendencies. I am a professional soldier of the conservative vintage. My horizon is limited by the army. I am a solider to the marrow of my bones. I have never pretended to be anything else. I am nothing if not a soldier."

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইয়াহিয়া তার প্রধান কৃতিত্বগুলো বর্ণনা করেছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় এসেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন তিনি ও তার পরামর্শকরা।

১. পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে পারে একমাত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং সেই সেনাবাহিনী ঠিক রাখা যাবে যদি তাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িত করা না হয় এবং সে কারণে যত শিগগির সম্ভব নির্বাচন দিয়ে সেনাবাহিনীকে আক্ষরিক অর্থে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
২. বিদেশী কোনো শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে পাকিস্তানের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল। সে কারণে, যে দুটি শক্তিকে তারা পছন্দ করেছিলেন তা হচ্ছে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র।

এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে তিনি যে কাজ করেছেন সেটিকে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হিসেবে মনে করেন। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে কিসিঞ্জার, নিক্সনের বেশ কটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন যেখানে তারা তার প্রশংসা করেছেন।

তার দ্বিতীয় কৃতিত্ব করাচি স্টিল মিল স্থাপন, যেটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন এ 'ইউনিক সোভিয়েট গিফট' হিসেবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে জুলফিকার আলী ভূট্টোর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের বিবরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি লিখেছেন, ভূট্টোর একটি অভ্যাস ছিল আর্মি জেনারেলদের পার্টিতে যাওয়া। এ রকম একটি পার্টিতে আইয়ুব খান তার সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের পরিচয় করিয়ে দেন। ভূট্টোর ঘনিষ্ঠ জেনারেল গুল হাসান ইয়াহিয়াকে বলেছেন, ভূট্টো প্রায়ই অনাহূতভাবে তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং ডিনার না খেয়ে যেতেন না। জেনারেলরা ভূট্টোর এ দুর্বলতার কথা জানতেন এবং তা নিয়ে হাসিঠাট্টাও করতেন। ভূট্টো জেনারেলদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য তাঁর স্ত্রীকে ব্যবহার করতেন। ভূট্টো আসলে তুলে ধরতে চাইতেন যে, জেনারেলদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠতা তার শক্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। বা অনেকে তাই মনে করত। যা হোক ইয়াহিয়াকে উৎখাত করায় জন্য ভূট্টো সমর্থ হয়েছিলেন কয়েকজন জেনারেলকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করার। যে মুহূর্তে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সে মুহূর্তে ভূট্টো

তাতে বাধা দিয়েছেন। এবং এভাবে তিনি পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করেছেন। ভূট্টো অনেক সময় ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি বিষয়টি জানতেন, কিন্তু কিছু করেননি। ইয়াহিয়াকে কামুক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। মদ্যপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ইয়াহিয়া বলেছেন, অন্যকে পাথর ছুড়ে মারা তার কাজ নয়। কিন্তু ভূট্টোর নিজেরই 'ড্রাগ প্রব্লেম' ছিল। তার নৈতিক স্খলনের বিষয়ে ইয়াহিয়া কোনো অপপ্রচার চালাননি। অন্যদিকে ভূট্টো একজন ভদ্রলোক ও একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ সামরিক অফিসার হিসেবে ইয়াহিয়ার ইমেজ ধূলিস্মাৎ করতে চেয়েছেন। ইয়াহিয়া বলেছেন, "আমি সন্ত নই।। আমি পাপী। আমার ব্যক্তিগত চরিত্রে নানা দোষত্রুটি আছে। আমার পাপের জন্য সবসময় আল্লার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি। কিন্তু সন্ধ্যার পরও আমি এমন মাতাল থাকতাম যে সরকারি কাজকর্ম করতে পারতাম না– এ ধরনের ইমেজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল আমার বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চালানো। গর্ব করছি না, কিন্তু আমি বলতে পারি কোনোরকম পানীয় স্পর্শ না করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি দৈনিক ষোলো ঘণ্টা কাজ করেছি। সত্য কথা বললে, ভূট্টো এ ধরনের দাবি নিজের জন্য করতে পারবেন না।"

এরপর ইয়াহিয়া গুজরাটের আকলিম আখতার বা জেনারেল রাণীর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনেও জেনারেল রাণীর কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহিয়া বলেছেন, বিভিন্ন বারাঙ্গনা ও জেনারেল রাণীকে নিয়ে তার নামে রসালো সব গল্প ছড়ানো হয়েছে। অন্য কাহিনীগুলো সত্য হোক না হোক জেনারেল রাণী সম্পর্কিত সব কাহিনী মিথ্যা। ভূট্টোই ধর্ম-মা হিসেবে ইয়াহিয়ার সঙ্গে রাণীর পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছেন, "দালালের ভূমিকায় ভূট্টো ছাড়া আমার কোনো অধস্তনের কাজ করার সাহস ছিল না।" তার ভাষায়–"All wish to say is that with the possible exception of Bhutto, none of my associates or subordinates have even dared to assume the role of a pimp for me."

ইয়াহিয়া বলেছেন, নিজের পরিবারের প্রতি ভূট্টো খানিকটা মানবিক হওয়া দরকার। তিনি তার স্ত্রী সন্তানদের অবহেলা করেন। প্রথম স্ত্রীকে গ্রামে ফেলে রেখেছেন। দ্বিতীয় জনের প্রতি এত নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন যে, মহিলা স্নায়ুপীড়িত হয়ে উঠেছেন। তার মার প্রতিও তিনি খারাপ আচরণ করেছেন। কৌশল এবং অভ্যাস হিসেবে ভূট্টো সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে স্ক্যান্ডাল ছড়ান, যা কোনো ভদ্র সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, এ সব জানা সত্ত্বেও ভূট্টোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা

নেননি। কারণ "It is not the army tradition to hit below the belt."

ইয়াহিয়া লিখেছেন, ভূট্টো খুব জটিল মানুষ এবং ছোটোলোকেমী করতে তার বাধে না। লিয়াকত খান, কায়েদ-এর মাজার বা ইন্দাজ হাইওয়েতে তিনি তার নামফলক বসাতে চেয়েছেন। "অনেকে বলেন, আমি ভূট্টোর প্রতি পক্ষপাত করেছি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্নে, কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, যে ব্যক্তিটি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে আমার মধ্যে কোনো ইতস্ততাবোধ ছিল না। ভূট্টোর সঙ্গে গোপন আঁতাত করে শেখ মুজিবকে ক্ষমতার বাইরে রাখার চিন্তা আমি কখনো করিনি। আমি কখনো জুলফিকার ভূট্টোকে পছন্দ করিনি। আরো স্পষ্ট করে বলতে হয়, আমি তাকে অপছন্দ করতাম। ভূট্টো যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়ে রেখেছেন। দুজনের মধ্যে আমাকে একজন বেছে নিতে বলা হলে, কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে 'ম্যান ফ্রাইডে' হিসেবে আমি শেখ মুজিবকেই চাইতাম। স্বর্গেও আমি ভূট্টোকে প্রতিবেশী হিসেবে চাইতাম না– এমনকি নরকেও যেখানে আমাদের দুজনেরই যাবার সম্ভাবনা বেশি।"

এরপর ইয়াহিয়া উল্লেখ করেছেন কিভাবে ভূট্টো তার পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার নাম ব্যবহার করতে লাগলেন। তার মতে, মুজিবের সঙ্গে তার সম্পর্কের যে অবনতি তার কারণ ভূট্টো। লিখেছেন তিনি, ভূট্টো যদি একটু কম স্বার্থপর এবং একটু বেশি দেশপ্রেমিক হতেন তাহলে মুজিবের সঙ্গে তার সম্পর্কের ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতেন না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবের অনীহা সৃষ্টির একটা বড় কারণ ভূট্টো।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম, "জুলফিকার ভূট্টো অ্যান্ড মাইসেলফ : দি অফিসিয়াল ইন্টারঅ্যাকশন।"

ইয়াহিয়া লিখেছেন, যথানিয়মেই তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন। এবং কোনো বিকল্প না দেখে আইয়ুব খান তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন।

তিনি সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন ক্ষমতা হাতে নিলেন তখন ভূট্টোই তার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রথম সাক্ষাতকারেই ভূট্টো বলেছিলেন, তিনি ইয়াহিয়ার 'রাজনৈতিক হাত' হতে চান। অনির্দিষ্টকালের জন্য ইয়াহিয়া সেনাপ্রধান থাকবেন এবং জনগণের ব্যাপারটা দেখবেন ভূট্টো এবং এভাবে রোমক আমলের মতো তারা দুজন যুগ্ম সম্রাট হয়ে পঁচিশ বছর শাসন করবেন।

ইয়াহিয়া লিখেছিলেন, তার ওসব পরিকল্পনা বা চিন্তা তাকে হতবাক করে

দিয়েছিল এবং তিনি তাকে একটি চড় লাগাতে চেয়েছিলেন। ভূট্টো নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইতেন এবং বলতেন আইয়ুব খানকে তিনিই ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। এটি মিথ্যা। সেনাবাহিনী বরং আইয়ুবকে জানিয়েছিল, অবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সবাই জানে, পাকিস্তানিরা, 'তামাশা'র ভক্ত এবং ভূট্টো ছিলেন একজন 'তামাশাঅলা'।

আইয়ুব ইয়াহিয়ার কাছে যা চেয়েছিলেন তা হলো, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তার প্রতি যেন বৈরী আচরণ না করা হয়। তিনি অনেক টাকা করেছিলেন এবং তা ভোগ করতে চেয়েছিলেন। অনেক দিন ক্ষমতায় থাকার পর মানসিকভাবেও তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভূট্টোর কারণে তিনি ক্ষমতা ছাড়েননি। ভূট্টোকে ইয়াহিয়া উল্লেখ করেছেন আত্মগর্বে মদমত্ত এক ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে। তার ভাষায়–"Zulfiqar Bhutto was an unprincipled ego-centric who could go to any length to acquire power and use power." ভূট্টোর প্রতি সহনশীলতা দেখানোটাই তার ভুল হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন এবং আরো স্বীকার করেছেন, পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তারাই যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য দায়ী–"As the commander-in-chief, I am ashamed to admit that the real causes for the defeat of the Pakistan Army are to be found at the level of the formation commanders, both before and during the war."

এরপরও ভূট্টো সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরেছেন ইয়াহিয়া। লিখেছেন, ভূট্টো হচ্ছে বৃশ্চিক। যার হাত থেকে খাবার খাবে তাকেই কামড়াতে তিনি দ্বিধা করবেন না। একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ভূট্টো তখন তার মন্ত্রী, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই ইয়াহিয়াকে জানালেন যে, ভূট্টো তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন চীন সফরের জন্য। কিন্তু তারা তাকে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্টের অনুরোধ ছাড়া এ ধরনের সফর সম্ভব নয়। ইয়াহিয়া ভূট্টোর অনুরোধ রেখেছিলেন। কিন্তু স্বীকার করেছেন, এটি তার ভুল হয়েছিল কারণ ভূট্টো চীনাদের 'রং সিগন্যাল' দিয়েছিলেন। 'রং সিগন্যাল'টি হলো ভূট্টো তাদের বুঝিয়েছিলেন তিনি যে রকম জনপ্রিয় তাতে ক্ষমতা তারই করায়ত্ত হবে। এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সঙ্গে রাখা পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ নয়।

এ প্রসঙ্গে ইয়াহিয়া বলতে চেয়েছেন, পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরা নিজ স্বার্থে কী ধরনের কাজ করে। মাওলানা ভাসানীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে। লিখেছেন তিনি, ভাসানীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তো এই ভাসানী তাকে একবার নব্বই দফা দাবিনামা পেশ করেন। তিনি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নব্বই দফার কী হবে?" উত্তরে ভাসানী বললেন,

"আপনি একজন প্রশাসক এবং আমি একজন আন্দোলনকারী। ব্যবসায় থাকার জন্য আমাকে দাবিনামা পেশ করতে হবে। আপনি যা ভালো মনে করণে তা-ই করবেন। আর মানুষ আমার কাছে যা আশা করে আমি তাই করব।"

এরপর তিনি আবারও সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, "গণহত্যার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীকে দায়ী করা হয়। এটি সত্য নয়। আমি যখন কর্ণধার তখন পাকিস্তান ভেঙে গেছে। তবে এ কারণে আমার থেকেও বেশি দায়ী জুলফিকার ভূট্টো।"

এবোটাবাদে যখন ইয়াহিয়া বন্দি তখন ইয়াহিয়ার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা মারফত ভূট্টো একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। বার্তাটি ছিল, ওয়ালি খানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হচ্ছে। ইয়াহিয়া খান যদি ওয়ালি খানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেন তবে মুক্তি পাবেন। ইয়াহিয়া রাজি হননি। ভূট্টো এতে চটে গিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন জেলেই তাকে কাটাতে হবে এবং সেখানেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ইয়াহিয়া লিখেছেন, আসলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য ভূট্টোকেই তো কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত।

এরপর ইয়াহিয়া নিজের প্রকাশ্য বিচার দাবি করেছেন। তিনি পাকিস্তানকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাকে আটক রাখা হয়েছে। এই ছুরি মেরেছেন ভূট্টো, যিনি বিশ্বাস করেন শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। কিন্তু কেন তাকে এখনো বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে? ইয়াহিয়ার মতে, তাকে বাঁচিয়ে না রাখলে সেনাবাহিনীতে প্রতিক্রিয়া হবে। তার ভাষায়—"I wonder why he permitted me to live. I think he was afraid of the Army reaction to my death in custody."

৮৭

শেখ মুজিবের ওপরও একটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন ইয়াহিয়া। এ অধ্যায়টির নাম 'শেখ মুজিব : ওয়াজ হি এ ভিকটিম অব মাস হিস্টিরিয়া অর দি ইমপ্লানটেড আর্মি ফোবিয়া?'

এ অধ্যায়টিও তিনি শুরু করেছেন ভূট্টোকে দিয়ে। তার মতে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে, তারা এ রকম রাজনীতিবিদ পেয়েছে। কি রকম রাজনীতিবিদ? যেমন ভূট্টো– নীতিহীন, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী এক ব্যক্তি যিনি বাঙালিকে ঘৃণা করতেন কারণ বাঙালিরা তাঁর গুণে মুগ্ধ ছিল না। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না জেনে এ ব্যক্তিটি পাকিস্তান ভাঙার জন্য দুবার চিন্তা করেনি।

আরেকজন 'ক্যারিসমেটিক' ব্যক্তিত্ব হলেন শেখ মুজিব। একজন ছাত্র নেতা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের দিগন্তে তিনি উদয় হন। ভূট্টো তাকে ফয়সালাবাদ জেল থেকে মুক্ত করে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা পালন করতে পারেন। ভূট্টো চেয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। এবং এমনভাবে খেলার পরিকল্পনা ছকে ছিলেন যাতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের আর কোনো উপায় না থাকে। তাতে যদি রক্তপাত হয় তাতেও ভূট্টোর কিছু যায় আসে না।

ইয়াহিয়ার মতে, ভূট্টো-মুজিবের যে দ্বন্দ্ব তা অনেকটা লোক দেখানো। তাদের দুজনের লক্ষ্য ছিল এক। তা হলো, পাকিস্তানকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া। ভূট্টো চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করতে। আর শেখ মুজিব চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে, যাতে তিনি বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা পালন করতে পারেন। দুজনই যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছিলেন। তাঁদের লাভ হলো পাকিস্তানের ক্ষতি। ভূট্টো আবার গালভরা একটি উপাধি নিয়েছিলেন– কায়েদে আওয়াম। এ নামটি তার কানে মধু বর্ষণ করত। ইতিহাসে তিনি তার নাম খোদাই করতে চেয়েছেন এবং পাকিস্তানের বিনিময়ে তা করেছেনও।

এরপর শেখ মুজিবের মূল্যায়ন করেছেন ইয়াহিয়া। এই মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে বেশি। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এমনসব মন্তব্য করেছেন যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। তার মতে মুজিব হচ্ছেন, 'an immature person who thrives on publicity and mass hysteria.' ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর উত্থান, কিন্তু ছাত্রনেতার সেই ভাবটি তিনি ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। তিনি একজন 'এজিটেটর'। চিন্তা বা বিশ্লেষণ করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি পারেন অঙ্গভঙ্গি করতে এবং চিৎকার করতে এবং তা তিনি ভূট্টোর থেকে ভালো করতে পারেন। তিনি দুঃখিত, কিন্তু তার মনে হয়েছে "Mujib is a born liar." একই সঙ্গে তিনি লোভী এবং ঘুষ দিয়ে তাঁকে বশ করা যায়। সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে তিনি কথা রাখেন না। তাঁর ওপর নির্ভর করা যায় না। ইয়াহিয়ার মতে, মুজিবের ধারণা, তিনি চালাক এবং মানুষকে তিনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আসলে তিনি বোকা এবং তাঁকে ব্যবহার করা যায়। ইয়াহিয়ার মতে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং ভূট্টো মুজিবকে ব্যবহার করেছেন এবং মুজিব বুঝে উঠতে পারেননি কে তাঁকে ব্যবহার করছে।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, শেখ মুজিব যখন ফয়সালাবাদে বন্দি তখন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের কর্নেল কাইয়ুমকে পাঠানো হয়।

তাঁদের কথোপকথন টেপবন্দি করা হয়েছে এবং ভূট্টো যদি তা নষ্ট না করে থাকেন তবে পাকিস্তানের সামরিক আর্কাইভসে টেপটি থাকার কথা। পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটছে তা তাঁকে জানতে দেয়া হয়নি। তিনি ভীত ছিলেন এ ভেবে যে, সেনাবাহিনী তাঁকে হত্যা করবে। তাঁর প্রকোষ্ঠের বাইরে যখন মাটি খোঁড়া হচ্ছে তখন তা দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কর্নেল কাইয়ুমকে বিশ্বাস করে তিনি অনেক কথা বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, আগরতলায় ভারতীয় কিছু প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল। এরা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি অধীনে থেকে কাজ করেছিলেন এবং শেখ মুজিবকে অনেক টাকা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ধারণা সতর্কভাবে তাঁর মাথায় ঢোকানো হয়েছিল। এক কথায়, বাংলাদেশ স্থাপনের জন্য ভারতীয়রা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে রাজি ছিল। কর্নেল কাইয়ুমের কাছে নাকি মুজিব স্বীকার করেছেন, তিনি যে বিপুল পরিমাণে অর্থ পেয়েছিলেন ভারতীয়দের কাছ থেকে তার অনেকটা তিনি সরিয়েছেন। ভারতীয়রা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, সেনাবাহিনী কখনো তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এবং এটি ইয়াহিয়া বিশ্বাস করেন। কারণ, তাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে মুজিব সব সময় সন্দেহ প্রকাশ করে বলতেন যে, সেনাবাহিনী কখনো তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হবে না। এবং তাঁকে সোজাসুজি বলেছিলেন যে, ভূট্টো তাঁকে বলেছেন, নিজেদের বাঁচাবার একমাত্র পথ এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা। সেই সময় থেকে ইয়াহিয়ার মনে হয়েছে, ভূট্টো পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে তৎপর যাতে তিনি তার 'বাঙালি ভাইদের' ছাড়া শাসন করতে পারেন। পাকিস্তানের এরকম সব নেতা থাকতে পাকিস্তানের শত্রুর দরকার নেই। এবং ইয়াহিয়ার মনে হয়েছে, তা সত্ত্বেও পাকিস্তান এতদিন টিকল কিভাবে? তার ভাষায়– "Of course, if Pakistan had such leaders. it did not need any enemies to break it. The wonder is how it survived so long."

৮৮

পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী কে? এ প্রশ্নের উত্তরও দেয়ার চেষ্টা করেছেন ইয়াহিয়া। তিনি জানাচ্ছেন, ভূট্টো তার দলীয় সংসদ সদস্যদের ঢাকায় না যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের সঙ্গেও শলাপরামর্শ করছিলেন। ইয়াহিয়া এসব খবর পেয়ে ভূট্টোকে ডেকে পাঠান এবং তার অসন্তুষ্টির কথা জানান। জবাবে ভূট্টো বলেন, "জেনারেল

সাব, আমরা রাজনীতির মানুষ। আমরা এসব বলি সাধারণ মানুষের জন্য।" ইয়াহিয়া তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তার এসব উক্তি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। ভূট্টো চুপ করে রইলেন। ইয়াহিয়া তাকে বললেন, তার মনে হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের আশা ভূট্টো ছেড়ে দিয়েছে এবং তিনি চান পশ্চিম পাকিস্তানের কারও কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। ভূট্টো তখন তাকে সোজাসাপ্টাভাবে জানালেন, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের দিন ফুরিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, ইয়াহিয়াকে তিনি জানালেন, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে দমন করতে। শুধু তাই নয়, গোটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে হত্যা করার পরামর্শও দিলেন। আরো বললেন, গোটা পাকিস্তান রক্ষার জন্য ১০ লাখের মতো বাঙালি মারা যেতে পারে এবং এ জন্য ইয়াহিয়ার প্রস্তুত থাকা উচিত। ইয়াহিয়া লিখেছেন–" He suggested to me to round off and then kill the entire leadership of the Awami League in cold blood. In his opinion, the cost of integrity of Pakistan may be the lives of millions of Bengalis and that I should prepare for this."

ইয়াহিয়া জানাচ্ছেন, ভূট্টো বাঙালিদের বলতেন 'emotional foes' এবং 'misguided people.' ইয়াহিয়া খান তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করতে মানা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "Bhutto's contempt for Bengali people was truly morbid." ইয়াহিয়া খান তাকে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান গিয়ে দেশপ্রেমিক লোকদের সংগঠন করতে। ভূট্টো বিদ্রূপ করে জওয়াব দিয়েছিলেন, এ সবের জন্য ওয়ালী খান উপযুক্ত।

সুতরাং ইয়াহিয়া মনে করেন পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী জুলফিকার আলী ভূট্টোর ক্ষমতায় যাওয়ার লোভ। তিনিই এক দেশে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল ও দুই প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। এবং এটি ছিল বিচ্ছিন্নতার রসদ। ভূট্টোর হুমকি দেয়া বক্তৃতা 'ইধার হাম, উধার তুম'-এর বিপরীত শেখ মুজিব ১২ ডিসেম্বর (১৯৭০) করাচিতে এক বক্তৃতায় পাকিস্তানের সংহতির কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে ভূট্টোর চেয়ে মুজিব ছিলেন ঢের বেশি দেশপ্রেমিক।

সপ্তম অধ্যায়েও ইয়াহিয়া ভূট্টোর কথা বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "I found Mujib ready to co-operate in saving Pakistan from disintegration" ঢাকায় বৈঠকের সময়ও ভূট্টো ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করেছেন। ইয়াহিয়া বলেছেন, ভূট্টো ঢাকায় এসেছিলেন কফিনের শেষ পেরেকটি ঠুকে দিতে। তার ভাষায়, "Bhutto had come to Dacca to drive the last nail in coffin of a united Pakistan. He was openly talking of seceding West Pakistan from East Pakistan. What a topsy-turvy man!"

৮৯

শেখ মুজিবকে জীবিত অথবা মৃত নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছিলেন টিক্কা খান। করাচি এসে এ সংবাদ শুনে ইয়াহিয়া খান নতুন নির্দেশ দিলেন। তা হলো শেখ মুজিবের গায়ে হাত তোলা যাবে না! অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভূট্টো আর্মি অ্যাকশনে খুব খুশি হয়েছিলেন, মুজিবের গ্রেফতারে আরো বেশি। শুধু তাই নয়, ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেকোনোভাবে হোক শেখ মুজিবকে হত্যা করতে। ভূট্টোর এ ধরনের চিন্তাভাবনায় "লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসত" লিখেছেন ইয়াহিয়া। এবং অপছন্দের কাউকে হত্যার ব্যাপারে ভূট্টোর কল্পনা ছিল মর্বিড। ইয়াহিয়া বলছেন, ভূট্টো যেভাবে বলছেন সেভাবে কেউ যদি তাঁর হত্যার পরিকল্পনা করত তাহলে তা জেনে তাঁর কেমন লাগত? ইয়াহিয়ার মতে, এসব মানুষ আসল রাজনীতিবিদ নন। এগুলো হচ্ছে ফ্যাসিস্ট চিন্তাভাবনা। তার ভাষায়, "I wonder how Zulfiquar Bhutto would feel if some one someday planned his death as he had been planning for the death of his own enemies. In my humble view, the person who keeps thihking of 'bumping off' people is not a real politician. This is fascist thinking. I abhor it."

ভূট্টোর ষড়যন্ত্র সেখানেই শেষ হয়নি। ইয়াহিয়া জানতে পারলেন, জেনারেল গুল হাসান এবং এয়ার মার্শাল রহিমের সঙ্গে ভূট্টো ষড়যন্ত্র করেছেন ক্ষমতা দখলের। একদিন ভূট্টো এসে তাকে বললেন, 'জেনারেল, আজ হোক কাল হোক, আমাকে ক্ষমতা দিতে হবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বন্ধুর মতো আগে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ভালো হয় না?" শুধু তাই নয়; বারংবার তিনি ইয়াহিয়াকে বলছিলেন শেখ মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং সেনাবাহিনীর উচিত তাঁকে খতম করে দেয়া। এবং বার বারই ইয়াহিয়া জানিয়েছেন, মুজিব বিশ্বাসঘাতক হলেও পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের প্রতিনিধি। ভূট্টো বললেন আশ্চর্য হয়ে, "আপনি একজন বিশ্বাসঘাতককে ছেড়ে দেবেন!" ইয়াহিয়া বললেন, "কেন নয়। আমি যদি একজন ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে বসে খেতে পারি তা হলে আমি একজন বিশ্বাসঘাতককে স্যালুটও করতে পারি যে ক্ষেত্রে তাঁর পিছে আছে জনসমর্থন।" ইয়াহিয়ার ভাষায়—'So far as I remember, my precise words were 'why not? If I can sup with a conspirator, I can also salute a traitor, particularly when he has the popular mandate!'

ইয়াহিয়া একথা বলেছিলেন কী না জানা যাবে না। তবে, লিখেছেন, তার কথা শুনে ভূট্টো থমকে গেলেন। এক পেগ হুইস্কি চাইলেন। তাকে তা দেয়া

হলো। এক চুমুকে তা শেষ করে জানতে চাইলেন, ইয়াহিয়া কী জানেন? ইয়াহিয়া যা জানেন তা বললেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, ভূট্টো ভাবছিলেন তাকে গ্রেফতার করা হবে। না, তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। ইয়াহিয়া শুধু তাকে বলেছিলেন জেনারেলদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি না করতে।

ইয়াহিয়া আরজিতে গণহত্যার প্রসঙ্গ আবারো এনেছেন। এবং দ্ব্যর্থকণ্ঠে জানাচ্ছেন, আর্মি গণহত্যা করেনি। তবে, আরজির সংক্ষিপ্তসারে তিনি জানিয়েছেন, গণহত্যার দোষে যদি কাউকে দোষী করতে হয় তাহলে করতে হবে জেনারেল টিক্কা খান ও ভূট্টোকে। ভূট্টোর প্রতি টিক্কার দরদ ছিল। ইয়াহিয়া লিখেছেন, টিক্কা খানকে গভর্নর না করে তার উপায় ছিল না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে তার নিযুক্তরা ব্যর্থ হচ্ছিল। তখন সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থীরা টিক্কার নাম প্রস্তাব করে। এবং ইয়াহিয়া মনে করেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী একটি ফাটল সৃষ্টির জন্য টিক্কা এসব কাজ করেছিল।

সংক্ষেপে এই হলো পাকিস্তান ভাঙার ইতিহাস এবং এই বিচ্ছিন্নকরণে ভূট্টো ও শেখ মুজিবের সমঝোতা ছিল। দুজনই সমানভাবে দোষী। তবে, জুলফিকার ভূট্টো শেখ মুজিব থেকে বেশি দায়ী।

ইয়াহিয়ার দুটি প্রতিবেদনের মূল সুর একই, পার্থক্য আছে ডিটেলে। তার মূল বক্তব্য, তিনি ছিলেন একজন সামরিক একনায়ক। এ শব্দটি অকপটেই তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৯৬৯ সালে ক্ষমতা তাকে নিতে হয়েছিল। ক্ষমতা তিনি দখল করেননি। নির্বাচন দিয়ে তিনি ব্যারাকে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতিবিদদের কারণেই সমস্ত ঝামেলা লেগে গেল। এই রাজনীতিবিদ হলেন দুজন– জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

এরা দুজনে কোনো সমঝোতায় আসতে চাননি। ফলে, পাকিস্তান বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এই হস্তক্ষেপের দরুণ কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভারত ১৯৪৭ সাল থেকেই মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিবকে তারা করায়ত্ত করে নিয়েছিল। অন্তিমে লড়াইয়ে পাকিস্তান হেরে গেল, যদিও তার একটি গ্র্যান্ড স্ট্রাটেজি ছিল।

পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী কে? দায়ী দুজন– শেখ মুজিব ও ভূট্টো।

এ দৃষ্টি নিছক একজন জেনারেল ইয়াহিয়ার নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরো পাকিস্তানের [আমার লেখা পরাজিত *পাকিস্তানি জেনারেল ও মুক্তিযুদ্ধ* এবং *সে সব পাকিস্তানি* গ্রন্থে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছি]। এবং এই মনোভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে হামুদুর রহমান কমিশনেও। কিন্তু ইয়াহিয়া, কমিশন বা পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কয়েকটি

বিষয়ের তারা সদুত্তর দিতে পারেনি। এই বিষয়গুলি ছিল মৌলিক। যেমন নির্দ্বিধায় সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা অর্পণ। এ নিয়ে তো আলোচনা হতে পারে না। এবং এ জন্য তো দায়ী ইয়াহিয়া এবং ভূট্টো। ভূট্টো কী করেছিলেন তা ইয়াহিয়া জেনেও তো কোনো ব্যবস্থা নেননি?

১৯৭২ সালে ইয়াহিয়া কমিশনের যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন তা অনেক নমিত। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পর তিনি বন্দি যা মানসিকভাবে তার পক্ষে মেনে নেয়া ছিল কষ্টকর। তার ওপর জুলফিকার আলী ভূট্টো ছিলেন ক্ষমতায়। সুতরাং, একটা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি এনে তিনি লেখার চেষ্টা করেছেন এবং অকপটে কিছু মন্তব্যও করেছেন। যেমন :

১. পাকিস্তান ভাঙার জন্য এককভাবে কেউ দায়ী নয়।
২. বাংলার মুসলমানরা কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিল তা ভেবে দেখা দরকার।
৩. পাকিস্তান বাহিনী যে অবস্থায় [অর্থাৎ জনসমর্থনহীন] লড়েছিল সে অবস্থায় জেতার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

কমিশনে প্রদত্ত বক্তব্যে ভূট্টোকে তিনি সরাসরি দোষারোপ করেননি। বরং ভূট্টোকে সমর্থনই করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ভূট্টো যখন বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে কিন্তু তার ইচ্ছায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দিতে পারা যায় না, তখন এটি ভ্যালিড পয়েন্ট হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।" এ যুক্তি অবশ্য সব পাকিস্তানিরই।

ইয়াহিয়া ভূট্টোর প্রতি নমিত থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, ভূট্টো তখন ক্ষমতায়। সেনাবাহিনী তার পক্ষে। কমিশনও তার পক্ষে। পাকিস্তানে কোনো বিচারক শাসকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেন না। সুতরাং তিনি এমন কিছু বলতে চাননি যাতে সমস্ত দায়দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। তার আশা ছিল হয়তো খানিকটা সময় পেলে ভূট্টো তার প্রতি নমিত ব্যবহার করবেন যেমনটি তিনি করেছিলেন ভূট্টোর প্রতি।

ভূট্টো ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনো নমনীয়তা দেখাননি। ভূট্টো ক্ষমতাচ্যুত হলে তিনি হাইকোর্টে রিট করেন। তার এক সময়ের অধস্তন জিয়াউল হক তখন ক্ষমতায়। ইয়াহিয়া আশা করেছিলেন এই রিটের মাধ্যমে তিনি মুক্তি পাবেন। এ কারণে, রিটের আরজিতে আমরা দেখছি অপেক্ষাকৃত আক্রমণাত্মক। এবং প্রতি ছত্রে ছত্রে ভূট্টোর প্রতি বিষোদগার। ভূট্টোর ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তাতে সত্যতা আছে। কারণ মার্কিন নথিপত্রেও এসবের ইঙ্গিত আছে। 'বিষোদগার' শব্দটি ব্যবহার করলাম এ কারণে যে, ১৯৭২ সালে

এসব কথা তিনি বলেননি। ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন, এই আক্রমণাত্মক ভঙ্গি হয়তো জিয়াউল হককে খুশি করবে এবং তার মুক্তি ত্বরান্বিত হবে। আরজিতে ইয়াহিয়া ভূট্টোর যে চরিত্রটি এঁকেছেন তাতে খুব একটা অতিরঞ্জন নেই। পাকিস্তানের অনেক নীতি নির্ধারকের সঙ্গে আলাপ করেছি। ভূট্টো সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনাও এ রকম। শেখ মুজিব সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন কিন্তু যেহেতু তাঁর কোনো চরিত্রগত ক্রটি উন্মোচন করা যায়নি; সেহেতু তাঁকে ভারতের ক্রীড়নক হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব বা বাঙালিত্বের পক্ষে যারাই কথা বলবে তারাই ভারতের ক্রীড়নক। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এ কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্তও বাংলাদেশের একদল বাঙালিও তা বলছেন। এবং এ ধরনের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন বাংলাদেশে পাকিস্তানের কাকুলে প্রশিক্ষিত সামরিক কর্মকর্তা ও স্বাধীনতাবিরোধীরা। সুতরাং পাকিদের এই অভিযোগ আর নতুনত্বই নেই। বাংলাদেশের পাকিস্তানিদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

পাকিস্তান ভাঙার জন্য, আরজিতে ইয়াহিয়া আগের মতোই ভূট্টো ও মুজিবকে দায়ী করেছেন। তবে, দায়টা ভূট্টোর ওপরই বেশি চাপিয়েছেন। পাকিস্তানিরা অবশ্য, পাকিস্তান ভাঙার জন্য এ দুজন ছাড়া ইয়াহিয়ার নামও যুক্ত করেন।

গণহত্যার কথা ইয়াহিয়া কোনো প্রতিবেদনে স্বীকার করেননি। আর্মির যে বড় ধরনের কোনো ক্রটি ছিল তাও তিনি অস্বীকার করেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনেও গণহত্যার কথা স্বীকার করা হয়নি। তবে, সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর মাত্র দোষারোপ করা হয়েছে, সমগ্র সেনাবাহিনী বা সেনামানসিকতার ওপর নয়। কারণ পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করে, ওপরে আল্লাহ আর নিচে মিলিটারি। এর বাইরে কোনো জগত নেই, শক্তিও নেই। ইয়াহিয়ার দুটি প্রতিবেদন একটি বিষয়ই আবার তুলে ধরে, একজন পাকিস্তানি, একজন পাকিস্তানিই। বাঙালিদের সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা আছে, যা কিছুতেই পরিবর্তনযোগ্য নয়। এবং পাকিস্তানও ভেঙে না গেলে এ পূর্ব ধারণার পরিবর্তন হবে না এবং উপমহাদেশে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও সম্ভব হবে না।

৯০

আমাদের কৈশোর ও যৌবনে গওহর আইয়ুব খান নামটি ছিল বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন মহাপ্রতাপান্বিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের জ্যেষ্ঠপুত্র। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, পিতার এডিসি ছিলেন, পরে ক্যাপ্টেন

হিসেবে পদত্যাগ করেন।

এর পরপরই তিনি ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন এবং সে কারণে আলোচিত হতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মুসলিম লীগের সাংসদ নির্বাচিত হন। ৬ বার তিনি পাকিস্তানিদের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন। ১৯৯০-৯৩ সালে ছিলেন স্পীকার। নওয়াজ শরীফ যখন প্রধানমন্ত্রী তখন কিছুদিন ছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জেনারেল পারভেজ মুশাররফ ক্ষমতায় এলে স্বাভাবিকভাবেই পদচ্যুত হন।

গওহর আইয়ুব একটি আত্মজীবনী লিখেছেন ইংরেজিতে, নাম "*Glimpses into the Corridors of Power*"– ৩৫৩ পৃষ্ঠায় রয়েল সাইজের বইটি প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

গওহরের আত্মজীবনীতে বাংলাদেশ সম্পর্কে সরাসরি কোনো স্মৃতিচারণা নেই। কারণ বাংলাদেশে তিনি কখনও ছিলেন না। তবে, উল্লেখ আছে সামান্য, সেটিই এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়। অধ্যায়টির নাম 'স্পিলিটিং পাকিস্তান'। কিন্তু ভাঙ্গল কে?

১৯৭০ সালের মার্চের নির্বাচন থেকে ঘটনাবলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন তিনি, যা সঠিক যে, পিপিপির পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। সামরিক সরকার সহায়তা করছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামকে। এটি করে,সামরিক সরকার প্রমাণ করল যে, তারা কল্পনার জগতে বসবাস করতে পছন্দ করে। জেনারেল ইয়াহিয়া তিন বছর পূর্ব পাকিস্তানে জিওসি ছিলেন। তার বাস্তব বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু মদ ও মেয়েমানুষ সামরিক সরকারের কর্তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন, শেখ মুজিব যোগাযোগ রাখছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগ আর জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে। তিনি জানতেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন কিন্তু অভাবনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তিনি চাননি। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন তাহলে তিনি পার্টির জিম্মি হয়ে পড়বেন। ৬ দফার ব্যাপারে পার্টি ছিল অনড়। তিনি সামরিক শাসক ও জামায়াতের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথেও বৈঠক করলেন। বাস্তবের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা সংসদে বেশি আসন দাবি করছিল। মুজিব তাদের ৪০টি আসন দিতে চেয়েছিলেন।

এ অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করলে দেখব, বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই। শেখ মুজিব নির্বাচনের আগেই ছয় দফা প্রত্যয় ব্যক্ত করে জানিয়েছিলেন, তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। মুসলিম লীগ ও জামায়াতের সঙ্গে কেন তিনি

আপস করবেন বা আসন ছেড়ে দিবেন তা বোধগম্য নয়। দ্বিতীয়ত, ছয় দফা তাঁর সৃষ্টি। ছয় দফার জন্যই এক দশক লড়াই করছিলেন। দলে ছিল তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য, তাহলে তিনি দলের জিম্মি হবেন কীভাবে? অজ্ঞতা অথবা কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে এটি লেখা।

নির্বাচনের আগে সাইক্লোনের কথা লিখেছেন । এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো নামকরা নেতা যে আর্থিক বা নৈতিক সমর্থন দেয়নি 'পূর্ব পাকিস্তানি'দের তা তিনি যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন ।

গওহর মনে করে, নির্বাচনের পর ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার একটি মৈত্রি হয়েছিল । তারপর মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। গওহর লিখেছেন, "General Yahyah had arrested the wrong man,though. In Paltan Mujib may have said a lot but he had not made a unilateral declaration of independence."

গওহর দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। কর্নেল সগির হোসেন শাহ ২৯ ল্যান্সারদের নিয়ে ঢাকা আসছিলেন। ঢাকা রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি সস্ত্রীক ছিলেন গওহর আইয়ুবের সঙ্গে। যে রেজিমেন্টের তিনি নেতৃত্ব দেবেন তা অর্ধেক পূর্ব ও বাকি অর্ধেক পশ্চিম পাকিস্তানিদের দিয়ে গঠিত হবে। গওহর তাকে বলেছিলেন, সতর্ক থাকতে। "তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কেন যাচ্ছ? আমার তো মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ হবে। আমার পরামর্শ হবে, তোমার ট্যাংকে গানার এবং ড্রাইভার যেন পশ্চিম পাকিস্তানি হয়। পূর্ব পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীরা যা করেছিল এখানেও সে রকম হবে।"

এপ্রিল ১৯৭১ সালে তার বোনের জামাই ক্যাপ্টেন আলী কুলি খান পূর্ব পাকিস্তানে। তাকে তিনি বলেছিলেন, ভারত আক্রমণ করবে ও পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে। সবসময় একটি হেলিকপ্টার তৈরি রাখবে এবং তা রাখবে বিমান বন্দরের বাইরে যাতে শেষ মুহূর্তে বার্মা বা নেপাল পালিয়ে যেতে পারো। ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে আলী কুলি খান তাই করেছিলেন।

তাঁর পিতা আইয়ুব খান তাকে ঘটনা পর্যালোচনা করে বলেছিলেন, "জেনারেল ইয়াহিয়াকে আমি পূর্ব পাকিস্তান পাঠিয়েছিলাম। সেখানে সে ছিল তিন বছর। জায়গাটাও সে চেনে। সে নিশ্চয় জানে পূর্ব পাকিস্তানে আমরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারব না। আওরঙ্গজেব তাঁর ভাই সুজাকে তাড়িয়ে আরাকানে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্রেফ হারিয়ে গিয়েছিল । ইয়াহিয়া কি পাকিস্তানি বাহিনীকে সেই একই পরিণামের

দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১৯৭১ সালের আগস্টে জেনারেল গুল হাসান ও মেজর জেনারেল গুলাম উমরের সঙ্গে তার দেখা। বিমানে করে তারা যাচ্ছিলেন। করাচি থেকে ইসলামাবাদ। ঐ দুজন মাত্র ঢাকা থেকে ফিরেছেন। গওহর তাদের কাছে ঢাকার খবর জানতে চাইলেন। গুল হাসান বাস্তব অবস্থা জানিয়ে বলল," Only a miracle could save us there." [পৃ. ১২৮]

ইয়াহিয়া কি তা জানে? গওহর জিজ্ঞেস করলেন, "গত তিন মাস তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।"

গওহর শেষ মন্তব্য করেছেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে গুল জানালেন, "We were heading towards a disaster and that too, without eyes wide open." [পৃ. ১২৮]

গওহর আইয়ুব রিজার্ভ ফোর্সের সদস্য হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। এ অধ্যায়ে তার উপসংহার পড়লে বোঝা যায়, তিনি জানেন, ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তানি সেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা স্বীকার করতে রাজি নন। সে জন্য দু'টি প্রসঙ্গ এনেছেন হঠাৎ করে। একটি ধর্ষণ, অপরটি গণহত্যা।

মেজর জেনারেল জ্যাকব রাও ফরমান আলীকে একটি নথি দেখিয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা কত বাঙালি রমণী ধর্ষণ করেছে তার বিবরণ এখানে আছে। ধর্ষিতার সংখ্যা এত বেশি ছিল যে ফরমান উত্তরে বলেছিলেন, যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে তা সত্যি হলে পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধ করতে হতো না। ধর্ষণে ধর্ষণেই বেলা কেটে যেত। [পৃ. ১৩৬] অর্থাৎ সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত। এ প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করেছি।

গওহর বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে 'সুইপ অপারেশন' চালাবার সময় কী পরিমাণ মানুষ হত্যা করা হয়েছে বা লুট বা অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানানো যাবে না। আওয়ামী লীগ যা দাবি করে তা অতিরঞ্জিত। তবে, এটা ঠিক দুপক্ষেই বেশ ভালো সংখ্যক মানুষ মারা গেছে যার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি সিভিলিয়ানও ছিল। পূর্ব পাকিস্তানও নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছে। উপসংহারে বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ 'স্বাধীনতা'র জন্য সংখ্যা লঘিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এমনটি পৃথিবীতে ঘটেনি- "Indeed, it has never happened in history that the majority group of a country broke away from the minority in a fight for independence".

এ দুটি অনুচ্ছেদ পড়লে পাঠকদের মনে হবে, গওহর আইয়ুব দূর থেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ঠিকই বলেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবেন,

দু-পক্ষেই মারা গেছে– যার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও অন্তর্ভুক্ত। এই পশ্চিম পাকিস্তানি কারা? বিহারীরা নিশ্চয় নয়। কারণ, পাকিস্তান বিহারীদের কখনো পাকিস্তানি মনে করেনি। তাহলে কি পাকিস্তানি সৈন্য? যুদ্ধে সৈন্য নিহত হবেই। কিন্তু তিনি বলছেন 'সিভিলিয়ান'। কোথায় কত পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেল! ডাহা মিথ্যা কথা।

উপসংহারে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলতে গিয়ে স্বাধীনতা বা Independence শব্দটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে রেখেছেন। অর্থাৎ বাঙালির যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল না।

এই হলো পাকিস্তানি মন।

৯১

পাকিস্তানের সর্বনাশের জন্য দায়ী স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। পাকিস্তানে সেনাবাহিনী দ্বারা রাষ্ট্র দখলের যে প্রক্রিয়া, তা তিনি শুরু করেন।

১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করেন তিনি। উপদেষ্টা নিয়ে শাসন শুরু করেন। আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তারপর হ্যাঁ-না ভোটের প্রচলন করেন। প্রেসিডেন্ট হন। মুসলিম লীগ ভেঙে নিজের দল গঠন করেন কনভেনশন মুসলিম লীগ। সুযোগ সন্ধানীরা ভিড় জমায়। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে গড়ে ওঠে কনভেশন মুসলিম লীগ। মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক ধরনের গণতন্ত্র চালু করেন। তাদের ভোটে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন পশ্চিমা দেশগুলি তাকে বিশেষভাবে সমর্থন করে। রাজনীতিবিদদের অস্পৃশ্য হিসেবে আখ্যায়িত করে যাত্রা শুরু করলেও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কারণ, অনুধাবন করেছিলেন তা ছাড়া ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

তার রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসম্পৃক্ত রাজনীতিবিদদের দমন করে সামরিক কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে এমন রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি সৃষ্টি করা। তার অপশাসনে পাকিস্তানের দু'প্রদেশেই অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানকে চিরতরে রাজনীতি থেকে হটিয়ে দেয়ার জন্য ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা শুরু করেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন।

অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে আইয়ুব ভিন্ন কিছু ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি উপনিবেশি মনে করতেন আর বাঙালিদের নিম্ন শ্রেণীর। শোনা যায়, ঢাকায় এসে এক পার্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'হাইওয়ান' (পশু) নামে। সুফিয়া কামাল ছিলেন

সেখানে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, আপনি তো তা হলে হাইওয়ানদের প্রেসিডেন্ট।

কাহিনী সত্য কী মিথ্যা জানি না। তবে এটি প্রচলিত ছিল এবং এ থেকে বোঝা যায় আইয়ুবের দৃষ্টিভঙ্গি।

আইয়ুবের বিশ্বস্ত আমলা আলতাফ গওহর *আইয়ুব খান* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি জানান, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২৬ মার্চ তার প্রাক্তন মন্ত্রিদের জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করেন। সেখানে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যটির উদ্ধৃতি আমি দিচ্ছি এ কারণে যে এর মাধ্যমে শুধু আইয়ুব খান নয়, পাকিস্তানি সব জেনারেলের পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান, রাজনীতিবিদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে। তিনি বলেছিলেন–

"কাঠামোগতভাবে দেশটি জটিল। হয়তো তা আধুনিকায়নে আমি বেশি জোরাজুরি করেছি। সংস্কারের জন্য আমরা তৈরি নই। সত্যি বলতে কী এক্ষেত্রে আমি ব্যর্থ। ....আমরা স্বাধীনতার মর্ম বুঝি না। স্বাধীনতায় আমাদের মানুষজন অনভ্যস্ত ও অসুখী। এ অবস্থা চলতে থাকলে দাসত্বে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমাকে তাই সরে যেতে হলো। ....কখনো ভাবিনি মানুষজন এত পাগল হয়ে উঠবে। দুর্ভাগ্যবশত যুক্তিযুক্ত কোনো জনমত নেই। আমার সবচেয়ে বড় উচ্চাশা ছিল গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। ... My deepest disappointment when I met the opposition was that there was not one person among them who could rise above his self-interest. I doubt if in our political life we will have a good man for a long time. Thank God we have an army. If nothing else I have held this country together for ten years. It was keeping a number of frogs in one basket. What sort of Pakistan will emerge is anybody guess. There will be either force or mob rule.....

পূর্ব পাকিস্তানিরা যেভাবে থাকতে চায় থাকতে দাও। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাগুলো আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার। শক্তিশালী কেন্দ্র ছাড়া দেশ টিকবে না। দুই পাকিস্তানের কোনো ভবিষ্যত নেই। পূর্ব পাকিস্তান কয়েকদিন টিকবে, পশ্চিম পাকিস্তান ধুঁকে ধুঁকে চলবে। .... আসুন আশা করি কোনো দৈব ঘটনা আমাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণ থেকে বাঁচাবে। [পৃ. ৩৩৯-৩৫০]

পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে আইয়ুব খানের ভবিষ্যত বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী মিলে গেছে।

আইয়ুব খান মারা যান ১৯ .... সালে। সম্প্রতি ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তার লেখা রোজনামচা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন ক্রেইগ ব্যাক্সটার। ৫৯৬ পৃষ্ঠার বইটি ঢাকার ইউপিএল

প্রকাশ করেছে ২০০৭ সালে। এখানে আমি শুধু তার ১৯৭০-৭১ সালের রোজনামচা বিশ্লেষণ করব।

৯২

১৯৭০ সালে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। ৫ জানুয়ারি আইয়ুব লিখলেন, ভাসানী আর আতাউর রহমান জনসভা করে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা বলছেন। মুজিব জনসমর্থন বেশি পাচ্ছেন দেখে হয়তো তারা এ ধরনের ধুঁয়ো তুলছেন যাতে তাদেরও জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়। আইয়ুব লিখছেন, আমি অবাক হবো না যদি মুজিব ওদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাধীনতার কথা বলেন এবং অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। আশা করি আমরা শেষের শুরু দেখছি না।

এদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় বিদ্যমান সামরিক জান্তা থেকে আইয়ুব খান দূরদর্শী ছিলেন। জান্তা যেখানে ভাবছিল, কেউ-ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, মুজিব তো নয়ই, সেখানে আইয়ুব অনুমান করছিলেন পাকিস্তান ভেঙে যেতে পারে।

এ বক্তব্যটিই আবার ফিরে এসেছে ৮ তারিখ। সেখানে তিনি রাজনীতিবিদদের প্রতি বিষোদগারও করছেন স্বাভাবিকভাবে। নির্বাচনে হার-জিতের বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন, সবচেয়ে ভয়ানক হবে যদি মুজিব-ভুট্টো জিতে যায়। প্রমোক্তজন তার প্রদেশের বিযুক্তিকরণ চাইবে, শেষোক্তজন প্রশাসন, সেনাবাহিনী, গণমাধ্যমের বামঘেঁষা সাংবাদিক, আইনবিদ, শ্রমিক সবখানে তার 'cell' সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকবে যাতে তার একনায়কত্ব অটুট থাকে।

তিনি আরো লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবুর রহমানের বিশাল বিজয় দুরাশা নয়। এ ধরনের নেতিবাচক ভোট এই প্রথম নয়। ১৯৫৪ সালেও এমনটি ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে, আইয়ুব খান বাস্তব পরিস্থিতি অনেকটা অনুধাবন করলেও পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে চাননি। সেটি খুব সম্ভব পূর্ব ধারণার কারণে। ১৯৫৪ সালে ভোট ছিল মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাচার ও পশ্চিমের ঔপনিবেশিক মনোভাবের বিরুদ্ধে। এ সহজ সত্য তারা কখনো মেনে নিতে চায়নি।

আইয়ুব খানের ৯ তারিখের এন্ট্রি পড়লে অবাক হতে হয়। মনে হচ্ছে, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তার রাজনীতিবিষয়ক ধারণাগুলো সুষ্ঠ হতে থাকে। তিনি লিখছেন, সুলেরি *পাকিস্তান টাইমসে* লিখেছেন, দু'প্রদেশে দুজন সংখ্যারিষ্ঠতা

পাওয়ায় ভালোই হলো। আইয়ুব খান বলছেন, এতে ভালো কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। ভুট্টো সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, ভুট্টো চরমপন্থা পছন্দ করে। তার ভাগ্য হবে 'তখ্‌ত' অথবা 'তক্তা'। এর বাইরে কিছু নয়। লিখেছেন তিনি,

"আমাকে একজন বললেন, নির্বাচনের ফলাফলে ইয়াহিয়া বিষণ্ন। তিনি ভাবেননি ফলাফল এমন হবে। তবে, জেনারেল পীরজাদা আছে এখন ভালো অবস্থায়। ইয়াহিয়া তার পকেটে আর ভুট্টো তার বন্ধু। শোনা যায়, প্রশাসনের সব খবরাখবর ভুট্টোর কাছে পাচার করে পীরজাদা।

এই নির্বাচন থেকে যে উপসংহার টানা যায় তা হলো, জনগণ, পুরানো রাজনীতিবিদদের ত্যাগ করেছে। তারা অতীত নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং মরিয়া। পুরানোদের অধিকাংশ হয় পরাজিত নয় জিতলেও অনুসারি সামান্য। এটি করতে গিয়ে জনগণ পরিবার, ট্রাইবেল বা স্থানীয় সংযোগ কিছুই মনে রাখেনি যা অপ্রত্যাশিত এবং তা এক healthy change."

আইয়ুব এই পরিবর্তন সম্পর্কে শেষে মন্তব্য করেছেন :

"আমাদের ভুলে গেলে চলবে না জনসংখ্যার অর্ধেকের বয়স পঁচিশের নিচে এবং ট্রানজিসটর, টিভি, গণমাধ্যম ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন এনেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন ও নগরায়ন। তারা পরিবর্তন চায়– পুরানো মূল্যবোধের কোনো দাম তাদের কাছে নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে Old appeals have very little relevance." [পৃ. ৪২১]

Out

পরের দিনের 'এন্ট্রি'তেও বিষয়টি আলোচনা করেছেন আইয়ুব। তার মতে, ভাসানী স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছেন এবং মুজিবুর রহমান এ লক্ষ্য পূরণের জন্য তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছেন। "আমার মতো, তিনি জনগণের মনের ইচ্ছাটা জানাচ্ছেন। সেটি ঠিক না ভুল তা অন্য কথা। This demand may sound premature may well start in these provinces once the reality dawns , as it in bound to in course of time, that they are being robbed". [পৃ. ৪২১]

তার মতে, মুজিব এখনো স্বাধীনতা চাননি, 'স্বায়ত্ত শাসন চেয়েছেন' এর অর্থ তারা আরো খানিকটা সময় চায় যাতে পাঞ্জাব আর সিন্ধু দোহন করে তাদের অর্থনীতি দাঁড় করাতে পারে। তারপর সেপারেশনের কথা আলোচনা করবে।

আইয়ুব এ মন্তব্য যখন করছেন তখন বেমালুম ভুলে গেছেন পাঞ্জাব ও সিন্ধু গত ২৫ বছর ধরে পূর্ববঙ্গকে শোষণ করছে। ১৯৭০ সালের সাইক্লোনের উল্লেখও তিনি করেছেন। তবে, এ ক্ষেত্রে তার ধারণা পূর্বোল্লিখিত জেনারেলদের মতো। তা হলো, তাণ্ডব হয়েছে ঠিকই, তবে সেনাবাহিনী সব

জায়গায় ত্রাণ দিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকায় উল্টোটা লিখছে। মানুষজন কবর দিচ্ছে না, টাকা দিলে কবর দিচ্ছে। তবে, এ প্রসঙ্গে আইয়ুব একটা নতুন তথ্য দিচ্ছেন। যে কবর দেয় বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। তাঁর ভাষায়, "Apparently the custom in that only a certain class of people did the job." [পৃ. ৪২২]। পূর্ব ধারণা, মানুষের চিন্তাশক্তি কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে এটি তার প্রমাণ। তিনি হয়তো, ডোমদের কথা ভাবছিলেন। আর বাঙালি মুসলমান তো হিন্দু!

১৯৭০ সাল পর্যন্ত আরো কিছু এন্ট্রি আছে। সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে। পুনরাবৃত্তিও। পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ/শেখ মুজিব আবার ফিরে আসছেন রোজনামচায় জোরালো হয়ে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে।

আইয়ুব মন্তব্য করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণার ইস্যুতে বিরাট গরিষ্ঠতা নিয়ে এসেছেন মুজিব। ইচ্ছে করলেই তিনি ছয়দফা বা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কিছু করতে পারবেন না। এই মতটিও অধিকাংশ জেনারেলের। আইয়ুব লিখেছেন, "He is no longer a free agent. He is the prisoner of his vast support." [পৃ. ৪৩৫] শেখ মুজিব, আইয়ুবের মতে, যা বলেছেন তা থেকে বিচ্যুত হলেই বিশ্বাস হন্তা হিসেবে পরিচিত হবেন। সুতরাং, তার চরমপন্থা অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ানোর উপায় নেই। ভুট্টো তার সঙ্গে সমঝোতা করতে পারেন তাও একটি পর্যায় পর্যন্ত। সমঝোতা করলেও কেউ বলবে না যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। সুতরাং, যা বোঝা যাচ্ছে দুটি 'autonomous regions'-এর সৃষ্টি হবে। "আমার সমাধান হবে", লিখেছেন আইয়ুব "দুই এলাকাই তাদের নিজ নিজ সম্পদ" নিজে ব্যবহার করুক এবং "live as them on account of central and provincial requirement." [পৃ. ৪৩৫]

এরপর আইয়ুবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য কারণ এখানেই রাজনীতিবিদ সম্পর্কে জেনারেলদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি লিখেছেন, আমার অবাক লাগছে মানুষজন মুজিবুর রহমান ও ভুট্টোর হাতে দেশের ভার ছেড়ে দিয়েছে। একজন শিক্ষিত ও অভিজাত। অন্যজন অশিক্ষিত, স্থূল, কুৎসিত রাজনৈতিক গুণ্ডা। বাংলায় বিষয়টি তেমনভাবে আসছে না বিশেষ করে বাঙালি মুজিব সম্পর্কে বিশেষণের অর্থ। তাঁর ভাষায়– "One is educated and sophisticated, the other is an uneducated and crude and uncouth political goonda." [পৃ. ৪৩৫] রাজনীতিবিদরা খারাপ। তবে, তাতেও পার্থক্য আছে। পশ্চিম পাকিস্তান হলে শিক্ষিত, অভিজাত। বাঙালি হলে অশিক্ষিত ও গুণ্ডা।

৪ তারিখের ভুক্তিতেও একই কথা ঘুরে ফিরে আসছে, তবে অন্যভাবে। আইয়ুব লিখেছেন, ভাগ্যের কী পরিহাস! শত্রুভাবাপন্ন অনড় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পাকিস্তান হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এ দেশে

এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে এক প্রদেশের অন্য প্রদেশের ওপর স্থায়ী আধিপত্য থাকবে অথচ তারা বহন করবে না গুরুভার বা দায়। এভাবে কতদিন টিকবে এই কৃত্রিম মৈত্রি? জিজ্ঞাসা আইয়ুব খানের। পশ্চিম পাকিস্তানের সিকি শতাব্দীর শাসন কিন্তু তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন।

৯ জানুয়ারির সংবাদে জানা গেল, শেখ মুজিবকে হত্যার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। ছুরি হাতে একজন ধরাও পড়েছে। জানিয়েছে, তাকে ভাড়া করা হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল আরো চারজন। আইয়ুবের মতে, এটি একটি অ্যামেচার প্রচেষ্টা। একদিন পর জানাচ্ছেন, ঢাকা থেকে একজন ফিরেছেন। তিনি করাচি ও লাহোরেও গিয়েছিলেন। মুজিবের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। মুজিব বলেছেন, এত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তিনি চাননি। ১০০ জন সদস্য হলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারতেন। এখন তিনি গরিষ্ঠতার জালে বন্দী। তিনি আরো জানান, মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার একটি সমঝোতা হয়েছিল যে, ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট হবেন।

ঐ ভদ্রলোক আরো জানান, পাঞ্জাবের মনোভাব ভয়ঙ্কর। মানুষজন চায় পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলতে এবং তারা বিশ্বাস করে ভুট্টো এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারে। ভুট্টো নিজেও তা বিশ্বাস করে এবং বিচ্ছিন্ন হলে অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে কী অবস্থা হবে তা জানার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি করেছেন।

যে ভদ্রলোক আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আইয়ুব তার নাম বলেননি। পাঞ্জাবের মনোভাব সঠিক হলেও শেখ মুজিব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অতিরঞ্জিতই মনে হয়। ঐ পরিস্থিতিতে তিনি বলবেন মাত্র ১০০ সদস্য নির্বাচিত হলেই চলত–এ মন্তব্যটিই জেনারেলদের লেখায় বারবার এসেছে। উল্লেখ্য ১৩ তারিখের এন্ট্রিতে আইয়ুব খান আবার শেখ মুজিবকে 'গুণ্ডা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরের দিন একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। লিখেছেন তিনি, ঢাকা থেকে করাচি এয়ারপোর্টে ফিরে ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মুজিব হবেন ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রি। তবে, যখন তা ঘটবে তখন ইয়াহিয়া থাকবেন না। ভুট্টো সম্পর্কেও তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন পরদিন, তাও মোটামুটি সত্য। লিখেছেন তিনি, "It is with this sort of jugglery, tall talk and impractical promises that he has been able to befool people so completely. His ambitions and methods are truly that of Hitler and Goebbels." [পৃ. ৪৪২]

বাঙালিদের সম্পর্কে যে জেনারেলদের সীমাহীন অবজ্ঞা তা ফিরে এসেছে বারবার আইয়ুবের রোজনামচায়। শেখ মুজিবকে তিনি গুণ্ডা ছাড়া কিছু মনে

করেন না। আওয়ামী লীগের নেতা কামরুজ্জামানকে মনে করেন পশু। ফেব্রুয়ারি ৭-৯ তিনি লিখছেন, শোনা যাচ্ছে শেখ মুজিব সংসদীয় দলের প্রধান থাকতে চান না। তিনি হয়তো গান্ধীর ভূমিকা নিতে চান অর্থাৎ 'রাজা বানাবার' [যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'কিং মেকার'] তিনি কামরুজ্জামানকে সংসদীয় প্রধান বানাতে চান। আইয়ুবের ভাষায়, "A man called Kamruzzaman, who is better than an animal is tipped as a probable successor." [পৃ. ৪৫০] কয়েকদিন পর লিখেছেন, মুজিব সর্বসম্মতক্রমে সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। এটা নতুন নয়। আমাদের দেশে নেতা ও সরকার সর্বসম্মতক্রমে নির্বাচিত হয় এবং সেভাবেই পরিত্যক্ত হয়। তার নিজের বেলায়ও যে সে কথা প্রযোজ্য তা অবশ্য তার মনে হয়নি। ঐ একই তারিখের ভুক্তিতেও তিনি ভুট্টো এবং মুজিবের সমালোচনা করেছেন কিন্তু মুজিবের বেলায় ব্যবহার করেছেন রূঢ় শব্দ। তার মতে, ভুট্টো নিজেকে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার ধারক হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং যারা মুজিবের সমর্থন দিতে পারে তাদের সমালোচনা করেছেন। নিজেকে তুলে ধরেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের একক নেতা হিসেবে। এটি সম্ভব হয়েছে, "Through Mujibur Rahmans, stupidity and arrogance." [পৃ. ৪৫২] আইয়ুব আরো মন্তব্য করেছেন, মুজিব খালি বাঙালি বাঙালি আর বাঙালিত্ব বাঙালিত্ব করছেন। এ কারণে এখানে [প. পাকিস্তান] তার প্রতি মানুষরা বীতশ্রদ্ধ। সুতরাং তারা "May welcome separation, however reluctantly." [১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, পৃ. ৪৫৩]

মার্চ পর্যন্ত আইয়ুব প্রতিদিনের ঘটনা বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দোষটা চাপিয়েছেন বাঙালি/মুজিবের প্রতি। মার্চের ২ তারিখে তার মনে হয়েছে, পাকিস্তান ভীষণ বৈপরীত্যের মুখোমুখি। পাকিস্তান চায় ঐক্য ও গণতন্ত্র। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত। পূর্ব পাকিস্তান ঐক্যের বিরোধী। আর গণতন্ত্রের কথা ধরলে পূর্ব পাকিস্তানকে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা দিতে হবে, যা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। একমাত্র সেনাবাহিনীই পারে দেশকে ধরে রাখতে। কিন্তু কতদিন? এ পরিপ্রেক্ষিতেই মন্তব্য করেছেন, ১০ তারিখ নেতাদের সভায় মুজিব আসতে অপারগতা জানিয়েছেন। আমার মনে হয় তার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে অন্যান্য বাঙালি নেতাদের সাহায্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাব্য ঘোষণার প্রস্তুতি নেয়া [পৃ. ৪৫৮]। আরেকটি বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে দেশ। মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যরা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন ঘৃণা ছড়িয়েছে যে, তা এখানেও [প. পাকিস্তান] প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এটা সন্দেহের ব্যাপার যে ভুট্টোর মতো কেউ এখানে নিরাপদে থাকতে পারবেন কিনা বা

মুজিবুর রহমান এখানে। [৬.৩.১৯৭১]

৭ মার্চের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান লিখেছেন। দেশের সামনে এখন দুটি বিকল্প।

১. এক থাকা। এর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাম দেয়া। সেটি এত বেশি হবে যে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. বিচ্ছিন্নতা, কিন্তু তা কি হবে পরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ? সন্দেহ আছে। বাঙালিরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যে, "so that separation could be presented as a panacea" ঐখানের পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য তার মায়া হচ্ছে।

বর্তমান অবস্থা, আইয়ুবের ভাষায়, ভারত ভাগের সময়ের মতো। সমাধানের কোনো পথ নেই। লিখেছেন তিনি– "The hatred in East Pakistan is too deeply burnt into the bones and souls of the people. The politicians in their perfidy, have seen to it. Meanwhile, feelings of aversion are growing fast in West Pakistan, however divided." [পৃ. ৪৬১]

এ পর্যন্ত যতগুলো ভুক্তির উল্লেখ করলাম, পর্যালোচনা করলে দেখবেন, দেশের সব অশান্তির জন্য দায়ি করা হয়েছে বাঙালি ও তাদের নেতা শেখ মুজিবকে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, এলিটরা এর জন্য দায়ী তা তার মনে হয়নি। কখনো হলেও তার গুরুত্ব দেননি।

১২ জানুয়ারি লে. জে. ইয়াকুবের পদত্যাগের কথা শুনে তিনি লিখেছেন, মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বলে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। তার জন্য ও সেনাবাহিনীর জন্য আমার দুঃখ হয়। কারণ পাকিস্তানের কমান্ডার ইন চিফ হওয়ার জন তিনিই ছিলেন একমাত্র জেনারেল। জেনারেল ইয়াকুব সম্পর্কে এ মন্তব্য আর কোনো জেনারেল করেননি। এ পর্যায়েও একটি মন্তব্য করেছেন যা সেই পূর্ব ধারণার সঙ্গে যুক্ত। তিনি মন্তব্য করেছেন, বাঙালিরা এখন রক্ত চায়। কার রক্ত? খুব সম্ভব অবাঙালি মুসলমানদের, হিন্দুদের নয় যারা তাদের শোষণ করে। সম্পদ নিয়ে গেছে পশ্চিম বঙ্গে। [পৃ. ৪৬৪, ১৪.৩.৭১]

বাঙালিদের সম্পর্কে আবার কটু মন্তব্য করেছেন। বাঙালিরা কখনো সন্তুষ্ট হয় না। ২৩ বছর ধরে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। যতই তাদের সন্তুষ্ট করা হয়েছে ততই তারা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। লিখেছেন তিনি, "আমি নিশ্চিত করে তা বলতে পারি কারণ আন্তরিকভাবে আমি সে প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তাতে অসন্তুষ্টি ও শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের সঙ্গে তারা আড়ষ্ট বোধ করে। "They want to be left alone and run their show on their own, good or bad. The answer is to let them do so with our prayers for success. Otherwise, they will finish

themselves as well as us." [পৃ. ৪৬৫]

এলো ২৫ মার্চ। রোজনামচায় প্রথম ২৬ মার্চের অনুচ্ছেদে আইয়ুব উল্লেখ করেছেন হয়তো ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোর একটি সমঝোতা হয়ে গেছে। বিকেল ৫টার দিকে ইয়াহিয়ার ভাষণের পর বুঝলেন কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে কিন্তু ঠিক কী বুঝতে পারছিলেন না। নানা কথাবার্তাও কানে আসছিল।

আইয়ুব এ পর্যায়ে একটি সঠিক মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, একটি আদর্শকে যাতে অনেক মানুষ বিশ্বাসী সে আদর্শকে শক্তি দ্বারা পরাভূত করা যায় না। সুতরাং মনে হচ্ছে ঐসব কুৎসিত ঘটনা ও কার্যক্রম বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করবে। তারপর লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগ সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যার অসম্ভব সংখ্যা শোনা যাচ্ছে। এই সংখ্যা ২৫,০০০ থেকে ৫০,০০০। ঢাকায় ট্যাংক ব্যবহৃত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যারা ক্যাম্পাস থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছিল তাদেরও গুলি করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ইকবাল হল ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সম্ভবত ঘটনাবলি দাবি করছিল কঠিন ব্যবস্থার কিন্তু এখানে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ও নিহিত। দীর্ঘ সময় ধরে সৈন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য, গালিগালাজ করা হয়েছে। ধৈর্যের শেষ সীমায় তারা পৌঁছে গিয়েছিল। এ ছাড়া তারা দেখেছে অবাঙালিদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার। পুলিশের সাহায্যে স্থানীয় মিরপুরের বিহারি কলোনি আক্রমণ করে। ঠিক সময়ে সেনাবাহিনী পৌঁছে তাদের রক্ষা করে।

শোনা যাচ্ছে, মুজিবের পুত্র যে তার বাবার থেকেও "bigger goonda"। ইকবাল হলে গিয়ে ছাত্রদের উত্তেজিত করে। সংঘর্ষে সে ও আরেকজন "notorious leader" নিহত হয়। একই ভাবে গ্রেফতারে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হয় তাজউদ্দীন ও মোয়াজ্জেম আলী।

এ ধরনের বর্ণনা পাঠক আগেও পড়েছেন। তাই পুনর্বার এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অন্তিমে যে আইয়ুব একজন জেনারেল ও বর্ণবাদী পশ্চিম পাকিস্তানি তা বোঝা যায় তার শেষ দুটি বাক্যে– "If this much was done, then I wander why a number of leading scoundrels were not dealt with in the same fashion. The province would have seen same peace for sometime." [পৃ. ৪৭০]

মার্চের শেষ ভুক্তিতে মন্তব্য করেছেন, ভুট্টো এখন সেনাবাহিনীর নীল চোখের বালক এবং সেনাবাহিনীতে জনপ্রিয়। এই ধারা এক বড় বিপদ ডেকে আনবে।

আইয়ুব খান এরপর চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান, ফিরে আসেন। এই সময় নিয়মিত রোজনামচা লেখেননি। যখন লিখেছেন তখন কখনো কখনো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তবে

ইতোমধ্যে বিভিন্ন জন ও তার পুত্র গওহর আইয়ুবের কাছে শুনেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। ৮ নভেম্বর একটি ইন্টারেসটিং এন্ট্রি আছে। লিখেছেন আইয়ুব–

"শুনেছি, মুজিবুর রহমানের বিচার হচ্ছে লায়ালপুর জেলে। এজলাসে ঢুকে তিনি বললেন, 'জয় বাংলাদেশ'। তিনি আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট তাকে বিশ্বাসঘাতক ঘোষণা করেছেন সুতরাং বিচারের দরকার কী? তার বিরুদ্ধে 'কনক্রিট' কোনো সাক্ষ্য নেই। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব সম্ভব তাকে 'ব্রিফ' করা হয়েছে। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সব এগোচ্ছে দেখে তিনি খুশি। তিনি আরো জানতে চেয়েছেন ভুট্টো কি পাগল হয়েছেন কারণ তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা। ক্ষমতা ছাড়া ভুট্টোর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।"

পরের দিনের ভুক্তিতে আছে একজন এসে তাকে বেশ কিছু খবরাখবর দিলেন। ইয়াহিয়ার ছেলের বিয়ে হয়েছে খুব জাঁকজমকভাবে। কনেকে প্রচুর গহনা দেয়া হয়েছে, উপহারও নেয়া হয়েছে অনেক। কয়েকদিন ধরে আমোদফুর্তি চলেছে। মানুষ বুঝতে পারছে না পূর্ব পাকিস্তানে যখন আগুন জ্বলছে তখন কেন এসব হচ্ছে।

সেই লোক আইয়ুবকে আরো খবরাখবর জানালেন, বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে। আইয়ুব সে সব খবর ১২ ভাগে ভাগ করে যত্ন করে লিখেছেন, তার দুটি হলো :

রাওয়ালপিন্ডি সিএমএইচে এক তরুণ অফিসারকে আনা হয়েছে মানসিক চিকিৎসার জন্য। সে নাকি প্রায় ১৪,০০০ মানুষকে হত্যা করেছে। এ কথা মনে হলেই "gives him convulsions and nightmares."

প্রথম দিকে হিন্দুরা অনেক হত্যা করেছে। এখন তাদের দেখলেই গুলি করা হয়। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় না।

১৬ ডিসেম্বর ভুক্তিতে সবকিছু তিনি পর্যালোচনা করে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পাকিস্তান ভেঙে গেছে, পশ্চিম পাকিস্তানও বিপর্যস্ত কিন্তু জেনারেলের পূর্ব ধারণা দূর হয় না। সিদ্ধান্তগুলো এরকম–

* পাকিস্তানের এখন দুর্দিন। শুধু যে সাড়ে ছয় কোটি লোক হিন্দু প্রভাবে চলে গেল তা নয়, "আমাদের চমৎকার ডিভিশন এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর কিছু অংশও হারালাম। এখান থেকে বেরিয়ে আসা সমস্যা হবে। বন্দীদের বিনিময়ে ভারত বড় কিছু দাবি করবে।"

* বাংলা বিচ্ছিন্ন হওয়া বেদনাদায়ক কিন্তু তা ছিল প্রত্যাশিত ও নির্ধারিত। সংখ্যাগরিষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তান তাদের শত্রু।

আমার মনে হয়, শাসকদের যথাসময়ে এটি বোঝা উচিত ছিল এবং ভারতকে দিয়ে সার্জিকাল অপারেশন না করিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের চলে যেতে দেওয়া উচিত ছিল।

* আমার ধারণা এখন হিন্দু 'morale is very high.' শতাব্দীকালের ভেতর মুসলমানদের ওপর এটিই তাদের বড় বিজয়। অনেক দিন লাগবে এই স্মৃতি বিস্মৃত হতে। তবে ভারতের এই উল্লাস বেশি দিন থাকবে না। কঠিন সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাকে। বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে এখন চার ডিভিশন লাগবে। .... প্রচুর টাকার ব্যাপার। মনে হয় না ভারত তা সামলাতে পারবে। বাঙালিরাও খুব শিঘ্রই বুঝবে পাকিস্তান থেকে মুক্ত হতে তাদের চড়া দাম দিতে হয়েছে।

৯৩

বইয়ের শুরুতে তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোচনা করেছি, আলোচিত বইগুলির বিবরণ আশা করি সেটিকে সুষ্ঠু করে তুলেছে। পাকিস্তানি জেনারেলরা সব জেনেশুনেই বাংলাদেশকে দমন করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি, যাদেরকে তারা গণনার মধ্যেই কখনো আনেননি, তারা 'বিদ্রোহ' করছে পৃথিবীর 'শক্তিশালী সেনাবাহিনীর' বিরুদ্ধে। তাদের গর্বে, ঔদ্ধত্যে এটি ছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তারা ভেবেছিল, কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করলেই বাঙালিরা 'ঠাণ্ডা' হয়ে যাবে এবং তারা শাসন করতে পারবে [যে ভাবে পরবর্তিকালে তারা পাকিস্তান শাসন করেছে]। কিন্তু তা তো হয়নি বরং তাদের বিশাল বাহিনী নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এখনো তারা সে পরাজয় ভুলতে পারেনি। এবং সে কারণেই দোষ স্খলান ও আত্মপক্ষ সমর্থনে এসব বই লিখতে হয়েছে।

আলোচিত বইগুলির মধ্যে পাঁচটি বই ব্যতিক্রমধর্মী।

আসগর খানের বইটি, প্রথম থেকেই ধরে নেয়া যায় যে ব্যতিক্রমী হবে। তিন দশক ধরে তিনি রাজনীতি করছেন, তাঁর মতামত সবার জানা। মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিকবাহিনীর কর্মকাণ্ডে সমালোচনা করেছেন তিনি প্রকাশ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় পক্ষের মধ্যে বাড়াবাড়ি খুঁজে পেয়েছেন। এর অন্য অর্থ করা যেতে পারে যে, একপক্ষ দোষী নয়।

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকির বইটির বিষয়-ই ভিন্নধর্মী কিন্তু অন্তিমে তিনিও আসগর খানের মতো একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ১৯৭১-এর জন্য ভুট্টো-মুজিব উভয়কেই তিনি দায়ী করেছেন।

তোজাম্মেল হোসেন মালিকের বইটি শুধু সর্বক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী মনে হয়েছে। মালিক গোঁড়া মুসলমান, শরিয়ত মেনে চলেন। কিন্তু আশ্চর্য যে, আগাগোড়া বইটিতে তিনি সামরিকবাহিনীর সমালোচনা করেছেন। পাকিস্তান যে কারণে ভাঙল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন [একজন সৈনিকের পক্ষে যতটা সম্ভব]। তাঁর বইটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, জেনারেলদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সম্মুখ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ, বাঙালি বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অযথা কোনো বিদ্বেষ নেই।

বাঙালিদের হাতে ধরা পড়ার পর মুক্তিবাহিনী তাকে বালুচি দেখে হত্যা করেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মনে আছে, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, বাঙালিরা বালুচিদের অন্য চোখে দেখতেন। ভাবতেন, তারা অপেক্ষাকৃত দয়ালু। ঘৃণাটা পাকিস্তান তো বটেই, আরো নির্দিষ্টভাবে পাঞ্জাবিদের প্রতি ছিল। বালুচিদের দেখা হতো বাঙালিদের মতো যারা দলিত। হয়তো, বালুচিরাও সেভাবে দেখতেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, জেনারেল গুল হাসানের জন্মও তো কোয়েটায় কিন্তু তাঁর অবস্থান একেবারে বিপরীতে। আবার ১৯৭১ সম্পর্কিত জেনারেল মুসার বিবরণ মালিকের কাছাকাছি। জেনারেল মুসাও ছিলেন বালুচি। রাজনীতিবিদদের সমালোচনা তিনি পাঞ্জাবিদের মতো করেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আবার বলতে হবে, গুল হাসান বালুচিদের মধ্যে ব্যতিক্রমী। বা বালুচিস্তানে জন্ম হলেও আগাগোড়া তাঁর কেটেছে পাঞ্জাবে। আসলে যে প্রশ্নটি করতে চাই, তাহলো, সব রচয়িতাকে কি অন্তিমে জাতীয়তা প্রভাবিত করে? ইতিহাস?

এ ক্ষেত্রে দুটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। আইয়ুব খানের সময় পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হন জেনারেল মোহাম্মদ মুসা। সাধারণ সৈনিক থেকে তিনি জেনারেল ও সেনাপ্রধান হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানেও জিওসি হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর জেনারেল ইয়াহিয়া সেনাপ্রধান হন। মুসা, ইয়াহিয়াকে রেকমেন্ড করেননি। আইয়ুব বেঁচেছিলেন। ইন্টারেস্টিং হলো, ইয়াহিয়াই আইয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অন্যদিকে, ভুট্টো জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধান করেছিলেন। জিয়াই তাকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে মুসা অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে ঘটনাবলির কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়া উচিত ছিল। তাছাড়া, সরকার তো আওয়ামী লীগের ছয় দফার ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেননি এবং তারা সেই প্রোগ্রামের ভিত্তিতেই জয়লাভ করেছে। সুতরাং, তাদের অধিকার ছিল ক্ষমতায় যাওয়ার। তাঁর মতে,

শাসকচক্র আসলে এ ধরনের নির্বাচনী ফলাফল আশা করেনি। সুতরাং, যা করার, তা না-করে "In their distrubed and confused state of mind...the, resorted to political manipulations."

মুসা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইয়াহিয়াকে যখন আইয়ুব ঠিক করেছিলেন তখন মুসা জানিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া ভুট্টোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এ পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সেনাপ্রধান না করাই উচিত। এটি ১৯৬৬ সালের কথা। মুসা আরো জানিয়েছে, ভুট্টো যখন শুনলেন ইয়াহিয়া সেনাপ্রধান হচ্ছেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, ভুট্টো-ইয়াহিয়ার বন্ধুত্ব অনেক পুরানো এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তারা একত্রে পরিকল্পিতভাবে করেছিলেন।

জেনারেল মুসা পরামর্শ দিয়েছেন, সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে। কারণ, তা তার কাজও নয় এবং সে জন্য তার কোনো প্রশিক্ষণও নেই। ১৯৭১ সাল থেকে তিনি সবাইকে সবক নিতে বলেছেন-"Neither God nor history forgives those who do not learn from past mistakes and repeat them."

অন্যদিকে জেনারেল আরিফের কথা ধরা যাক। জেনারেল জিয়াউল হকের আমলে তিনি ছিলেন সেনাপ্রধান। ১৯৭১ ও সামরিক শাসন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি চিরাচরিত প্রথায় সেই রাজনীতিবিদদেরই দোষারোপ করেছেন। পাকিস্তান ভাঙার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাসঘাতকতা, ভুট্টোর উচ্চাশা ও ভারতের ষড়যন্ত্রকে দায়ী করেছেন। লক্ষ্য করুন 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'উচ্চাশা' শব্দটির মধ্যে তফাৎ আকাশপাতাল। তাঁর ভাষায়—

"In the final analysis Pakistan's internal mismanagement, the treachery of Sheikh Mujibur Rahman, the overambitiousness of Mr. Bhutto and the inept leadership of General Yahyah Khan contributed to converting East Pakistan into Bangladesh, no less than the covert and overt aggression committed by India."

বাংলাদেশে অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যার বিষয়টি প্রকাশ্যে এড়িয়ে গেলেও পাকিস্তানি বাহিনীতে তা অভিঘাত এনেছিল। এ যুদ্ধের পর অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, অনেকে বিবেকের দংশনে কাতর হয়েছেন। নিরস্ত্র, বিশেষ করে বাম সমর্থকরা আমার কাছে স্বীকার করেছেন এটি অন্যায় [দেখুন, আমার লেখা 'সেইসব পাকিস্তানি']। তারা এই যুদ্ধের প্রতিবাদ করে অনেকে শাস্তি পেয়েছেন, জেলেও গেছেন। কিন্তু, সেনাবাহিনী রাষ্ট্রকে গত পাঁচ দশকে এমনভাবে পরিবর্তন করেছে যে, সামাজিকভাবেই অনেকে এখনো সত্য কথা বলতে পারেন না। হয়তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলেন।

মেজর জেনারেল শওকত রিজা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে একটি ইনফ্রেনট্রি ডিভিশনের দায়িত্বে ছিলেন। পূর্বোক্ত কর্নেল কাইয়ুমের ছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাকিস্তান ফিরে আসার পর সদর দফতর থেকে একটি বই লেখার দায়িত্ব দেয়া হয় ১৯৭১ সালের ওপর। তার লেখা *দি পাকিস্তান আদর্শ* ১৯৬৬-৭১ (১৯৬৬-৭১); [সার্ভিসেস বুক ক্লাব] ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি এমন কিছু নয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য নিয়ে একটি বিবরণ দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু, বিভিন্ন সময় তার ক্রোধ, ক্ষোভ হতাশা গোপন রাখতে পারেননি। যেমন লিখেছিলেন– "But this was not the whole tragedy. The greater tragedy was the sickness in our national life, which spawned insecurity; which reduced professionalism to idolatry; which incubated every kind of putrescence which ate out the healthy marrow." [পৃ. ১৬৩]

এই মন্তব্যই সঠিক। আরো সঠিক যেটি তিনি তার বইয়ের উপসংহারে লিখেছেন। তার মতে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি জেনারেলদের বয়স ছিল ৪০-এর ওপর এবং সবার চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর হয়ে গেছিল। অর্থাৎ তারা 'ম্যাচুয়ুর' ছিল। কিন্তু 'সিভিল ওয়ার' ও 'ভায়োলেন্স' থামাতে খুব কম জেনারেলই চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রকাশ্য বিচার হওয়া উচিত ছিল। তাতে হয়তো অতীত নিয়ে পাকিস্তানিরা স্বচ্ছ চিন্তা করতে পারত। ভণ্ডামী থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। তার ভাষায়–

"Had he been tried we may perhaps have been torn out of our petrified hypocrisy. We may perhaps have emerged a cleaner people. We may perhaps have dealt honestly with our past. We may have acquired the ability to honestly recognise the consequences of our actions, we may have tried for ever greater precision in our decision making." [পৃ. ২১১]

এই শওকত কাইয়ুমকে প্রতিমাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দুটি চিঠি লিখতেন। কাইয়ুম এ সময় ঢাকায় বদলি হয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কাইয়ুম লিখেছেন এ কথা জানার পর শওকত তাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যার কথা এখনো তিনি ভোলেননি। চিঠির মূল কথা ছিল, কাইয়ুম যেন কোনো অবস্থাতেই ঢাকা না আসেন। তার ভাষায়–

"Do not come Kayyum. Keep away from it, as far as you can... Do not believe what they say ... This is not war, this is civil war and soldiers were not meant to fight their own people... I pray for you. God protect you. Take my advice. Keep away from it all, as far as you can..."

উপসংহারে শওকতের চিঠির রেশ ধরেই বলব, যা তারা লিখেছে তা কখনো বিশ্বাস করবেন না।

গ্রন্থপঞ্জি

[প্রথমে উল্লিখিত ২০টি বই ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্ন লিখিত বইগুলো দেখা যেতে পারে।]

Aziz, Kutubuddin, *Blood and tears*, Karachi, 19

Basu, Sugata, Between Monolith and Fragment . A Note on the Historiography of Nationalism in Bengal; Sekhar Bandyopadhya (ed) *Bengal : rethinking History*, Delhi, 2001.

Chattopadhay, Gautam, *Arun Shonriei Slanders Rebutted : History has vindicated the communists*, Calutffta, 1984.

Cohen, Stephen P, *The Pakistan Army,* Karachi, 2002.

Feldman, Herbert, *Revolution in Pakistan*, Dhaka, 1967.

Jahangir, B. K, *Nationalism, Fundamentalism and Democracy in Bangladesh, Dhaka, 2002.*

Haqqani, Husain, Pakistan : Between Mosque and Military, Washington, 2005.

Khan, Ayub, Friends not masters, Dacca

Nayyar, A. H and Salim, Ahmad (ed) *The subtle subversion, Islamabad.*

Qayyum, Abdul, *Zia-Ul-Haq and I*, Islamabad, 1997.

Raza, Shaukat, Maj. Gen. *The Pakistan Army*, 1966-71, Lahore.

Salim, Ahmad and Khan Zaffarullah, *Mesing up the Past,* Islamabad, 2000.

Sayeed. K. B. *Politics in Pakistan*, Newyork, 1980.

Siddiqa, Ayesha, *Military Inc.,* Karachi, 2007.

Waseem, Mohammad, *Pakistan under Martial Law,* Lahore, 1987

Williams L. R, *The East Pakistan tragedy,* London, 1971.

আব্বাস রশীদ, 'পাকিস্তান; মতাদর্শের পরিধি', মোহাম্মদ আসগর খান সম্পাদিত, *ইসলাম রাজনীতি এবং রাষ্ট্র, পাকিস্তান অভিজ্ঞতা,* ঢাকা, ১৯৯২।

এ.টি.এম হামিদুল হোসেন তারেক, *জলছবি '৭১,* ঢাকা।

খোন্দকার আবদুল হামিদ, 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক,* ঢাকা, ১৯৮৭।

জয়া চ্যাটার্জী, *'বাংলা ভাগ হলো,* ঢাকা, ২০০৩।

জিয়াউর রহমান, 'একটি জাতির জন্ম', *বিচিত্রা,* ঢাকা, ১৯৭২

জিয়াউল হক, 'পাকিস্তান ও ইসলামী মতাদর্শ', হাসান গারদেজি ও জামিল রশীদ সম্পাদিত, *পাকিস্তান : ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি,* ঢাকা, ১৯৮৬।

তপন বসু, প্রদীপ দত্ত, সুমিত সরকার প্রমুখ, *খাকি প্যান্ট গেরুয়া ঝাণ্ডা,* কলকাতা, ১৯৯৩।

তাজউদ্দীন আহমেদ, *ডায়েরী,* দু'খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৯, ২০০০।

বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র,* ঢাকা, ১৯৮৩।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা,' *পাক্ষিক জনকণ্ঠ,* ২০০৩।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম,* ঢাকা, ১৯৯৫।

মুনতাসীর মামুন, *সেই সব পাকিস্তানি*, ঢাকা, ১৯৯৯।

মুনতাসীর মামুন, *যে সব হত্যার বিচার হয়নি*, ঢাকা, ২০০০।

মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, পাকিস্তানিদের *দৃষ্টিতে একাত্তর*, ঢাকা, ২০০৫।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, কলকাতা, ২০০০
শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, ঢাকা।

সন্তোষ গুপ্ত, 'ভূমিকা', হাসান গারদেজি ও জামিল রশীদ সম্পাদিত, *পাকিস্তান : একনায়কতন্ত্র ও সংকটের স্বরূপ*, ঢাকা, ১৯৮৬।

পরিশিষ্ট ঃ ১

Verdict of history
Masud Mufti

On December 16, twenty-five years ago, the Indian army entered Dhaka as a victor. Outwardly, I witnessed it with stunned silence, but inside my feverishly agitated mind was recalling what I had read about three weeks ago.

It was November 24, Three days had passed since twelve divisions of Indian army, aided by air force, had openly attacked East Pakistan on five fronts but, to everybody's surprise, Pakistan had not complained to the Un Security Council. I happened to glance through the copy of a dispatch by a foreign correspondent sent to his newspaper abroad painting three possible scenarious of the impending Indo-Pakistan war. One of these was that Pakistan might go for a mock war and quick surrender, because the loss of face for Gen. Yahya Khan would then be far less for surrendering to the Indian army than to the Mukti Bahini. With that face he was hopping to continue to rule the remaining Pakistan.

With anger rushing to my face. I dismissed this projection anti-Pakistan foreign journalist, but the subsequent events unfolded themselves in such an incredible manner that my surge of anger on Nov. 24 gradually changed during the course of war into a silent question mark by December 16, 1971.

On return to Pakistan in 1974 after captivity in India, I read the book ``Pakistan's Crisis of Leadership" written by Maj. Gen. (Retd) Fazal Muqeem Khan to know the total war was fought in both the wings of the country. The description almost sounded like an eacho of the press dispatch of Nov 24, `71.

The projection of the coming events before the war by an outside observer and the performance evaluation after the war by our own military expert are amazingly identical, because the projection was based on observation of the conduct of our leaders in handling the situation in East Pakistan for quite some time. In addition, the observers were also fully familiar with the 23-years history of Pakistan up to 1971. They had a very clear perception of the army-feudal axis which not only ruled the country but had repeatedly demonstrated in the past that it was bent or retaining its dominance by any means whatsoever. This axis had always inwardly felt threatened by East Pakistan-Firstly, because the non-feudal Bengali was more vocal and politically than conscious than the docile and traditionally oppressed West Pakistan in

a feudal setting, and, secondly, because his association with the army was that of an objective citizen, unlike that of the generations of job-seeking West Pakistanis. Many straws in the wind were clearly indicating to any intelligent observer that this axis would rather get rid of Fast Pakistan than allow its domination to be diluted. The deceptive pretence of losing inherent challenger in mock combat with a visibly powerful enemy provided an easy way out for the power hungry.

It is an affront to the nation's right to know everything that even after a quarter century since the 1971 debacle we know only the patently visible facts without any proof of the hidden motives. Many of the material witnesses authored such writings as try to justify the individual or institutional role with out unravelling the inner thinking of the main actors or attempting to fix responsibility. Most of these narrations are thus mere scratches on the surface. If not skilful evasion of truth. The only official window Hamoodur Rahman Commission Report. could provide a peep into reality, was slammed shut by the same omnipotent army-feudal axis Further research on the subject in neither facilitated by the concerned quarters nor missed by the anti-research psyche of today's Muslims.

In the absence of cogently hard facts. therefore, we are being forcc .o rely mostly on circumstantial evicence and the established maxim of law that "men may tell lies but circumstances do not. ``This circumstances, when combined with some books on the subject (written by Maj. Gen. (retd) Fazal Muqeem Khan, Hassan Zaheer, Dr Safdar Mahmood, G. W. Chaudhury, Lt. Gen (retd) Farmar A'li Brig, Siddiq Salik and some Indian writers) pose wide-ranging questions.

Some of these questions focus on the half-hearted, unprofessional and inexplicable manner of fighting the war in both wings of the country. For instance, with the established strategy that the defence of East Pakistan lay in West Pakistan (a) why there was a fatal delay of 13 days inactivating army operations on the western front between November 21 and December 3, 1971, (b) why the strike from West Pakistan on December 3 was half-hearted and ineffectively limited, (c) why the main counter-attack from West Pakistan was repeatedly postponed and ultimately abandoned, (d) why the air force was ``conserving" itself, instead of fighting, (e) why there was almost total absence of inter-service co-ordination, and (f) why the war strategy was not regularly revised in line with the constantly changing ground situation? It is almost impossible to draw a line between the roles of GHQ in Rawalpindi, and the Eastern Command in Dhaka. They were supplemental, inter-mingling and overlapping to the extent of being

congruent. None of the can pass the blame solely on to the other.

Other questions focus on bungling at diplomatic and political levels. For instance, (a) why did Gen. Yahya postpone the National Assembly session scheduled for March 3, 1971, without announcing a new dat against the clear warning of the Governor of East Pakistan about grave consequences of such a course, and the conditional willingness of Mujib to accept postponement only if a new date was announced? (b) why the issue of India invasion on Pakistan soil was neither raised in the UN Security Council, nor agitated in the world information media thereby allowing full freedom to India to dishonestly twist facts to its own advantage, (c) why false hopes of Chinese help were repeatedly fed by Islamabad to East Pakistan after December 5, 1971, and (c) why the wrong information from Islamabad about the possible drop of Chinese para-troops preceded the safe para-drop of Indian forces near Tangail on December 11, 1971? This measure considerably strengthened the Indian military position and hastened the fall of Dhaka.

Still other questions focus on national obligations. For instance, (a) why the nation in general, and the to-most body for crisis management (the Emergency Meeting) in particular, was deliberately fed wrong information by Gen. Yahya Khan and his confidants, (b) why did Yahya Khan refuse to receive telephone calls from the Governor of East Pakistan. Dr. A. M. Malik at the crucial hours, (c) why the report of Hammodur Rahman Commission was not published? and (d) why public trials of those were not held who were responsible for the debacle?

The absence of authoritative answers, or even satisfactory explanations, to these and many other similar questions, lend considerable support to the pre-war projection and post-war evaluation mentioned above. Hind-sight created by the foregoing visible and circumstantial evidence raises and accusing finger against all the three main actors-Yahya, Bhutto and Mujib.

Their self-serving modus operandi was shamelessly blatant and brazen. With a view to remaining in power at all costs Gen. Yaha was playing the other two against each other. After securing an understanding form Mujib for retaining him as the President he organised fair elections in West Pakistan to attain a balance among the parties in West Pakistan, but the elections in East Pakistan were deliberately unfair due to the open support of administrative machinery to Mujib to give him a sure edge over Bhutto combined with other political paties in the country. After the election, therefore, he publicly referred to Mujib in a Press conference in Dhaka in Jabuary 1971 as the future prime minister of Pakistan. (This

was, incidentally, the only time he said so).

But Yahya's strategy when, by winning 160 out of a total of 162 seats for East Pakistan Mujib emerged much stronger than Yahya's calculations and wore his true colours. Mutual suspicions soon grew between them which were skilfully exploited by Mujib's connections. The disillusioned Yahya then developed an understanding with Bhutto, whose dram for power was equally shattered by the rise in Mujib's strength. He was not willing to play the constitutional role of opposition and came out with a strange proposal of sharing power with Mujib at the centre.

The ruthlessness of Yaha and Bhutto for an unconstitutional grab for power brought them together. The two power hungry accomplices then conveniently allowed East Pakistan to be devoured by the Indian might without offering genuine resistance, each of them secretly hoping ultimately to outwit the other for the final prize.

All the three actors were suitable rewarded: Mujb became the head of Bangladesh, Bhutto became the head of the remaining Pakistan. and Yahya escaped the wrath of the nation with Bhutto's help in avoiding a public trial and suppressing the publication of Hamoodur Rahman Commission report.

In the long-drawn drama of mutual deception hoodwinking the two politicians got the better of the soldier but the Pakistani national, and the Muslim of the subcontinent, suffered an irreparable loss.

On the twenty-fifth anniversary of this great national tragedy my memories of 16 December 1971 recall another great tragedy in the history of Bengal and the subcontinent. In 1757 the battle of Plassey, fought between the East India Company and Nawab Siraj-ud-Dawlah of Bengal, decisively turned the course of history towards the subsequent British conquest of the subcontinent. The British commander, Clive had secretly bribed Mir Jaffar (Nawab's commander) with the promise of making him the Nawab. In the thick of battle, Mir Jaffar deserted Siraj-ud-dawlah, along with a large contingent, and crossed over to the British side. The battle was lost to the British,-and sow as India in the long run. Mir Jaffar was crowned as the Nawab.

History has recorded on the basis of irrefutably hard facts that Mir Jaffar's sole motive was purely lust for power. Such hard facts relating to 1971 have not reached us because even the fingerprints have been deliberately erased, but the inescapable circumstantial evidence clearly establishes that the same motive was again operative in 1971 also. The only difference was that, instead of one in 1757, thee were three Mir Jaffars in 1971.*s

পরিশিষ্ট ঃ ২

PM's selective review o history

Husain Haqqani

During the last six weeks, Prime Minister Nawaz Sharif has repeatedly pointed out that military action in the former East Pakistan was a grave mistake. During his visit to Bangladesh for a summit meeting with his Indian and Bangladeshi counterparts. he visited the memorial commemorating Mukti Bahini martyrs. These men were rebels in united Pakistan, who fought against the Pakistan army with assistance from India. Mr Sharif's admission of the mistake of military action prompted Bangladesh to demand an apology and for renewed calls from some Bangladeshis for monetary compensation and reparations. The Prime Minister repeated his remarks about the 1971tragedy in Karachi, when he went to pay tribute to martyrs of the MQM. Here he even forked out Rs 50 million in compensation to the relatives of MQM members killed in police action in the city since 1992.

The thrust of Mr Sharif argument seems to be that Pakistan would not have been divided if the mandate of the Awami League had been nonoured. His purpose, obviously, is to defend his own mandate, the legitimacy of which is being increasingly questioned. No one would dispute that military solution for internal political crises are usually the wrong recipe for national integration and that electoral mandates must generally be respected. But the motives of Mr Sharif's foray into an incomplete review of Pakistan's history are open to question.

The events in then East Pakistan following the 1970 General Elections were undoubtedly a national tragedy. But military action was only one element of the inability of West Pakistanis in general to assess the sensitivities of their Bengali compatriots. East Pakistan were treated as second-class citizens soon after independence Their languages was refuse recognition as early as 1948, leading to riots. Constitution-making was repeatedly delayed because of the Western wing's inability to accept tht Bengalis constituted a majority of the country's population. That is why the military action in 1971 cannot be isolated from the history of the preceding 23 years.

Following Awami League's massive triumph in the 1970 General Elections, West Pakistani political and cultural arrogance translated into the decision to suppress the Bengalis with force. If Mr Sharif's genuine in his desire to review history and make amends. he must also acknowledge the role of the entire West Pakistani political leadership in

the events leading up to the military action. The main West Pakistan-based political parties, including the Pakistan Muslim League (which was then divided into three factions) opposed transfer of power to the Awami League.

West Pakistan public opinion strongly supported military action. It can be argued that the application of force in Bengal was merely an extension of the dominant political way of thinking in West Pakistan. Some excesses in the course of military action are, of course, the responsibility of the military leaders. But blame for the debacle as a whole must be shared by all in positions of leadership in the Western Wing. It was not a simple case of refusing to accept the Awami League's mandate. The west and the east had started thinking differently and separate mandates were handed down in 1970. These mandates clashed. and one was backed by military might. The real mistake was not the military action alone but the entire way of thinking which led to concentration of power in West Pakistan.

The crisis in East Pakistan was aggravated further by India's involvement. It is unfortunate that in his keenness to justify and defend his mandate, Mr Sharif is totally glossing over the Indian role. If Pakistani military action was a political mistake Indian moves in the eastern theatre were naked aggression. To condemn one without so much as mentioning the other is tantamount to condoning it. One wonders whether the Prime Minister's statements against Pakistani military action, without referring to Indian aggression in then East Pakistan are really inadvertent.

There are those who believe that Mr Sharif does not really inadvertent.

There are those who believe that Mr Sharif does not really have a view of history or even of regional power equilibrium. He only thinks in terms of acquiring and consolidating his own power. Having secured absolute control over the civilian instruments of political power, the argument goes, the Prime Minister must now ensure that his mandate is not thwarted by the armed forces, Pakistan's armed forces have refused to play any political role and are content with their role ad defenders of the country's frontiers. They accept the supremacy of the constitution and act under orders of the elected civilian leadership. But some of Mr Sharif's advisers and associates believe that one can never be too sure about the security of one's mandate. Let the nation. Let the nation be reminded of the errors of previous military leaders and that would deprive present and future army commanders of public support.

This approach is too limited and fraught with hazardous consequences. The Prime Minister is repeatedly telling the nation that our military was fighting for the wrong reasons in East Pakistan. He has also implicitly supported the contention of his ally Altaf Hussain that the army was responsible for undermining the MQM's mandate in Karachi, In both cases, Mr Sharif has carefully omitted mention of Indian involvement and the violent actions of the groups which received Indian baking. Thus, the mistkes of Pakistan's armed forces are being admitted and projected by the country's Prime Minister. the nation's enemy is being left off the hook. The next time Indian intelligence plans an operation inside Pakistan. To distract attention from mutnies within India, we will hardly a case left to present to the world.

If there is to be a review of history, whether of East Pakistan or of anti-insurgency operations in the remaining part of the country, it should be objective and complete, Selective admission of historic mistakes will only undermine national determination and resolve. In case of East Pakistan. for example, the review must start from 1947. Blame must be apportioned to the Muşlim League leadership, which sowed the seeds of Bengali discontent and other West Pakistani politicians for refusing to share effective power long before the 1970 elections. The Ayub Khan era must be reviewed as well. The culmination of the tragedy the military action of 1971 must surely be examined but not without its civilian, political and regional context. Similarly, the excesses during the police action in Karachi must be analyses and condemned. But so should the fascist practices and covert international connections of these whose mandate was allegedly undermined by the military operation in 1992.

Mr Sharif cannot invoke bits and pieces of historical evidence to justify a free hand for himself on grounds of his dubious mandate. If truth is what he is looking for, he should also talk about the thwarting of popular will from 1977 to 1988. He should acknowledge his own error in becoming part of a military regime. He should admit the lapses of his mentor. General Ziaul Haq. in seeking to replace democracy with an authoritarian system. He should make public the role of elements within our national security apparatus in the creation of the IJI and his own rise to national prominence in 1988. He should allow review of the alleged secret intelligence fudging of his own election in 1990.

Mr Sharif's fascination with electoral mandates and their historical significance may have started in February 1997, when he himself received a mandate with only 93 percent of eligible voters

casting their ballots. But the actual history of elective politics and its interaction with authoritarianism in Pakistan goes back much farther.

The Prime Minister would do well to heed the lessons of history in entirety. For example, he must also remember that mandates sometimes lose significance when those receiving them fail to deliver on their promises, Sheikh Mujibur Rhaman's massive mandate in 1970 (much more massive than Mr Sharif's) simply disappeared into thin air in 1974 amid failed promises and his own megalomania.

The real guarantee for a mandate lies not in amassing arguments for why it should not be thwarted but in earing respect for it from the people. Sheik Mujibur Rahman managed to save his mandate against military action. But he could not save himself form his own people. Legalistic and historic arguments cannot serve as a defiance when people get angry over nepotism, corruption, rising prices, a failing economy, ineffective law enforcement, and unemployment. For success. Mr Sharif needs good policies and better governance, not selected admissions of mistakes made by other.

পরিশিষ্ট ঃ ৩

Who is to blame for '71 crisis?

M. H. Askari

Following certain remarks made by Prime Minister Nawaz Sharif during is recent tour of Dhaka about the breakaway of the former e astern wing of the country, there has been a bitter media debate over who was to blame for the excesses allegedly committed during the army action there in 1971 and whether or not Pakistan owed an apology to Bangladesh for what happened.

There are clearly two aspects of the 1970-71 crisis : one, whether the secession of erstwhile East Pakistan could have been averted, and, two, whether the manner in which the secessionist impulse among the people there was handled was the best or only way to deal with it.

In tracing the genesis of the breakaway movement, there is that it certainly did not erupt suddenly with the elections of 1970. The question has been asked time and again whether the dominant elements is Pakistan's ruling elites did not from the outset pursue policies which aggravated rather than narrowed down the cultural, political and economic disparities between the two wings of the country.

It is a matter or record that the veteran Muslim League leader of undivided Bengal, Abul Hashim, actually raised the demand for a separate Bengali state in the session of the All India Muslim League Council in New Delhi in 1946 on the plea that the March 23, 1940 resolution of the League had to be interpreted as an endorsement of the demand for two separate states. Along with Shaheed Suhrawardy, Abul Hasihim had been the architect of the Muslim League in Bengal during the critical phase of the struggle for a homeland for the Muslims of the subcontinent and represented the will of the Bengali people at the grassroots level.

However, he and the elements represented by him were passed over in the Muslim League Council session of 1946 and the Lahore resolution was amended in a way to establish that the intention had always been to demand a single state and not more than one state. Did Abul Hashim and other Bengali leaders who were in harmony with his thinking have the premonition that within the setup of a single state, the people of Bengal despite their majority, would have to live under the domination of a highly centralised government, with no regard for their own aspirations and political and cultural identity? It has been suggested by several eminent scholars that soon after the formation of

Pakistan. the conflict between those who claimed to represent the popular and more radicla elements in Bengal and others, who were more conservative, had begun. Prof Khalid Bin Sayeed has expressed the view that once Pakistan had come into being, the central leadership adopted the perception that ``a significant number of influential Bengali Muslim were probably not completely loyal Pakistan. ``It was openly suggested that in matters such as the Bengalis' insistence upon retaining the Bengali language and culture, it was evident that they were under the influence of ideas from across the border.

The Muslim separatist movement had almost always been dominated by the Urdu-speaking leadership belonging to the northern parts of the subcontinent. Prof Sayeed contends that strong elements among them, specially those under the influence of the thinking of Jamaat-i-Islami, tended to regard the Bengali as well as Muslims from many other non-Urdu speaking parts of the subcontinent as ``not really pure and strict Muslims, ``almost ``an inferior breed who needed to be purified more rigorously. ``Such thinking in the western wing, even among sections of the intelligentsia, reached near-hysteric proportions during the crisis of 1970-71 and was perhaps even encouraged by certain vested interests who believed that dumping East Pakistan was the only way to deal with post-election situation.

However, even Prof. G. W. Choudhury, who subscribed to the belief that Bengali nationalists like Sheikh Mujibur Rahman always wanted to have a separate state of Bangladesh. Concedes that thought at the outset Pakistan had adopted a parliamentary system of government and a federal constitution. This remained only the outer trappings. They were designed to provide a cloak for 'rule by the few who were able to concentrate power in their hands. ``He was emphatically of the view that during eleven years (1974-58) of so called parliamentary system, neither the system nor the federation was genuine. Thos even prompted the Electoral Reforms Commission of Pakistan to say in a report in 1956 that Pakistan had held no general elections, even such provincial elections as were held had been no more than ``a farce a mockery and a fraud upon the electorate."

One would tend to agree with Prof. Choudhury that the failure of democracy in Pakistan led to the emergence of a powerful civil-military bureaucratic elite, almost entirely dominated by West Pakistan, and they were the ones who wielded real political and economic power. Even in purely provincial matters, all the key posts in the East Pakistan administration were held by West Pakistan with direct access to the

ruling elite at the centre.

A senior civil servant from Punjab had the temerity to give a Bengali Muslim leader of the stature of Suhrawardy 24 hours to move out of East Pakistan.

With the rise of Ayub Khan to power, the army which was until then supporting the ruling bureaucratic elite from the outside came into the open. In the state of affairs which then prevailed. to quote Prof. Choudhury once again. it was only through participation and sharing of responsibility that the Bengalis could have developed a national sentiment but this was not to happen. In the situation that the Bengalis found themselves, religion failed to serve as a binding force with the rest of Pakistan.

To make matters worse, the country's economic resources were almost all entirely under the control of the West Pakistan-based bureaucratic elite. While East Pakistan earned most of the country's foreign exchange, a much larger share of it was spent on the development of West Pakistan. A report compiled by certain economic experts of the planning Commission in 1970 established the fact of the increasing disparity between the economic development of the two wings, with ``a widening gap between the income of the average West Pakistani and of his (poorer) Eastern counterpart."

Prof. Choudhury has also gone on record to say that in 1969 when he joined Yahya Khan's cabinet, he discovered that the intelligence authorities used to render elaborate briefs to the Cabinet merely on matters such a labour or education policy and their ``real reports" on the political situation was meant only for Yahya Khan and his inner junta. Never during his two years in the Cabinet did Dr. Choudhury see any ``real and meaningful reports on vital matters such as defence, foreign affairs of political policies and programmes."

The turning point in the situation in East Pakistan developed after Mr. Bhutto and the PPP decided not to attend the Constituent Assembly meeting in Dhaka scheduled for March. 1. 1971. But the responsibility for what followed was entirely that of Yahya Khan and his junta. According to ``one able officer" quote (but not named) by the American scholars Richard Sission and Leo Rose. authors of one of a most definitive study of the 1971 crisis. Yahya Khan declared in ``an important meeting" on February 20 that Mujibur Rahman was not ``Behaving" and he needed to ``sort this b...out" and test his loyalty. The following day (Feb 21). Yahya khan dismissed his civilian cabinet. one major reason for which was that it could have been a "nuisance" if and

when military action had to be taken in East Pakistan and with five of the misters belonging to the eastern wing it was impossible to discuss the East wing crisis in the cabinet.

At a subsequent high- level meeting Yahya Khan announced his intention to renege on his announcement to convene the Constituent Assembly at Dhaka on March. 1. The President also decided to impose strict Press censorship and ensure a "tighter enforcement of martial law. "in the eastern wing by combining the posts of governor and martial law administrator, Admiral Ahsan, who had persistently opposed military action, immediately asked to be relieved of his responsibilities as governor in Dhaka. If appears that in the last few days of February. Communication between Dhaka and Rawalpindi were virtually at a standstill and East Pakistan was unaware of what was happening in the President's House.

When the negotiations in Dhaka between Yahya Khan and his aides on one side and Mujib and his aides on the other in the third week of March 1971 broke down, Yahya Khan directed Generals Tikka Khan and Rao Farman Ali to "finalize the drafting of operational orders for military action. "It was then discovered that Gen Rao Farman, along with another General, Khadim Raja, had already started drafting the operational orders a week earlier. This surely could not have happened at the instance of political leaders such as Bhutto but only at the behest of the army high command.

In the words of Professors Rose and Sisson, Yahya, under pressure from his army command, choose o "pursue a military solution according to plan" when the chances of a negotiated settlement with the Awami League diminished. The estimates of civilian casualties after the onset of the military action range from thousand to hundreds of thousands.

Among the perceived objectives of the Operation Searchlight (the code name for the army action) were the arrest of the top leaders of the Awami League, and the neutralizing of "the more radical elements" in the eastern wing such as students, intellectuals, the journalists. According to some senior army officers who were involved in the operation. the chaos in the streets and the road blocks, combined with various forms of people's resistance led to the army action being unusually aggressive, rather than in the nature of a selective search and neutralization of the radical elements.

It is significant that two of the senior most and most competent military persons who were in East Pakistan when the crisis there

reached its peak. i.e. admiral S. M. Ahsan and Lieut. Gen Sahabzada Yaqub Khan, were firmly opposed to the form that the military action assumed. Yaqub Khan had drawn up the much discussed Operation Blitz but that was in the context of the situation as he assessed it on the eve of the 1970 elections, and not after the results were known and the Awami League became entitled to being trusted with political authority on the basis of the results.

As for the political antecedents of the 1971 debacle, they had their root in how the eastern wing was governed by the highly centralized ruling elite initially from Karachi and later from Rawalpindi, after the capital was shifted to Islamabad.

As has been said, it was indeed an ``artificial situation in which the majority felt itself dominated by an elite from West Pakistan composed of top civil and military official ``A lot of the ruling elites in successive governments at the centre contributed to the making of the crisis which finally erupted in 1970-71-not much different from the murder plot in Agatha Christie's Murder on the Orient Express.

পরিশিষ্ট ঃ ৪

Thoughts and afterthoughts

What we need is a Truth Commission

Altaf Gauhar

At a banquet in Dhaka hosted by Sheikh Hasina Wajid, Prime Minister of Bangladesh. on Friday 16^{th} of January 1998, the PM of Pakistan, Mian Nawaz Sharif made the following observations :

``We have a shared past and a common future Several eminent personalities of Bengal are remembered in Pakistan with respect, their role etched in our history and their memory enshrined in various boulevards and avenues of our capital, Islamabad. Let us work together to reshape the destiny of our teeming millions, so that together we can march toward the 21^{st} century in dignity and honour.

``Even today I feel that had the results of the 1970elections been respected, the history of the region would have been different. It is only when we do not respect the principles of democracy or the sanctity of the ballot box do problems arise. External inimical forces are always there to exploit our mistakes. Let us learn from the mistakes. Let us learn from the mistakes of the past and build a better tomorrow for our people."

These observations form the concluding part of the written text of the PM's speech to which the Government of Pakistan stands formally committed. For the first time since military action was launched in Dhaka in Dhaka on the night of 25^{th} March, 1971, a duly elected Prime Minister of Pakistan has admitted in clear and unmistakable terms that the government of the day failed to respect the results of the 1970 general elections, universally recongnised ad free and fair, which gave a clear majority in the National Assembly to the Awami League under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman (father of the present PM of Bangladesh).

The sanctity of the ballot box was violated by a military ruler, General Yahya Khan, who had seized power in violation of all constitution provisions and democratic norms. The Supreme Court of Pakistan declared Yahya Khan a usurper on an application filed by my wife Zarina, for my release from unlawful detention, in the historic Asma Jilani case. The usurper and those who were closely associated with him in the conspiracy to subvert the democratic process came to occupy all important civil political offices and proceeded to

government the country as martial law administrators. Not one military officer was impelled by any oral or legal consideration to dissociate himself from Yahya's act of usurpation. They were all a party to the conspiracy to disrupt the democratic process. Senior civil officers a bunch of opportunists played an important, though totally subservient, role in devising the means to promote the dastardly conspiracy. They had all convinced themselves that the democratic system of government was not suited to Pakistan.

But the usurper and his collaborators were compelled to maintain a democratic facade. General elections on population basis, under the system of direct franchise, were held in December 1970. Every device was used to influence and control the voting process to suit the purpose and design of the usurpers. But the broad mass of the people refused to be bribed and browbeaten in the exercise of their right of vote. Out of a total of 313 seats in the National Assembly, East Pakistan's Awami League secured 167. All the other political parties were virtually wiped out except Zulfikar Ali Bhutto's Pakistan People's (PPP) which got 88 seats in West Pakistan. The people shattered the plans of the usurpers to divide the electorate and form a civilian government composed of splinter groups without majority support in any part of the country.

That is the situation which Mian Nawaz Sharif was recalling when he said in his banquet speech in Dhaka : "Even today I feel that had the results of the 1970 elections been respected the history of the region would have been different." How were the results of the election violated? How was the will of the people frustrated? And how was the history of the region distorted? These questions continue to haunt the people of Pakistan. They want to know the truth. They reject the pleas that the truth might hurt national interests. Truth never hurts. In ennobles the nation by identifying those who acted against the people. The humiliating ceremony of surrender of the Pakistan Army in Dhaka shattered our national interests and resulted in the dismemberment of the country. The enemy knows everything connected with are being kept in the dark under the pretext of national interests. Truth can cause no further damage to our interests : indeed it may help us to salvage some of or dignity and give us the courage to face the facts

Twenty seven years have passed since the military action was launched which resulted in the separation of East Pakistan. The official records of the events that changed the history of the region remain buried in the archives of the GHQ and other offices of the Federal Government. The extent to which these records have been tampered

with is not known. Some members o the gang of usurers have published their memories which the people have dismissed as self-serving and unreliable. It is time to declassify all the official documents. Including the records of the GHQ. So that the events of 1971. which marked a turning point in our history, cab be examined and analysed in an objective and independent manner. Hiding the truth will make it impossible for us to learn from our mistakes.

A week after his speech at the Dhaka banquet Mian Nawaz Sharif told a public gathering in Karachi that his government would take action against all those who played foul during the previous governments and acted against the stability and integrity of the country. He observed that ``he had no doubt that former East Pakistan was separated in order to rule over West Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman had majority seats in the NA and he deserved the right to become the PM. "The PM must have gone through the official records before he was left with no doubt in his mind that the separation of East Pakistan was the result of a conspiracy hatched by a group of persons holding high offices and influential political positions who could not tolerate the thought of Sheikh Mujib becoming the PM of Pakistan. They conspired to get rid of East Pakistan so that they could establish their control over West Pakistan. Who were the people who hatched this conspiracy? How did they execute their plans? From the statement of the PM it is clear that he has the answers to these questions. Before he can proceed to have the conspirators tried in a court of law. according to due process, he must take the people into confidence by disclosing all the evidence. If he fails to do that his statements and actions will be treated as partisan propaganda.

Even those of us who witnessed the tragic events of 1971 had no access to the truth because the Press was under strict censorship and the official media had lost all credibility. We known that before launching the military action General Yahya designated Sheikh Mujib as PM-designate. But no one knows how and why he changed his mind. know that Sheikh Mujib declared that he would realise his six-point programme. "No power on Earth would be able to frustrate the legitimate demands of Bangladesh."

We know that Zulfikar Ali Bhutto, the leader o the majority party in West Pakistan, was not prepared to occupy the opposition benches in the NA. He wanted to come to power immediately to fulfill the pledges made by his party to the people. Bhutto wanted both the Awami League and the PPP "to share the responsibilities of the country as the

majority parties." Was Bhutto trying to frustrate the results of the elections by terming majority rule as a form of tyranny? Was he acting independently or was he is league with the usurpers? The fact the he became the Deputy PM and Foreign Minister in a government formed by General Yahya Khan before the secession of East Pakistan would suggest the he had become a collaborator.

When was the plan of military action drawn up? Before of after the elections? We learn from one of the collaborators that the plan was prepared by Sahibzada Yaub Khan. Commander Eastern Command and Martial Law administrator. East Pakistan, and it was given the bloodcurdling name of Operation Blitz'. Where is that plan and what are its contents? Did the military action follow that plan? How many people were killed? Fie million? Three million? Or one million?

In and interview with Oriana Fallact, Bhutto said in April 1972, when he had become PM of Pakistan, that he was being wrongly associated with the military action. "But how dare they try to discredit me by an incident so barbarous and stupid? The whole business was conducted in such a stupid way .... I would have done it with more intelligence, more scientifically, less brutally ." About the number of people killed. Bhutto said "According to what I have been able to find out so far, there must have been something like 50,000. Mind you, too many. Even if the action was morally justified. I am not trying to minimise things. I am trying to bring them back to reality-there is quite a difference between 50,000 and three million."

Why rake up the past ? Because unless we do that we will never understand our present our will we be able to "reshape the destiny of our teeming millions" as the PM promises to do. This is precisely how Nawaz Sharif should proceed if he wants to establish the truth about the events which resulted in the dismemberment of the country. As a first step he should order the publication of the Hamoodur Rahman Commission report and place it before the NA for discussion. If the report is found to be inadequate because of its restricted terms of reference, we must set up a commission, headed by the Chief Justice of Pakistan with two other judges drawn from the Commonwealth countries, to establish the truth and the whole truth. Such a commission would need the whole-hearted support of the COAS to complete its job effectively. The questions of offering an apology or providing redress and compensation are all of secondary importance. The first thing is to establish the truth and to project it.

The Nation, 8.2.1998

পরিশিষ্ট ঃ ৫

Observer's column

East Pakistan returns !

Brigadir (Retd) A.R. Siddiqi

Could we be ever rid to the ghosts of our past? Hardly ! They may well be buried but scarcely banished from our memory the ghosts of East Pakistan would seem to have returned with a vengeance.

In addition to the string of books, a number of Press statements from Prime Minister Nawaz Sharif downward have appeared of late to revive critical interest in the subject. The question being raised in whether or not we should say sorry for the excesses committed by the then Pakistan government against the East Pakistanis.

Prime Minister Nawaz Sharif while in Dhaka for the Bangladesh-India-Pakistan Economic Summit, spoke courageously of our 'mistakes' through the 1971 crisis and civil war. If only the results of the general elections of December 1970 were accepted and power transferred to the Awami League, the majority party. The history of Pakistan might have been different. It would be right to extrapolate that the two wings of the country, instead of falling apart, would still have been together in a stable, even if a loose federal or confederal structure.

The only sane course of the government of the day to follow was to save the organic onensess of Pakistan at any cost regardless of all other political of constitutional consideration. The unfortunately was not done, to cost us the dismemberment of our majority eastern wing and military humiliation to boot.

Barely a week or so after his Dhaka speech (January 16). Prime Minister Nawza Sharif did not only reiterate his anguish over the happenings in East Pakistan but promised to punish those responsible for the foul play. He had 'no doubt' that former East Pakistan was separated in order to rule over West Pakistan'! Sheikh Mujibur Rahman had majority seats in the National Assembly and he 'deserved' to be the Prime Minister.

The PM's categorical pronouncement on a subject as sensitive and emotive as the East Pakistan tragedy reflected the kind of courage rare amongst run-of-the-mill politicians. It raised his stature as a leader of men bold enough to face the truth and speak it without reservations.

Founder President of the Tehrik-Istiqulal, Retired Air Marshal

Asghar Khan, took the cue from the Prime Minister and expressed himself even more bluntly on the issue. He said "It is apparent that even after 27 years it will be a national mistake to gloss over the events of 1971 tragedy as has been done by General "Tiger' Nazi in his recent book (The betrayal of East Pakistan published by the Oxford University Press, Karachi). The Retired Air Marshal commended the intention of Prime Minister Nawaz Sharif to punish' those guilty of the 1971 tragedy and make public the Hamood-ru-Rahman Commission report which has not seen 'the ray of light' even after over two decades of its compilation.

Noted lawyer S.M. Zafar and columnist Altaf Gauhar have both recommended the establishment of a commission of truth and reconciliation on the pattern of one formed in South Africa. Rather than as a penal court, the Truth Commission purports to act as a forum for public leaders to speak truthfully for themselves and for their contentious acts while in power. Mr Zafar believes that such a commission, if set up, should help in finding 'for all times to come' the relevant facts and historical background which led to the secession of East Pakistan.

Mr Gauhar poses the question : Why wake up the past? and goes on the answer it as follows: "Because unless we do that we will never understand our present nor (in the words of the Prime Minister) will be able to reshape the destiny of our people".............

"Truth never hurts," Mr Gauhar goes on to say, 'it enables the nation by identifying those who acted against the people. The humiliating ceremony of surrender of the Pakistan Army in Dhaka shattered our national interests and resulted in the dismemberment of the country."

The above quotes have been from Mr Gauhar's column, "What we need is a Truth Commission." appearing in the Nation, dated February 8.

At the official-bureaucratic level, however, the reaction has been altogether different. The Federal Minister for Kashmir Affairs, Retired Lt,-Gen. Abdul Majeed Malik responded furiously to the statement of a Bangladesh Foreign Office spokesman January 26 urging Pakistan to apologise for the excesses committed by the Pakistan Army in 1971 against the people of Pakistan. The Bangladesh spokesman asked Pakistan to express regret for the crimes committed against the people of Bangladesh. The spokesman reportedly used such words as geneoide and massacre (etc).

Now it is one thing for the Prime Minister of Pakistan himself to volunteer a statement regretting the tragic episode of 1971. But quite another for BD Foreign Office to demand a of 1971, but quite another for BD Foreign Office to demand a formal apology from the Government of Pakistan. Gen. Malik's rebuttal needs to be seen in that perspective of a correct appraisal. Both as a retired General and an incumbent Federal Minister, it would be only expected of him to come to the rescue of his government. His blunt refusal to tender an apology to the BD government and the people was, however, expressed in his personal capacity'?

In the context of India's naked aggression the retired General said. It would be an insult to the patriotism of those who participated in the East Pakistan Jehad to accuse them of massacre and 'genocide'. The Minister also spoke of a 'memorandum' addressed to the Pakistan government by the Bangladesh government. "I would request Dhaka not to touch this issue because it would do not do any good to the relations between the two countries." he said. The disclosure of a memorandum addressed to Pakistan raises the issue to a formal government –to-government level as a matter for serious discourse and due redressal.

Such and action should have been best avoided after prime Minister Nawaz Sharifis voluntary expression of regret over the sad event of 1971 personally in the course of speech in Dhaka. He went on to follow up his oral apology with the promise of punitive action against the wrongdoers.

The matter, in all fairness, should have rested there for the time being at least. Rather than addressing the memorandum to Pakistan, the Bangladesh government might have waited for Prime Minster Nawaz Sharif to initiate further action. That it preferred haste to patience reflects on its diplomatic sophistication.

Our Foreign office reacted almost as impulsively to BD's demarche. It dismissed the apology plea as unwarranted and unjustified. "Revisting the past can only adversely affect relations which in undesirable and inavisable." Our spokesman said.

Whereas the Foreign, Office stand makes a good deal offences in the diplomatic context. It bears little relevance to the imperatives of history. History has to be told and retold somehow. It has a way of making itself known, sooner or later, though popular folklore if denied sober recollection and interpretation. Refusing to recall the past fro fear of reviving bitter memories could make some senese only in the

context of individual relationships. Where two or more nations and their past problem and issue are concerned, those have got to be faced boldly and resolved dispassionately as far as possible.

The 1971 trauma was not just an isolated event limited to a single regime or a power-hungry group of individuals but a national tragedy with its roots stretching into the past. It was the sort of avoidable disaster made an avoidable by the force of circumstance and the fortuitous congregation of small men on either side of the fence. East Pakistan's emergent political clout in the wake of the 1970 elections came into conflict with the established military power of West Pakistan to push the country unstoppably into the valley of the shadow of death: the death of one united Pakistan of Mohammad Ali Jinnah.

Why must today's Pakistan fight shy of soberly examining and analysing the deeds or the misdeeds of the leaders of erstwhile West Pakistan ? Are we pleading guilty to something simply by refusing to face it? If Bangladesh demands an apology from us, we might as well turn a round and suggest a corporate basis for the consideration of such a demand. The fact remains that both the wings contributed to the crisis. While West Pakistan' share of blame is admittedly much larger than East Pakistan, the latter cannot be altogether absolved. As for the Army, it was inexorably sucked into the political quagmire. Mainly of the making of Mujib and Bhutto.

The Nation 18.298

পরিশিষ্ট ঃ ৬
সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের পদত্যাগপত্র

January 31,1998

Dear Altaf Gauhar Sahib.

I am writing about your column in The Nation of 25th January 1998. Although you have justly concluded that General Niazi's book needs to be consigned to the dustbins, you have asked whether I drew up the original plan of military action in East Pakistan and whether this was the plan executed by Tikka and Niazi during the early phase with or without modification I have answered these question as well as other points in the enclosed statement and its annexures.

As you know, baseless and malicious charges are best treated with contempt However, in deference to your suggestion which I believe is based on a genuine an and laudable desire to know the truth and to make it known to the public, I have addressed the points you have raised, I hope it can be. published in full. including the annexures.

Best regards

Sincerely,

(sahabzada Yaqub-khan)

Mr. Altaf Gauhar
No. 16, Street 1, F, 7/3
Islamabad

STATEMENT OF SAHABZADA YAQUB-KHAN

1. My views have been invited points (i) Did I prepare the original plan (Operation Blitz) for military action in ``East Pakistan?" (ii) Was it executed by Tikka and Niazi during the initial phase with or without modification?

2. 'Operation Blitz' was a contingency plan prepared by me in November 1970 to meet the eventuality of an insurgency and the total collapse of law and order during the period of general elections in `E Pakistan' in December '70, In this hypothetical situation. The mission was to restore order rapidly by the stringent enforcement of martial law, selective arrests of anti-Pakistan elements, vigorous implementation of orders to secure key points and vital areas using minimum force. The object was to gain swift control to be able to meet external intervention.

3. As regards the second question, I have no first hand information as I handed over command to Tikka Khan on 7 March and left Dacca on 11th march, two weeks before the large scale military action was launched. I gather it was a modification of "Op Blitz. "to fit specific situation prevailing at that time, particularly as regards tactical aspects and scale of the operation.

4. After my telegram of resignation, I continued to attend office and carry out my duties until I handed over to my designated successor General Tikka Khan. Operation Blitz was never implemented during my tenure. In fact, Government Ahsan and I strongly advised the President against any action that would invite or lead to a military solution especially after the decisive verdict of the December elections. My telegram of resignation of 5th March, attests to these facts.

"Only solution presents crisis is a purely political one (.) Only President can take this far-reaching decision by reaching Dacca by 6th which I have repeatedly recommended (.) Am convinced there is no military solution which can make sense in present situation (.) I am consequently unable to accept responsibility for implementing a mission, namely a military solution, which would mean civil war and large scale killing of unarmed civilians and would achieve no same aim (.) It would have disastrous consequence (.) I therefore confirm tending my resignation (.)

5. Two other aspects remain to be covered (i) Niazi's statement that all Yaqub faced was a rag tag mob...... but showed no desire to execute his plan of action. Niazi also refers to a discussion of ``op Blitz" in Islamabad and my being given carte blanche to execute it.(ii) General Sher Ali's question ``what is to be examined in whether he was against the use of troops in principle from the very beginning or was he against it at that particular time......?

6. My letter at Annexure `A ' answers both points raised. especially if read with my telegram of resignation and the last paragraph of this statement. Incidentally, Sher Ali was no longer a cabinet minister by 22 February when the crucial meeting took place at Rawalpindi nor did he have first hand knowledge of events in early March.

7. Central to the whole issue was my meeting with the President in Rawalpindi on 22 February (Annexure `A') The President discussed the political deadlock relating to the attendance of the National Assembly at Dacca on I march, the option of declaring a "very tough" martial law in E. Pakistan and postponing the date of the meeting of the National Assembly at Dacca, Government Ahsan and I opposed this

option. I confirmed these views in my letter of 23rd February (Annexure 'A') which was delivered to the President that day. Extracts from telegrams, in addition to telephone calls took up the same refrain resisting reintroduction of martial law and the forceful military action it necessitate, insisting on a political solution, and pressing for and early Presidential visit to Dacca for that purpose. Annexures 'B' & 'C' contain extracts from telegrams substantiating the above facts.

8. It was with sorrow that I was led to the conclusion that in view of my advice forecasting the consequences of reintroducing a stringent martial law and the President's refusal to come to Dacca early, to seek a political solution left me with no other option but to resign. I was convinced that this was the only honorable course. when a theatre commander has repeatedly conveyed his views in writing, and when in his judgment, implementing the mission would make him a willing instrument of the destruction of his country and the forces he has honour to command.

<u>Question from Napoleon's Maxims of war cited by Neville Maxwell- "India's China war p. 315-316 appears to clinch the issue in predicaments of this kind:</u>

"A C-in-C is not exonerated for his mistakes in war committed by virtue of an order of his sovereign or of a minister, when he that gives it is far from field of operations and knows little of the latest development. Hence it follows that any C-in-C who undertakes to execute a plan which he considers bad is guilty. He should give his reasons. insist that the plan be changed, and finally resign rather that become the instrument of the ruin of the Army."

ANNEXURE 'A'

Gen. Sahabzada Yaqub Khan
ML. A Zone "B"
East Pakistan House
Rawalpindi
Dated 23 Feb. 71
DO no 136/116 PA

My dear

1. Reference last evenings (22 Feb 71) meeting with the President at which the general situations resulting from the present deadlock was discussed with Government Ahsan and myself in the presence of COS (Chief of Staff) and yourself.

2. I thought it would be useful to summarise the main point which I tried to make as an aid to decision making in the critical days ahead which may well prove decisive for the destiny of the country.

a. The situation in E. Pakistan has been transformed after the election to such an extent that for an "Open sword" Martial Law action. we would not be able to enlist political support from any party or group however small, through which alone a rule with bayonets is possible. Nor could we count on civil administration/agencies including vital ones such as the police and the civil intelligence without whose cooperation we would be groping in the dark. This would be equally true for all departments including all essential services.

b. The tide of Bengali Nationalism now runs so deep that disaffection among EPR (East Pakistan Rifles) cannot be ruled out.

c. The discipline and loyalty of EBR (East Bengal Regiment) units (4/5 bns) and E. Pak. personnel generally will be put to the severest test. A small incident could flare up into a major crisis.

d. Although trouble would be concentrated in major towns Al (Awami League) workers have gone out into the country side and disturbances can be expected in mufassil (countryside) areas. These would be exploited by Naxalite elements.

e. The present serious border tension with India would add to problems of deployment.

f. Clandstine Indian support to local uprisings would by highly probable.

g. Owing to shortage of troops for these tasks we would have to adopt exceptionally severe measures resulting in considerable bloodshed.

h. For large-scale arrests, for intelligence and for general administration we would be entirely dependent on E. Pakistan whose cooperation with us in this environment would by minimal and these few persons would be branded as traitors.

i. If the situation does not escalate to this extent in all spheres we would, by Draconian measures, assisted by re-enforcements from W. Pakistan, keep a degree of control.

4. But our ability to do so is NOT the main point. The main point is ``what is the next step"? We would really be an occupation army. Can naked force without even the degree of minority political support which the Americans are enjoying in South Vietnam be the basis for holding down 70 million people? Even if we succeed we have failed. For in attempting integration by the sword we would have followed a self defeating policy.

5. I consider that the option discussed at yesterday's meeting namely re-introduction of a naked sword Martial Law at our initiative-as a remedy to the present deadlock is likely to escalate into the situation I have described above.

6. The question is would this be any better or worse than the solution of:

a. Postponement of the date of the Assembly meeting if we do not succeed in securing the attendance of major parties?

b. "Coming down with the LFO" (Legal Frame work Order) after the assembly has passed an unacceptable constitution?

7. Either of these actions could bring about an uprising leading to the same results but we could at least be satisfied that we have done everything in our power to defer escalation before launching an action that would certainly end up in the break up of Pakistan for even if we succeed in gaining control of the situation we would have to divert massive economic resources to Pakistan which would be no substitute for political power and for ``independence." Can we in the last quarter of the 20th Century attempt to assume an Imperial role?

8. The main conclusion therefore is that the present regime has gone as far as it could to introduce democracy, bring sanity to both wings and preserve the integrity of Pakistan. Let political leaders assume. or at any rate share, the responsibility for action which would lead to its break up and the resultant consequences.

9. Therefore my main recommendations are that :

a. We should not ``escalate" earlier than absolutely necessary and not at our initiative.

b. We should be quite clear what escalation implies vis a vis the ultimate political aim we would be trying to pursue.

c. While trying ``to buy time" we should make leaders of both wings see what they are heading for.

d. W. Pak leaders must make up their mind regarding ``the price" they are prepared to pay in the political and economic spheres for integration.

e. It should be our endeavour to place the responsibility for their failure on their shoulders or at worst they-at least the W. Pak leaders-must be made to share with us the responsibility for decision which are bound to lead to disintegration under the most unfavorable and bitter circumstances.

yours sincerely

BY HAND

Lt. Gen. S.G. M Peetzada SPK SQA
PSO (Principal Staff Offiver) to the President
President's House
Rawalpindi

(Original delivered personally by me to PSO (Principle Staff Officer) on 23 Feb 71 at President's House Officer)

sd/
23 Feb 71

Delivered by Principal staff Officer to President on the morning of 23 Feb. 71 in the presence of Admiral Ahsan, Gen Peerzada and myself.

ANNEXURE 'B'

Extract from telegram sent by Lt. General Sahabzada yaqub-Khan on 23rd March 1971 to Lt SGM Peerzada. PSO to CMLA.

"MUJIB's proposal is that a provisional government should be allowed to be formed by the majority party as early as possible under a Presidential order within framework of 1962 Constitution pending finalization of the new constitution which may take considerable time (.) He can not afford to wait for that owing to growing communist strength (.) DELTA (.) To forestial BHASHNI's move the strongly requests that President (.) DELTA (.) To forestial BHSHANI's move he

strongly requests that President should come to DACCA in the next few days so that above proposal with the approval in principle by President could by projected by him in his speech of 07 March which would strengthen his hand his opponents (.) Own comments (.) There may be some validity in these views but the main point obviously in that his party is hungry for power and are pressurising him (.) Moreover he claims to be able to undertake developmental projects quickly so as to show some progress to the people on this front to retain their support (.) Subject to overall considerations the proposal has merits including the important one that its implementation will take the pressure off constitution making (.) We favour this view as in the current environment it is extremely difficult for a government to function in EAST PAKISTAN without political backing (.) We therefore recommend most urgent consideration of this proposal (.) The President on his arrival here in the next few days can discuss this with MUJIN so that President's final verdict in principle is available to MUJIB before 07 March".

ANNEXURE 'C'

Extract from telegram sent by Lt. General Sahabzada Yaqub-Khan on 4th March 1971 to Lt. General Peerzada, PSO to CMLA.

"Main conclusion is that this type of situation which has now arisen can not be met or solved by force however strongly or widely applied as it is bound to be counter productive. (.) Nor must we forget the aim we are trying to achieve (.) I am still confident that by timely and bold political initiatives we can still salvage sufficient pieces to get afloat cmm but every day counts and therefore strongly recommend President's earliest possible visit to defuse Mujib's 07 March announcement........(.)*

* জেনারেল ইয়াকুবের পদত্যাগ সংক্রান্ত এইসব চিঠিপত্র আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে আলাপের সময় তিনি এগুলি আমাকে দেন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য।

পরিশিষ্ট ঃ ৭

Newsline Special

I.A. Rehman

The author makes a strong case for Pakistan tendering an apology to Bangladesh for its sins of omission and commission

A growing number of Bangladeshis want Pakistan to apologise for what was done by its forces to their people in 1971. of which the wanton killing of innocent people formed only a part. The demand has reached the government and the people of Pakistan both. It has been summarily rejected by the-at least by the foreign office. The people are divided into opinion. Many do not see any justifications for offering regrets, quite a few others do.

The issue cannot be swept under the carpet. Turning away from it won't make it disappear. It is better to face it now because its deferment will not make things west easier for Pakistan. An apology tendered today may well be accepted as a graceful, act, tomorrow it may appear as a gesture under compulsion.

The events of 1971 did not erupt all of a sudden. They marked the culmination of a process begun much earlier, in the course of which Pakistan's leaders' failure to establish a genuinely federal democracy progressively alienated the more numerous Bengali citizens of the state, and coloured the perceptions of the people in both wins. Without an objective understanding of this long process happening of 1971 cannot be properly appreciated.

Pakistan was born as a divided country and not only in the geographical sense. A majority of the population lived in the eastern wing while power was concentrated in the western part. The eastern wing was richer in terms of export earnings than the western, but its people were poorer than their compatriots in the other half. Its people valued their ethnic and linguistic identity with much greater commitment and passion than was the case with the dominant community in the western part. Within a few weeks of independence the Bengalis started releasing that not only were they culturally different from their western compatriots, they also disagreed with the latter on a host of issues concerning the state and the society. This was unhappy result of the Muslim league's failure to define and debate its ideal and allow different people to interpret Pakistan in different ways. The

situation demanded, from day one, a positive effort to resolve these differences. Instead, the gap was allowed to widen. Attempts were made to suppress the differences in the name of religion, some shared cultural attributes, and patriotism. A compromise on democratic principles was justified in terms of practical needs dedicated by geography, Unequal development investment was explained away in terms of regional capacity of benefit from it. The eastern wing's defense was visualised in terms of regional capacity for offensive against the single perceived enemy These issue could possibly have been sorted out but for the emergence of a western-based dictatorship which denied the eastern region even the limited right to democratic governance, There were people on both sides who exploited political issues for factional ends. Their existence did not create the problems. but it made them worse. By 1971 after the 1970 general election, a large section of the eastern wing's population had been converted to the idea that the western-based establishment's attitude towards them did not stem from an honest end of judgement, it flowed from a definite decision to deny them their due in both politics and economy. At the same time the majority in the western part had been led to believe that the Bengalis did not understand the demands of national unity because they did not want to.

It was only then that the Pakistan establishment began to realise the magnitude of the crisis it had on its hands. Yahya Khan thought that whatever he had conceded, after consulting the eastern wing's leader (Sheikh Mujibur Rahman), was the farthest that Pakistan could go to save the state's integrity. When things did not turn out the way he had hoped, he interpreted Sheikh Mujib's stand as treason and turned his back on the eastern part. A military operation was launched as an exercise in deception.

The events of 1971 are described variously. Pakistanis describe them as the dismemberment of Pakistan by outside forces, the Awami League's rebellion against the state, `the separation secession of East Pakistan, 'a' national debacle (though its principal author, Yahya Khan, insisted on replacing debacle with the word `setback') a great betrayal, or 'a great tragedy, The Bangladeshis are usually content with two expression-`genocide' and war of liberation. Sufficient evidence is now available to show that the events of 1971 were the consequence of the state's ruling coterie's decision to write off the eastern half of the country as a war loss thus betraying the people of both wings in different ways and in different measure.

The world at large had no difficulty in realising that the moment

the military operation began in Dhaka on the night of March 25, 1971, Pakistan had chosen to dismember itself,

Yahya could not have been ignorant of what his mentors like Kissinger were saying, or what Podgorny and Kosygin had tried to tell him. Any illusions about winning the war he had started might have been strengthened by the apparent effectiveness of the first phase of the operation (March-June 1971) but from August onwards, particularly after the signing of the Indo-Soviet treaty and the development of a consensus around the world that the Yahya regime was making a futile attempt to solve a political issue with the force of arms, there was no room for such illusions. Everything that the regime, did after that, such as the manoeuvres undertaken to resist aggression against the eastern wing and the start of hostilities along the western wing's border, was meant merely to convince his hawkish colleagues and the gullible public that the eastern wing had not been given up without a fight.

It is impossible to justify the so called war of 1971. It was an unnecessary conflict, the meaninglessness of which the Islamabad coterie was perfectly aware of a conflict begun with the purpose of losing. It was a betrayal of the officers and men of the Pakistan army in that they were deceived into giving their lives for an issue, of which the adverse outcome had already been determined by their supreme commander. And no justification could be advanced for the attacks on the the life, dignity and property of the Bengali people. The rules of combat do not apply in this case.

There is no point in arguing over the number of Bengalis killed or of the women raped. nor in recalling similar atrocities by the other side, Whatever the figures Pakistan's establishment may have concede, and whatever allowances made for exaggeration by the world media, the fact that excesses on non-combatants were committed cannot be denied. By no stretch of the imagination could all victims be described as enemies. Even if a small number of people were killed without reason and a few women dishonoured or a few children disemboweled (for which there can never be a reason). Pakistan should accept its guilt render a sincere apology. Two common arguments advanced against expressing regret are that the people of present-day Pakistan also suffered at the hands of the dictators who committed crimes against the people of Bangladesh and that they did not know what their rulers doing in the eastern wing. Both arguments are fitions and based on falsehood. True, the people of the western wing had also been deprived of their rights and their dignity. But they, in a preponderant majority, supported

the massacre of their compatriots the eastern wing. With a very few honourable exceptions, the west Pakistan population, led by politicians, academics, bureaucrats, and opinion makers, chose to back the senseless carnage, and there were many who fought over spoils.

Likewise, the plea of ignorance is too naive to be considered. It is true that the surrender in Dhaka on December 16, 1971, shocked the population out of its illusion. There were spontaneous demonstrations of anger and repentance. There was anger at the realisation of a military defeat, at the shattering of the dream of certain victory, at having been kept in the dark, at the lies told by the highest authorities, at having been cheated by the Yahya regime. Nobody was ignorant of the issues at stake, They knew that Pakistanis had been killing Pakistanis, and that when blood was split to divide a people, a parting of the ways became inevitable.

There is a stronger reason for Pakistan, the government and the people both, to express regrets for the 1971 events than the demand from Bangladesh. If we sincerely believe that in 1971 a great tragedy befell us, then a catharsis of the same order is necessary for the restoration of our mental health and our perceptions of justice and equity. So long as we believe, and continue to teach our children, that we were not responsible for killing our own innocent people in Bengal, we will never be able to understand what actually happened. We will continue to blame individuals, Ayub or Yahya, without realising the disasters their system portended, or which must follow dictatorship and one-man rule. We will never comprehend the nature of the Yahya regime and the total collapse of the Pakistani mind it represented. Had we reflected of these matters we might not have been deceived by Zia-ul-Haq or his apologists to the extent we were. If we had not killed fellow Pakistanis in Bengal we might not have found the courage to kill Pakistanis in Balochistan and in Sindh or even in Punjab. The operation in Bengla elevated a pre-existing streak of intolerance in our make-up to the level of virtuous duty and convinced us that it was right to kill anyone who did not accept our political prescription or did not share our ethnic goals or personal beliefs. The events of 1971 dealt a severe below to the psyche of the Pakistan people. The present level of intolerance and fratricidal madness in our society may be older than 50 years, but these tendencies were greatly consolidated by what we hid or allowed to be done in our name in 1971. Unless we purge ourselves of the malignant growth which deprived our collective mind of normal functions decades ago, rationalism and sanity will not return to our

actions or thoughts. The only way we can cure ourselves is to accept our guilt, not only as gestured to the Bangladeshis, whom we wish to cultivate afresh, but as an imperative of mental health, our own and of the generations to come.

Some thought should also be given to the change in human values humankind has recorded over the past few decades. The rules of war and conflict have changed as much as those of governance. There was a time when the people were slaves of their feudal lords and in that climate all the rights and all the virtures belonged to the victor. Everything was fair in war. Civilians among the defeated camp could be butchered, and their women taken salves and whole settlements erased. Happily this is no longer the case, at least in some parts of the world. Powerful nations have been obliged to express regrets to people they had wronged in earlier periods. This is because the people wish to see their history in a longer perspective. Unfortunately the Pakistan people still take a short view of history. They have made a fad of forgetting it. They have nothing to lose by learning the elementary lessons in the principle of accountability of the collective, as well as of the individual.

Newsline, March, 1998

পরিশিষ্ট ঃ ৮

Letter From General Osmany

General M. A. G. Osmay, p.s.c. M.N.A

27, Mintu Road Dacca
june 3, 1972

My Dear General Gul,

Many thanks for your letter of 14 May '72 which I received only yesterday. It was indeed a surprise, pleasant to start with then I was shocked to read its contents.

The 75 million people of BANGLADESH were subjected to the most inhuman form of genocide, rape, repression, and arson by Pakistan Armed Forces, who exhibited NOT the slightest hesitation in killing their Bengali brother offices and men. Unarmed and in cold blood-all aimed at the denial of human rights guaranteed by United Nations Charter, Indeed, history does NOT have a single instance of inhuman acts which can equal the bestial treatment meted out to our people between night 25/26 March to the day before surrender, History's most ignominous defeat, in which some 93,000 professional and very well-equipped soldiers led by their officers including a substantial number of General Officers bowed to lay down their arms and were stripped of their badges of ranks, is therefore, the justice meted by'God, such as He has always done and promised to do.

No one in Bangladesh has included your name in the list of War Criminals. I am very surprised to hear you say that-I do hope some B.....in what was Pakistan isn't trying to do you down.

Every one who knows you, has the highest respect for your uprightness, soldierly and, above all, human qualities which endeared you to all has a great gentleman.

With kindest regards formhus all including the leader.

পরিশিষ্ট ঃ ৯

CONFIDENTIAL

IMMEDIATE
HQ Eastern Command
Dacca Cantt
Tele : 251
721/R/AI

15 April 1971

	Comd 9 Div	Comd CAF
	Comd 14 Div	ACC PAF
	Comd 16 Div	OC 3 Cdo Bn
	DG FP CAF	OC Log Flt
	Comd Ep Log Area	OC 604 FIU
	CONCEP	CO 734 FIC
		OC 27 FL See
Info :	HQ MLA Zone 'B'	Det ISI
Internal :	Estb. Branch	GS Branch
Distr :	HQ Def Coy	

Subject : **Discipline-Troops**

1. Since My arrival I Have heard numerous reports of indulging in loot and arson, killing people at random and without reason in areas cleared of the anti state elements. Of late there have been reports of rape and even the West Pakistanis are not being spared, on 12 Apr. Two West Pakistani women were raped, and an attempt was made on two others. There is talk that looted material has been sent to West Pakistan through returning families.

2. I gather that even officers have been suspected of indulging in this shameful activity and, what is worse, that in spite of repeated instructions, comds have so far ailed to curb this alarming state of indiscipline. I suspect that COs and OSC units/Sub-units are protecting and shielding such criminals.

3. Here I wish to sound a note of warning to all comds that if this tendency is not curbed and stamped out at once. it will undermine battle efficiency and discipline out at once, it will undermine battle efficiency

and discipline of the Army. It is a contagious disease and you must be fully alive to its adverse effects and far-reaching consequences, some day it may well boomerang involving our own women-folk and your own person.

It's not uncommon in history, when a battle has been lost because troops were over indulgent in loot and rape.

4. I, therefore, direct that the troops must be got hold of and the incidence of indiscipline, misbehaviour and indecency must be stamped out ruthlessly. Those including officers, found guilty of such acts must be given deterrent and exemplary punishment, I will NOT have soldiers turn into vagabonds and robbers. Such elements must be given no quarter, mercy or sympathy.

5. I would also like to remind comds, that we have a sacred mission before us and we are yet very far off the goal set before us. Nothing must detract us from the fulfilment of the task entrusted to us. Indiscipline will only undermine it.

6. I would like every soldier in this Theatre to be an embodiment and an example of discipline. As far as the officers are concerned, I wish to remind them that they have a code of honour and conduct, and as gentlemen and officers I would like them to abide by it. This is necessary if we are to achieve the aim and win back the people of this Province.

7. These instruction equally apply to all intelligence agencies MP and SSG operating in East Pakistan.

Sd/-
Lt.-Gen
Commander Eastern Comd
(Amir Abdullah Khan Niazi)

Lt. Gen. A.A.K Niazi, The Betrayal of East Pakistan, Karachi, 1998.

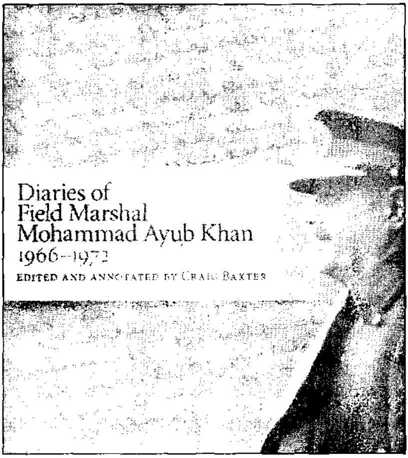
শব্দসূচি



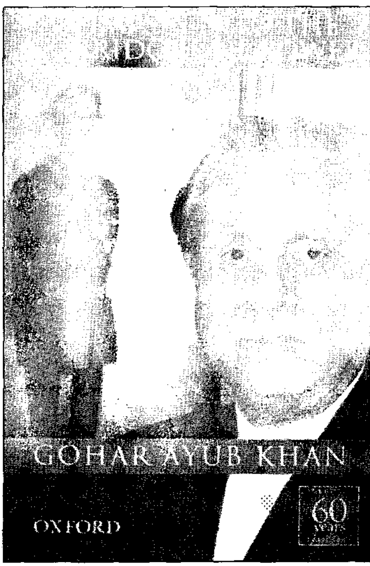
পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ঢাকায় গার্ড অব অনার প্রদান করেছেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি মেজর জেনারেল আইয়ুব খান



ঢাকায় জিওসি হিসেবে আইয়ুব খান



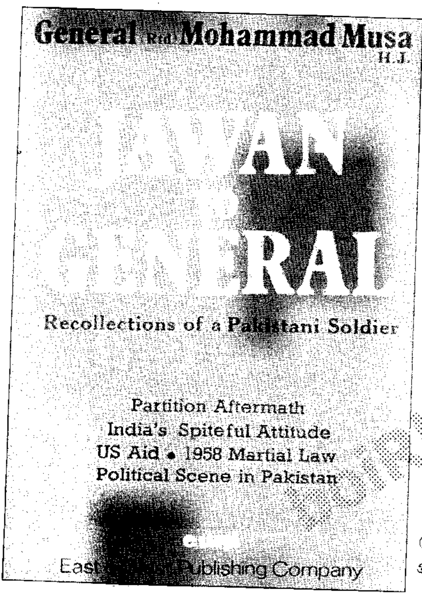
আইয়ুব খানের বইয়ের প্রচ্ছদ



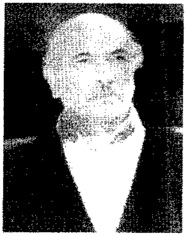
আইয়ুব পুত্র গওহর আইয়ুবের বইয়ের প্রচ্ছদ



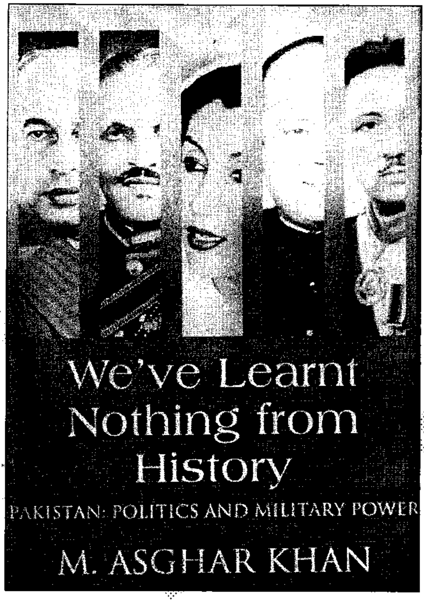
জেনারেল মুসা



জেনারেল মুসার বইয়ের প্রচ্ছদ



আসগর খান



আসগর খানের বইয়ের প্রচ্ছদ


জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

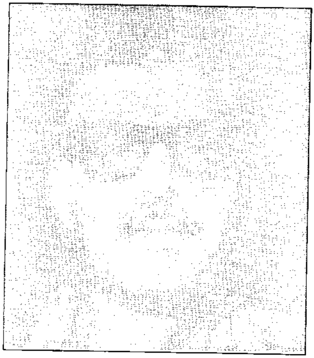

জেনারেল আব্দুল হামিদ খান


ভাইস এডমিরাল এসএম আহসান


লে. জেনারেল সাহিবজাদা ইয়াকুব খান



লে. জেনারেল টিক্কা খান



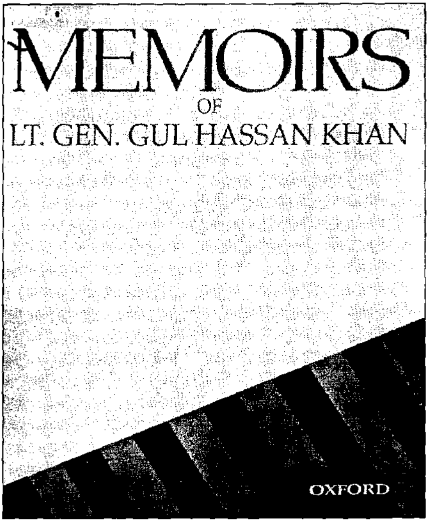
মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী



লে. জেনারেল জি.এম.এম পীরজাদা



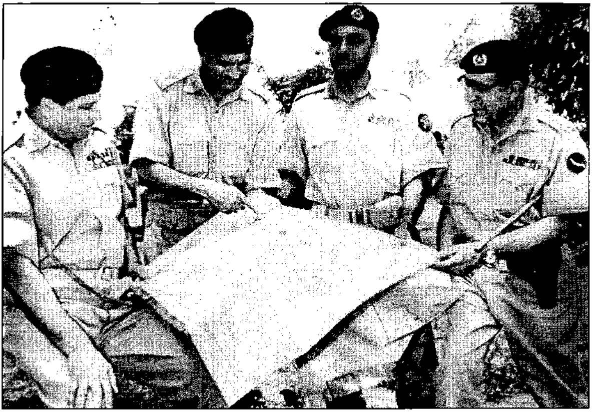
মেজর জেনারেল গুল হাসান খান



গুল হাসানের বইয়ের প্রচ্ছদ



এপ্রিল ১৯৭১। চট্টগ্রামে ৫৩ ব্রিগেড কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার এম আসলাম নিয়াজী অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন জেনারেল নিয়াজীকে



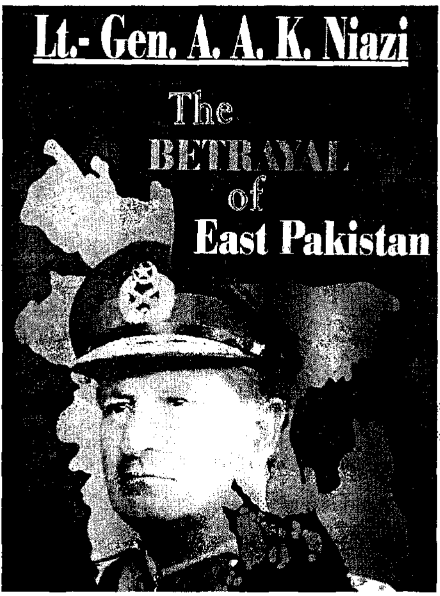
শাহবাজপুরে ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল রহিম খান হানাদার বাহিনীর পরিকল্পনা বোঝাচ্ছেন নিয়াজীকে। বা থেকে নিয়াজী, রহিম, ব্রিগেডিয়ার খুশি মোহাম্মদ ও ব্রিগেডিয়ার আব্দুলকাদের নিয়াজী। জুন ১৯৭১।



হানাদার বাহিনীর পরিকল্পনা, পর্যালোচনা। বাঁ থেকে অ্যাডমিরাল এম শরীফ, আর্টিলারী কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এসএসএ কাসিম, মেজর জেনারেল এম রহিম খান, নিয়াজী ও চট্টগ্রামের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আতা মোহাম্মদ



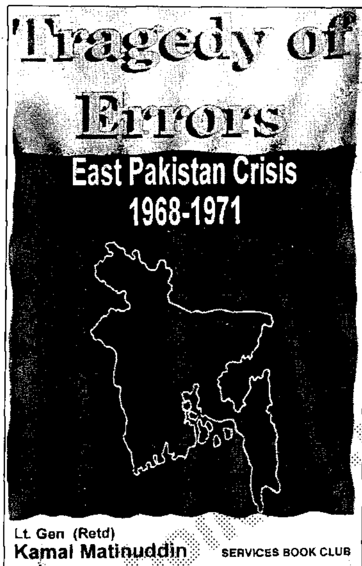
যশোরে নবম ডিভিশনের মেজর জেনারেল আনসারী অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন নিয়াজীকে, ৫ জুলাই, ১৯৭১



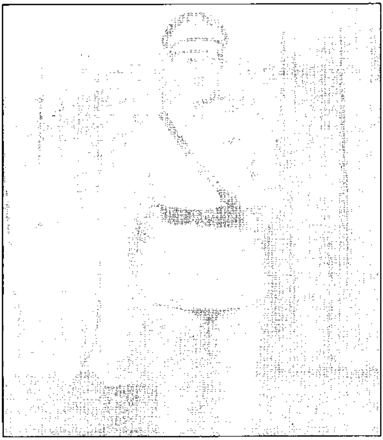
নিয়াজীর বইয়ের প্রচ্ছদ



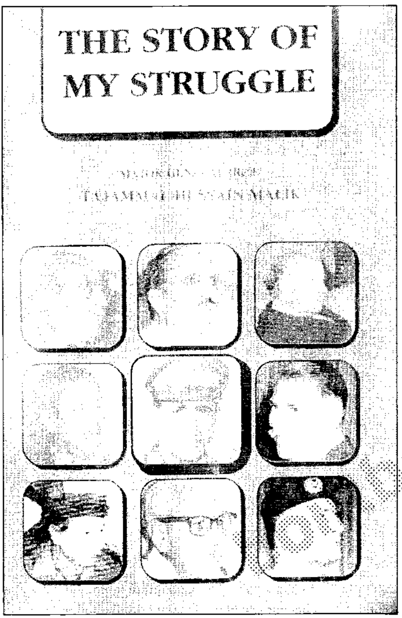
লে. জেনারেল কামাল মতিন উদ্দিন



কামাল মতিনউদ্দিনের বই



মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হুসাইন মালিক



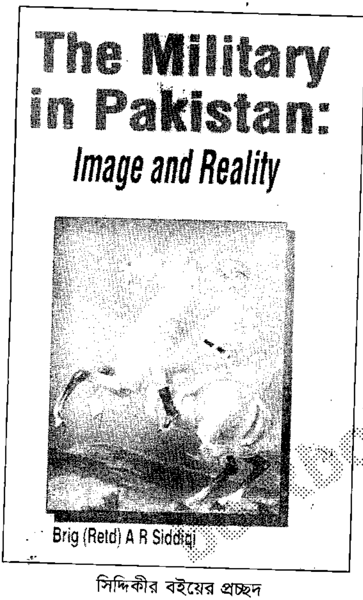
তোজাম্মেলের বইয়ের প্রচ্ছদ



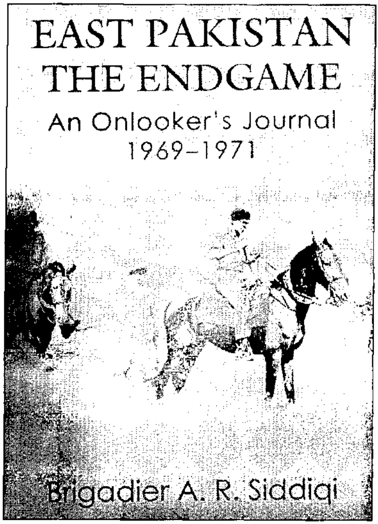
হিলি সীমান্তে নিয়াজী, পেছনে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মেল



ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী



সিদ্দিকীর বইয়ের প্রচ্ছদ



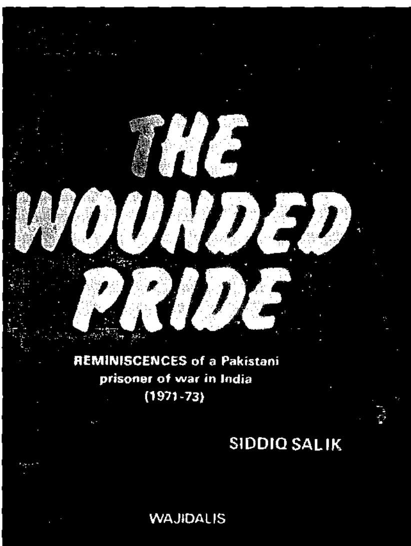
সিদ্দিকীর বইয়ের প্রচ্ছদ



১৯৬৫ সালে লাহোরে ঘোড়ায় চড়ে জলা পার হচ্ছেন তৎকালীন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। পেছনের ঘোড়ায় তৎকালীন মেজর সিদ্দিকী



ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক



সিদ্দিক সালিকের বইয়ের প্রচ্ছদ



মেজর জেনারেল হাকিম আরশাদ কোরেশী



হাকিম আরশাদ-এর
বইয়ের প্রচ্ছদ

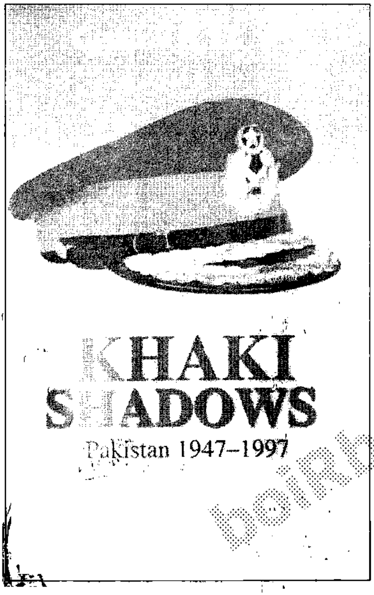


জহির আলম খান



জহির আলম খানের বইয়ের প্রচ্ছদ

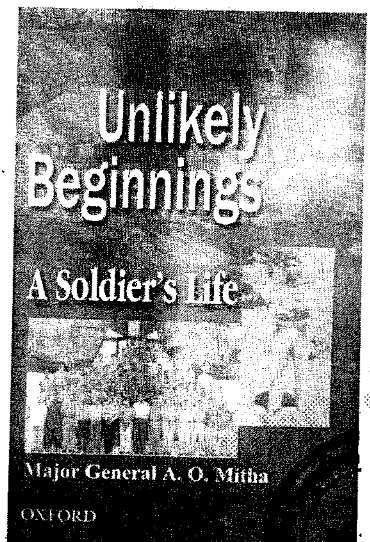

জেনারেল কে এম আরিফ



আরিফের বইয়ের প্রচ্ছদ



মেজর জেনারেল এ ও মিঠা ও তার স্ত্রী



মিঠার বইয়ের প্রচ্ছদ